জীবনী কোষ

(ভারতীয়-ঐতিহাসিক

৩য় খণ্ড

শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার

গোবিন্দ (২)

হইতে

দিব্যসিংহ দ্বিতীয় পর্য্যন্ত

১৩৪৫ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক
শ্রীদেবব্রত চক্রবর্ত্তী এম্ এ
২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

কলিকাতা
২০৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
জীবনী-কোষ মুদ্রাযন্ত্রে
শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার
কর্ত্তৃক মুদ্রিত

তৃতীয় খণ্ডের মুখবন্ধ।

এই তৃতীয় খণ্ডে ত বর্গ শেষ হইবে বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা হইল না। আকার, মূল্য ও পৃষ্ঠার সমতা রক্ষা করিতে হইলে বর্গের ও পৃষ্ঠার সমতা রক্ষা করা যায় না। আমরা আকার, মূল্য ও পৃষ্ঠার সমতা রক্ষা করিয়াই এক এক খণ্ড বাহির করিতে চেষ্টা করিব। ত-বর্গের দিব্যসিংহ দ্বিতীয় পর্য্যন্ত তৃতীয় খণ্ডে গেল। পূর্ব্ব খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডেও বন্ধুদের মধ্যে অনেকে আমাকে কোনকোন নাম লিখিয়া দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। আমি এজন্য তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ক বর্গ হইতে ১ পৃষ্ঠা আরম্ভ হইয়াছে, এখন ক্রমাগত তাহাই চলিবে।

নিকটে দীক্ষিত হইয়া তিনি প্রথমে 'মন্নাথ' ও পরে 'এমার' নামে খ্যাত হন। পুরীতে যে এমার মঠ আছে, তাহাই রামানুজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত স্বায় শিষ্য এমারের নামে অভিহিত হইয়াছে।

গোবিন্দ—(২) তিনি নীলকণ্ঠ বিরচিত নীলকণ্ঠি তাজিকের উপর ১৫৪৪ শকে (১৬২২ খ্রীঃ) রসালা নাম্নী এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

গোবিন্দ—(৩) দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশে গোবিন্দ নামে বহু ভূপতির নাম পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে ধ্রুবধারাবর্ষের পুত্র (৩য়) গোবিন্দই সমধিক বিখ্যাত। তাঁহার শাসন কালের বহু তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিনি প্রতীহার বংশীয় বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভটকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। গৌড়ের পালবংশীয় নরপতি ধর্ম্মপালও তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। গোবিন্দ ষাট বৎসরের অধিক কাল রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকাল প্রধানতঃ ৮ম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ৯ম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের কয়েক বৎসর বলিয়া গৃহীত হয়। তাঁহারই বিবিধ স্থানে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার রাজ্যও বহুদূর বিস্তৃত ছিল, এবং বিস্তৃত অধিকারের মধ্যে তাঁহার অনেক সামন্ত রাজা ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল ও কান্যকুব্জপতি চক্রায়ুধ গুর্জ্জররাজ নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া গোবিন্দের সাহায্য প্রার্থী হন এবং গোবিন্দ নাগভটকে পরাজিত করিলে, ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ তাঁহার অনুগত হন। ধর্ম্মপাল খুব সম্ভব গোবিন্দেরই কন্যা রান্নাদেবীকে বিবাহ করেন। গোবিন্দ, প্রথম অমোঘবর্ষ নামেও খ্যাত ছিলেন। মতান্তরে গোবিন্দের পুত্রের নাম অমোঘবর্ষ (প্রথম)। গোবিন্দের পিতা ধ্রুবধারাবর্ষ ও পিতামহ কৃষ্ণ।

গোবিন্দ অধিকারী—একজন যাত্রাওয়ালা। অনুমান ১৮০০ খ্রীঃ অব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী জাঙ্গীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণব ছিলেন।

বাল্যকালে তিনি গ্রামের পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়ন শেষে তিনি হাওড়া জেলার আমতার নিকটবর্ত্তী ধুরখালি গ্রামের গোলক দাস অধিকারীর নিকট যাইয়া কীর্ত্তন শিক্ষা করেন। পূর্ব্ববঙ্গ বাসী জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাত্রারদলের তিনি প্রসিদ্ধ 'ছোকরা' ছিলেন। পরে নিজে একটী দল গঠন করিয়া কীর্ত্তন গান গাহিয়া বেড়াইতেন। ইহাতে অধিক অর্থাগম হইত না দেখিয়া, তিনি 'কালীয়দমন' একটী যাত্রার দল গঠন করেন। 'রাধাকৃষ্ণের লীলা' অভিনয়ে স্বয়ং দূতি

রূপে অবতীর্ণ হইয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন। তাঁহার পালা শুনিবার জন্য সহস্র সহস্র লোক দূর হইতে আসিত। এই যাত্রা উপলক্ষে তাঁহাকে অনেক সঙ্গীত ও পদাবলী রচনা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পদাবলী বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে অনেক সহায়তা করিয়াছে। 'শুক শারীর পালা' ও 'চূড়া নূপুরের দ্বন্দ্ব' নামে তাঁহার রচিত দুইখানি নাটক আছে। তিনি একাধারে যাত্রা, কীর্ত্তন ও কথকতা বিষয়ে যথেষ্ট নাম করিয়া গিয়াছেন। ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ—সুপ্রসিদ্ধ 'লঘুভারত' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের কাব্যেতিহাসের প্রণেতা। তিনি পাবনা জেলার শালখিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

গোবিন্দ খাঁ—শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত বানিয়াচঙ্গের রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কেশব মিশ্রের বংশধর পদ্মনাভ মিশ্রের একাদশ পুত্রের মধ্যে গোবিন্দ খাঁ সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। গোবিন্দ খাঁ প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে খাসিয়া জাতি লাউড় রাজ্যে অতিশয় উৎপাত আরম্ভ করে। লাউড়ের অধিবাসীরা গোবিন্দ খাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, তিনি সসৈন্যে লাউড় রাজ্যে প্রবেশ করিয়া খাসিয়াদিগকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন এবং লাউড় রাজ্য অধিকার করেন। লাউড় ও বানিয়াচঙ্গের মধ্যে জগন্নাথপুর নামে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য লাউড়ের সামন্ত রাজ্য স্বরূপ ছিল। লাউড়ের ন্যায় ইহাও বানিয়াচঙ্গের অধীন হয়। জগন্নাথপুরের অধিপতি গোবিন্দ সিংহ (অন্যনাম জয় সিংহ) ইহাতে দুঃখিত হইয়া দিল্লী দরবারে প্রতীকার প্রার্থী হইলেন। ...র গোবিন্দ খাঁর নিকট দূত প্রেরণ করেন। দূত অপমানিত ও গোবিন্দ খাঁর পদাঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। অবশেষে গোবিন্দ খাঁ কৌশলে ধৃত হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হন এবং প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু বিধাতৃবিধান দুর্জ্ঞেয়, ঘাতক নামের সাদৃশ্য হেতু ভুলক্রমে গোবিন্দ খাঁর পরিবর্ত্তে গোবিন্দ সিংহেরই শিরশ্ছেদ করিল। অবশেষে সত্য ঘটনা প্রকাশিত হইলে দিল্লীশ্বর গোবিন্দ খাঁর প্রাণদণ্ড রহিত করিলেন বটে কিন্তু তাঁহাকে মুসলমান হইতে হইল। তখন তাঁহার নাম হইল হবিব খাঁ। হবিব খাঁ দেশে আসিয়াই লাউড় অধিকার করিলেন। এদিকে জগন্নাথপুরের রাজা গোবিন্দ সিংহের ভ্রাতা বিজয়সিংহ প্রতীকার প্রার্থী হইয়া দিল্লীশ্বরের শরণাপন্ন হন। দিল্লীশ্বর বিজয়সিংহকে লাউড় রাজ্যের অর্দ্ধভাগের সনন্দ প্রদান করেন। তিনি সনন্দ পাইয়াও রাজ্যলাভে অসমর্থ হন। অবশেষে ছয় আনা পাইয়া হবিব খাঁর

সঙ্গে মীমাংসা করেন। পরে হবিব খাঁর পুত্র মজলিস আলম বিজয়সিংহের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। হবিব খাঁর দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ মজলিস আলম এবং কনিষ্ঠ মজলিস প্রতাব।

গোবিন্দ গুপ্ত— দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনিই খুব সম্ভব মগধে গুপ্তবংশের এক শাখার আদি পুরুষ। তিনি কৃষ্ণগুপ্ত নামেও পরিচিত। এই গোবিন্দ গুপ্তের বংশীয় শিলালিপি সমূহ প্রধানতঃ অঙ্গ অথবা মগধের সীমার মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তজ্জন্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এই শাখা গুপ্তবংশের অধিকার মগধেই সীমাবদ্ধ। তাঁহার পুত্র হর্ষগুপ্ত ও পৌত্র (প্রথম) জীবিতগুপ্ত।

গোবিন্দ ঘোষ—তিনি ঘোষ ঠাকুর বলিয়া পরিচিত। বসুদেব ঘোষ ও মাধব ঘোষ নামে তাঁহার আরও দুই সহোদর ছিল। তাঁহারা উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ এবং তাঁহাদের জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কুলিন গ্রাম। তাঁহারা নবদ্বীপবাসী ছিলেন। পরে গোবিন্দ ঘোষ অগ্রদ্বীপে, বাসুদেব ঘোষ তমলুকে এবং মাধব ঘোষ দাঁইহাটে শ্রীপাট নির্ম্মাণ করেন। এই গোবিন্দ ঘোষকে হরীতকী সঞ্চয়ের জন্য শ্রীচৈতন্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে কৃপা পরবশ হইয়া বলিয়াছিলেন—"তোমার দ্বারা ভগবানের মহিমা প্রকাশ পাইবে। যাহা কিছু অদ্ভুত পাইবে যত্ন করিয়া রাখিবে।" তৎপরে শ্রীচৈতন্যের নিকট বিদায় লইয়া তিনি দেশে আসেন ও দারপরিগ্রহ করেন। একদিন স্নান করিতে যাইয়া এক খণ্ড কাষ্ঠ প্রাপ্ত হন। পরে স্বপ্নে আদেশ হইল এই কাষ্ঠ খণ্ড দ্বারা কোন ভাস্কর বিগ্রহ মূর্ত্তি করিবে ও শ্রীচৈতন্য তাহা প্রতিষ্ঠা করিবেন। বলা বাহুল্য তাহাই হইল। সেই বিগ্রহের নাম গোপীনাথ ছিল। তাঁহার এক পুত্রের নামও গোপীনাথ ছিল। তিনি কখনও স্বীয় পুত্রকে কখনও গোপীনাথকে বেশী আদর করিতেন। অকস্মাৎ তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হইল। তখন আমার 'জলপিণ্ডের কেহ রহিল না' এই মনে করিয়া তিনি সেই বিগ্রহের সেবায় বিরত হইলেন। স্বপ্নে বিগ্রহদেব তাঁহাকে আদেশ করিলেন— "আমার সেবা কর, আমি তোমার পুত্র স্থানীয় হইলাম, এবং শ্রাদ্ধ করিব।" তদবধি তিনি আবার বিগ্রহ গোপীনাথের সেবাতেই অনুরাগের সহিত প্রবৃত্ত হইলেন। কথিত আছে, তাঁহার মৃত্যুর পরে গোপীনাথ বিগ্রহ তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন।

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী— বাঙ্গালী বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। তিনি উৎকৃষ্ট গায়ক ও ভক্তিমান ব্যক্তি ছিলেন। তজ্জন্য অনেক স্থলে তিনি ভাবুক চক্রবর্ত্তী নামেও প্রসিদ্ধ হন। "পদকল্প তরু"তে

তাঁহার কয়েকটি পদ আছে। তিনি মুরশিদাবাদ জিলার অধিবাসী এবং শ্রীনিবাস আচার্য্যের একজন অনুগত শিষ্য ছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র—(১) বঙ্গদেশে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে গোবিন্দ চন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পিতামহের নাম সুবর্ণ চন্দ্র, পিতার নাম মাণিকচন্দ্র ও মাতার নাম ময়নামতী। গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। চোলবংশীয় দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোল তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশীয় গ্রন্থে আছে রাজেন্দ্র চোল গোবিন্দচন্দ্র কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্র চোল ১০৬৩—১১১২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ নবদ্বীপের সুবর্ণবিহার গোবিন্দচন্দ্র কর্ত্তৃকই প্রতিষ্ঠিত হইয় তাঁহার রাজধানী পটিকানগর এখনও বর্ত্তমান আছে।

গোবিন্দচন্দ্রের দুই মহিষী অদুনা ও পাদুনা সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের কন্যা ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মাণিকচন্দ্র ও মাতা ময়নামতী। মাণিকচন্দ্র ত্রিপুরা রাজবংশে বিবাহ করেন। ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষ্যা ছিলেন। তিনি গুরুর নিকট "মহাজ্ঞান" শিক্ষা করেন। ঐ বিদ্যাপ্রভাবে মৃতকে জীবন দান করা যাইতে পারিত। গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রকে উপলক্ষ করিয়া যে সকল গাথা প্রধানতঃ উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে প্রচলিত আছে, তাহা হইতে তৎকালীন সামাজিক, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, ও রাজনীতিক বহু মূল্যবান্ তথ্য শুনিতে পাওয়া যায়। গোপীচন্দ্র দেখ।

গোবিন্দ চন্দ্র—(২) তিনি গাহড়বাল প্রদেশের রাজা চন্দ্রদেবের পৌত্র ও মদনচন্দ্রের পুত্র। তিনি অঙ্গদেশেস্থ অধিপতি মদনদেবের দৌহিত্রী কুমার দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের অধিপতি পালবংশীয় নরপতিদের সামন্ত নরপতি ছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য—ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগের বাঙ্গালী সংবাদিক, ১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়" নামে একখানি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। উহা পূর্ব্বে পাক্ষিক পত্রিকা ছিল। অদ্বৈতচন্দ্র, উদয়চন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র এই তিন ভ্রাতা, উক্ত পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দ হইতে ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মুঘল রাজত্বের মধ্যভাগে উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী কর্ম্মচারী। নদীয়া জিলার অন্তর্গত নবদ্বীপের সন্নিকটস্থ কামারকুলি গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। অতি শৈশবেই পিতৃহীন হইয়া কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েন এবং দারিদ্র্যের তাড়নায় মাত্র আট বৎসর বয়সেই অর্থ

উপার্জ্জনের জন্য গৃহত্যাগ করেন। উদ্দেশ্যহীন ভাবে কিছুকাল নানাস্থানে বিচরণ করিতে করিতে এক সন্ন্যাসীর সহিত দিল্লী গমন করেন। তথায় থাকিবার সময়েই তিনি সুন্দররূপে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। ক্রমে দিল্লীর সম্রাটের দেওয়ানের সুদৃষ্টি লাভ করেন এবং তাঁহারই অনুগ্রহে আরও কিছু শিক্ষা লাভ করিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অধ্যবসায় বলে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে করিতে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার 'ক্রোড়িয়ান' অর্থাৎ প্রধান রাজস্ব সংগ্রহকের পদ লাভ করেন। দীর্ঘকাল ঐ পদে নিযুক্ত থাকিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন এবং সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। পৈতৃক নিবাস কামারকুলির বাসগৃহ গঙ্গার কুক্ষিগত হওয়ায় তিনি পূর্ব্বস্থলী গ্রামে নূতন প্রাসাদোপম বাটী নির্ম্মাণ করেন। তৎসংলগ্ন দেবায়তন, কাছারী বাড়ী, নহবৎখানা প্রভৃতিও নির্ম্মিত হয়। পাঠান ও বাঙ্গালী বাগদী জাতীয় প্রহরীরা এই সকল রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হয়। গোবিন্দ চন্দ্রের মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে নানারূপ জনশ্রুতি আছে।

গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী—তিনি বগুড়া জেলার অন্তর্গত সেরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জয়শঙ্কর চৌধুরী এবং তাঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাঁহার সঙ্গীত বঙ্গদেশে সুপরিচিত। তাঁহার সদ্ভাব উদ্দীপক সঙ্গীতগুলি প্রকৃতই মনোরম। রাজধানীর নিকট জন্ম হইলে, রামপ্রসাদ, দাশরথি প্রভৃতির ন্যায় তিনিও প্রসিদ্ধি লাভ করিতেন। নিম্ন লিখিত গ্রন্থগুলি তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন।—(১) সদ্ভাব সঙ্গীত। (২) সঙ্গীত পুষ্পাঞ্জলি। (৩) প্রমীলার চিতারোহণ। (৪) অঙ্গুরী সংবাদ। (৫) যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ। (৬) সতী নিরঞ্জন। (৭) কলঙ্ক-ভঞ্জন। (৮) ললিতলবঙ্গ কাব্য। প্রথম দুইখানি সঙ্গীত গ্রন্থ, তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত নাটক, অবশিষ্ট তিনখানি পাঁচালী কাব্য ইত্যাদি। সদ্ভাব সঙ্গীত ব্যতীত অন্যগুলি এখনও মুদ্রিত হয় নাই।

গোবিন্দচন্দ্র দাস, কবি—ঢাকা জেলার অন্তর্গত জয়দেবপুরে ১২৬১ বঙ্গাব্দের ৪ঠা মাঘ কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামনাথ দাস ও মাতার নাম আনন্দময়ী। তাঁহার পিতা অতি দরিদ্র গৃহস্থ ছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ইহাতে সংসারে দারুণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে, তথাকার দয়ালু রাজা কালীনারায়ণ রায়, এই দরিদ্র পরিবারকে মাসিক চারি টাকা সাহায্য করিতেন এবং পরে এই বৃত্তির পরিবর্ত্তে কিছু নিষ্কর ভূমি প্রদান করেন। গোবিন্দচন্দ্র

প্রথমে গ্রাম্য বিদ্যালয়েই পাঠ আরম্ভ করেন এবং যথাসময়ে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন হইতেই তিনি কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। রাজা কালীনারায়ণ রায় তাঁহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়া, ঢাকায় নর্ম্মাল স্কুলে অধ্যয়নের জন্য তাঁহাকে পাঁচ টাকা বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। তথায় এক বৎসর অধ্যয়নের পর নানা কারণে তিনি ঐ বিদ্যালয় ত্যাগ করিলেন। অতঃপর রাণী সত্যভামা দেবীর অর্থানুকুল্যে তিনি ঢাকার মেডিকেল স্কুলে প্রবেশ করেন। কিন্তু শব ব্যবচ্ছেদের ভয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি মেডিকেল স্কুল পরিত্যাগ করিলেন। তিনি নিতান্ত অব্যবস্থিত চিত্ত ছিলেন বলিয়া, আজীবন কষ্ট পাইয়া গিয়াছেন। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে তিনি রাজা কালীনারায়ণ রায়ের পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইলেন। ১২৮৫ বঙ্গাব্দে অকস্মাৎ রাজা কালীনারায়ণের মৃত্যু হইলে, রাজেন্দ্রনারায়ণ ভাওয়ালের রাজা হইয়া বিলাসিতা ও রাজকার্য্যে অমনোযোগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ইহাতে রাজ্য মধ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে, তিনি ব্যথিত হইয়া রাজ সরকারের চাকুরী পরিত্যাগ করেন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে তিনি জয়দেবপুরেরই এক গৃহস্থের কন্যা সারদাসুন্দরীকে বিবাহ করেন। পত্নী প্রেমিক স্বামী তাঁহার অমর লেখনী দ্বারা পত্নী সারদাসুন্দরীকে চিরস্মরণীয়া করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'প্রেম ও ফুল' এবং 'কুঙ্কুম' পত্নী প্রেমের স্মৃতিস্তম্ভ। গোবিন্দচন্দ্রের কৈশোরে রচিত কবিতাবলী এখন দুষ্প্রাপ্য। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে রচিত 'প্রসূন' নামে ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক এখন অপ্রাপ্য। ১২৮৬ বঙ্গাব্দে তিনি ময়মনসিংহে গমন করেন এবং তাঁহার বাল্যবন্ধু দেবেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর ভবনে বাস করিতে থাকেন। ময়মনসিংহের 'সারস্বত' উৎসবে তাঁহার 'বাণীর আরাধনা' শীর্ষক কবিতা পঠিত হয় এবং ১২৮৬ সনের 'বান্ধবে' তাঁহার রচিত 'পরশুরামের শোণিততর্পণ' শীর্ষক কবিতা প্রকাশিত হয়। সুসঙ্গ দুর্গাপুরের মহারাজা কমলকৃষ্ণ তাঁহার সাংসারিক অসচ্ছলতার কথা জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে তাঁহার খাজাঞ্চীর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু অসুস্থতার জন্য তিনি সেই চাকুরী পরিত্যাগ করেন। তৎপরে মুক্তাগাছার বিদ্যোৎসাহী ভূম্যধিকারী কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী কর্ত্তৃক তাঁহার দপ্তরে নিযুক্ত হইলেন। কেশবচন্দ্র তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিলেও, নানা কারণে তাঁহাকে কার্য্য হইতে অপসৃত করিতে বাধ্য হইলেন। ১২৮৯ বঙ্গাব্দে তিনি ময়মনসিংহ সাহিত্য সমিতির অধ্যক্ষ

নিযুক্ত হন এবং তথায় তিনি সারস্বত কবি বলিয়া অভিহিত হইতেন। ১২৯০ বঙ্গাব্দে দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক পত্র 'নব্য ভারত' কলিকাতা হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি এই সময় কলিকাতা আগমন করিয়া দেবীবাবুর সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁহার নিকট তিনি অনেক সময় অর্থ সাহায্য ও নানা প্রকার সৎপরামর্শ প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার গীতিকাব্যগুলি এককালে দেবীবাবুর 'নব্য ভারত প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল এবং মুদ্রণ ব্যয় পুস্তক বিক্রয় লব্ধ অর্থ হইতে তিনি ক্রমে পরিশোধ করিয়াছিলেন। ১২৯০ বঙ্গাব্দে তিনি ময়মনসিংহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং সেরপুরের সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের 'চারুবার্ত্তা' নামক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১২৯২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার প্রথমা স্ত্রী সারদাসুন্দরী পরলোক গমন করেন। অতঃপর হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে কৃষি বিভাগ এবং পরিশেষে ইতিহাস ও সাহিত্য সম্পর্কিত নিজ কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য তাহার প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে ১২৯৩—৯৪ সনে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'নবজীবনে' তাঁহার কয়েকটী উৎকৃষ্ট কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। সেরপুর অবস্থান কালে তিনি জয়দেবপুর আগমন করিয়া তাহার নব প্রকাশিক 'কুস্কুম' এক খণ্ড রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণকে উপহার দিলেন। তিনি উহা পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। রাজা ও রাজমাতা সত্যভামাদেবী কবিকে পুনরায় বিবাহ করিয়া জয়দেবপুরে অবস্থান করিতে অনুরোধ করেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিবাহ ও আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু অকস্মাৎ রাজার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এসম্পর্কে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত নবযুগ নামক সাপ্তাহিক পত্রে রাজা ও তাহার ম্যানেজারের বিরুদ্ধে অতি তীব্র ভাষায় এক প্রবন্ধে অনেক অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছিল। উক্ত প্রবন্ধ তাহার রচিত বলিয়া রাজা তাহাকে জয়দেবপুর ত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। ১২৯৮ সনে কবি তাহার জন্মভূমি জয়দেবপুর হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। ইহার পর কলিকাতায় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে, তিনি রাজাকে বলিলেন এই প্রবন্ধ আমার রচিত নহে অতএব আমাকে জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আদেশ প্রদান করুন। কিন্তু ইহাতে কোন ফলোদয় না হওয়ায়, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে বলিলেন, 'আচ্ছা, না লিখিয়াও যদি

লিখিয়াছি বলিয়া মিছামিছি দণ্ডিত হইলাম; তবে এখন আমি লিখিব দেখিবেন আর কেহ লিখিতে পারে কিনা'? অতঃপর কবি পাঁচ দিনে একখানি বিদ্রূপাত্মক কাব্য রচনা করিয়া, তাহার নামকরণ করিলেন মগের-মুল্লুক'। উহা কলিকাতার তদানীন্তন সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র 'প্রকৃতিতে' প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা নিয়া ফৌজদারী আদালতে এক মান-হানির মোকদ্দমা সৃষ্টি হয় এবং তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করা হয়। তিনি অনেক স্থানে গুপ্তচরের হাতে লাঞ্ছিত হইয়াছেন, এমন কি অনেক সময় তাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত সংশয় হইয়াছে। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর প্রায় সাত বৎসর পরে বিক্রম-পুরান্তর্গত ব্রাহ্মণ গ্রামে তিনি দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন এবং তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া, বাস করিতে থাকেন। ১৩০১ সনে তিনি হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কর্ম্ম ত্যাগ করেন। ইহার পর মুক্তাগাছার মহারাজা সূর্য্য কান্ত আচার্য্য চৌধুরীর জমিদারীতে একটী চাকুরী পান। রাজা রাজেন্দ্র-নারায়ণ ১৯০১ সালে মৃত্যু মুখে পতিত হইলে, তাঁহার পুত্রগণ তাঁহাকে ভাওয়ালে আগমন করিতে আহ্বান করেন এবং তিনি ভাওয়ালে আগমন করেন। এই সময় তিনি মহারাজা সূর্য্যকান্তের কার্য্য হইতেও অপসৃত হন এবং ভয়ানক অর্থাভাবে পতিত হন। মুক্তাগাছার দানশীল ভূম্যধিকারী জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী নিরুপায় দরিদ্র কবিকে আমরণকাল পর্য্যন্ত ২০৲ টাকার বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন এবং ভাওয়ালের তিন কুমার কবিকে মাসিক ২৪৲ টাকা বৃত্তি প্রদান করিতে লাগিলেন কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ভাওয়া-লের রাজকুমারগণের অভাবে তাঁহাদের সাহায্য বন্ধ হইয়া যায় এবং তিনি শিশুসন্তান সহ অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। কবি রোগ কাতর ও অন্ন সংস্থানের উপায়হীন হইয়া নৈরাশ্যে এক কবিতা লিখিলেন। ঐ কবিতা প্রকাশিত হইলে বঙ্গের নানা স্থান হইতে, তিনি যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য পাইয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্যের জন্য দেশে নানা প্রকার সভা সমিতি পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ১৩২২ সনে গুরুতর পীড়িত হইয়া, তিনি ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে ভর্ত্তি হন। তৎকালীন 'বাঙ্গালী' নামক দৈনিক সংবাদ পত্রে এই সংবাদ দেখিয়া, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় ভাগলপুর হইতে ঢাকার ব্যারিষ্টার শ্রীযুত প্রাণকিশোর বসু মহাশয়ের নিকট নিম্ন লিখিত তারবার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন,—কবির চিকিৎ-সার সুব্যবস্থা করুণ; সম্পূর্ণ ব্যয় ভার আমি বহন করিব। রোগমুক্ত হইয়া

তিনি পল্লীগ্রামে ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার শারীরিক দৌর্ব্বল্য দূরীভূত হইল না। ক্রমেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। এই সময়ে তিনি ঢাকার উপকণ্ঠ নারান্দিয়াতে এক ভদ্র লোকের বাটীর একাংশে বাস করিতেছিলেন। রীতিমত চিকিৎসা, শুশ্রূষা ও পথ্য ইত্যাদির অভাবে তাঁহার মৃত্যু ঘনাইয়া আসিল। ১৩২৫ সনের ১০ই আশ্বিন তাঁহার দুঃখময় জীবনের অবসান হইল। তাঁহার রচিত গ্রন্থ, অন্যান্য রচনা এবং অপ্রকাশিত কবিতাবলীর একটী তালিকা— (১) 'প্রসূন' ক্ষুদ্র কবিতা গ্রন্থ ইহা অধুনা বিলুপ্ত। (২) 'প্রেম ও ফুল' গীতিকাব্য। (৩) 'কুঙ্কুম' গীতিকাব্য। (৪) 'মগের মুল্লুক' বিদ্রূপ রসাত্মক কবিতা। (৫) 'কস্তুরী' গীতিকাব্য। (৬) 'চন্দন' গীতিকাব্য। (৭) 'ফুলরেণু' সনেটের সমষ্টি। (৮) 'বৈজয়ন্তী' গীতিকাব্য। (৯) 'শোক ও সান্ত্বনা' কবিতা পুস্তিকা। (১০) 'শোকোচ্ছ্বাস' একটি শোক কবিতা। (১১) 'গীতার কাব্যানুবাদ'। (১২) অপ্রকাশিত কবিতাবলি ইহাতে কতকগুলি 'নব্য ভারতে' প্রকাশিত হইয়াছিল, কতকগুলি অমুদ্রিত আছে, সমগ্রগুলি একত্র করিলে প্রায় তিন চারি খানি গীতিকাব্য হইবে।

গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ—আসামের কাছাড় রাজবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর (১৮১৩ খ্রীঃ) তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। মণিপুর-পতি মারজিৎ কাছাড় রাজ্য আক্রমণ করিলে (১৮১৮ খ্রীঃ) গোবিন্দ নারায়ণের সেনাপতি (মণিপুর রাজেরই ভ্রাতা) বিশ্বাস ঘাতকতাপূর্ব্বক আক্রমণকারীদের পক্ষ অবলম্বন করেন। তখন গোবিন্দ নারায়ণ শ্রীহট্টে পলায়ন করিয়া ইংরেজ সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু প্রথমে ইংরেজ সরকার তাঁহাকে সাহায্য করিতে সম্মত হন নাই। সেই সময়েই ব্রহ্মদেশের রাজার সহিত ইংরেজদের মনোমালিন্য চলিতেছিল। বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্ট (Lord Amherst) গোবিন্দচন্দ্রকে কাছাড়ের সিংহাসনে স্থাপন করিয়া ব্রহ্ম-রাজ ইংরেজ আশ্রিত রাজ্য (কাছাড়) আক্রমণ করিয়াছেন এই অজুহাতে ব্রহ্মরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। অথচ যেদিন কলিকাতা হইতে বড়লাট যুদ্ধ ঘোষণা করেন, তাহার পর দিন ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধির সহিত গোবিন্দনারায়ণের সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হয়। ঐ সন্ধিপত্রের সর্ত্তানুসারে ইংরেজ সরকার বার্ষিক দশ সহস্র টাকা কর দিবার বিনিময়ে বহিঃশত্রুর হাত হইতে কাছাড় রাজ্য রক্ষা করিতে সম্মত হন।

ব্রহ্ম যুদ্ধের অবসান হইলে কিছূকাল গোবিন্দচন্দ্র শান্তিতে রাজ্যশাসন

করেন। ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দে তিনি মণিপুরীদের হস্তে গুপ্তভাবে নিহত হইলে, কাছাড় ইংরেজ অধিকার ভুক্ত হয়।

গোবিন্দচন্দ্র রায়—তাঁহার জন্মস্থান বরিশাল জিলার অন্তর্গত মীরপুর গ্রাম। তিনি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। বাল্যকালেই তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি ধর্ম্মানুরাগী লোক ছিলেন। সেই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের খুব আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন এবং এই অপরাধে পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত হন। তাঁহার পত্নীও তাঁহার অনুগমন করেন। এই সময়ে তিনি অতিশয় অর্থ কষ্টে পতিত হইয়াছিলেন। কিছুদিন শান্তিপুরে শিক্ষকের কর্ম্ম করিয়া পরে বারাণসী গমন করেন। এই স্থানে তিনি কাশীর প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ মৈত্র মহাশয়ের আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করেন। কাশীর জিলার জজ আইরন সাইড সাহেব (Mr. J. B. Ironside) হোমিওপ্যাথির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ডাক্তার মৈত্রের পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি আগ্রায় বদলী হইয়া তাঁহার মিত্র ডাক্তার মৈত্রকে একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার পাঠাইতে লিখিলেন। তদনুসারে ডাক্তার গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয় তথায় প্রেরিত হন। উক্ত সাহেব গোবিন্দবাবুকে আগ্রায় স্থায়ী হইতে বিশেষ সাহায্য করেন। একটী জটিল রোগীকে রোগ মুক্ত করিয়া আগ্রায় তিনি খুব যশস্বী হন। ক্রমে তাঁহার সুনাম চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয় এবং অর্থাগমও খুব হইতে থাকে। এক সময়ে তিনি অর্থাভাবে দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার সেই অভাব দুরীভূত হইল। অর্থাভাব দুর হওয়ায় তিনি জ্ঞানার্জ্জনে ও ললিত কলার অনুশীলনে মনোযোগী হইলেন। সঙ্গীতে তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। এখন তিনি সময় ও সুযোগ পাইয়া সঙ্গীত ও কাব্যে মনোযোগ প্রদান করিলেন। এই সময়েই তাঁহার প্রসিদ্ধ সংগীত যমুনা লহরী (নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা, তটশালিনী সুন্দরী যমুনে ও) এবং ভারত বিলাপ (কতকাল পরে, বল ভারতরে; দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে) সংগীত রচিত হয়। এই দুই সংগীতই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। এই প্রাণস্পর্শী সংগীতগুলি এক সময়ে বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র বড়ই উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল। তৎপরে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের আলোচনায় গভীর ভাবে মনোনিবেশ করেন। পাঠে অত্যধিক মনোযোগ দিবার ফলে এবং তাঁহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক আইরন সাইড সাহেব অন্যত্র বদলী হওয়ার ফলে

তাঁহার আয় খুব কমিয়া গেল। সুতরাং লোক সমাগমও খুব কম হইতে থাকে। এই সময়ে ধনাগমের বন্ধুরা ধীরে ধীরে স্বার্থের হানী হওয়ায় দূরে সরিয়া পড়িলেন। ইহার কিছুকাল পরে তাঁহার পত্নী বিয়োগ হয়। তাহার পরেই তিনি তাঁহার ভ্রাতা বেরেলীর উকিল মহাশয়ের নিকট যাইয়া অবস্থিতি করেন। এই স্থানেই তিনি পরলোক গমন করেন।

গোবিন্দচরণ দাস—১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্ট সহরে তাহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাস। তিন বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। তাঁহার মাতা তাঁহাকে সংস্কৃত পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তিনি ক্রমে সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং ব্যাকরণের তর্কে ব্রাহ্মণদিগকে পরাজয় করিতে আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার মাতা তাঁহার টোলে যাওয়া বন্ধ করিয়া দেন। সেই সময় হইতে তিনি ইংরেজী পড়িতে আরম্ভ করেন। ছয় বৎসর ইংরেজী পড়িয়া তিনি জুনিয়ার স্কলারসিপ ও দুইটী পদক প্রাপ্ত হন। তৎপর তিনি ঢাকা যাইয়া পড়িবার মনস্থ করিলেন, তাঁহার মাতাও তাঁহার সঙ্গে গেলেন এবং দুই বৎসর অধ্যয়নের পর সিনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। প্রথমে তিনি ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। তৎপর তিনি কয়টি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে শ্রীহট্টে প্রথম নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হয় এবং গোবিন্দচন্দ্র প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইহার পরে গৌহাটি, জোড়হাট, ধুবড়ীতে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হন। কিন্তু তিনি সেই সমস্ত পদ গ্রহণ করেন নাই। সঙ্গীত বিদ্যায় তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি একজন কাওলাত ছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। মৃত্যুর তের দিন পূর্ব্বে তিনি কলিকাতাতে কুস্তি দেখাইয়া সকলকে অবাক করিয়াছিলেন। তিনি ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সত্তর বৎসর বয়সে বয়সে পরলোক গমন করেন।

গোবিন্দ দাস—(১) এই কবির রচিত একটী ভাষান পাওয়া গিয়াছে।

গোবিন্দ দাস—(২) একজন কবি। তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। ১৯৯৫ অব্দে তিনি 'কালিকা মঙ্গল' নামে একখানা কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে একটী বিদ্যাসুন্দর পালা আছে। গোবিন্দ দাসের সুন্দরের বাড়ী গৌর রাজ্যের অন্তর্গত কাঞ্চননগর। তাঁহার জন্মস্থান চট্টগ্রামের

অন্তর্গত দেবগ্রাম। তাঁহার কাব্য অশ্লীলতা পূর্ণ নহে। নামেই বুঝা যায় তাঁহার গ্রন্থ কালী মাহাত্ম্য জ্ঞাপক।

গোবিন্দ দাস—(৩) যতিরাজ রামানুজাচার্য্যের পূর্ব্ব গুরু যাদব প্রকাশ অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তিনি স্বীয় শিষ্য রামানুজাচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গোবিন্দদাস নামে খ্যাত হন। এই সময়ে আশী বৎসর বয়সে তিনি 'যতিধর্ম্ম সমুচ্চয়' নামক অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন।

গোবিন্দদাস — (৪) পদমালা নামক পদ সমূহের সংগ্রহ পুস্তকের প্রণেতা। চৈতন্যদেবের বিরাশী বৎসর পরে রাজসাহীর বুধরী গ্রামে বৈদ্যকুলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

গোবিন্দদাস—(৫) তিনি 'গরুড় পুরাণ' ও 'গীতাসার' নামক গ্রন্থদ্বয়ের রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধ প্রভাবের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

গোবিন্দ দাস—(৬) এই বৈষ্ণব ভক্ত একটী সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে গোবিন্দপন্থী কহে। ফৈজাবাদ জিলার অহরোলিতে তাঁহার সমাধি আছে। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে তথায় একটী মেলা হয়। তাঁহাদের সাধন প্রণালী বৈষ্ণবদেরই মত।

গোবিন্দদাস, কবিরাজ—একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা। তাঁহার রচিত ৪৫৮টী পদ পাওয়া গিয়াছে। ১৪৫৯ শকে (১৫৩৭ খ্রীঃ) কুমারনগর গ্রামে বৈদ্য বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি শ্রীচৈতন্যের সহচর পরম ভাগবত চিরঞ্জীব সেনের পুত্র এবং শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ও কবি দামোদরের দৌহিত্র। গোবিন্দের মাতার নাম সুনন্দা। তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের মন্ত্র শিষ্য ছিলেন। ১৫৩৫ শকের (১৬১৩ খ্রীঃ) আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে তিনি পরলোক গমন করেন। 'সঙ্গীত মাধব' নাটক ও 'কর্ণামৃত' নামক গ্রন্থদ্বয় তাঁহারই রচিত। প্রেম বিলাস, ভক্তি রত্নাকর, নরোত্তম বিলাস, সারাবলী, অনুরাগবল্লী প্রভৃতি গ্রন্থে প্রসঙ্গত গোবিন্দদাস কবিরাজ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। কিন্তু ধারাবাহিক জীবন চরিত কোথাও পাওয়া যায় না। কথিত আছে তিনি চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শাক্ত ছিলেন। পরে গ্রহণী রোগাক্রান্ত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হন। ১৫৭৭ খ্রীঃ অব্দে ৪০ বৎসর বয়সে তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম দিব্যসিংহ। প্রেম বিলাসের লেখক বলরাম দাস তাঁহার ভাগিনেয় ছিলেন।

গোবিন্দ দাস কর্ম্মকার—তাঁহার রচিত করচা অতি প্রসিদ্ধ ও প্রামাণিক গ্রন্থ। তাহাতে তিনি নিজ পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন—

বৰ্দ্ধমান কাঞ্চননগরে মোর ধাম।
শ্যামদাস পিতৃনাম গোবিন্দ মোর নাম॥
অস্ত্র, হাতা, বেড়ী, গড়ি জাতিতে কামার
মাধবী নামেতে হয় জননী আমার॥

এই গোবিন্দদাস তেমন বিদ্বান ছিলেন না। কিন্তু মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার প্রতিদিনের কার্য্য কলাপ লিপিবদ্ধ করিয়া যে অমূল্য সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মূল্য নির্দ্ধারণ করা কঠিন। গোবিন্দের স্ত্রী অতিশয় মুখরা ছিলেন। একদিন তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে 'মূর্খ ও নির্গুণ' প্রভৃতি বাক্যে তিরস্কার করিলে, তিনি গৃহত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হন। তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার প্রতিদিনের কার্য্যাবলীর বিবরণ লিখিয়া রাখিয়াছেন। বিশেষতঃ চৈতন্যদেবের তীর্থ ভ্রমণ কাহিনী তাঁহার করচা ছাড়া এমন সুন্দর ভাবে আর কোথাও রক্ষিত হয় নাই।

গোবিন্দদেব চক্রবর্ত্তী—মহারাজা রাজবল্লভের পুরোহিত। তিনি রাজবল্লভ কর্ত্তৃক কাশীতে প্রেরিত হন এবং তথায় বৈদিক ক্রিয়াকলাপাদির মন্ত্র প্রকরণ পদ্ধতি প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া গ্রন্থাদিসহ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। গোবিন্দ স্বহস্ত লিখিত পুঁথী বহুকাল পর্য্যন্ত প্রামাণিক বলিয়া আদৃত হইয়া আসিয়াছে।

গোবিন্দ দেব রায়, রাজা—তিনি বাঁশবেড়িয়ার প্রসিদ্ধ রাজা রঘুদেব রায় মহাশয়ের পুত্র। রাজা রঘুদেব রায় এক নৈশযুদ্ধে মারহাট্টাদিগকে পরাস্ত করিয়া ১৭৪০ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালার নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর নিকট 'শূদ্রমণি' উপাধি লাভ করেন। তাঁহার পুত্র গোবিন্দদেব রায় ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ বিঘা জমি দান করিয়া পণ্ডিত সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার পুত্র নৃসিংহ দেব রায় ১৭৪০ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

গোবিন্দ দৈবজ্ঞ—(১) তিনি প্রসিদ্ধ তাজক গ্রন্থ প্রণেতা নীলকণ্ঠ দৈবজ্ঞের পুত্র। তিনি কাশীতে অবস্থান কালে ১৫২৫ শকে (১৬০৩ খ্রীঃ) স্বীয় পিতৃব্য প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী রাম দৈবজ্ঞের 'মুহূর্ত্ত চিন্তামণি' নামক গ্রন্থের উপর 'পীযূষ ধারা' নামে এক উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন। গোবিন্দ দৈবজ্ঞের পুত্র মাধব দৈবজ্ঞ স্বীয় পিতামহ নীলকণ্ঠের 'নীলকণ্ঠি জাতক' নামক গ্রন্থের উপর 'শিশু বোধিনী' নামে এক টীকা প্রণয়ন করেন।

গোবিন্দ দৈবজ্ঞ—(২) তিনি কাশী নিবাসী বল্লাল দৈবজ্ঞের অন্যতম পুত্র। তিনিও স্বীয় অন্যান্য ভ্রাতার ন্যায় জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। 'কুম্ভমার্ত্তণ্ড' গ্রন্থ গোবিন্দ দৈবজ্ঞের প্রণীত। অনন্ত দৈবজ্ঞ উক্ত

গ্রন্থের প্রভা নামে এক টীকা রচনা করিয়াছেন।

গোবিন্দনাথ সেন—বাঙ্গালী কবি। ফরিদপুর জিলায় তাঁহার নিবাস ছিল। জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের অনুকরণে তিনি 'পদচিন্তামণি মালা' নামে একখানি সঙ্গীতপুস্তক রচনা করেন। ঐ সকল সঙ্গীতে অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত চৌষট্টি প্রকার রসের বর্ণনা আছে। তিনি কর্ম্মজীবনে মুন্সেফ ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ — খ্যাতনামা বাঙ্গালী ন্যায়শাস্ত্রকার। তাঁহার পিতার নাম রুদ্র ন্যায়পঞ্চানন। তিনি খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। রেবি-রাজ রাঘব তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিতেন (রেবি বর্ত্তমান কৃষ্ণনগরেরই প্রাচীন নাম)। তিনি 'ন্যায় সংক্ষেপ' 'পদার্থ খণ্ডণ ব্যাখ্যা' এবং 'সমাস বাদ' নামে তিনখানি পুস্তক রচনা করেন।

গোবিন্দপন্থ বুন্দলে— মারাঠি সিন্ধিয়াবংশীয় রণোজার পুত্র দত্তজীর একজন সেনাপতি। তিনি প্রথমে দত্তজীর নির্দ্দেশে বুন্দেলখণ্ডে অভিযান করিয়া অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতিকে পরাজিত ও তাঁহাদের রাজ্য লুণ্ঠন করেন। পরে তিনি সুজা-উদ্-দৌলার নিকট পরাস্ত হওয়ায় মধ্যভারতে কিছুকাল শান্তি বিরাজ করে। গোবিন্দপন্থ সদাশিব রাওএর সহিত আহম্মদ শাহ্ আবদালীর বিরুদ্ধে পাণিপথের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আহমদ শাহের রসদ সরবরাহের ব্যবস্থা নষ্ট করিতে যাইয়া নিহত হন।

গোবিন্দ পাদ—তিনি আচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের গুরু ছিলেন। তিনি নর্ম্মদাতীরে ওঁকার নাথ তীর্থে এক গুহায় অবস্থান করিতেন। তাঁহার নিকট শঙ্কর গমন করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহারই আদেশে শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন।

গোবিন্দ পাল—খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে মগধে গোবিন্দ পাল নামে রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি প্রকৃত পক্ষে কোন্ বংশোদ্ভব ছিলেন তাহা নিশ্চিতরূপে স্থির হয় নাই। কেহ কেহ মনে করেন গৌড়ের (বঙ্গের) পাল রাজবংশীয় মদন পালের পর, তিনি রাজা হন। তাঁহার রাজত্বকালীন কতিপয় শিলালিপির পাঠ হইতে অনুমান হয় যে তিনি পাল বংশীয় এবং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। মগধের পূর্ব্বাংশে উদ্দণ্ডপুর, নালন্দ, বিক্রমশিলা প্রভৃতি স্থানগুলি তাঁহার অধিকারভুক্ত ল। লক্ষ্মণ সেনের পতনের পর মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। গোবিন্দপাল, মুষ্টিমেয় সৈন্য ও ভিক্ষুগণের সাহায্যে

রাজ্য ও সঙ্ঘারাম প্রভৃতি রক্ষায় অকৃত কার্য্য হইয়া নিহত হন। তিব্বতীয় বৌদ্ধ ঐতিহাসিক তারানাথের বিবরণী হইতে অবগত হওয়া যায় যে ঐ সংঘর্ষে বিজেতৃগণ উদ্দণ্ডপুর, বিক্রমশিলা প্রভৃতি বৌদ্ধ মঠগুলি ধ্বংস করেন। গোবিন্দপাল খুব সম্ভব ১১৬১ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের ৩৮শ বৎসরে বক্তিয়ার কর্ত্তৃক তৎরাজ্য আক্রান্ত হয়।

গোবিন্দ প্রসাদ মুন্সী— যুক্ত-প্রদেশের একজন শিক্ষানুরাগী জন-হিতব্রতী। তিনি এলাহাবাদে হাই-কোর্টের একজন খ্যাতনামা আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ 'কায়স্থ পাঠশালা' নামক শিক্ষায়তনটির উন্নতির জন্য তিনি বিশেষ পরিশ্রম করেন। কয়েক বৎসর তিনি উহার কার্য্যকারী সভার সভাপতিও ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় ঐ প্রতিষ্ঠানটি একটী প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয়। ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই তিনি পরলোক গমন করেন।

গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিত— বর্দ্ধমান জিলার আসানসোল মহকুমার অন্তর্গত সিয়ারসোল রাজবংশের আদি পুরুষ। তিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে অধ্যবসায় ও বুদ্ধি বলে প্রভূত ধন-সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির অধিকাংশই তিনি নানা সৎকার্য্যে দান করিয়া যান। তাঁহার দত্ত অর্থ হইতে বিদ্যালয়, চতুষ্পাঠী, দাতব্য চিকিৎসালয়, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং পথ নির্ম্মাণ, জলাশয় ও কূপ খনন প্রভৃতি সৎকার্য্য সম্পাদিত হয়। তিনি অপুত্রক থাকায় তাঁহার একমাত্র কন্যা হীরাসুন্দরী সমস্ত সম্পত্তি লাভ করেন।

গোবিন্দপ্রসাদ রায়—(১) বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও সংস্কৃত পণ্ডিত। ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে (১২৪৫ বঙ্গাব্দ) তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রাধা-নাথ রায়। কাশীতে তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তিনি সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিতার জন্য নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধি ভূষিত হন। তিনি দীর্ঘকাল রঙ্গপুর জিলার কাকিনার ভূম্যধিকারীদের প্রধান অমাত্য ছিলেন। সত্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মপ্রাণ বলিয়া তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। গণিত ও স্মৃতি শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি 'মৃন্ময়ী', 'হরি-বাসর তত্ত্বসার', 'অষ্টাদশ বিদ্যা' প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করেন। প্রথমোক্ত পুস্তকখানিতে জ্যোতিষ শাস্ত্রে হিন্দুদের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণিত হইয়াছে। ১৩০৪ বঙ্গাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গোবিন্দপ্রসাদ রায়—(২) পূর্ব্ব-বঙ্গের রাজধানী ঢাকা হইতে প্রকাশিত প্রসিদ্ধ 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার উহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তাহার পর গোবিন্দপ্রসাদ সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন।

গোবিন্দ বিদ্যাধর—তিনি উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের একজন সামন্ত নরপতি ছিলেন। তিনি উড়িষ্যার গড়জাত রাজ্যের ভঞ্জবংশীয় কোন নরপতির দ্বিতীয় পুত্র। ১৫৪৪—১৫৪৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার স্থাপিত বংশ ভূয়া বংশ নামে খ্যাত। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র চক্রপ্রতাপ বা চকাপ্রতাপ রাজা হইয়া ১৫৫৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। চক্রপ্রতাপের মৃত্যুর পর তৎপুত্র নরসিংহ রায় জেনা রাজা হন। তিনি তাঁহার সেনাপতি মুকুন্দ হরিশ্চন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হন। ইহাতে মুকুন্দ ও চক্রপ্রতাপের কনিষ্ঠ পুত্র রঘুরাম জেনার মধ্যে যুদ্ধ হয়। কিন্তু মুকুন্দ তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজা হন।

গোবিন্দ ভট্ট—তিনি গোবিন্দরাজ নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মাধব ভট্ট। তিনি মনুসংহিতার উপর এক উৎকৃষ্ট টিকা রচনা করেন। তাঁহার প্রামাণ্য রঘুনন্দন স্মার্ত্ত, শূলপাণি প্রভৃতি স্বীকার করিয়াছেন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার মঞ্জরী নাম্নী টীকাও রচনা করিয়াছেন। এই অসাধারণ বিদ্বান্ পণ্ডিত সেন রাজাদের সময়ে বঙ্গদেশে বর্ত্তমান ছিলেন। 'স্মৃতি মঞ্জরী' নামে একখানা সুবৃহৎ উৎকৃষ্ট স্মৃতির নিবন্ধ গ্রন্থও তাঁহার রচিত।

গোবিন্দমাণিক (মহারাজা)—ত্রিপুরার অধিপতি কল্যাণমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৬৫৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছত্রমাণিক্যের চক্রান্তে কিছুকাল তিনি রাজ্যহীন হন। পরে আবার সিংহাসন লাভ করিয়া দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। তিনি প্রজাবৎসল, দয়ালু, ধর্ম্মপ্রাণ নৃপতি ছিলেন। তাঁহারই রাজত্বকালে কুমিল্লার প্রসিদ্ধ সুজা মস্‌জীদ নির্ম্মিত হয়।

গোবিন্দ মিশ্র—দামোদর দেবের শিষ্য। তিনি শঙ্করী, ভাস্করী মত, হনুমানের পৈশাচ ভাষ্য, আনন্দগিরির টীকা ও শ্রীধর স্বামীর সুবোধিনী টীকা, এই পঞ্চটীকার আলোচনা ও সমন্বয় করিয়া গীতার পদ রচনা করেন। ইহা বিশেষ ক্ষমতার পরিচায়ক।

গোবিন্দরাম মিত্র—১৬৬৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলিকাতা ইংরেজ ফ্যাক্টারির অধ্যক্ষ জব চার্ণক (Job Charnach) সাহেবের অধীনে কোম্পানীর সরকারের চাকরী গ্রহণ করেন। অতিশয় কর্ম্মনিপুণ কর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহার সুখ্যাতি

ছিল। তিনি কলিকাতা দুর্গের নিকটবর্ত্তী স্থান স্বীয় অধিকার ভুক্ত করিয়া তথায় বাসস্থান স্থাপন করেন। তাঁহারই নামানুসারে গোবিন্দপুর নাম হয়। তিনি কলিকাতার মেয়র (Mayor of Calcutta) নামে খ্যাত ছিলেন। ১৭৫৬ সালে সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণকালে, তিনি ইংরেজ পক্ষে যুদ্ধ করিয়া বন্দী হন। পরে পলাশী যুদ্ধের পর মুক্তি লাভ করেন। তৎপরে তিনি কলিকাতার পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। তাঁহারই প্রপৌত্র রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

গোবিন্দরাম সিদ্ধান্তবাগীশ—খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফরিদপুর জিলার ধানুকা গ্রামে পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কুমারসম্ভবের 'ধীর রঞ্জিকা' নাম্নী এক টীকা, চণ্ডীর টীকা, মহিম্ন স্তোত্র টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

গোবিন্দ রায়—(১) বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বল্লভাচার্য্যের পৌত্র ও বিত্তল দাসের পুত্র। তিনিও একটী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

গোবিন্দ রায়—(২) তিনি দিল্লীর রাজা পৃথ্বীরাজের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। মোহাম্মদ ঘোরী দিল্লী আক্রমণ করিলে স্বয়ং পৃথ্বীরাজ গোবিন্দ রায় প্রভৃতি সেনাপতিসহ তিরৌরী যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হন। প্রথম যুদ্ধে গোবিন্দ রায়ের হস্তে পরাজিত হইয়া মোহাম্মদ ঘোরী পলায়ন করেন। গোবিন্দ রায় পরবর্ত্তী যুদ্ধে নিহত হন।

গোবিন্দলাল রায়, মহারাজা—তিনি রংপুরের অন্তর্গত তাজহাট রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গিরিধারীলাল রায়ের সুযোগ্য পুত্র। ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী তাঁহার জন্ম হয়। পিতার মৃত্যুর পরে তিনি বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি অতিশয় শান্ত, বিনয়ী ও দাতা ছিলেন। দেশীয় লোকদের জন্য স্থাপিত দার্জ্জিলিং সহরস্থিত লুইস জুবিলী স্বাস্থ্যনিবাস (Louis Jubilee Sanitorium) নির্ম্মাণ কল্পে তিনি এক লক্ষ টাকা দান করেন। তৎকালীন বঙ্গের ছোটলাট ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে এক দরবার করিয়া রাজা উপাধি প্রদান করেন। আরও নানা সদনুষ্ঠানে তিনি প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। বিদ্যালয় পুস্তকালয়, দেবালয়, জলাশয়, প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। দেশের যাবতীয় সদনুষ্ঠানের সহিতই তাঁহার প্রাণের গভীর যোগ ছিল। তিনি সর্ব্বপ্রকারে সকলের উপকার প্রয়াসী ছিলেন। এই উন্নতমনা মহারাজা ঋণের জন্য

কারাবদ্ধ বহু ব্যক্তিকে অর্থদ্বারা কারামুক্ত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার মাসিক ও বার্ষিক বহু গোপনীয় দান ছিল, যাহার বিষয় সাধারণতঃ সকলের জানিবারও উপায় ছিল না। তৎকালীন ভারতের বড়লাট লর্ড এলগিন তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া ১৮৯২খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে মহারাজা উপাধি প্রদান পূর্ব্বক সম্মানিত করেন। এই উপাধি বেশীদিন ভোগ করা, তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। এই মহাপ্রাণ পরোপকারী সদাবিনাত মহারাজ ১৮৯৭ সালের ১১ই জুনের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে আহত হইয়া ২৪শে জুন দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার একমাত্র পুত্র রাজা গোপাললাল রায়, তাজহাট ষ্টেটের অধিকারী হইয়াছেন।

গোবিন্দ সিংহ—শ্রীহট্টের অন্তর্গত জগন্নাথপুরের রাজা রাজসিংহের গোবিন্দ সিংহ (জয়সিংহ), বিজয় সিংহ ও পরমানন্দ সিংহ নামে তিন পুত্র ছিল। রাজসিংহের মৃত্যুর পরে গোবিন্দ সিংহ রাজা হন। জগন্নাথপুর রাজ্য লাউড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সময়ে লাউড়ে খাসিয়াদিগের অতিশয় উৎপাত আরম্ভ হয়। গোবিন্দ সিংহ তাহার কিছুই প্রতিকার করিতে পারিলেন না। সুতরাং লাউড়বাসীরা বাণিয়াচঙ্গের গোবিন্দ খাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। গোবিন্দ খাঁ খাসিয়াদিগকে বিতাড়িত করিয়া লাউড় অধিকার করেন। ইহার বিরুদ্ধে গোবিন্দ সিংহ দিল্লীশ্বরের নিকট প্রতীকার প্রার্থী হইলেন। দিল্লীশ্বর গোবিন্দ খাঁর নিকট দূত প্রেরণ করেন। দূত অপমানিত এবং গোবিন্দ খাঁর পদাঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। অবশেষে কৌশলে গোবিন্দ খাঁ ধৃত হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হন। বিচারে গোবিন্দ খাঁ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু ঘাতক ভুলক্রমে গোবিন্দ খাঁর পরিবর্ত্তে গোবিন্দ সিংহের শিরচ্ছেদ করিল। অবশেষে এই ঘটনা প্রকাশিত হইলে গোবিন্দ খাঁর প্রাণদণ্ড রহিত হইল বটে; কিন্তু তিনি মুসলমান হইতে বাধ্য হইলেন। তখন তাঁহার নাম হবিব খাঁ হইল। এই ঘটনার পর গোবিন্দ সিংহের ভ্রাতা বিজয় সিংহ জগন্নাথপুরে রাজা হন।

গোবিন্দাচারী—কাশীবাসী গোবিন্দাচারী ১৭৭৫ শকে (১৮৫৩ খ্রীঃ) 'সাধন সুবোধ' ও 'যোগীনীদশা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

গোবিন্দানন্দ—প্রাচীন বাঙ্গালী স্মৃতি শাস্ত্রকার। তিনি প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী স্মার্ত্ত রঘুনাথের প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার পিতার নাম গণপতি ভট্ট। গোবিন্দানন্দ সর্ব্ব মোট পাঁচ খানি স্মৃতির গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাদের নাম—(১) বর্ষক্রিয়া কৌমুদী;

(২) দানক্রিয়া কৌমুদী ; (৩) শ্রাদ্ধক্রিয়া কৌমুদী ; (৪) শুদ্ধি কৌমুদী ; (৫) ক্রিয়াকৌমুদী। গোবিন্দানন্দের মত কোনও কোনও স্থলে রঘুনাথ হইতে বিভিন্ন। তাহার স্বরচিত পুস্তক হইতে জানা যায় যে, তাঁহার পিতা গণপতি ভট্ট ৪৬১৩ কলিগতাব্দে জ্যোতিস্মতী নামক, জ্যোতিষ শাস্ত্রের এক টীকা রচনা করেন।

গোবিন্দানন্দ—(২) একজন দার্শনিক পণ্ডিত ও শঙ্করভাষ্যের টীকাকার। 'ভাষ্য রত্নপ্রভা' ইহার অক্ষয় কীর্ত্তি তিনি খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি গোপাল সরস্বতীর শিষ্য এবং রামানন্দ সরস্বতী তাঁহার শিষ্য ছিলেন।

গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কন—একজন জ্যোতিষের পণ্ডিত। তিনি গণপতি ভট্টের পুত্র। মহাদেব শর্ম্মা কৃত 'জাত-কার্ণব' গ্রন্থের তিনি 'অর্থ রত্নপ্রভা বা অর্থ প্রভাবতী' নাম্নী টীকা রচনা করেন এবং শ্রীনিবাস কৃত শুদ্ধি দীপিকার তিনি 'অর্থকৌমুদী' নামে এক টীকা রচনা করেন।

গোভিল— সামবেদের গৃহ্যসূত্রের তিনি প্রণেতা। গৃহ্য সংগ্রহকার কাত্যায়ন তাঁহারই পুত্র।

গোমান সিংহ—রাজপুতানার অন্তর্গত কোটা রাজ্যের রাজা অজিত সিংহের তিনি অন্যতম পুত্র ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চণ্ডরলাল অপুত্রক গতায়ু হইলে, গোমান সিংহ কোটার রাজা হইয়াছিলেন। ১৭৬৬ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৭৭১ সাল পর্য্যন্ত তিনি রাজ্য শাসন করিয়া পরলোক গমন করিলে, শিশু উমেদ সিংহ রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে মহলর রাও হোলকার কোটা আক্রমণ করেন। প্রথমে মহলর রাও পরাজিত হন, পরে তিনি জয়লাভ করেন। গোমান সিংহ পরাজিত হইয়া ছয় লক্ষ টাকা দিয়া সন্ধি স্থাপন করেন।

গোমুখ নাথ—তিনি নাথপন্থী সম্প্রদায়ের অন্যতম সিদ্ধপুরুষ ও গুরু। অপান নাথ দেখ।

গোমুখ স্বামী—বেরারের অন্তর্গত বাসিম তালুকের উমরখের নগরে তিনি বাস করিতেন। এই সাধুপুরুষের যথেষ্ট সুনাম ছিল। বহুদূর স্থান হইতে লোকেরা এখানে সাধু দর্শনে আসিত তিনি বৎসরে ভিক্ষালব্ধ প্রায় দুইলক্ষ টাকা নানা সৎকাজে ব্যয় করিতেন। তিনি ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

গোয়ীচন্দ্র— তিনি সংক্ষিপ্তশর ব্যাকরণের একজন টীকাকার।

গোরক্ষনাথ—তিনি নাথ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মীননাথের শিষ্য ছিলেন। অনুমান একাদশ শতাব্দীতে তিনি জীবিত ছিলেন। পাঞ্জাবের জলন্ধর

নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি নাথ সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা ছিলেন। নাথ সম্প্রদায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি শাখা। 'গোরক্ষ বিজয়' গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে এই গোরক্ষনাথই কালীঘাটের কালী প্রতিষ্ঠা করেন। গোরক্ষনাথের সম্প্রদায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে। ভারতবর্ষের নানাস্থানে গোরক্ষনাথের মন্দির আছে। উত্তর ভারতেই গোরক্ষ পন্থীর সংখ্যা অধিক। হরিদ্বারের নিকট গোরখপুরে, নেপালের একাধিক জায়গায় এবং পাঞ্জাবের বহুস্থানে গোরক্ষ পন্থী সাধু ও তাঁহাদের আশ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। নেপালের ঠাকুরী বংশীয় বরদেবের রাজত্বকালে গোরক্ষনাথ নেপালে গমন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

নাথপন্থী আচার্য্যদের মধ্যে গোরক্ষনাথই সমধিক প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমানকালে ভারতের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত নাথপন্থীরা যে সকল ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করেন, তাহাদিগের মধ্যে অনেকগুলিই অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং গোরক্ষনাথ প্রমুখ প্রাচীন আচার্য্যদের অনুমোদিত নহে। তদ্ভিন্ন, পরবর্ত্তীকালে গোরক্ষনাথ নামে আরও অনেক সাধু আবির্ভূত হন। নাম সাদৃশ্যে এইসকল বিভিন্ন ব্যক্তিদের প্রচারিত মত অনেকস্থলে একীভূত হইয়া গিয়াছে। গোরক্ষ পন্থীরা শৈব ধর্ম্মের নিয়মানুসারে গেরুয়া বস্ত্র পরিধান, মস্তকে জটা ধারণ, শরীরে ভস্ম লেপন ও ললাটে বিভূতি দিয়া ত্রিপুণ্ড্র করিয়া থাকে। সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় ইহাদিগকেও গুরু স্বীকার করিতে হয়। কেহ শিষ্যের মস্তক মুণ্ডন করেন, কেহ বা তাঁহার কর্ণমূলে ছিদ্র করিয়া মুদ্রা পরাইয়া দেন। অপর কেহ তাহাকে জগৎমার্গে প্রবেশিত করিয়া থাকেন। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন গুরু শিষ্যের দীক্ষা ও সাধন সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া দেন। দশনামীদের ন্যায় ইহাদেরও জগৎমার্গে প্রবেশপূর্ব্বক মদ্য-মাংস ব্যবহার করিবার রীতি আছে। গিরি, পুরী প্রভৃতি যেরূপ দশনামী সন্ন্যাসীদের উপাধি, সেইরূপ কর্ণফট্ যোগীদের উপাধি নাথ। আদিনাথ দেখ।

গোরা—চিতোরের রাণা ভীমসিংহের স্ত্রী পদ্মিনীর পিতৃব্য গোরা ও ভ্রাতা বাদল চিতোর রক্ষার জন্য আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া সমর ক্ষেত্রেই প্রাণ-ত্যাগ করেন। তাঁহাদের অসাধারণ বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া শত্রু পক্ষও বিস্মিত এবং মুগ্ধ হইয়াছিল।

গোরাচাঁদ বসাক—ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগের কলিকাতার একজন বিশিষ্ট নাগরিক। ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দের ২০শে জানুয়ারী, তাঁহার চীৎপুর

রোডস্থ ভবনে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন উহাতে কুড়িজন ছাত্র ছিল। পরে উহা কমললোচন বসুর বাড়ীতে উঠিয়া যায়।

গোলকচন্দ্র কর—'সাধন কথা' নামক গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

গোলক চর্ম্মকার—একজন চর্ম্মকার জাতীয় সাধক। তিনি ও তাঁহার শিষ্য ফকিরচাঁদ কর্ত্তাভজা দলের লোক ছিলেন। তাঁহাদের জন্মস্থান নদীয়া জিলার অন্তর্গত উলা গ্রামের বেলডাঙ্গা পাড়ায় ছিল। গোলক প্রথমে জুতা প্রস্তুত করিতেন ও ফকিরচাঁদ ঢোল বাজাইতেন। তাঁহারা জীব হিংসা করিতেন না, দেবদেবী মানিতেন না। পরোপকার ও সাধু চরিত্র তাঁহাদের ধর্ম্মের মূল ভিত্তি ছিল। তিনি ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

গোলকচন্দ্র বিদ্যাবাচস্পতি—(১) ১৭৬৮ খ্রীঃ অব্দে ফরিদপুরের অন্তর্গত হন্তপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কলাপ ব্যাকরণ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। দশকর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল।

গোলকচন্দ্র বিদ্যাবাচস্পতি—(২) তাঁহার জন্মস্থান শিঙ্গা দ্বাদশী। চণ্ডিকা চরিতামৃত নামক বাঙ্গালা কাব্য তাঁহারই রচিত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বহু বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থের হস্ত লিখিত পুঁথি বর্ত্তমান আছে।

গোলকনাথ চট্টোপাধ্যায় রেভারেণ্ট—গোলকনাথের পিতা কলিকাতা এক নীলকুটীতে কাজ করিতেন। গোলকনাথ যখন রেভাঃ ডফ সাহেবের স্কুলে পড়িতেন। তখন তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ দেখিয়া তাঁহার পিতা স্কুলের পড়া বন্ধ করিয়া দেন। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার দুর্দ্দমনীয় খ্রীষ্ট ধর্ম্মানুরাগ কমিল না। তিনি ১৮৩৪ সালে কয়েকটী মাত্র টাকা সঙ্গে লইয়া সন্ন্যাসী বেশে সতর বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করেন। নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া কাশীতে উপনীত হন। এই স্থান হইতে লুধিয়ানায় উপস্থিত হইয়া একটী কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা ও কর্ম্মানুরাগে তথোধিক তাঁহার সত্যনিষ্ঠায় তাঁহার উপরিতন সাহেবেরা মুগ্ধ হইয়া, বলিতেন—'এই দূরদেশী বাঙ্গালী যুবক সাধুতার আদর্শ।' ১৮৩৬ সালে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তখন পাঞ্জাবে রণজিৎ সিংহের রাজত্ব। তখনকার পাঞ্জাবের খ্রীঃ মিশনারীরা স্বীয় গণ্ডীর বাহিরে এক পদও বিক্ষেপ করিতে পারিতেন না। তখনকার পাঞ্জাবের নৈতিক আবহাওয়াও অতিশয় দূষিত ছিল। এই অবস্থায় গোলকনাথ পাঞ্জাবে ধর্ম্ম-প্রচারার্থ গমন করিলেন। প্রথম দুই

দিন তিনি 'বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা' ও 'নির্ম্মল চরিত্রের গুণ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন, লোকেরা খুব আগ্রহ সহকারে তাহা শ্রবণ করিল। কিন্তু তৃতীয় দিনে 'খ্রীষ্টের উদার চরিত্র ও খ্রীষ্ট ঈশ্বরাবতার' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে যাইয়া তিনি দুর্গে বন্দী হইলেন। কিন্তু সারারাত্রি তিনি ঈশ্বরোপাসনা ও ঈশ্বর নাম কীর্ত্তনে যাপন করিলেন। তাঁহার জীবন্ত ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া পরদিন প্রহরীরা তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিল।

১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি রেভারেণ্ড উপাধি প্রাপ্ত হইয়া জঙ্গলময় জালন্ধর জিলায় ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করিলেন। অল্পদিন মধ্যেই উক্ত স্থানে চিকিৎসালায়, ভজনালয়, গ্রন্থাগার, প্রচারাশ্রম, অনাথাশ্রম প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইল। তিনি তখন পাঞ্জাবের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। কতিপয় লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল। নানাস্থানে তিনি চিকিৎসালয়, বালিকা বিদ্যালয়, অনাথাশ্রম প্রভৃতি স্থাপন করিয়া পাঞ্জাবের সকল প্রকার উন্নতির সহায় হইলেন। তাঁহার প্রচারের ফলে পাঞ্জাবে নূতন জীবনের সঞ্চার হইল। কর্পূরতলার রাজকুমার হরনাথ সিংহ বাহাদুর তাঁহার শিষ্য হইলেন, পরে তাঁহার কন্যাকে রাজকুমার বিবাহ করেন। রেভাঃ আবদুল্লা তাঁহার শিষ্য হইলেন। তিনি সস্ত্রীক খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। রেভাঃ আবদুল্লার এক কন্যা স্কুল পরিদর্শিকা ও অপরা কন্যা ডাক্তার। এই প্রকারে একজন বাঙ্গালী সুদূর পাঞ্জাবে স্বীয় শক্তি দ্বারা অক্ষয়-কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাঞ্জাবের নানাস্থানে বিষয় সম্পত্তিও করিয়াছেন। এই ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দের ২রা আগষ্ট ৭৬ বৎসর বয়সে স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্র জলন্ধর সহরে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান সকলে মিলিত হইয়া গোলক নাথ মেমোরিয়েল চার্চ্চ (Golok nath Memorial Church) নামক ভজনালয় স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার কীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছেন।

গোলচেহারা বেগম—সম্রাট বাবর শাহের অন্যতমা কন্যা ও হুমায়ুনের সর্ব্বকনিষ্ঠা ভগিনী। কাবুলের উজবেগ অধিপতি আব্বাস সুলতানের সহিত ১৫৪৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার বিবাহ হয়।

গোল মোহাম্মদ খাঁ—দিল্লীর একজন কবি। ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১২৬৪) তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার কবিজন সুলভ নাম নাতিক।

গোলাপ চাঁদ—বাঙ্গালার শান্ত প্রকৃতি সুবাদার নবাব ইব্রাহিম খাঁর সময়ে (১৭৯৬—১৭১২ খ্রীঃ) শোভা সিংহের সেনাপতি রহিম খাঁ মুরশিদা-

বাদ আক্রমণ করেন। জায়গীরদার নিয়ামত খাঁ নিহত হন। কাশিম বাজারের প্রধান বণিক গোলাপ চাঁদ বিদ্রোহী সেনাপতি রহিম খাঁকে উপহার প্রদান করিয়া নিষ্কৃতি পান। কিন্তু তাহার জন্য তাঁহাকে বিশেষ শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল।

গোলাপ চাঁদ শেঠ—বঙ্গের শেষ জগৎ শেঠ ইন্দ্রচাঁদের পুত্র গোবিন্দ চাঁদ অপুত্রক ছিলেন। তিনি গোপাল চাঁদকে পোষ্য পুত্র রাখিয়া পরলোক গত হন। গোপাল চাঁদের স্ত্রী প্রাণ কুমারী, গোপালচাঁদ অপুত্রক পরলোকগত হইলে, গোলাপ চাঁদকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোবিন্দ চাঁদ মাসিক বারশত, তৎপরে তাঁহার স্ত্রী মাসিক তিনশত টাকা বৃত্তি পাইতেন। প্রাণকুমারীর মৃত্যুর পরে এই বৃত্তি বন্ধ হইয়া যায়। গোলাপ চাঁদ শেষ জীবনে বিশেষ অর্থ কষ্ট ভোগ করিয়া ১৯১৩ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

গোলাপচন্দ্র সরকার, শাস্ত্রী—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ইন্দাস গ্রামে ১২৫৩ বঙ্গাব্দের ১০ই শ্রাবণ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শম্ভুচন্দ্র সরকার ও মাতার নাম লক্ষ্মীপ্রিয়াদাসী। গোলাপচন্দ্র সাত বৎসর বয়সে বিদ্যাশিক্ষার্থ পল্লীভবন পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন এবং সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। সেখানে দীর্ঘকাল অধ্যয়নপূর্ব্বক একে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহ উত্তীর্ণ হন। ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে সংস্কৃত ভাষায় এম্-এ পরীক্ষা দিয়া তিনি উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৩ সালে তিনি বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৮৮৬ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য পদে (Fellow) নিযুক্ত হন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে সমাসীন ছিলেন। ১৯০৯ খ্রীঃ অব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউসনে আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন ১৯১২ খ্রীঃ অব্দে তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণের পর মেট্রপলিটান কলেজ উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। গোলাপচন্দ্র কলেজের পরিচালক পরিষদের সদস্যদিগকে বুঝাইয়া, বিনা বেতনে অধ্যাপকের কার্য্য করিয়া এবং দীর্ঘকাল অর্থ সাহায্য করিয়া, কলেজের স্থায়ীত্ব বিধান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব্বে তিনি কলিকাতা আইন কলেজ নামে একটী কলেজ স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন কলেজ

সমূহের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণের অনুরোধে তিনি ঐ সংকল্প পরিত্যাগ করেন। ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি 'ল' বোর্ডের ফ্যাকল্‌টী অব ল'র (President of the Law Board of Faculty of Law) প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। তিনি আইন সম্বন্ধে অনেক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে প্রিভিকাউন্সিলের হিন্দু সদস্য নিযুক্ত করেন। কিন্তু বিলাতে যাইতে হইবে বলিয়া, তিনি সে পদ গ্রহণ করেন নাই। তিনি তেজস্বী, উন্নতচেতা ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ১৩২২ সালের ১৪ই আশ্বিন (১৯১৫ খ্রীঃ) এই মহানুভব ব্যক্তি পরলোক গমন করেন।

গোলাপ সিংহ—তিনি বর্ত্তমান কাশ্মীর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পিতামহ, রাজা জোরাবর সিংহ, মহারাজা রণজিৎ সিংহের ভ্রাতা ছিলেন। রাজা রণজিৎ সিংহ তাঁহাকে কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দে রাজা রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পরে শিখ যুদ্ধের সূচনা হয়। তিনি শিখ মন্ত্রণা সভার প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। শিখ সেনাপতিদের বিশ্বাস ঘাতকতায় যুদ্ধে শিখদের পরাজয় হয়। গোলাপ সিংহ এক কোটী টাকা দিয়া কাশ্মীর রাজ্য লাভ করিলেন। তিনি ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার তৃতীয় পুত্র রণবীর সিংহ কাশ্মীরের রাজা হইয়াছিলেন।

গোলাম আহাম্মদ কাদিয়ানী, মির্জা—ধর্ম্ম সংস্কারক। পাঞ্জাবের অন্তর্গত গুরুদাসপুর জিলার কাদিয়ান গ্রামে ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার প্রপিতামহ মির্জা গুল মোহাম্মদ সপরিবারে ও অনেক অনুচর লইয়া পারস্য দেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমনপূর্ব্বক লাহোরের নিকটবর্ত্তী একস্থানে বসতি স্থাপন করেন। পঞ্জাবে শিখ শক্তির উদ্ভবের সময়ে মির্জা পরিবার তথাকার একটি সম্ভ্রান্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী পরিবাররূপে গণ্য হইতেন। কিন্তু শিখ রাজশক্তির বিস্তারের সময়ে তাঁহারা নানারূপে ক্ষতি গ্রস্ত হন এবং অনেক সম্পত্তি তাঁহাদের হস্তচ্যুত হয়। পরে অবশ্য কিয়দংশ তাঁহারা ফেরত পাইয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্ব গৌরব অনেকাংশে নষ্ট হয়। গোলাম আহাম্মদ সাহেব বাল্যে মৌলবীদের নিকট ইসলামধর্ম্ম শাস্ত্র এবং ব্যাকরণ অলঙ্কার তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি বিশেষ চিন্তাশীল ছিলেন। তাঁহার পিতার ইচ্ছা ছিল যে, আহাম্মদ সাহেব বিষয় সম্পত্তি রক্ষা ও পরিচালনা করেন। আহাম্মদ সাহেবের তাদৃশ ইচ্ছা না থাকিলেও

অবস্থার গতিকে কিছুকাল তাঁহাকে ধর্ম্মচিন্তার পরিবর্ত্তে বিষয় চিন্তাই অধিক করিতে হইয়াছিল।

১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দ হইতে তিনি একাধিক পুস্তিকা প্রকাশদ্বারা নিজেকে একজন প্রেরিত পুরুষ (মেশায়া) বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম প্রথম তাঁহার স্বধর্ম্মাবলম্বীগণ তাহাতে বিশেষ প্রতিবাদ করেন নাই। কিন্তু ক্রমে তাঁহার বিরুদ্ধবাদীর সংখ্যা বাড়িতে থাকে এবং অনেকে তাঁহাকে কাফের অর্থাৎ বিধর্ম্মী বলিয়া নানা ভাবে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। এমন কি কোনও কোনও ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তি, নানাস্থান হইতে মৌলবীগণের ফতোয়া সংগ্রহদ্বারা তাঁহাকে বধ করিবার জন্যও লোককে উত্তেজিত করিতে থাকেন। ইহাতে ভীত না হইয়া আহাম্মদ সাহেব নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া নিজ মত প্রচার ও তৎসঙ্গে নানা ধর্ম্মাবলম্বী আচার্য্য ও পণ্ডিতদের সহিত বিচার করিতে থাকেন। তাঁহার মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগকে আহমদীয়া বা কাদিয়ানী বলে। অন্যান্য অনেক ধর্ম্মের ন্যায় মুসলমান ধর্ম্মেও একজন ভাবী অবতারের কথা উল্লেখ আছে। কোনও এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিশেষ লক্ষণযুক্ত সময়ে ঐ অবতার প্রাদুর্ভূত হইবেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে ইসলাম শাস্ত্রোক্ত ঐ সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং ঐ সময়েই তিনি নিজেকে প্রেরিত পুরুষ বলিয়া প্রচার করেন। উত্তর ভারতের বহু স্থানে প্রধানতঃ পাঞ্জাবেই তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বেশী দৃষ্ট হয়। ভারতের বাহিরে আফগানিস্থান, পারস্য প্রভৃতি দেশেও আহমদিয়া মতাবলম্বী লোক আছে। ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে লাহোর নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গোলাম কাদির খাঁ—রোহিলা সর্দ্দার জবিত খাঁর পুত্র এবং নজিব উদ্দৌল্লার পৌত্র। তিনি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক স্বীয় প্রভু দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমকে অন্ধ করিয়া মোহাম্মদ শাহের পৌত্র ও আহাম্মদ শাহের পুত্র বেদর বক্তকে সিংহাসন প্রদান করেন। এই ঘটনা ১৭৮৮ খ্রীঃ অব্দের ১০ই আগষ্ট (হিঃ ১২০২, ৭ই জেলকাদ) সংঘটিত হয়। গোলাম কাদির খাঁ ইহার পরে স্বীয় দেশাভিমুখে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহাকে পথে আক্রমণ করিয়া, তাঁহার নাসাকর্ণ ও হস্তপদাদি ছেদনপূর্ব্বক দিল্লীতে প্রেরণ করেন, কিন্তু পথেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

গোলাম কুতবউদ্দিন শাহ—তিনি এলাহাবাদের লোক। মুসিবত তাঁহার কবিজন সুলভ নাম। তাঁহার পিতার নাম শাহ মোহাম্মদ ফকির। তিনি একজন বিদ্বান্ ও কবি ছিলেন। ১৭২৫

খ্রীঃ অব্দের ২৯শে আগষ্ট তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৭৭৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গোলাম গাউত, শেখ—তিনি বিখ্যাত শেখ মোহাম্মদ খাঁ মখদুম উলমুল্কের অন্যতম পুত্র ছিলেন। তাঁহার পিতার ন্যায় তিনিও একজন বিখ্যাত মৌলবী ছিলেন। এই ধার্ম্মিক জ্ঞানী মৌলবী, ধনশালী লোকদের সহিত মিশিতে একেবারেই অনিচ্ছুক ছিলেন। একবার নবাব সাদত খাঁ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে জৌনপুরে উপস্থিত হইলেন। তিনি মনে করিয়া ছিলেন, তাঁহার জৌনপুরে আগমন সংবাদ পাইয়াই শেখ গাউত সাহেব অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাইবেন। কিন্তু শেখ সাহেব তাঁহার নিভৃত কক্ষ হইতে বাহির হইলেন না। নবাব সাদত খাঁ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া কেবল তাঁহারই সম্পত্তি গ্রহণ করিলেন না, পরন্তু জৌনপুরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত শেখের সম্পত্তি গ্রহণ করিলেন। গোলাম গাউত সাহেব বাধ্য হইয়া জৌনপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক দিল্লীতে গমন করিলেন। দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মাদ শাহ অতি সমাদরে সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। বিদায় কালে সম্রাট স্বহস্তে তাঁহার অঙ্গাভরণে সুগন্ধী মাখাইয়া দিলেন। একবার সম্রাট তাঁহাকে ও তাঁহার আত্মীয়দিগকে কিছু সম্পত্তি দান করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আত্ম-সম্মান বোধ এমনই প্রবল ছিল যে, তিনি কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। দিল্লীতে অবস্থান কালেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃতদেহ জৌনপুরে লইয়া গিয়া সমাহিত করা হয়। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তন্মধ্যে ফৈজিকৃত গ্রন্থের ভাষ্য—'সয়াতি-উল-ইলহাম' খুব প্রসিদ্ধ।

গোলাম হোশেন খাঁ—তিনি 'রিয়াজ উস-সালাতিন' নামক বঙ্গদেশের একখানা ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ ১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে শেষ হয়। মিঃ জর্জ উডনী সাহেবের অনুরোধে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত রিয়াজ-উস-সালাতিন গ্রন্থ ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল নিবাসী শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক কর্তৃক ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। গোলামহুশেন খাঁ মালদহের অধিবাসী ছিলেন।

গোলাম হোশেন খাঁ তবতবা, সৈয়দ—বাঙ্গালার মুসলমান রাজত্বের শেষভাগের একজন সম্ভ্রান্ত রাজ-কর্ম্মচারী। তাঁহার পিতা হিদায়াত আলি খাঁ বিহারের সহকারী শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। গোলাম হোশেন কিছু-কাল তদানীন্তন মুঘল বাদশাহের

অধীনে মীর মুন্সার কাজ করেন। তারপর কিছুকাল বাঙ্গালার নবাব মীরকাশিমের অধীনে কাজ করেন। মীরকাশিমের পতনের পর কিছুকাল ইংরেজ কোম্পানীর পরে অযোধ্যার নবাব বাহাদুরের অধীনে কাজ করেন। তিনি 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষারিণ' নামে একখানি প্রামাণিক ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। তাহাতে মুঘল সাম্রাজ্যের শেষভাগের এবং ভারতে ইংরেজ শক্তির অভ্যুদয়ের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। মিঃ রেমণ্ড (Raymond নামে একজন ফরাসী 'হাজী মুস্তাফা' এই ছদ্ম নামে উহার একটী অনুবাদ প্রকাশ করেন। মূল গ্রন্থখানি ওয়ারেন হেষ্টিংসকে উৎসর্গ করা হয়। কিন্তু হেষ্টিংস যখন বিলাত প্রত্যাগমন করিতেছিলেন তখন পথে উহা কিভাবে নষ্ট হইয়া যায়। কতিপয় বর্ষ পরে উহার একটী সংক্ষিপ্ত সংস্করণও প্রকাশিত হয়। জেনারেল ব্রিগ্‌স (Briggs) নামে একজন ইংরেজ সেনাপতি উহা প্রকাশ করেন।

গোল্ডষ্টুকার থিয়োডোর, (Theodore Goldstucker) — জার্ম্মান দেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ১৮২১ খ্রীঃ অব্দে জার্ম্মানীর অন্তর্গত কানিসবার্গ (Konigsberg) নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জার্ম্মানী ও সুইজারল্যাণ্ডের (Switzerland) একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি কিছুকাল পারী নগরীতে ও পরে লণ্ডনে বাস করিতে থাকেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এবং ভারতীয় দর্শন তাঁহার প্রধান পাঠ্য ছিল। এই সকল বিষয়ে তিনি গভীর জ্ঞান লাভ করেন। তিনি দীর্ঘকাল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। সংস্কৃত ভাষাতত্ত্বে (Philology) তাঁহার মত প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইত। ১৮৬১ খ্রীঃ তাঁহার 'সংস্কৃত গ্রন্থ পাণিনীরস্থান' (Panini—His place in Sanskrit Literature') নামক বহু মূল্যবান গ্রন্থ খানি প্রকাশিত হয়। ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে 'পাণিনীর মহাভাষ্য' প্রকাশিত হয়। উক্ত পুস্তকখানিও সকল সুধী সমাজে পরম সমাদরে গৃহীত হয়। তদ্ভিন্ন তিনি তৎকালীন বহু উচ্চশ্রেণীর পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন। ভারতে বর্ত্তমানে প্রচলিত হিন্দু দায়াধিকার সম্বন্ধে তিনি একখানি গবেষণা পূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে লণ্ডন নগরে সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করিবার জন্য একটী সমিতি স্থাপন করেন। ইংলণ্ডের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী (Royal Asiatic Society) প্রভৃতি অনেক বিদ্বজ্জন সভার সদস্য ছিলেন। ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার কতিপয় বর্ষ পরে ভারতসরকার তাঁহার

অপ্রকাশিত গ্রন্থাদি একত্র প্রকাশ করেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এবং প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্ট বিষয়ে তিনি সর্ব্বজনমান্য পণ্ডিত ছিলেন।

গোশাল—তিনি জৈনধর্ম্মের প্রচারক মহাবীরের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। গোশালায় জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম গোশাল হয়। গোশালের চরিত্রবল ছিল না। সেজন্য মহাবীরের কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের বিরোধী হইয়া একটী পৃথক দলের সৃষ্টি করেন। কিন্তু কিছু মাত্র কৃত-কার্য্য হইতে পারেন নাই। গোশালের পূর্ণ নাম ছিল মক্‌খলি পুত্ত গোশাল (মস্করি পুত্র গোশাল) তিনি বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িক ছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যের বহু স্থানে তাঁহার মতবাদ উল্লেখ আছে। গৌতমবুদ্ধ ও মহাবীরের সহিত তাঁহার অনেক বিষয়ে বিচার ও আলোচনা হয়। এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

গোষ্টমহল— একজন জৈনাচার্য্য। তিনি ব্রজস্বামীর শিষ্য ছিলেন। তাহা হইতে একটি জৈন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

গোষ্ঠিপূর্ণ— একজন পরম সাধক ভক্ত। তিনি গোষ্ঠিপুর নামক স্থানে বাস করিতেন। রামানুজ অন্যতম গুরু মহাপূর্ণের আদেশে, গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট বৈষ্ণব মন্ত্র শিক্ষার্থ গমন করেন। কিন্তু গোষ্ঠিপূর্ণ অষ্টাদশবার রামানুজকে প্রত্যাখ্যান করেন। রামানুজ স্বীয় কোন অপরাধের জন্য, এইরূপ বারবার প্রত্যাখ্যাত হইতেছেন মনে করিয়া একদিন রোদন করিতে আরম্ভ করেন। এই সংবাদ পাইয়া গোষ্ঠিপূর্ণ রামানুজকে স্বীয় সমীপে আনয়নপূর্ব্বক মন্ত্র প্রদান করেন এবং স্বীয় পুত্র সৌম্য নারায়ণকে তাঁহার শিষ্য করিয়া দেন।

গোসাই কমল—কামতাপুরের রাজা (বর্ত্তমান কোচবিহার) বিশ্বসিংহের অন্যতম পুত্র। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে কোচবিহার হইতে উত্তর লক্ষ্মীপুর পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ৩৫০ মাইল দীর্ঘ একটী প্রশস্ত রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার কতকাংশ এখনও বর্ত্তমান আছে এবং গোসাইকমল পথ নামে অভিহিত হয়। ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য ১৫৪৭ খ্রীঃ অব্দে শেষ হয়।

গোস্বামী—'তিতিপল্লি' গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

গোহ—বল্লভীপুরের রাজা শিলা-দিত্যের পুত্র। বল্লভীপুর ম্লেচ্ছ পারদ কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইলে, রাজা শিলা-দিত্য সেই যুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার স্ত্রী রাণী পুষ্পবতী সেই সময়ে গর্ভবতী ছিলেন। তিনি এক গুহায় আশ্রয় লইলেন। তথায় তিনি একটী পুত্র প্রসব করিয়া কমলাবতী নাম্নী এক ব্রাহ্মণ রমণীর হস্তে পুত্রের প্রতিপালনের ভার সমর্পনপূর্ব্বক স্বামীর অনুমৃতা

হইলেন। গুহায় জন্মিয়াছিল বলিয়া বালকের নাম গোহ হইল। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বালক অতি দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। মিবারের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ঘন পর্ব্বতমালার অভ্যন্তরে ইদর নামে একটি ভীল জনপদ ছিল। মাণ্ডলিক নামে এক ভীল রাজা তাঁহার অধিপতি ছিলেন। গোহ এই ভীল বালকগণের সহিত সর্ব্বদা থাকিতেন ও খেলা করিতেন। একদিন খেলাচ্ছলে ভীল বালকগণ তাঁহাকে রাজা মনোনীত করিল। একটি বালক কর্ত্তিত অঙ্গুলির রক্তে তাঁহার কপালে রাজতিলক প্রদান করিল। রাজা মাণ্ডলিক ইহা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে সিংহাসন প্রদান পূর্ব্বক মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। ইদর রাজ্যে গোহের বংশধরগণ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত নিরাপদে ছিলেন। অষ্টম পুরুষ নাগাদিত্যকে ভীলগণ সংহার করিয়া আবার ভীল রাজ্য স্থাপন করিল। নাগাদিত্যের তিন বৎসর বয়স্ক পুত্রকে লইয়া পুরোহিতগণ পলায়ন করিলেন। এই বালকের নাম বাপ্পা। এই গোহ হইতেই 'গোহিলোট' বা 'গিহ্লোট' নামে তদ্বংশীয়গণ অভিহিত হন। বাপ্পা দেখ।

গোহিল—চিতোরের অধিপতি মহারাণা খোমানের আহ্বানে যেসকল **স্বদেশ প্রেমিক** বীর স্বদেশ শত্রু মুসলমানদিগকে তাড়াইবার জন্য খোমানের পতাকাতলে সম্মিলিত হইয়াছিলেন, পরাণগড়ের অধিপতি গোহিল তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। খোমান দেখ।

গৌড়—তিনি ভোজ বংশীয় ছিলেন। খ্রীঃ পূর্ব্ব ৭৩০ অব্দে বর্ত্তমান মালদহ জিলায় গৌড় নামে একটী নগর স্থাপন পূর্ব্বক, তথায় তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

গৌড়গোবিন্দ—মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে শ্রীহট্ট প্রদেশ কয়েকটি খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল রাজ্য এক এক জন স্বাধীন হিন্দু নরপতি কর্তৃক শাসিত হইত। বর্ত্তমান শ্রীহট্ট সহর ও তৎসংলগ্ন উত্তর প্রদেশ তখন গৌড় রাজ্য নামে খ্যাত ছিল। এই গৌড় রাজ্যে গৌড় গোবিন্দ নামে এক রাজা ছিলেন। ঐ সময়ে দিল্লীতে সম্রাট আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ রাজত্ব করিতেছিলেন। দিল্লীর সম্রাট পূর্ব্বাঞ্চলে রাজ্য বিস্তার মানসে, স্বীয় ভাগিনেয় সিকান্দর শাহ গাজীর অধীনে, শ্রীহট্টে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি গৌড়ের তদানীন্তন রাজা গৌড় গোবিন্দ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। পরে গৌড় গোবিন্দ শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ দরবেশ শাহ জালালের হস্তে পরাজিত হইয়া ১৩৮৪ খ্রীঃ অব্দে রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। শাহ জালাল এমনি দরবেশ দেখ।

গৌড় মল্লিক—তিনি গৌড়ের (বাঙ্গালার) নবাব হোসেন শাহের সেনাপতি ছিলেন। স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজা ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রাম প্রদেশ হইতে মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করিয়া, উক্ত প্রদেশ স্বীয় অধিকারে আনয়ন করিয়াছিলেন। নবাব হোশেন শাহ সেনাপতি গৌড় মল্লিককে উক্ত প্রদেশ জয় করিবার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু ত্রিপুর বাহিনীর বুদ্ধি কৌশলে তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী গোমতী নদীর খরস্রোতে প্রাণ বিসর্জ্জন করে। অবশিষ্ট সৈন্যসহ স্বয়ং সেনাপতি গৌড় মল্লিক অতিকষ্টে পলায়নপূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন।

গৌতম—(১) তাঁহার প্রণীত ন্যায়দর্শন অতি প্রাচীন গ্রন্থ। তাঁহার সময় এখনও নিশ্চিতরূপে নিরূপিত হয় নাই। প্রসিদ্ধ কারিকা প্রণেতা পণ্ডিত বামনের পুত্র মস্করী খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীতে গৌতম ধর্ম্মসূত্রের একটী ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। পদমঞ্জরী প্রণেতা হরদত্ত দ্বাদশ শতাব্দীতে উহাকে অনুসরণ করিয়া গৌতম সূত্রের মিতাক্ষরা নামে একটী উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছেন। মস্করী ও হরদত্ত উভয়েই গৌতম সূত্রে অপানিণীয় পদ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় গৌতম পানিণীর পূর্ব্ববর্ত্তী। লাট্যায়ন, দ্রাহ্যায়ণ, গোভিল প্রভৃতি গৌতমের উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি তাঁহাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। সম্ভবত তিনি খ্রীঃ পূ ৮ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। গৌতম সূত্রের বহু ভাষ্য ও টীকা টিপ্পনী রচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ যে জ্ঞান রাজ্যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, এই সকল দর্শন শাস্ত্রাদি তাহার প্রমাণ।

গৌতম—(২) তিনি ধর্ম্ম শাস্ত্রকার গৌতম। তাঁহার প্রণীত গৌতম সংহিতা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। পুরাকালে সামবেদীয় ব্রাহ্মণগণই গৌতম ধর্ম্মসূত্রের দ্বারা অনুশিষ্ট হইতেন। এখন তাঁহার ব্যতিক্রম হইয়াছে।

গৌতম ইন্দ্রভুতি— জৈন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীরের একজন প্রধান শিষ্য। তাঁহার জন্ম খ্রীঃ পূর্ব্ব ৬০৭ সালে হইয়াছিল। তিনি মহাবীর হইতে আট বৎসরের বড় ছিলেন। মহাবীরের নির্ব্বাণ লাভের বার বৎসর পরে বিরানব্বই বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার আরও দশ ভাই ছিল। তাঁহারা সকলেই মহাবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অগ্নিভূতি, বায়ুভূতি ও অকম্পিত বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মহাবীরের প্রধান দ্বাদশজন শিষ্যের মধ্যে গৌতম ইন্দ্রভূতি ও সুধর্ম্ম ব্যতীত সকলেই তাঁহার মোক্ষ লাভের পূর্ব্বেই মোক্ষ লাভ করেন। গৌতমের পিতার নাম বসুমতি ও মাতার নাম পৃথী। গোডর

গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি খুব বিদ্বান্ ছিলেন এবং বিদ্যার গৌরবও করিতেন। একদা কোনও ব্রাহ্মণ বাড়ীতে যজ্ঞে পশুবলীর সাহায্য করিতে যাইতে ছিলেন। এমন সময় শুনিতে পাইলেন যে গ্রামে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন এবং তিনি অহিংসা ধর্ম্মের প্রচারক। ইহা শুনিয়া তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিবার জন্য খুব আগ্রহের সহিত যাইতে লাগিলেন। কিন্তু ফল বিপরীত হইল, তিনি সন্ন্যাসীর বাক্যে মোহিত হইয়া ভ্রাতৃগণসহ তাঁহার শিষ্য হইলেন। এই সন্ন্যাসীই জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বর্দ্ধমান বা মহাবীর ছিলেন। মহাবীরের মৃত্যুর পরে তাঁহার সম্প্রদায়ের তিনি প্রধান পরিচালক হইয়া দ্বাদশ বৎসর জীবিত ছিলেন। তৎপরে সুধর্ম্ম তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া আরও দ্বাদশ বৎসর জীবিত ছিলেন।

গৌতমবুদ্ধ—বুদ্ধদেব, গৌতম বুদ্ধ, শাক্যসিংহ, সিদ্ধার্থ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতেন। বুদ্ধদেব দেখ।

গৌতমা বাঈ—ইন্দোরের হোলকার বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ মহলার রাও হোলকারের মহিষী। তিনি স্বীয় স্বামীর ন্যায়ই অতি তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন মহলার রাও হোলকার ও অহল্যাবাঈ দেখ।

গৌতমী—সিদ্ধার্থের বিমাতা ও মাসী সিদ্ধার্থের মাতা মায়াদেবী সিদ্ধার্থের জন্মের পরে পরলোক গমন করিলেন। তখন মায়াদেবীই সিদ্ধার্থকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। পরে তিনি সিদ্ধার্থের (বুদ্ধের) মত গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায় ভুক্তা হইয়াছিলেন।

গৌতমী পুত্র—অন্ধ্রবংশীয় নরপতি গৌতমী পুত্র একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি উত্তর ভারতে শকদিগকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের অনেক রাজ্য অধিকার করেন। তাঁহার পুত্র পুলমায়ীর সময়ে কাঠিওয়ারের শক নরপতি রুদ্রদমন প্রবল হইয়া অন্ধ্রদিগকে তাড়াইয়া সেই সমস্ত রাজ্য পুনঃ অধিকার করেন।

গৌতমী পুত্র যজ্ঞশ্রী—তিনি অন্ধ্রবংশীয় একজন নরপতি। তিনি শক কর্ত্তৃক তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতি পুলমায়ীর পরাজয়ের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। শকদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য পুনরায় অধিকার করিয়াছিলেন।

গৌতমী পুত্র শাতকর্ণী—দাক্ষিণাত্যের শাতবাহন বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা তিনি ছিলেন। তিনি শকদিগকে দাক্ষিণাত্য হইতে বিতাড়িত করেন। অধিকন্তু তিনি উত্তর ভারতবর্ষের শকদিগের অধিকৃত রাজ্যের কতক অংশ অধিকারও করেন। তাঁহার পুত্র পুলমায়ী শকরাজ রুদ্র দমনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই

বিবাহেও উভয় রাজ্যের বিরোধের অবসান হয় নাই। শাতবাহন বংশীয়েরা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং এই বংশের ত্রিশজন রাজা প্রায় ৪৫০ বৎসর (খ্রীঃ পূ ২২০ হইতে ২৩০ খ্রীঃ) রাজত্ব করেন।

গৌরগুণানন্দ ঠাকুর — একজন বাঙ্গালী কবি। তিনি শ্রীখণ্ড নিবাসী এবং জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। 'শ্রীচৈতন্য সঙ্গীত' নামে তাঁহার একখানি সুন্দর কবিতা পুস্তক আছে।

গৌরগোবিন্দ রায়, উপাধ্যায়— ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে যে কয়জন ব্যক্তি বৈষয়িক জীবনের সকল প্রকার উন্নতির আশা ত্যাগ করিয়া কেশবচন্দ্রের অনুগামী হন, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ তাঁহাদের অন্যতম। পাবনা জিলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার বাগবাটী গ্রামে এক বৈদ্য বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি বাল্যকাল হইতেই মেধাবী, চিন্তাশীল ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন। সংস্কৃত ভাষার বিশেষ আগ্রহ থাকাতে নিজের চেষ্টাতেই শিখিতে আরম্ভ করেন এবং পরবর্ত্তীকালে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। বাল্যকালে কিছু ফারসী ভাষাও শিখিয়া ছিলেন। স্বাভাবিক চিন্তাশীলতার জন্য প্রথম জীবনেই প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের উপর আস্থাহীন হইয়া ইসলামের অনুরাগী হন। । তাঁহার পিতা ও খুল্লতাত তাঁহার স্বাধীন চিন্তাশীলতায় উৎসাহ প্রদান করিতেন। সাধারণ শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি পুলিশ বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ঐ সময় কুসংসর্গে পড়েন এবং পুলিশ বিভাগের সাধারণ উচ্ছৃঙ্খলতার অধীন হন। কিছুকাল পরে স্বেচ্ছায় ঐ চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া শিক্ষা বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তখন হইতেই জীবনে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। কেশবচন্দ্রের খ্যাতি প্রতিপত্তি দ্বারা তিনি আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার সেবক হন। কেশবচন্দ্র তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষা ও ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনায় নিযুক্ত করেন। আমরণ উপাধ্যায় উহাতেই নিযুক্ত ছিলেন। (কেশবচন্দ্র, ২৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) তৎরচিত গীতার 'সমন্বয় ভাষ্য' ও 'বেদান্ত সমন্বয় ভাষ্য' বহু পাণ্ডিত্য পূর্ণ উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থ। তদ্ভিন্ন তিনি 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম' প্রভৃতি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রত্যেকখানি পুস্তকেই তাঁহার অনুসন্ধিৎসা, বিচারক্ষমতা ও শাস্ত্রজ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ধর্ম্ম প্রচারার্থ যে মণ্ডলী গঠন করেন তিনি তাহার একটী উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

গৌর চাঁদ বিদ্যালঙ্কার— নদিয়া কুষ্টিয়া উপবিভাগের অন্তর্গত মেঘনা গ্রামে অনুমান ১৮০৮ খ্রীঃ অব্দে (১৭৩০ শকে) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ ও মৌদ্গায়ন গোত্রীয় ছিলেন। ব্যাকরণ, কাব্যে, তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল।

গৌরদাস—তিনি একজন পদকর্ত্তা। তাঁহার রচিত দুইটি মাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে।

গৌড়পাদ--অদ্বৈত মতের একজন শ্রেষ্ঠ আচার্য্য। তিনি খুব সম্ভব সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে গৌড়দেশের অধিবাসী বলিয়া মনে করেন। গৌড়পাদের পূর্ব্বে বৌদ্ধদর্শনের বিশেষ প্রচার ও প্রভাব ছিল। কুমারিল প্রভৃতি আচার্য্যগণ চেষ্টা করিয়াও বৌদ্ধমতের প্রভাব হ্রাস করাইতে পারেন নাই। আচার্য্য গৌড়পাদ অদ্বৈত মত প্রচার করিয়া বৌদ্ধ দার্শনিক মতের প্রভাব কিঞ্চিৎ লাঘব করিতে সমর্থ হন। গৌড়পাদের পর তাঁহার প্রধান শিষ্য আচার্য্য গোবিন্দপাদ ও তৎপরে গোবিন্দপাদের শিষ্য আচার্য্য শঙ্কর ঐ অদ্বৈত মতকে আরও বিশেষভাবে প্রচার করেন। গৌড়পাদ অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'মাণ্ডুক্য কারিকা' প্রধান। আগম, দ্বৈত, অদ্বৈত ও আলাতশান্তি এই চারিটি প্রকরণে উক্ত কারিকা বিভক্ত এবং উহাতে সর্ব্বমোট দুইশত পনরটি শ্লোক আছে। তদ্ভিন্ন সাংখ্যকারিকা ভাষ্য, উত্তর গীতা ভাষ্য, শ্রীবিদ্যাতন্ত্র ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থও গৌড়পাদের রচিত।

গৌর ভট্টাচার্য্য—তিনি প্রজাপতি দাস কৃত 'পঞ্চসরা' নামক গ্রন্থের এক টীকা রচনা করিয়াছেন। তিনিই রাঘবানন্দ বলিয়া অনুমিত হয়।

গৌরমণি ন্যায়ালঙ্কার—তিনি খাটুয়ার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন তিনি কলিকাতার উত্তর ভাগে হাতীবাগানে এক চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক ছাত্রগণের অধ্যাপনা কার্য্য সমাধা করিতেন।

গৌরমোহন—তিনি একজন পদকর্ত্তা। তাঁহার রচিত তিনটি পদ পাওয়া গিয়াছে।

গৌরমোহন আঢ্য— ওরিয়েন্টাল সেমিনারী নামক বিখ্যাত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮০৫ খ্রীঃ অব্দের ২০শে জুলাই তিনি কলিকাতা নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাল্যে লেখাপড়া অতি সামান্যই শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু অধ্যবসায় বলে ক্রমে ক্রমে তিনি বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মভীরু, সদাশয়, ও স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। সেই সময়ে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এদেশস্থ লোকের ইংরেজী শিক্ষার দিকে বিশেষ

দৃষ্টি পড়িয়াছিল। ভদ্র শ্রেণীর লোকেরা তাঁহাদের সন্তান সন্ততিকে ইংরেজি শিক্ষা দিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে ছাত্রদিগকে প্রেরণ করিতেন। এই খ্রীষ্ট শিষ্যেরা হিন্দু ছাত্রদিগকে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের সহিত তাঁহাদের ধর্ম্ম বিশ্বাস শিথিল করিয়া দিতে ছিলেন। ইহাতে বিরক্ত হইয়া অনেকে ইংরেজি শিক্ষার উপরেই বীত-শ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। এই সময়েই ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দে গৌরমোহন আঢ্য মহাশয় স্বীয় জীবীকা নির্ব্বাহের উপায়স্বরূপ 'ওরিয়েন্টেল সেমিনারী' নামক স্কুলটী স্থাপন করিলেন। সমগ্র হিন্দু সমাজ অতি আগ্রহে তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। অচিরেই ছাত্র সংখ্যা দুই শতেরও অধিক হইল। যাহাতে ছাত্রেরা ইংরেজিভাষা বিশুদ্ধরূপে উচ্চারণ ও শিক্ষা করিতে পারে তদর্থে টারনবুল নামক একজন ইংরেজকে তিনি অংশীদার করিয়া লইলেন। ইহাতে স্কুলের আরও দ্রুত উন্নতি হইতে লাগিল ১৮২৯ সালে টারনবুল সাহেবের মৃত্যু হইলে তিনিই স্কুলের একমাত্র অংশীদার হইলেন। তৎপরে তিনি হারমান জেফ্রয় (Herman Geofferey) নামক এক বারিষ্টারকে মাসিক একশত মুদ্রা প্রদান করিয়া শিক্ষক নিযুক্ত করেন। এই ফরাসী দেশীয় ভদ্রলোকটী ইউরোপের প্রধান কয়েকটী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি অতিশয় মদ্যপায়ী ছিলেন বলিয়া, বারিষ্টারী ব্যবসায় উন্নতি করিতে পারেন নাই, অধিকন্তু অতিশয় দৈন্য দশায় পতিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে গৌরমোহন তাঁহাকে শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তাঁহার শিক্ষাদিবার ক্ষমতাও অসাধারণ ছিল। গৌরমোহন ছাত্রদিগকে অতি-শয় স্নেহ করিতেন। ছাত্রদের কেহ কোন কারণে অনুপস্থিত হইলে স্বয়ং বাড়ী যাইয়া সংবাদ লইতেন। সর্ব্বোপরি ছাত্রদের চরিত্রের দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কেহ অন্যায় কার্য্য করিয়া নিস্কৃতি পাইত না। তিনি ছাত্রদিগকে যেমন ভালবাসিতেন, তেমনি তাঁহাদিগকে শাসনও করিতেন।

ছাত্রেরা বিদ্যালয় পাঠ্য ছাড়া যাহাতে বাহিরের অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য গৌরমোহন সদ্‌গ্রন্থে পরিপূর্ণ একটী উৎকৃষ্ট লাইব্রেরীও স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা আটশত পর্য্যন্ত হইয়াছিল। এই স্কুলে হিন্দু পেট্রিয়ট ও বেঙ্গলী সম্পাদক স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল, হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত, রায়বাহাদুর কৈলাস চন্দ্র বসু, প্রভৃতি বহু সম্মানিত ব্যক্তি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। গৌরমোহন ১৮৫৪ খ্রীঃ

অব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী পরলোক গমন করেন।

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার—ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের প্রথম যুগের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ও গ্রন্থকার. তিনি রাজা সার রাধাকান্ত দেবের সমসাময়িক ছিলেন। তৎকালে এদেশীয়দের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রচারের জন্য কলিকাতা স্কুল সোসাইটি (Calcutta School Society) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। তদ্ভিন্ন বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তকাদি প্রণয়ন ও প্রকাশের জন্য স্কুল বুক সোসাইটি (The School Book Society) নামে একটি প্রতিষ্ঠানও বর্ত্তমান ছিল. গৌরমোহন সুখ্যাতির সহিত প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠান ও পরিচালনাধীন বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতের কাজ করিতেন। উভয় প্রতিষ্ঠানই তৎকালীন শিক্ষানুরাগী ভারতীয় ও ইউরোপীয় মনস্বীগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত। গৌরমোহন প্রায় কুড়ি বৎসর কাল শিক্ষকতা করিবার পর মুন্সেফের পদ লাভ করেন। খুব সম্ভব সোসাইটির কাজ ভালরূপ না চলাতে ব্যয় সংক্ষেপের জন্য তাঁহাকে অন্যত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তাহা হইলেও সোসাইটির পরিচালকগণ তাঁহার কর্ম্মপটুতা ও পাণ্ডিত্যের জন্য বিশেষ প্রীত ছিলেন।

গৌরমোহন কতিপয় পুস্তকও রচনা করেন। তাহার মধ্যে 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' নামক পুস্তকখানি সমধিক বিখ্যাত। উহা ১৮২২ খ্রীঃ প্রথম প্রকাশিত হয়। তৎপরে উহার একাধিক সংস্করণ মুদ্রিত হয়। তৎকালীন অনেক বালিকা বিদ্যালয়ে উহা পঠিত হইত। উক্ত পুস্তকে গৌরমোহন শাস্ত্রীয় যুক্তি ও উদাহরণ দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা প্রচার করেন। 'কবিতামৃত-কূপ' নামক আর একখানি বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তকও তিনি সঙ্কলণ করেন। উহার ভূমিকায় লিখিত হইয়াছিল "বালক সকলের জ্ঞান ও সুনীতি বৃদ্ধির কারণ চাণক্য মুনি সংগৃহীতপুস্তকের ন্যায় কবিতামৃতকূপ নামক অপর এক পুস্তক নানা গ্রন্থ হইতেসংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করিলাম"।

গৌরসুন্দর দাস—তিনি একজন পদকর্ত্তা। তাঁহার রচিত তিনটী পদ পাওয়া গিয়াছে।

গৌর স্বামী—এই বাঙ্গালী সন্ন্যাসী খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সৌরাষ্ট্র দেশে আবির্ভূত হইয়া বহু সিন্ধী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী প্রভৃতি শিষ্য করিয়াছিলেন।

গৌরীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত—ওয়ারেন হেষ্টিংসের আদেশে যে এগারজন পণ্ডিত 'বিবাদার্ণব সেতু' নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ দেখ।

গৌরীকান্ত, দ্বিজ— মহাস্থানের কবিতা রচয়িতা। বগুড়া জেলার অন্তর্গত নাড়ুলি গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল।

গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য— বাঙ্গালী পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। রাজা রামমোহন রায় যখন রঙ্গপুর হইতে প্রথম ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিতে থাকেন, তখন রঙ্গপুর জজ আদালতের দেওয়ান গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য তাঁহার বিরোধিতা করিয়া 'জ্ঞানাঞ্জন' নামে এক পুস্তক রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থ প্রথমে ১৮২১ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হয়।

গৌরীদাস—তিনি একজন পদকর্ত্তা। তাঁহার রচিত তিনটি পদ পাওয়া গিয়াছে। গৌরীদাস নিত্যানন্দ প্রভুর খুড়াশ্বশুর ছিলেন। তাঁহার বাড়ী শান্তিপুরের নিকট অম্বিকা গ্রামে ছিল। তিনি শ্রীচৈতন্য দেবের অনুচর ছিলেন। চৈতন্যদেবের স্বহস্ত লিখিত গীতা গ্রন্থ তাঁহার নিকট ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।

গৌরা দেবী—তিনি কাশ্মীরের অধিপতি যশস্করের সাধ্বী মহিষী। তাঁহার পুত্র সংগ্রাম দেবকে বধ করিয়া পর্ব্ব গুপ্ত কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই পাপিষ্ঠ রাজমহিষীর প্রতি কুদৃষ্টিপাত করায়, রাণী গৌরা দেবী কৌশলে তাঁহার অভিপ্রায় ব্যর্থ করিয়া যজ্ঞকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করেন।

গৌরীনাথ সিংহ—আসাম প্রদেশের আহমবংশীয় রাজা লক্ষ্মীসিংহ ১৭৮০ অব্দে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গৌরীনাথ সিংহকে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকেরা রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্য নাম সুহিতপাংফা ছিল। আহমবংশীয় নরপতিদের মধ্যে তাঁহার মত অকর্ম্মণ্য রাজা আর কেহ ছিলেন না। তিনি অতিশয় প্রতিহিংসাপরায়ণ নরপতি ছিলেন। তাহার ফলে মোয়ামারিয়ারা আবার বিদ্রোহী হয়। এই বিদ্রোহ দমন করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি সপারিষদ গৌহাটীতে পলায়ন করেন। তিনি জয়ন্তিয়া, কাছাড় ও মণিপুর রাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কাছাড় ও জয়ন্তিয়াপতি, আহমপতিকে সাহায্য করা দূরে থাকুক বরং তাঁহারা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। মণিপুরপতি সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াও অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এদিকে দরং রাজের কৃষ্ণনারায়ণ বিদ্রোহী হইয়া রাজসৈন্যকে দরং হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন। গৌরীনাথ অনন্যোপায় হইয়া ইংরেজের সাহায্য প্রার্থী হন। কাপ্তান ওয়েলশ (Captain Welsh) একদল ভারতীয় সৈন্যসহ তাঁহাকে সাহায্য করিয়া বিদ্রোহীদিগকে দমন করেন এবং তাঁহাকে স্বীয় রাজধানী রঙ্গপুরে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইংরেজ সৈন্য চলিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যের অবস্থা পূর্ব্ববৎ হইল। ইতিপূর্ব্বে ইংরেজের

মধ্যস্থতায় কৃষ্ণনারায়ণ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ইংরেজ চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সদিয়া নগরে কামতি নাগারা স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। তাঁহার রাজ্যের সীমা এইরূপে অতিশয় খর্ব হইল। এই সময়ে ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দের ১৯শে ডিসেম্বর গৌরীনাথ পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখিয়া বড়গোহাই, তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বড় বড়ুয়াকে গৌহাটী হইতে রাজার আদেশ বলিয়া আনয়ন করেন ও পরে তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করেন। সঙ্গে সঙ্গে ভূতপূর্ব নরপতি গদাধর সিংহের একজন বংশধর কিনারামকে রাজা করেন। কিনারাম কমলেশ্বর সিংহ নাম গ্রহণপূর্বক রাজা হন।

গৌরীনারায়ণ—তিনি আসামের রাজা বীরপালের পুত্র। বীরপাল আসামের পূর্ব অঞ্চলের সদিয়া নামক স্থানের সোনাগিরিতে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহার পুত্র গৌরীনারায়ণ কখন কখন সোনাগিরিপাল নামেও কথিত হইতেন। গৌরীনারায়ণ স্বীয় রাজধানী রত্নপুর নামক স্থানে স্থানান্তরিত করিয়া, স্বয়ং রত্নধ্বজ পাল নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রঙ্গন-গিরি, নীলগিরি ও বজ্রগিরি প্রভৃতি স্থানের রাজাদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি সমতল ভাগে ভদ্রসেন নামক এক রাজাকে পরাস্ত করিয়া বহু ধনরত্ন হস্তগত করেন এবং বহু সংখ্যক লোককে বন্দী করিয়া আনিয়া স্বীয় রাজ্যে স্থাপন করেন। তিনি কুমারপাল নামক অপর একজন রাজাকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন। কুমারপাল স্বীয় কন্যাকে গৌরীনারায়ণের সহিত বিবাহ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার অষ্টম পুরুষে ধারনারায়ণ নামে এক রাজা ছিলেন।

গৌরীবর বিদ্যালঙ্কার—মৌদ্গল্য গোত্রীয় এই অসাধারণ জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে বর্ত্তমান ছিলেন। এই বংশে বহু জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

গৌরীবাঈ—গুজরাটের অন্তর্গত গীরপুর নামক ক্ষুদ্র সহরে ১৮১৫ সম্বতে (১৭৫৯ খ্রীঃ) নাগর ব্রাহ্মণবংশে এই বিদুষী মহিলার জন্ম হয়। নাগর ব্রাহ্মণদের মধ্যে বাল্যবিবাহ বিশেষ প্রচলিত। তৎফলেই পঞ্চমবর্ষ বয়সের সময় তাঁহার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। বিবাহের আট দিবস পরেই তাঁহার বৈধব্যদশা ঘটিল। অদৃষ্টের কি নিদারুণ পরিহাস! এই অল্প বয়সেই তাঁহার জীবনের ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তাঁহার পিতা বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান ছিলেন। এবম্বিদ নিষ্ঠুরতা তাঁহার

মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিয়াছিল তিনি যত্নপূর্ব্বক কন্যার বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগী হইলেন। কয়েক বৎসর বিদ্যা শিক্ষার পর তিনি তাঁহাকে গীতা প্রভৃতি ধর্ম্ম গ্রন্থ পড়াইতে লাগিলেন। বিদ্যা শিক্ষার প্রতি গৌরীবাঈয়ের এরূপ প্রবল অনুরাগ জন্মিল যে, তিনি তের বৎসর বয়সের সময় হইতে গৃহের বাহির হওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া, অবিশ্রান্ত নানা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ সদ্‌গুণরাশি তাঁহার চিত্তে প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি যোগাভ্যাসে মনোনিবেশ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার চিত্ত ঈশ্বর ভক্তিতে এতদূর নিবিষ্ট হইল যে, অধিকাংশ সময় তিনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িতেন, চিত্ত সমাধি আনন্দে: তন্ময় হইয়া যাইত। তথাকার সামন্ত রাজা শিবসিংহ তাঁহার এই সকল সদ্‌গুণরাশির কথা শুনিতে পাইয়া, তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন এবং অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া তিনি তথায় একটী সুন্দর মন্দির ও তৎসংলগ্ন একটী বৃহৎ সরোবর নির্ম্মাণ করাইয়া গৌরীবাঈয়ের নামে উৎসর্গ করিলেন। ১৮৩৮ সম্বতের ৬ই মাঘ (১৭৭২ খ্রীঃ) গৌরীবাঈ এই মন্দিরে স্বীয় ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি স্থাপনা করেন। ইহার কিয়দ্দিবস পর তাঁহার আদেশ অনুযায়ী শিবসিংহ মন্দিরের সন্নিকটে একটী প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালাও নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। একবার একজন সাধু মোহন্ত সেই মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তিনি গৌরীবাঈকে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ভক্তিমার্গে সমুন্নত বুঝিতে পারিয়া, স্বীয় বালমুকুন্দের মূর্ত্তি তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে গৌরীবাঈ সমাধি আনন্দে অধিকতর লীন হইতে লাগিলেন, এমন কি একাদিক্রমে পনের দিন পর্য্যন্ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া চিন্ময় আনন্দে মগ্ন থাকিতেন। তৎকালে তিনি কিঞ্চিন্মাত্র দুগ্ধপানে জীবন রক্ষা করিতেন। ১৮৬০ সম্বত (১৮০৪ খ্রীঃ) পর্য্যন্ত তিনি এই অবস্থায়ই ছিলেন। তৎকালে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানপূর্ণ বিবিধ কবিতা রচনা করেন। গৌরীবাঈ স্বীয় ভগিনীকন্যা চতুরী বাঈয়ের প্রতি সমধিক অনুরক্তা ছিলেন। অল্প বয়সেই সংসার সুখ সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া চতুরীবাঈ তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি সাধু প্রদত্ত বালমুকুন্দ বিগ্রহ চতুরীবাঈকে প্রদান করেন। ১৮৬৫ সম্বতের ৯ই চৈত্র (১৮০৯ খ্রীঃ তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দে চিরলীন হইলেন। তাঁহার কাব্য অপূর্ব্ব সরলতা ও বিশুদ্ধ জ্ঞান ভক্তিরসে পূর্ণ ছিল। তিনি ৬৫২টী বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানপূর্ণ পদ রচনা করেন, প্রথম রচনা 'কৃষ্ণবাললীলা' ও 'শিবস্তুতি' ব্যতীত অধিকাংশই শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানমূলক।

গৌরী মহাদেবী—তিনি উড়িষ্যার করবংশীয় নরপতি দ্বিতীয় শোভাকরের মহিষী। স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি রাজ্যভার স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার কন্যা দণ্ডী মহাদেবী ৯১৮—৯২৫ শ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। উন্মত্ত সিংহ দেখ।

গৌরীমোহন দাস—রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ে বহু কবির প্রায় সাড়েতিনশত পদসংগ্রহ করিয়া 'পদকল্পলতিকা' নামে এক সংগ্রহ গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন।

গৌরীশঙ্কর উদয়শঙ্কর—গুজরাতি উচ্চ পদস্থ রাজ কর্ম্মচারী। ১৮০৫ শ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। মাত্র সতের বৎসর বয়সে তিনি ভাবনগর রাজ্যে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং প্রতিভা বলে দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে থাকেন। ১৮৩৯ শ্রীঃ অব্দে সহকারী দেওয়ান এবং তাহার কতিপয় বর্ষ পরে, দেওয়ানের পদ লাভ করেন। তাঁহার শাসন ব্যবস্থায় রাজ্যের নানাবিধ উন্নতি সাধিত হয় এবং শাসন কার্য্যের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। ১৮৭৭ শ্রীঃ অব্দে তিনি C. S. I. উপাধি প্রাপ্ত হন এবং দুই বৎসর পরে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৮৬ শ্রীঃ অব্দে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী নাম গ্রহণ করেন। ১৮৯১ শ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ—১৭৯৯ শ্রীঃ অব্দে শ্রীহট্ট জিলার ইটা পরগণার পাঁচ গাও নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য। তিনি প্রথমে গ্রামের চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ক্রমকালে গোপনে উচ্চ শিক্ষা লাভার্থ নবদ্বীপে চলিয়া আসেন। এই স্থানে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তর্কবাগীশ উপাধি প্রাপ্ত হন। যে সময়ে রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ নিবারণ প্রভৃতি সমাজ সংস্কার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, সেই সময়ে তিনি কলিকাতা আগমন করিয়া, সেই সব কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক সম্পাদিত 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকার তিনি একজন লেখক ছিলেন। তৎপরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর,' প্রেমচাঁদ সম্পাদিত 'সংবাদ সুধাকর' ও দক্ষিণানন্দ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রভৃতি পত্রের তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। শেষোক্ত পত্রের বাংলা বিভাগের তিনি সম্পাদক ছিলেন। ১৮৩৯ শ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাস হইতে গৌরীশঙ্কর কলিকাতা হইতে, 'সংবাদ ভাস্কর' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ভাস্করের অন্য সম্পাদক ছিলেন শ্রীনাথ রায়। শ্রীনাথ রায় আন্দুলের রাজার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ

লিখিয়া তৎকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হন। কিন্তু রাজা বাহাদুর এক সহস্র টাকা জরিমানা ও কয়েকদিন হাজত বাস করিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। শ্রীনাথ রায় ভাস্কর সম্পাদন পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু গৌরীশঙ্কর তৎপরে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত (১৮৫৯ খ্রীঃ) ইহার সম্পাদক ছিলেন। ইহা প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে সপ্তাহে দুইবার, সর্ব্বশেষে সপ্তাহে তিনবার (মঙ্গল, ও শনিবার) প্রকাশিত হইত।

গৌরীশঙ্কর নির্ভিক, স্পষ্টবাদী, অপক্ষপাতী সম্পাদক ছিলেন। তিনি কাহারও দোষের উল্লেখ করিতে কিছুমাত্র ভয় করিতেন না। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদের দোষাদ্ঘাটনে তিনি কিছুমাত্র ভীত হইতেন না। এজন্য এক শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারী তাঁহার প্রতি অতিশয় বিরক্ত ছিলেন। অন্যদিকে তিনি সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া, দেশের প্রাচীনপন্থীরা তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না। স্ত্রী শিক্ষা, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ তাঁহার পত্রিকায় সর্ব্বদা প্রকাশিত হইত। এই নির্ভিক সম্পাদক কাহারও অনুরাগ বিরাগের কিছুমাত্র ধারধারিতেন না। একদিকে যেমন তাঁহার শত্রু সংখ্যা খুব ছিল, অন্য দিকে মিত্র সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিলনা। তাহা সত্ত্বেও তাঁহার স্পষ্টবাদীতার জন্য তাঁহাকে কয়েকবার কারাগারে গমন করিতেও হইয়াছে। ভাস্কর প্রকাশের পর 'রসরাজ' নামে আর এক খানা পত্রিকা তিনি বাহির করেন। তাহাদের সম্পাদকীয় অনেক প্রবন্ধ সুরুচীর সীমা লঙ্ঘন করিত। আক্কেল 'গুড়ুম' 'রসমুদ্গর' প্রভৃতি রস রাজের বিরোধী ছিল। কিন্তু রসরাজ একাই একশত। তাঁহার পরম সুহৃদ শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণের বিরুদ্ধেও লিখিতে গৌরীশঙ্কর শঙ্কুচিত হইলেন না। অনেকের অনুরোধে রসরাজ বন্ধ করিলেন। ১৮৫৭ সালে তিনি 'হিন্দুরত্ন কমলাকর' নামে এক পত্রিকা বাহির করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত কতিপয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থও আছে। নিম্নে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। ১। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার বঙ্গানুবাদ ২। জ্ঞান প্রদীপ ১ম ও ২য় খণ্ড, বালকদের শিক্ষার্থ গ্রন্থ। (৩) ভূগোল সার। (৪) পাকরাজেশ্বর। (৫) নীতিরত্ন (৬) মহাভারত ১ম ও ২য় খণ্ড। (৭) চণ্ডী মূল এবং গোবিন্দরাম সিদ্ধান্তবাগীশাদির টীকা ও অনুবাদ সহ।

গৌরীশঙ্কর দে—কলিকাতার উত্তর অংশে দর্জিপাড়ায় ১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ রামসুন্দর দে শ্রীহট্টের জজ আদালতের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মধুসূদন দে। তিনি ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায়

সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ১৮৬৩ সালে এল, এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তৎপরে গণিত শাস্ত্রে (সম্মানের সহিত (Honours) প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৭ সালে গণিতে এম, এ পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। পরীক্ষা দিয়াই তিনি স্কটিস চার্চ্চ কলেজে (পূর্ব্ব নাম General Assembly Institution) গণিতের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে দীর্ঘ ৪৭ বৎসর কাল, মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। অধ্যাপন কালেই তিনি বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৮১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৮৫ সালে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নিযুক্ত হন। তিনি যেমন একদিকে গভীর জ্ঞানী ছিলেন, তেমনই মিষ্টভাষী, বিনয়ী, মিতাচারী ও ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্যে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার অনাড়ম্বর প্রকৃতি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এই মনীষী ১৯১৩ সালে পরলোক গমন করিয়াছেন।

গৌরী সেন—প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ব্যবসায়ী ও দাতা। 'লাগে টাকা, দিবে গৌরী সেন' এই সুপ্রচলিত প্রবাদটি তাঁহাকেই উপলক্ষ করিয়া প্রচারিত হইয়াছে। গৌরী সেন খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত কনখলের অধিবাসী ছিলেন। পুরন্দর সেন নামক তদ্বংশীয় একজন, সুবর্ণগ্রামে বাস করিতেন। তৎপরে হলধর সেন নামক আর একজন সপ্তগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এই হলধর সেনের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ অনিরুদ্ধ হুগলীর নিকট বালি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। গৌরী সেন এই অনিরুদ্ধের পৌত্র। তাঁহার পিতার নাম নন্দরাম সেন। তিনি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। গৌরী সেন সামান্য কিছু মূলধন লইয়া বংশগত প্রথা আমদানী রপ্তানীর ব্যবসায় প্রবৃত্ত হন। সাধুতা ও প্রখর বিষয় বুদ্ধিবলে অল্পকাল মধ্যেই তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে থাকেন। এই ধনলাভ তাঁহাকে অমিতব্যয়ী অথবা বিলাসী করে নাই। বরঞ্চ তিনি উহা নানা সৎকার্য্যে ব্যয় করিতে মনস্থ করিলেন। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে অনাথ আতুর সকলেই তাঁহার নিকট সাহায্য পাইত। যে কোনও লোক যে কোনও কারণে অভাবগ্রস্ত হইয়া, তাঁহার সাহায্য প্রার্থী হইলেই তিনি অকাতরে তাঁহার দুঃখ মোচনে প্রবৃত্ত হইতেন। কেহ কোনও জনহিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া

করিয়া, অসমর্থ হইলে, গৌরীসেন তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য ও অর্থ প্রদান করিতেন। এইভাবে অনেকে অর্থের সংগ্রহ না থাকিলেও কোনও কার্য্য আরম্ভ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। কারণ সকলেরই বিশ্বাস ছিল 'লাগে টাকা, দিবে গৌরী সেন'। তাঁহার এই অসামান্য বদান্যতার সুযোগে অনেক অসাধু ব্যক্তি তাঁহাকে বঞ্চনা করিতেন। কিন্তু তাহাতেও গৌরী ক্ষুব্ধ হইতেন না। অমিত ধনের অধিকারী হইয়াও তিনি বিনয়ী ও সদালাপী ব্যক্তি ছিলেন। ১৬৬৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি নিজ বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী স্থানে 'গৌরীশঙ্কর' নামে শিব প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুকালে খুবসম্ভব হরেকৃষ্ণ ও মুরলীধর নামে দুই পুত্র বর্ত্তমান ছিল।

গ্রন্থীভেদ নাথ—তিনি নাথ সম্প্রদায়ের একজ সিদ্ধ পুরুষ। জপান নাথ দেখ।

গ্রহণ কুণ্ড—তিনি বঙ্গের রামপাল রাজার ১৫শ রাজাঙ্কে (১১০৬ খ্রীঃ) নালন্দায় অবস্থানপূর্ব্বক বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখে কৃষ্ণ পক্ষের সপ্তমি তিথিতে মগধ বিষয়ে 'ভট্টারিকা প্রজ্ঞা পারমিতা' নামক একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।

গ্রহবর্ম্মা—তিনি কণৌজের মৌখরী বংশীয় নরপতি অবন্তী বর্ম্মার পুত্র। তিনি থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্দ্ধনের কন্যা এবং রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধনের ভগিনী রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রভাকর বর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে মালবের রাজা দেবগুপ্ত কণৌজ আক্রমণ করিয়া গ্রহবর্ম্মাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। রাজ্যশ্রী তৎপরে যুদ্ধে অবতীর্ণা হইয়া বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করেন। পরিশেষে শত্রু হস্তে বন্দিনী হন। পরে হর্ষবর্দ্ধন দেবগুপ্তকে বিনাশ করিয়া ভগিনী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

গ্রহবর্ম্মা (মৌখরী)—তিনি কান্যকুব্জের মৌখরী বংশীয় শেষ নরপতি। তিনি থানেশ্বরের বর্দ্ধন বংশীয় হর্ষবর্দ্ধনের ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করিয়া ছিলেন। মালব রাজ দেবগুপ্ত কর্ত্তৃক গ্রহবর্ম্মা নিহত হইয়াছিলেন।

গ্রাণ্ট-ডাফ্ জেম্স কানিংহাম, (James Cunningham Grant Duff)—ভারত প্রবাসী ইংরেজ সামরিক কর্ম্মচারী ও ঐতিহাসিক। ১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৮০৫ খ্রীঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সৈনিক বিভাগে কাজ লইয়া ভারতে আগমন করেন। প্রধানতঃ বোম্বাই প্রদেশের নানাস্থানে দায়ীত্বপূর্ণ পদে কাজ করিয়া ১৮২৭ খ্রীঃ অব্দে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তৎপরে ১৮২৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার বিখ্যাত 'মারাঠা জাতীর

ইতিহাস' (History of the Mahrattas প্রকাশিত হয়। ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গ্রাণ্ট, সার জন পিটার, (Sir John Peter Grant)—ভারত প্রবাসী উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী। ১৮০৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। শিক্ষা সমাপনান্তে ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি শাসন বিভাগে (Indian Civil Service) চাকুরী লইয়া ভারতে আগমন করেন। যুক্তপ্রদেশ (তখনকার নাম 'উত্তর পশ্চিম প্রদেশ') মান্দ্রাজ ও বাঙ্গালাদেশে নানা বিভাগে সুখ্যাতির সহিত কাজ করিয়া ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে থাকেন এবং ১৮৫৯—১৮৬২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশের ছোট লাটের পদে নিযুক্ত থাকেন। তাঁহার শাসনকালে 'বিধবা বিবাহ' সমর্থন করিয়া আইন প্রণীত হয়। নীলকরদের প্রতি অত্যাচারের জন্য বাঙ্গালা ও বিহারে তখন খুব আন্দোলন হয়। তিনি চাষীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করাতে, ইয়োরোপীয়দের বিরাগ ভাজন হন। যশোহর, নদীয়া, পাবনা, ফরিদপুর প্রভৃতি কয়েকটী জিলায় বহুপূর্ব্বাবধি নীলের চাষ হইয়া আসিতেছিল। ঐ চাষ ইউরোপীয়দিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে নির্ব্বাহিত হইত। নীলকর সাহেবদিগের চাষের প্রণালী দ্বিবিধ—এক নিজ, অপর রাইয়তি। নিজ চাষ সাহেবদিগের নিজ ভূমিতে বোনা কুলীদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইত। কিন্তু ঐ চাষের পরিমাণ অতি অল্প মাত্র। অধিক নীল চাষ রাইয়তদিগের ভূমিতে রাইয়তদিগের দ্বারাই হইত। রাইয়তেরা সাহেবদিগের স্থানে টাকা এবং বীজ দাদন লইয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভূমিতে নীল প্রস্তুত করিয়া দিবে স্বীকার করিত। অনন্তর নীল প্রস্তুত হইলে, চারা কাটিয়া কুঠীতে লইয়া যাইত। কুঠীতে সচরাচর আট বাণ্ডিল নীল চারার দাম এক টাকা ধরা হইত, এবং ষ্টাম্পের দাম ও বীজের দাম এবং চারা আনিবার খরচা বাদ দিয়া নীলের দাম যত হইত, তাহা দাদনের টাকা হইতে বাদ দেওয়া যাইত। এইরূপ করাতে রাইয়তদিগের দাদন শোধ যাইত না এবং বর্ষে বর্ষে তাহাদিগের দেনা বৃদ্ধি হইয়া পরিশেষে তাহারা কুঠীর গোলাম হইয়া পড়িত।

এ প্রণালীতে যে এতদিন কাজ চলিয়াছিল, তাহার দুইটী কারণ। এক কারণ এই, অজ্ঞ রাইয়তেরা মনে করিত যে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা, তাহারা আপনাদিগের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও কুঠিয়াল সাহেবদিগের নীলের চাষ করিয়া দেয়। আর একটী কারণ, এতদিন খাদ্য দ্রব্যাদির অতিশয় সুলভ মূল্য ছিল, তাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প ক্লেশে প্রজাদিগের একপ্রকার গুজরাণ

হইত। সম্প্রতি নীল চাষ স্থায়ী থাকিবার ঐ দুইটী কারণই দেখা গিয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের কোন কোন কর্ম্মচারী নীল চাষের সম্বন্ধে প্রজাদিগের ভ্রম আছে জানিতে পারিয়া, প্রকাশ্য কাছারিতে এবং মফঃস্বল ভ্রমণকালে তাহাদিগকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিলেন যে, নীল চাষে গবর্ণমেণ্টের কোন সম্পর্কই নাই। প্রজাদিগের ইচ্ছা হয় ঐ চাষ করিবে, না হয় না করিবে। আর খাদ্য সামগ্রীর মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছিল। যেরূপ চাউল ১৮৪০ অব্দে এক টাকা মণ তাহা এক্ষণে দুই টাকা। দাইল ১৸৵০ মণ হইতে ২৸৵০, তামাক ২৷৹ হইতে ৫ টাকা, তৈল ৪৸৵০ হইতে ১৬ টাকা হইয়া দাড়াইয়াছিল। সুতরাং পূর্ব্বে নীল দাদনের টাকা লইলে রাইয়তের সংসার চলিবার পক্ষে যত দূর সুবিধা হইত, এক্ষণে আর ততদূর সুবিধা হইত না। তদ্ভিন্ন, কৃষ্যুৎপন্ন দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে নীল চাষের অপেক্ষা অপরাপর চাষের লাভ অধিক, ইহাও রাইয়তদিগের চক্ষে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

এই সকল কারণ মিলিত হওয়াতে রাইয়তদিগের মধ্যে নীলচাষের প্রতি যৎপরোনাস্তি বিদ্বেষ জন্মিয়া গেল। তাহারা নীলের দাদন লইতে অস্বীকৃত হইল এবং যাহারা পূর্ব্বে দাদন লইয়াছিল, তাহারাও নীল চাষ করিয়া দিতে চাহিল না।

গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করিলেন যে রাইয়ত দাদন লইয়া নীলের চাষ না করিবে, তাহাকে দাদনের পাঁচগুণ জরিমানা দিতে হইবে এবং কয়েদ খাটিতে হইবে। এ বিষয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমের উপর কোন আপীল চলিবে না। রাইয়তেরা স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া রহিল। যে যে জিলায় নীলের চাষ হইত, তথাকার জেল রাইয়তে পূর্ণ হইয়া গেল। গবর্ণমেণ্ট নীল চাষের দোষ গুণ বিচার করিবার নিমিত্ত একটী কমিসন নিযুক্ত করিলেন। কমিসন কিছু দিন কলিকাতায় কিছু দিন কৃষ্ণনগরে থাকিয়া অনেকানেক নীলকর, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, মিসনরী সাহেব এবং দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন। এবং পরিশেষে গবর্ণমেণ্টের নিকট বিবরণ প্রদান করিলেন। নীল চাষের সমস্ত দোষ প্রকাশিত হইয়া গেল। নীলকর সাহেবদিগেরও আর ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা গবর্ণর জেনেরেলের নিকট গ্রাণ্ট সাহেবের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিলেন। নীল চাষের প্রতি দেশীয় লোকের অভিমত কিরূপ, ইহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার নিমিত্ত রায় দিনবন্ধু মিত্র প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ "নীলদর্পণ" নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করা হইয়াছিল।

সেই অনুবাদক বিশুদ্ধচেতা পাদ্রি লঙ্ সাহেবের নামে সুপ্রীমকোর্টে অভিযোগ করিয়া তাঁহাকে কারাদণ্ড দেওয়া হইল। পরিশেষে গ্রাণ্ট সাহেবের নামেও সুপ্রীমকোর্টে নালিস করিয়া তাঁহার জরিমাণা করান হইল।

ফল কথা, এই সময়টাতে বাঙ্গালার মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদ অতি গুরুতর-রূপ হইয়া উঠিয়াছিল। এক পক্ষে দেশীয় জনগণ এবং বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট, পক্ষান্তরে নীলকর প্রভৃতি সাহেব দল। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টও এই সময়ে একটু নীলকরদিগের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। চুক্তিভঙ্গের আইন এই সময়ে প্রস্তাবিত হইয়াছিল। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, কোন মজুরদার অমুক কার্য্য করিয়া দিব বলিয়া যদি আগাম টাকা লয়, তবে দেওয়ানি-আদালতে তাহার মোকদ্দমা না হইয়া ফৌজদারী আদালতে সরাসরি বিচার হইবে এবং মজুরদারকে যেরূপে হউক, ঐ চুক্তি বজায় করিয়া দিতে হইবে। এরূপ আইন অতি ভয়ানক। প্রাচীন রোমীয়দিগের মধ্যে এইরূপ আইন প্রচলিত ছিল বলিয়া তথায় সমূহ অত্যাচার হইয়াছিল। এরূপ আইনের প্রভাবেই অধমর্ণেরা উত্তমর্ণদিগের একান্ত বশীভূত দাস হইয়া পড়ে। কিন্তু ষ্টেট সেক্রেটারী স্যর চার্লস্ উড সাহেব ঐ আইন প্রচলিত হইতে দিলেন না।

কিন্তু হইতেও নীলকর এবং তৎপক্ষীয় রাজপুরুষদিগের নিবৃত্তি হইল না। বিনা আপীলে সরাসরি বিচার নিষ্পত্তি করাইবার নিমিত্ত সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র ছোট আদালত সকল সংস্থাপিত করিবার বিধি নির্দ্ধারিত হইল। গ্রাণ্ট সাহেব যদিও তাড়াতাড়ি কতকগুলি ছোট আদালত বাঙ্গালায় স্থাপিত করিতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন না, তথাপি ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুজ্ঞা পরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে এইরূপ করিতে হইল। এই সকল আদালতের বলে নীলবিদ্রোহকারী প্রজাগণ ক্রমেই বশীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। তথাপি গ্রাণ্ট সাহেব ঐ আদালতের সংখ্যা যথাসাধ্য ন্যূন করিয়া রাখিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে নীলকর সাহেবেরাও বাস্তবিক কেহ ধনী পুরুষ ছিলেন না। বাঙ্গালার মধ্যে তাঁহাদিগের যে সমস্ত কুঠী ছিল, তাহা প্রায় সকলই বন্ধকী। সুতরাং প্রজার সহিত সর্ব্বদা এরূপ হাঙ্গামায় লোকসান সহিয়া উহারা আর কতদিন টিকিবে? প্রায় সকলগুলিই দেউলিয়া হইয়া উঠিয়া গেল। আর যে যে কুঠী রহিল, তাহাতে নীল চাষার দর বৃদ্ধি করিয়া দিয়া যাহাতে রাইয়তদিগের নিতান্ত ক্ষতি না হয়, এরূপ ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইল।

গ্রাণ্ট সাহেব বাঙ্গালার সিবিলিয়ান-কুলের শিরোমণি স্বরূপ ছিলেন।

তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা এবং দৃঢ়তা যেরূপ ছিল, আড়ম্বর পরিশূন্যতা এবং প্রকৃত কার্য্যে অধ্যবসায় শীলতা তেমন প্রশংসনীয় ছিল। তাঁহার সময়ে মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টারের পদ এক হইয়া যায়। তিনি ফেরি ও টোল ফণ্ডের উদ্বৃত্ত পাঁচ লক্ষ টাকা দ্বারা অন্যূন ১০টী নূতন বড় রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া রেলের সহিত যোগ করিয়া দেন। তাঁহারই সময়ে প্রসিদ্ধ অর্থশাস্ত্রবিদ্ উলসন সাহেব ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থ সচিব হইয়া আসেন। তিনি নানাবিধ কর স্থাপন করিয়া আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা করেন।

এই সময়ে ষ্টেট সেক্রেটারী সার চার্লস উড টিপু সুলতানের বংশধরদিগকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দান করেন। ইহাতে এদেশে ইংরেজ বাঙ্গালী সকলেই ক্রোধান্বিত হইয়া প্রতিকার প্রার্থী হইলেন। কিন্তু প্রতিকার কিছুই হইল না। তাঁহারই সময়ে প্রথমে নোটের প্রচলন আরম্ভ হয়। এই সময়ে বাঙ্গালায় লাটের ব্যবস্থাপক সভার পত্তন হয়। মধ্যে কিছুকাল তিনি বড়লাটের পরামর্শ সভার (Supreme Council) সদস্য ছিলেন। তখন প্রধানতঃ তাঁহারই পরামর্শে অযোধ্যা ইংরেজ অধিকার ভুক্ত হয়। ভারতবর্ষের রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কিছুকাল জামাইকা দ্বীপের শাসনকর্ত্তা হন। ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

গ্রিফিথ, রালফ টমাস (Ralph Thomas Hotchkin Griffith)—১৮২৬ খ্রীঃ অব্দের ২৫শে মে তাঁহার জন্ম হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া বেনারস কলেজে ১৮৫৪—৬২ সাল পর্য্যন্ত অধ্যাপক ছিলেন। তৎপরে ১৮৬৩—৭৮ সাল পর্য্যন্ত উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৭৮—৮৫ সাল পর্য্যন্ত সংযুক্ত অযোধ্যা প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ (Directer of Public Instruction) ছিলেন। ১৮৮৫ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত ভালরূপে জানিতেন। রামায়ণ ইংরেজি পদ্যে অনুবাদ করেন। ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ, শুক্লযজুর্ব্বেদ তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। পণ্ডিত নামক সংস্কৃত মাসিক পত্রের তিনি আট বৎসর সম্পাদক ছিলেন।

গ্রিফিন, সার লেপেল হেনরী Sir Lepel Henry Griffin—১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৬০ সালে পঞ্জাবে সিভিলিয়ান হইয়া আগমন করেন। প্রথমে ১৮৭০ সালে তিনি পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী ছিলেন। ১৮৮০ সালে তিনি প্রধান পলিটিকেল অফিসার হইয়া পঞ্জাবে গমন করেন। আফগানিস্থানের আমীর আব্দুর রহমানের

সহিত তাঁহার অনেক লেখালেখি চলিয়াছিল। তৎপরে তিনি ইন্দোরের রেসিডেন্ট, বড়লাটের অধীনস্থ মধ্য-ভারতের এজেণ্ট প্রভৃতি কাজে লিপ্ত থাকিয়া ১৮৮৯ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার নিম্ন লিখিত বইগুলি খুব প্রসিদ্ধ। The Panjab Chiefs, The Law of Inheritance in Chiefship, The Rajas of the Panjab, The Great Republic. The Famous Manuments of Central India, Ranjit Singh প্রভৃতি। Asiatic quarterly Review নামক পত্রিকার তিনি জন্মদাতা।

গ্রিয়ারসন, জর্জ এব্রাহাম (George (Abraham Grierson)—১৮৫১ খ্রীঃ অব্দের ৭ই জানুয়ারী তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ডবলিন সহরের ট্রিনিটী কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া ভারতীয় সিবিল সার্ব্বিসে ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে প্রবেশপূর্ব্বক বঙ্গদেশে আগমন করেন। ১৮৮০ সালে বিহারের স্কুলের ইনস্পেক্টার, ১৮৯৬ সালে পাটনার কমিশনার এবং আফিং-এর এজেন্ট, ১৮৯৮ হইতে ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনে ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৯০২ সালে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইতিপূর্ব্বে ১৮৯৪ সালে সি, আই, ই, ও পি এইচ ডি, ১৯০২ সালে ডি-লিট উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালার এসিয়াটিক সোসাইটী (Asiatic Society of Bengal) এবং আরও বহু বিদ্বন্মণ্ডলীর সভ্য ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে Introduction to the Maithili Language, A Hand book to the Kaithi Character, Seven Grammars of the Behari Dialects, Tne Behar Peasant life, The Modern vernaculer literature of Hindustan, Notes on Tulsidas, The Linguistic Survey of India, The Languages of India প্রভৃতি গ্রন্থ প্রধান।

ঘ

ঘইরত খাঁ—বাঙ্গালার নবাব ইব্রাহিম খাঁর সময়ে (১৬৯৬—১৭১২ খ্রীঃ) বর্দ্ধমানের বিদ্রোহী পাঠান সর্দ্দার রহিম খাঁ। অতিশয় প্রবল হইয়াছিলেন; সম্রাট আওরঙ্গজীব সেই জন্য ইব্রাহিম খাঁর পুত্র জবরদস্ত খাঁকে সেনাপতি করিয়া দিলেন। এই জবরদস্ত খাঁও অতিশয় সাহসী ছিলেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধে ভগবানগোলার নিকটে রহিম খাঁর সেনাপতি ঘইরত খাঁ। সদল বলে নিহত হন। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি জবরদস্ত খাঁর হস্তগত হয়।

ঘঘড়—তিনি গুজরাতের চাবদবংশীয় একজন রাজা। তাঁহাদের রাজধানী অনহিলবাড় নামক স্থানে ছিল। ঘঘড়ের অন্য নাম রাহপ ছিল। রাহপ ভুবাদের পরে ৯০৮ হইতে ৯৩৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। বাণরাজ দেখ।

ঘটক—তিনি অনার্য্য বংশীয় নরপতি রত্নাসুরের পরে আসাম প্রদেশের রাজা ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিও অনার্য্য-বংশীয় ছিলেন। নরপতি নরক তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন।

ঘটকর্পর—বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার নয়জনের মধ্যে অন্যতম কবি। তাঁহার দ্বাবিংশ শ্লোক যুক্ত একখানি ক্ষুদ্র কাব্য আছে। এতদ্ব্যতীত একবিংশটি শ্লোক যুক্ত 'নীতিসার' ঘটকর্পরের লিখিত বলিয়া কিম্বদন্তি আছে।

ঘটীগোপ—আচার্য্য আর্য্যভট্ট বিরচিত আর্য্যভটীয় গ্রন্থের তিনি একজন ভাষ্যকার।

ঘনরাম—তিনি 'ধর্ম্মমঙ্গল' নামক কাব্যের রচয়িতা। ১৬৬৯ খ্রীঃ অব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত খণ্ডঘোষ থানার এলাকাধীন কৃষ্ণপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তী ও মাতার নাম সীতা দেবী। বাল্যকালে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ অনুরাগ দৃষ্টে তাঁহার পিতা তাঁহাকে এক টোলে অধ্যয়নের জন্য পাঠাইয়া দেন। অধ্যয়নে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া এবং উক্ত সময়ে খণ্ড খণ্ড কবিতা রচনা করিয়া, তিনি গুরু মহাশয়ের বিশেষ প্রিয় হন। গুরুমহাশয় তাঁহার পাণ্ডিত্য ও রচনা নৈপুণ্যে তাঁহাকে 'কবিরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন। পাঠ্যাবস্থায়ই তাঁহার বিবাহ হয় এবং বিবাহের কিছুকাল পরেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। তখন সংসার নির্ব্বাহের ভার তাঁহার উপর পতিত হওয়ায়, তিনি চতুষ্পাঠী পরিত্যাগ করিয়া, চাকুরীর অন্বেষণে বাহির হন। তৎকালীন বর্দ্ধমানের মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র তাঁহার কবিত্ব খ্যাতির কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে তথায় আহ্বান করিয়া রাজকবি পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। মহারাজের

আদেশে তিনি 'ধর্ম্ম মঙ্গল' নামক প্রসিদ্ধ কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। ১৬৯৯ খ্রীঃ অব্দে উক্ত গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়। তিনি ফারশী ভাষাও শিক্ষা করিয়া ছিলেন। তাঁহার রচিত একখানা সত্যনারায়ণের পাঁচালীও আছে। তিনি সদালাপী, সচ্চরিত্রবান্, সুগায়ক ও সুকণ্ঠ ছিলেন। ধর্ম্ম মঙ্গল কাব্য রচনা শেষ হইলে, ঘনরাম স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অবশিষ্ঠ জীবন ধর্ম্ম মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে যাপন করেন।

ধর্ম্ম মঙ্গল কাব্যকে ঐতিহাসিক কাব্য বলা যাইতে পারে, কারণ ইহাতে বর্ণিত লাউসেন, ইছাই ঘোষ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তি। যদিও ধর্ম্মদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। লাউসেন গৌড়াধিপের শ্যালক পুত্র। মেদিনীপুরের অন্তর্গত ময়নাগড়ে তাঁহার জন্ম হয়। এই ময়নাগড় রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বীরভূম জিলায় অজয় নদীর তীরে ইছাই ঘোষের স্থাপিত মহামায়ায় ভগ্ন মন্দির ও বাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই কাব্য ঐতিহাসিক হইলেও কবির কল্পনা ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়া ইহাকে ইতিহাসের সীমায় রাখে নাই। কাব্যের বিষয় অজয় নদীর তীরবর্ত্তী ঢেকুর রাজ্যের অধিপতি ইছাই ঘোষের বিদ্রোহ। ইছাই ঘোষ গৌড়ের অধিপতিকে কর দেয় না। সুতরাং যুদ্ধ বাঁধিল, গৌড়পতি পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। গৌড়পতি, স্বীয় শ্যালক ধর্ম্মের অবতার রণনিপুণ লাউসেনের সাহায্য প্রার্থী হইলেন। লাউসেন ইছাই ঘোষকে পরাস্ত করিয়া, ধর্ম্মের মাহাত্ম্য স্থাপন করিলেন। ঘনরামের কাব্য অনুপ্রাস বহুল, তাঁহার শব্দ সম্পদও যথেষ্ঠ ছিল। এখানে তাঁহার কাব্য হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—

চঞ্চল চেতন চিত্র চায় চর্ম্মচিল।
কূর্ম্ম কোলে কাঁক কঙ্ক করে কিলকিল॥
আতপ তণ্ডুল চিনি, ক্ষীর খণ্ড ছেলা ননি,
পায়স পিষ্ঠক দধি ঘৃত।
সারি সারি পরিপাটি, পূরিয়া পূরট বাটী,
মধু রাখি মদে মজে চিত॥

ঘনরাম দাস—একজন পদকর্ত্তা। তাঁহার রচিত চৌদ্দটি পদ পাওয়া গিয়াছে।

ঘনশ্যাম—(১) আসাম প্রদেশের আহম বংশীয় নরপতি রুদ্রসিংহ (১৬৯৬—১৭১৪ খ্রীঃ) কোচবিহার হইতে স্থপতি-বিদ্যাবিশারদ এই বাঙ্গালী শিল্পী ঘনশ্যামকে আনয়নপূর্ব্বক স্বীয় রাজ্যে বহু প্রাসাদ ও মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। বর্ত্তমান শিবসাগরের নিকটবর্ত্তী রঙ্গপুর নগরী রুদ্রসিংহের রাজধানী ছিল। এখনও তথায় বহু ভগ্ন অট্টালিকা ঘনশ্যামের স্থাপত্য নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া

তাঁহাকে প্রচুর ধনরত্ন প্রদান করিয়াছিলেন। কোনও সময়ে তাঁহার নিকট আহম রাজ্যের বর্ণনা মূলক একখানা হস্ত লিখিত গ্রন্থ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইহা মুসলমান শাসনকর্ত্তাকে প্রদান করা হইবে, এই সন্দেহ করিয়া রাজা তাঁহার প্রাণদণ্ড বিধান করেন।

ঘনশ্যাম—(২) একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত। তিনি 'নৃপতিযাত্রা মঙ্গল' নামক গ্রন্থের প্রণেতা।

ঘনশ্যাম—(৩) বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। বল্লভাচার্য্যের অন্যতম পুত্র বিত্তলদাসও একটী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা। আবার বিত্তলদাসের সপ্ত পুত্র হইতে সাতটী বৈষ্ণব সম্প্রদায় ঘটিত হইয়াছে। এই ঘনশ্যামও বিত্তলদাসের সপ্ত পুত্রের অন্যতম এবং একটী সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা।

ঘনশ্যাম আচার্য্য—তাঁহার পিতা মাধবাচার্য্য অদ্বৈতাচার্য্যের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সুতরাং ঘনশ্যাম অদ্বৈতাচার্য্যের ভাগিনেয়। তাঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এদিকে নিত্যানন্দ প্রভু রাঢ়ী শ্রেণীর। ঘনশ্যাম গঙ্গা নাম্নী নিত্যানন্দের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তৎকালে এইরূপ বিবাহ সময় সময় হইত। ঘনশ্যাম অতি পিতৃভক্ত ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন।

ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী— তিনি নরহরি চক্রবর্ত্তী নামেও খ্যাত ছিলেন। তিনি নদীয়াবাসী জগন্নাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র। জগন্নাথ ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য ছিলেন। সম্ভবত ঘনশ্যামও পিতৃ গুরু বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকটও দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন বৃন্দাবনে বাস করিয়া বৈষ্ণব শাস্ত্র বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি শ্রীরূপ গোস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দজীর পাচকের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। নিষ্ঠার সহিত বৈষ্ণব শাস্ত্র আলোচনার ফলে তাঁহার অমূল্য গ্রন্থরাজি আমরা পাইয়াছি। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি—(১) ভক্তি রত্নাকর। গ্রন্থখানি অতি বৃহৎ। ইহাতে আদি পুরাণ, বরাহ পুরাণ, উজ্জ্বল নীলমণি, পদ্ম পুরাণ, বায়ুপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ভক্তি রসামৃত সিন্ধু, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রমাণাদি বিষয়ে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা পঞ্চদশ তরঙ্গে বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ইহাতে অনেক বৈষ্ণব মহাজনের জীবন কাহিনী ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। (২) গৌর চরিত চিন্তামণি—নামেই ইহার বিষয় বুঝা যায়। ইহা শ্রীচৈতন্য দেবের জীবন চরিত। (৩) নরোত্তম বিলাস,—ইহা নরোত্তমঠাকুরের জীবনী এবং দ্বাদশ বিলাসে বা অধ্যায়ে বিভক্ত।

ইহার ভাষা অতি সরল ও সহজ বোধ্য। (৪) ব্রজ পরিক্রমা—এই গ্রন্থে বিংশতি যোজন বিস্তৃত ব্রজ মণ্ডলের মধ্যে বৈষ্ণবদিগের দ্রষ্টব্য স্থান সমূহের বিবরণ সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত (৫) শ্রীনিবাস চরিত, (৬) গীত চন্দ্রোদয়, (৭) ছন্দ সমুদ্র, (৮) প্রক্রিয়া পদ্ধতি, (৯) নবদ্বীপ পরিক্রমা, (১০) লীলা সমুদ্র প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য্য—সতীদাহ নিবারণের সহিত তাঁহার নামটী সংশ্লিষ্ট আছে বলিয়া উল্লেখ যোগ্য। বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলীর (১৭৯৮—১৮০৫ খ্রীঃ) প্রাইভেট সেক্রেটারী, বিধবাদিগকে যাহাতে বলপূর্ব্বক বাঁধিয়া স্বামীর সহিত দাহ না করা হয়, তাহার উপায় বিধান করিবার জন্য তৎকালীন নিজামত আদালতকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তৎকালে গবর্ণর জেনারেল ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁহার আইনাদি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা ছিল না। আইনাদি প্রণয়ন করিতে হইলে তাঁহাকে সদর দেওয়ানি আদালতের সম্মতি ও ফৌজদারী কিছু করিতে হইলে, নিজামত আদালতের অনুমতি লইতে হইত। কারণ উক্ত উভয় আদালত ইংলণ্ডাধিপতির অধীন ছিল। এবং তাঁহাদের অনুমতি ইংলণ্ডাধিপতির অনুমতি বলিয়া পরিগণিত হইত। তদনুসারে ঐ সতীদাহের প্রশ্ন নিজামত আদালতের নিকট বড়লাট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঘনশ্যাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় তৎকালে নিজামত আদালতের কোর্ট পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—বিধবাকে পতির চিতার সহিত বাঁধিয়া দেওয়া শাস্ত্র ও সদাচার উভয় বিরুদ্ধ। ইহাই সতীদাহ নিবারণের প্রথম উদ্যম।

ঘনশ্যাম মিত্র—তিনি বীরভূম জিলার গোমতি নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উত্তর রাঢ়ীর কায়স্থদের আচার, ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে একখানা কুলজী প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার কোনও পুত্র ছিল না। তাঁহার দৌহিত্র শুকদেব সিংহ ঘটক যশোহর জিলার পুরাপাড়া নামক স্থানে অবস্থান করিতেন। তাঁহার বংশধরেরা এখনও তথায় বাস করিতেছেন।

ঘরসী জী—প্রসিদ্ধ ভক্ত দাদূর শিষ্যদের মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত বায়ান্নজনের অন্যতম। তাঁহার রচিত পদ পাওয়া গিয়াছে।

ঘাটম্ দাসজী—প্রসিদ্ধ ভক্ত দাদূর অনেক শিষ্য ছিলেন, তন্মধ্যে ঘাটম্ দাসজী প্রভৃতি বায়ান্ন (৫২) জন প্রধান ছিলেন। তাঁহাদের রচিত অনেক দোঁহা (উপদেশ) পাওয়া গিয়াছে।

ঘাসিটী বেগম—নবাব আলিবর্দ্দি

খাঁর কন্যা, নোয়াজিস্ মোহাম্মদের স্ত্রী ও নবাব সিরাজ উদ্-দৌল্লার মাতৃষ্বসা। মিরজাফরের পুত্র মিরণ ১৭৬০ খ্রীঃ অব্দের জুন মাসে তাঁহাকে ও সিরাজ-উদ্ দৌল্লার মাতা আমিনা বেগমকে ঢাকার নিকটে জলমগ্ন করিয়া হত্যা করেন।

ঘাসিদাস—তিনি 'সৎনামী' নামে একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নেতা। ১৮২০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। ঐ সময় মধ্যেই তিনি স্বীয় মত প্রচার করেন। তিনি চর্ম্মকার জাতীয় ছিলেন। স্বজাতীয় চর্ম্মকারদের মধ্যে এই মত প্রচার করেন। তাঁহাদের মতে মূর্ত্তি পূজা নিষিদ্ধ। তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকেরা মাংসাদি আহার ও মদ্যপান করে না। তাহাদের সংখ্যা এক্ষণে প্রায় পাঁচ লক্ষ হইবে।

ঘুঘুনাথ—তিনি নাথ সম্প্রদায়ের এক-জন সাধক ও গুরু। অপ'ননাথ দেখ।

ঘোটক মুখ—একজন অর্থ শাস্ত্রকার। পণ্ডিতেরা মনে করেন খ্রীঃ পূর্ব্ব ৮ম কি ৭ম শতাব্দীতে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

ঘোড়াচুলি— হঠযোগসিদ্ধ একজন মহাপুরুষ। হঠযোগ প্রদীপিকা গ্রন্থের মতে চৌদ্দজন সিদ্ধনাথ ছিলেন। তিনি তাঁহাদের অন্যতম।

ঘোষাক—তিনি একজন বৌদ্ধ দার্শ-নিক পণ্ডিত। খ্রীঃ তৃতীয় শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আর্য্যদেবের তিনি অন্যতম শিষ্য ছিলেন।

ঘোষ খাঁ—তিনি বাঙ্গালার সুবাদার সরফরাজ খাঁর (১৭৩৯—৪০ খ্রীঃ) অন্যতম বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন। আলীবর্দ্দী খাঁর সহিত যুদ্ধে তিনি সপুত্র নিহত হন।

চ

চক্রচূড়ামণি— একজন জ্যোতির্বিজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি 'চূড়ামণি' নামক শাকুন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্যের 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'রও তিনি এক টীকা রচনা করিয়াছেন।

চক্রধর—বামনের পুত্র চক্রধর ১১০০—১৪০০ শক মধ্যে (১১৭৮—১৪৭৮ খ্রীঃ) 'যন্ত্রচিন্তামণি' নামক বেধগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গোদাবরী তীর-বর্ত্তী পার্থপুর নিবাসী মধুসূদনের পুত্র রাম 'যন্ত্রচূড়ামণি'র এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্‌ভিন্ন শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় অনন্তের পুত্র দিনকর ১৭৬৭ শকে (১৮৪৫ খ্রীঃ) উদাহরণরূপ ইহার এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

চক্রধরভঞ্জ—উড়িষ্যার অন্তর্গত ময়ূর-ভঞ্জের একজন রাজা। তিনি রঘুনাথ ভঞ্জের পরে রাজা হইয়াছিলেন। ১৭৪০ খ্রীঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীরা প্রথম উড়িষ্যা আক্রমণ করে। রঘুজী ভোঁসলের সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত ছত্রিশ গড়ের মধ্য দিয়া ছোট নাগপুরে প্রবেশ করেন এবং তথা হইতে ময়ূরভঞ্জের ভিতর দিয়া অতি দ্রুতগতিতে মেদিনীপুরে উপস্থিত হন। আলীবর্দ্দী খাঁ এই আক্রমণের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বঙ্গদেশাভিমুখে পলায়ন করেন। আফগান সেনাপতি মুস্তফা খাঁর নিকট ময়ূরভঞ্জপতি বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু আফগান সেনাপতি, প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া ময়ূর-ভঞ্জপতি চক্রভঞ্জকে দরবারে আনয়ন করেন। বাঙ্গালার ভাবী নবাব মির-জাফর আলী খাঁ, তাঁহাকে অনুচরের সহিত নিহত করেন। এই চক্রধর ভঞ্জকে ফরাসী ঐতিহাসিকেরা কখনও জগধর, কখনও জগদীশ্বর ভঞ্জ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

চক্রধ্বজ—(১) তিনি কামতাপুরের রাজা নীলধ্বজের পুত্র। তাঁহার মৃত্যুর পরে তৎপুত্র নীলাম্বর রাজা হইয়াছিলেন। নীলধ্বজ দেখ।

চক্রধ্বজ—(২) তিনি ডিমারোয়ার রাজা পন্থেশ্বরের পুত্র। তাঁহারা কোচবিহারপতি নরনারায়ণের সামন্ত নরপতি ছিলেন। রাজা চক্রধ্বজ একবার বার্ষিক কর দিতে অসম্মত হওয়ায় বন্দী হইয়াছিলেন। কিন্তু কোচবিহারপতি নরনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেবের অনুরোধে তিনি মুক্তি লাভ করেন। রঘুদেব পূর্ব্বে কোচ রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, চক্রধ্বজকে স্বীয় রাজ্য পুনঃ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধর পোয়াল সিংহ, রত্নাকর প্রভৃতি রঘুদেবের পুত্র পরীক্ষিতের অনুগত ছিলেন।

চক্রধ্বজ বা সুপাংমাং—আহমদের অধিপতি। বাণসিংহ দেখ।

চক্রধ্বজ সিংহ—১৬৬৩ খ্রীঃ অব্দে আসামের আহমবংশীয় নরপতি সুতীন

ফা (জয়ধ্বজ সিংহ) অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে, তাঁহার নিকট আত্মীয় সুপুংমুংফাকে (অন্য নাম চক্রধ্বজ সিংহ) রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকেরা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। গৌহাটীস্থিত মুসলমান ফৌজদার রসিদ খাঁ পূর্ব্ব সন্ধিসর্ত্তানুযায়ী চক্রধ্বজ সিংহের নিকট অর্থ চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু রাজকোষে অর্থাভাব বলিয়া তিনি তাহা দিতে অস্বীকার করিলেন। ইতিমধ্যে তিনি জানিতে পারিলেন যে, নিয়োগ ফুকন প্রভৃতি কর্ম্মচারী মুসলমানদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। সেজন্য তিনি তাঁহাদিগকে নিহত করিলেন। তৎপরে ১৬৬৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি মুসলমানদিগকে পরাস্ত করিয়া গৌহাটী ও পাণ্ডুয়া অধিকার করেন। দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজীব তাঁহার সৈন্যের পরাজয় সংবাদ শুনিয়া রামসিংহ নামক একজন রাজপুত সেনাপতিকে আহমপতির বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তিনিও পরাজিত হইয়া আহম নরপতি চক্রধ্বজ সিংহের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ১৬৬৮ খ্রীঃ অব্দে চক্রধ্বজ সিংহ পরলোক গমন করিলে, তাঁহার ভ্রাতা সুন্যৎফা উদয়াদিত্য সিংহ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক রাজা হন।

চক্রনাথ—তিনি নাথ পন্থী সম্প্রদায়ের চৌরাশী জন সিদ্ধ পুরুষের অন্যতম। অপাননাথ দেখ।

চক্রপাণি—(১) তিনি আসাম প্রদেশের মহাপুরুষীয় ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শঙ্করদেবের বংশধর। আসাম প্রদেশের আহমবংশীয় নরপতি উদয়াদিত্য সিংহ তাঁহার শিষ্য ছিলেন। রাজা তাঁহার রাজ্যের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার করিতে যাইয়া, তাঁহার ভ্রাতা রামধ্বজকর্ত্তৃক নিহত হন। চক্রপাণিকেও হত্যা করিয়া বাঁশের ভেলায় বাঁধিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

চক্রপাণি—(২) সত্যধরের পুত্র জ্যোতিষী চক্রপাণি 'প্রশ্ন তত্ত্ব' নামে একখানা জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

চক্রপাণি—(৩) তিনি 'জ্যোতির্ভাস্কর' নামক মুহূর্ত্ত সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

চক্রপানি দত্ত—(১) প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ও আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থকার। তিনি কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন এবং কোন্ জাতি ছিলেন, তাহা লইয়া প্রভূত মতভেদ দৃষ্ট হয়। কাহারও মতে তিনি বৈদ্যবংশোদ্ভব। তাঁহার পিতার নাম নারায়ণ। চক্রপাণির পিতা নারায়ণও প্রকৃতপক্ষে কে ছিলেন এবং কোথায় বাস করিতেন তাহা লইয়া অনেক গবেষণা চলিতেছে। "চক্রদত্ত" নামক নিজ প্রসিদ্ধ গ্রন্থে চক্রপাণি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার

পিতা গৌড়াধিনাথের মন্ত্রী ছিলেন। কাহারও মতে ঐ গৌড়াধিপতি পাল-বংশীয় রাজা নয়পাল। কাহারও মতে তিনি গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেন; চক্রদত্ত গ্রন্থে উল্লিখিত কয়েকটি বাক্য হইতে কোনও কোনও মনীষী তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অপরে আবার অপর বাক্য দ্বারা প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, চক্রপাণি শৈব ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত আত্মপরিচয়ে চক্রপাণি নিজেকে 'লোধ্র-বালী কুলিন' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। উহা খুব সম্ভব কোনও উচ্চ শ্রেণীর কুলিন বংশের সংজ্ঞা। কাহারও মতে চক্রপাণি মৌদ্গল্য গোত্রজ পুরুষোত্তম দত্তের সন্তান ছিলেন এবং তিনি কায়স্থ বংশোদ্ভব ছিলেন।

চক্রপাণি দত্ত—(২) তিনি কাশ্যপ গোত্রজ কায়স্থ দত্তবংশীয় ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ বর্ণণা করিয়াছেন।

শ্রীহট্টের গোপীনাথ দত্ত নামক কবির সংকলিত কুলপঞ্জিকা হইতে জানা যায় যে, চক্রপাণির বংশধরেরা শ্রীহট্টে গমন করিয়া বাস করিতে থাকেন। শ্রীহট্টের রাজা গৌড়গোবিন্দের চিকিৎসার জন্য চক্রপাণি রাঢ় দেশ হইতে শ্রীহট্ট গমন করেন। তাঁহার চিকিৎসায় রাজা আরোগ্য লাভ করিয়া তাঁহাকে নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু চক্রপাণি তাহাতে সম্মত না হইয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রসহ রাঢ় দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কেবল তাঁহার অপর দুই পুত্র মুকুন্দ ও মহীপতি রাজার নিকট হইতে ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া শ্রীহট্টেই বাস করিতে থাকেন।

চক্রপাণি দত্ত—(৩) তিনি 'বিজয় কল্পলতা' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

চক্রপালিত—তিনি সৌরাষ্ট্রের অধিপতি পর্ণদত্তের (৪৫৫ খ্রীঃ) পুত্র। তাঁহাদের রাজধানী গিরিনগরে (বর্ত্তমান গির্ণার) ছিল। গিরিনগরের অনতিদূরে পর্ব্বতোপত্যকায় মৌর্য্যবংশীয় নরপতি চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সৌরাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তা পুষ্যগুপ্ত একটী প্রাচীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সুদর্শন হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছেন। ৪৫৫ খ্রীঃ অব্দে সুদর্শন হ্রদের প্রাচীর ঝড়ে ও জলবৃদ্ধিতে নষ্ট হইয়া যায়। পর্ণদত্তের পুত্র চক্রপালিত ৪৫৬ খ্রীঃ অব্দে শত হস্ত দীর্ঘ ও প্রায় সপ্ততি হস্ত উচ্চ পাষাণ নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা সুদর্শন হ্রদ জলপূর্ণ করিয়াছিলেন। এবং পর বৎসর এই হ্রদের তীরে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

চক্রপ্রতাপ—তিনি উড়িষ্যার অধিপতি বিদ্যাধরের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পরে ১৫৪৯—১৫৫৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। মাদলা পঞ্জিকার মতে (তালপত্রে লিখিত মন্দিরে রক্ষিত ইতিহাস) তিনি অতিশয় অত্যাচারী রাজা ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদ্বারা

ঘোড়ার ঘাস কাটাইতেন। তাঁহার পুত্র নরসিংহ তাহাকে বধ করিয়া রাজা হন।

চক্রবর্ম্মা—কাশ্মীরের শৌণ্ডিকবংশীয় নির্জ্জিত বর্ম্মার অন্যতম পুত্র। তাঁহার মাতার নাম রাণী বপ্পটা। তিনি মাতামহী কিল্লিকা দেবী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা নির্জ্জিত বর্ম্মা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পার্থ উভয়ের মধ্যে বিবাদ ছিল। এই জন্য নির্জ্জিত বর্ম্মা জ্যেষ্ঠ পুত্র পার্থকে অতিক্রম করিয়া শিশুপুত্র চক্রবর্ম্মাকে সিংহাসন প্রদান করেন। কিন্তু তন্ত্রী দলেরা তাঁহাকে অপসারিত করিয়া তাঁহার অন্য বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাণী মৃগাবতীর গর্ভজাত পুত্র শূরবর্ম্মাকে, রাজপদ প্রদান করেন। পার্থ তন্ত্রীদলকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। চক্রবর্ম্মাও অধিকতর অর্থ প্রদানে পার্থকে অপসারিত করিয়া রাজ্য লাভ করেন। কিন্তু তন্ত্রীদের অর্থ প্রদানে অসমর্থ হইয়া পর বৎসর মাড়বদেশে পলায়ন করিলেন। এদিকে মন্ত্রী শঙ্কর বর্দ্ধন (রাণী মৃগাবতীর ভ্রাতা) তন্ত্রীদের সাহায্যে রাজ্য লাভের প্রয়াসী হইলেন। রাজ্য ভ্রষ্ট চক্রবর্ম্মাও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। শ্রীচক্রবাসী ডামর শ্রেষ্ঠ সংগ্রামের সহায়তায় শঙ্করবর্দ্ধনকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া নিহত করেন। এইরূপে রাজ্য লাভ করিয়া তিনি অতিশয় গর্ব্বিত হইলেন। এবং তিনি নানাবিধ দুষ্কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি ডামরজাতীয় সুগায়ক রঙ্গের হংসী ও নাগলতা নাম্নী সুন্দরী ও সুগায়িকা ভগ্নীদ্বয়কে বিবাহ করিয়াছিলেন। হংসী প্রধানা রাণী হইলেন। যে ডামরদের সাহায্যে তিনি রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন, সেই ডামরদের অনেককে তিনি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক হত্যা করেন। এই জন্য অন্যান্য ডামরেরা তাঁহাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। তৎপরে শম্বট প্রভৃতি মন্ত্রীরা পার্থের পুত্র পাগল অবন্তীনাথকে রাজপদ প্রদান করিয়াছিলেন।

চক্রসেন—কোটার রাজা রামসিংহের মৃত্যুর পরে ভীমসিংহ ১৭০৮ খ্রীঃ অব্দে কোটার রাজা হন। কোটা রাজ্যের দক্ষিণদিকে মনোহর থানা নামক নগরে ভিলদিগের রাজা চক্রসেন রাজত্ব করিতেন। ভীমসিংহ তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। ভিলদিগের স্বাধীনতা চক্রসেনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চিরতরে লুপ্ত হয়।

চক্রায়ুধ—তিনি কান্যকুব্জের অধিপতি ছিলেন। গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল, গুর্জ্জর প্রতীহার বংশের দ্বিতীয় নাগভট্ট, দাক্ষিণাত্যরাজ তৃতীয় গোবিন্দ তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। তিনি গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের সাহায্যেই সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।

চঙ্কুণ— তিনি কাশ্মীরের নরপতি ললিতাদিত্যের (৭০০-৭৩৬ খ্রীঃ) অন্যতম সেনাপতি ও মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার জন্ম স্থান ভূখার দেশ ছিল (বোখারা কি ?)। চঙ্কুণের একটী মনির সাহায্যে রাজা ললিতাদিত্য একটী নদী অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। মণির এই আশ্চর্য্য গুণ দেখিয়া রাজা ইহা চঙ্কুণের নিকট প্রার্থনা করেন। চঙ্কুণ ইহা প্রদান করিয়া তদ্বিনিময়ে মগধ হইতে আহৃত একটী বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি উচ্চতর স্তূপ ও অনেক বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। চঙ্কুণের ভ্রাতা কঙ্কনবর্ষ রাজার ধনাগারের রক্ষক ও অসাধারণ রসায়ণশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন।

চঙ্গদেব—তিনি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ভাস্করাচার্য্যের পৌত্র ও লক্ষ্মীধরের পুত্র ছিলেন। লক্ষ্মীধর অখিল পণ্ডিতগণের মুখ্য বেদার্থবিৎ তার্কিক চূড়ামণি ছিলেন। তিনি যাগ ক্রিয়াকাণ্ড বিচারে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এবং রাজা জৈত্রপালের সভাপণ্ডিত ছিলেন। এই লক্ষ্মীধরের পুত্র চঙ্গদেব সিংহল রাজের প্রধান দৈবজ্ঞ ছিলেন। ভাস্করাচার্য্যের শাস্ত্র গঠন নিমিত্ত চঙ্গদেব একটী মঠ স্থাপন করেন। সেই মঠের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সোহ্নদেব ১১২৮ শকে (১২০৬ খ্রীঃ) চন্দ্রগ্রহণ সময়ে চঙ্গদেবকে কতিপয় গ্রাম দান করেন।

চচ—সিন্ধুদেশের নরপতি দ্বিতীয় সাহসী রায় ৬৪৮ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার ব্রাহ্মণ কোষাধ্যক্ষ চচ (চঞ্চল কি ?) বলপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। কথিত আছে চচ লোহান জাট জাতির প্রতি বড়ই কঠোর ব্যবহার করিতেন। তাহারা উৎবস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিত না, পথে বাহির হইলে কুকুর সঙ্গে করিয়া বাহির হইতে হইত, যেন তাহাদিগকে চিনিতে অপরের অসুবিধা না হয়। তাহারা ঘোড়ায় চড়িতে অথবা তলোয়ার ব্যবহার করিতে পারিত না ইত্যাদি। চচ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ব্রাহ্মণাবাদের লোহান জাতীয় রাজা অঘমকে পরাজিত করেন। চচ সাহসী রায়ের বিধবা পত্নীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে বাঈ নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। অঘম দেখ।

চটক—তিনি কাশ্মীরের অধিপতি জয়াপীড়ের (৭৪৮—৭৮০ খ্রীঃ) রাজসভার অন্যতম প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

চটশাহ—শ্রীহট্ট জিলার বিখ্যাত দরবেশ। তিনি শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ দরবেশ শাহজালাল এমনির অন্যতম অনুগত শিষ্য ছিলেন। তিনি চিরকুমার ও অনিকেতন ছিলেন। শ্রীহট্টের গবর্ণমেণ্ট স্কুলের দক্ষিণ পার্শ্বে এখনও তাঁহার সমাধি আছে।

চনক—মগধের পালবংশীয় বৌদ্ধ রাজা।

তিনি খ্রীঃ দশম শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারই অধিকারকালে মগধের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় বিক্রমশীলা গৌরবের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল। চনকের রাজত্বকালে নিম্নলিখিত স্থবিরগণ বিক্রমশীলার শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণের অন্যতম ছিলেন—আচার্য্য রত্নাকর শান্তি, কাশী নিবাসী বাগীশ্বর কীর্ত্তি, নরোপ, প্রজ্ঞাকরমতি, রত্নবজ্র (কাশ্মীর নিবাসী), গৌড়নিবাসী জ্ঞানশ্রী মিত্র। শ্রেষ্ঠ পাল (অথবা প্রৈষ্ঠ পাল) চনকের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং ভয়পাল তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা।

চণক পাল—তিব্বতীয় গ্রন্থের মতে তিনি বঙ্গের পালবংশীয় অন্যতম নরপতি। ৯৫৫—৯৮৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত পালবংশের যে বংশাবলী পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে এই নাম নাই।

চণ্ড—(১) একজন প্রাকৃত বৈয়াকরণিক. তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম "প্রাকৃত লক্ষণ"। উক্ত পুস্তকে অপভ্রংশ, পৈশাচি ও মাগধী তিন প্রকার প্রাকৃতেরই সূত্রাদি আছে। অপর প্রাকৃত গ্রন্থকার বররুচী চণ্ডের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

চণ্ড—(২) চিতোরের রাণা লাক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার অনুরোধ সত্বেও তিনি মারবার রাজ রণমল্লের কন্যাকে বিবাহ করেন নাই। সেইজন্য তিনি জ্যেষ্ঠের অধিকারও পরিত্যাগ করেন। অবশেষে রাণা লাক্ষ বাধ্য হইয়া রণমল্লের কন্যাকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার গর্ভে মুকুলজি নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মুকুলজির পাঁচ বৎসর বয়সের সময় রাণা লাক্ষ তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ডকে তাঁহার অভিভাবক নিযুক্ত করিলেন এবং স্বয়ং গয়াতীর্থ মুসলমানদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য গমন করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে তিনি গতায়ু হইলেন। এদিকে চণ্ড অতি সুশৃঙ্খলার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। নানা বিষয়ে রাজ্যের উন্নতি হইতে লাগিল। কিন্তু বিমাতার তাহা ভাল লাগিল না। তিনি মনে করিয়াছিলেন, তিনিই সকল কার্য্য পরিচালনা করিবেন। এখন কর্ত্তৃত্ব করিতে না পারিয়া তিনি অতিশয় ঈর্ষান্বিত হইলেন। চণ্ডের মহত্ব ও স্বার্থত্যাগের কথা তিনি ভুলিয়া গেলেন। রাজমাতা বলিয়া যে গর্ব্ব করেন, তাহাও যে চণ্ডের স্বার্থত্যাগ ব্যতীত সম্ভব হইত না, তাহাও তিনি ভুলিয়া গেলেন। চণ্ডের প্রতি কার্য্যে তিনি দোষ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ইহাও প্রচার করিতে লাগিলেন যে, রাজকার্য্য পরিচালন ব্যপদেশে চণ্ড সমস্ত ক্ষমতাই

করায়ত্ত করিয়াছেন। রাণা উপাধিটী এখন শূন্যগর্ভ। বিমাতার এইরূপ আচরণ চণ্ডের হৃদয়ে বড়ই আঘাত করিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, নিঃস্বার্থ ও সরল ব্যবহারের প্রতিদান এজগতে নাই। অতিদুঃখে বিমাতাকে সুমিষ্ট তিরস্কার করিয়া বলিলেন—'আপনার বুঝিবার ভুল হইয়াছে। আমার যদি চিতোর সিংহাসনে বসিবার অভিলাষ থাকিত, তবে আজ কে আপনাকে রাজমাতা বলিয়া সম্বোধন করিত? ভাল তাহাতে আমার ক্ষতি নাই, কোন দুঃখও নাই। কেবল দুঃখ এই যে চিতোর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। এক্ষণে আমি চলিলাম, রাজ্য শাসনের ভার আপনার উপরই সমর্পিত হইল। দেখিবেন শিশোদীয় বংশের গৌরব সম্ভ্রম যেন অনন্ত বিনাশ না পায়।' চিতোর পরিত্যাগ করিয়া চণ্ড মান্দু রাজ্যে গমন করিলেন। মান্দুরাজ তাঁহার পরিচয় পাইয়া, সাদরে ও যথোচিত সম্ভ্রমসহকারে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং হল্লার নামক জনপদ তাঁহার ভূমিবৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। চণ্ডের চিতোর ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই মাতুল যোধরায় ও মাতামহ রণমল্ল চিতোরে আগমন করিয়া তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। রণমল্ল চিতোরের সিংহাসন হস্তগত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ধাত্রীমুখে মুকুলজির মাতা আরও অনেক কথা শুনিলেন এবং ভয়ে বিমর্ষ হইলেন। ইতিমধ্যে তিনি জানিতে পারিলেন যে, চণ্ডের কণিষ্ঠ সহোদর রঘুদেব দুরাচার রণমল্ল কর্ত্তৃক গোপনে নিহত হইয়াছেন। ইহাতে তিনি ভয়ে আরও বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে তিনি চণ্ডকে সমস্ত বিষয় অবগত করাইলেন। চণ্ড দূরে অবস্থান করিয়াও চিতোরের সমস্ত সংবাদ অবগত ছিলেন। এক্ষণে বিমাতার কাতর প্রাণে সাহায্যের আহ্বান পাইয়াই, চিতোর অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। চিতোরে উপস্থিত হইয়াই তিনি কতকগুলি বিশ্বস্ত ভিল সর্দ্দারকে হস্তগত করিলেন; এদিকে বিমাতাকে গোপনে সংবাদ দিলেন যে, 'চতুঃপার্শ্বস্থ পল্লীগ্রামে ভোজ দিবার জন্য প্রত্যহ কতকগুলি অনুগত বিশ্বস্ত দাস দাসীর সহিত মুকুলজিকে লইয়া অবতরণ করিবেন। ক্রমে দুই এক গ্রাম করিয়া চিতোরের দূর হইতে দূরতর স্থানে আগমন করিতে হইবে। কিন্তু দেখিবেন, দেওয়ালি উৎসবের দিন গোসুন্দ নগরে উপস্থিত হইতে ভুলিবেন না। ভুলিলে সকল দিক হারাইতে হইবে।' মুকুলজননী এই সংবাদ পাইয়া আশ্বস্ত হইলেন এবং চণ্ডের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে মূহূর্ত্তও অবহেলা করিলেন না। দেখিতে

দেখিতে দেওয়ালি উৎসব সমাগত হইল। মুকুলজি স্বজন সমভিব্যাহারে গোসুন্দ নগরে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইলে, মুকুলজি দুর্গে প্রবেশ করিবার প্রাক্কালেই চণ্ড কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচরসহ দুর্গে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে কাহারও সন্দেহ হইল না, ক্রমে ক্রমে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া সকলেরই সন্দেহ হইল এবং উভয় দলে যুদ্ধ বাঁধিল। প্রথমে দ্বারপাল ও অন্যান্য সর্দ্দারেরা প্রাণ দিল। রণমল্ল তাঁহার শয়নকক্ষে নিহত হইলেন। যোধরাও প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন। চিতোর রাঠোরদিগের গ্রাস হইতে মুক্ত হইল। চণ্ড যোধরাওয়ের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাঁহাকে মুন্দর নগর হইতেও তাড়াইয়া দিলেন এবং স্বীয় তনয় কান্তটজি ও মুঞ্জজিকে তথায় রাখিয়া আসিলেন। কিছুকাল পরে যোধরাও বল সঞ্চয় করিয়া মুন্দর নগর আক্রমণ পূর্ব্বক চণ্ডের পুত্র কান্তটজি ও মুঞ্জজিকে বধ করিয়া উক্ত নগর অধিকার করেন। চণ্ডের বংশধরেরা চণ্ডাবৎ নামে খ্যাত। তাঁহাদের অধিপতি সর্দ্দারের আবাস ভূমির নাম সালুম্বা। মিবারের সর্দ্দার সমিতির মধ্যে সালুম্বাপতিই শ্রেষ্ঠ। চণ্ডের মহৎ ত্যাগ স্বীকারের প্রতিদান স্বরূপ তাঁহাকে মন্ত্রণাভবনে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদত্ত হইয়াছিল এবং ইহাও বিধিবদ্ধ হইয়াছিল যে সেই দিন হইতে যে কোন সামন্তকে ভূমিবৃত্তি প্রদান করা হইবে, তাহার দানপত্রে রাণার সাক্ষরের শিরোভাগে চণ্ডের ভল্ল চিহ্ন অঙ্কিত থাকিবে।

চণ্ড—(৩) তিনি রাঠোরপতি বিরামদেবের পুত্র। চণ্ড যেমন বীর তেমনি একজন রাজনীতিজ্ঞ নৃপতি ছিলেন। উদ্যম, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা দ্বারা তিনি রাজ্যহীন হইয়াও পরিণামে বিশাল রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। তিনি জীবনের প্রথম ভাগে পিতৃপুরুষদিগের অর্জ্জিত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া, প্রাণ রক্ষার্থ অজ্ঞাতবাসে কালযাপন করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার এই হীন অবস্থায় কালুনগরে এক চারণ তাঁহাকে আশ্রয় দান করিয়া বাঁচাইয়া ছিলেন। কিছুদিন চারণ গৃহে গোপনে অবস্থান করিয়া সুযোগক্রমে মুন্দরনগর অধিকার করেন। তৎপর ক্রমে নাগার, গদবার প্রভৃতি স্থান তাঁহার অধিকার ভুক্ত হয়। পুগলপতি রণঙ্গদেবের সহিত তাঁহার শত্রুতা ছিল। তিনি রণঙ্গদেবকে নিহত করেন। রণঙ্গদেবের পুত্র তনু ও মৈর এবং যশল্মীরপতি রাওল কেলুনের তৃতীয় পুত্র কীলন চণ্ডকে পরাজয় করিবার এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। কীলন স্বীয় কন্যাকে চণ্ডের সহিত বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন, বিবাহ নাগোরে সম্পন্ন হইবে বলিয়া স্থির

হইল। তদনুসারে নির্দ্দিষ্ট দিনে কন্যার পরিবর্ত্তে ছদ্মবেশে একদল সশস্ত্র বাহিনী নাগোরে উপস্থিত হইল। তাহার পশ্চাতে প্রকাণ্ড একদল সৈন্যও ছিল। রাঠোরপতি চণ্ড প্রথমে ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পরে যখন বুঝিতে পারিলেন, তখন যুদ্ধ অনিবার্য্য কিন্তু তিনি শত্রুর অসংখ্য সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং শত্রু শরে স্বীয় দুর্গ দ্বারেই নিহত হইলেন। চণ্ডের রণমল্ল, সত্তা, রণধীর, অবণ্যকমল, পুঞ্জ, ভীম, কাণ, উজো, চিজো, রামদেব, সাহশামল, বাঘ, শিবরাজ ও লুম্ব নামে চতুর্দ্দশ পুত্র এবং হংসা নামে এক কন্যা ছিলেন। এই হংসা মিবারপতি রাণা লাক্ষের পত্নী ছিলেন।

চণ্ডার্জ্জুন—সঙ্কট গ্রামের অধিপতি চণ্ডার্জ্জুন বঙ্গের পালবংশীয় নরপতি রামপালের অন্যতম সামন্ত নরপতি ছিলেন।

চণ্ডীচরণ তর্কবাগীশ—এই বিখ্যাত পণ্ডিত ১৭৬৮ খ্রীঃ অব্দে নদীয়া জিলার অন্তর্গত উলা বা বীরনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যাকরণ, ন্যায়, স্মৃতি, কাব্য, জ্যোতিষ ও তন্ত্র শাস্ত্রে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার রচিত কয়েকখানা গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে ৯৪ বৎসর তিনি পরলোক গমন করেন।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালী গ্রন্থকার। তিনি স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনীকাররূপে সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার পিতা রামকমল সার্ব্বভৌম বাল্যেই পারিবারিক অশান্তিতে বিব্রত হইয়া গোপনে গৃহত্যাগপূর্ব্বক কাশীধামে গমন করেন এবং তথায় নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া বিদ্যার্জ্জন করেন। ১২৬৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে (১৮৫৮ খ্রীঃ জুলাই) চণ্ডীচরণ চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বারাশত মহাকুমার নলকুঁড়া গ্রামে পৈতৃক ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকলেই মাতৃপিতৃ হীন হওয়ায় প্রথমে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ সুযোগ হয় নাই। সামান্য কিছু শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন। কিছুকাল পরে নড়াইল জমীদারদের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে আরও কিছুদুর শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হন। যৌবনের প্রারম্ভেই নড়াইলে থাকিবার সময়ে তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কয়েক বৎসর পরে ব্রাহ্ম মতেই অসবর্ণ বিবাহ করেন।

চণ্ডীচরণ বিদ্যাসাগর জীবনী ভিন্ন 'মা ও ছেলে,' 'দুখানি ছবি,' 'মনোরমার গৃহ' 'কমলকুমার' প্রভৃতি কথাগ্রন্থ রচনা করেন। 'পাপীর-

জীবন লাভ' নামক গ্রন্থখানি অনেকে তাঁহার আত্মজীবনীর অংশ বলিয়া মনে করেন।

তিনি সুবক্তা ও স্পষ্টবাদী এবং সামাজিক বিষয়ে উদার মতাবলম্বী ছিলেন। ১৩২৩ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে (১৯১৬ খ্রীঃ ডিসেম্বর) আকস্মিক দুর্ঘটনায় তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার অন্যতম কৃতী পুত্র ইন্দুপ্রকাশ শিক্ষালাভান্তে আমেরিকা হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে জাহাজডুবি হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন ইয়োরোপে মহাসমর চলিতেছিল। জার্ম্মনদের যুদ্ধ জাহাজ হইতে নিক্ষিপ্ত টর্পেডোদ্বারা আহত হইয়া যাত্রীবাহী লুসিটানিয়া জাহাজ জলমগ্ন হয় এবং তৎফলেই ইন্দুপ্রকাশ পরলোক গমন করেন।

চণ্ডীচরণ মুন্সী—অনুমান ১৭৬০ খ্রীঃ অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন ঐতিহাসিক ছিলেন। ১৮০৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার প্রণীত 'তোতা ইতিহাস' প্রকাশিত হয়। ১৮২৫ খ্রীঃ অব্দে ইহা লণ্ডন নগরে পুনঃমুদ্রিত হয়।

চণ্ডীচরণ লাহা—কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী লাহাবংশের খ্যাতনামা পূর্ব্বপুরুষ ও ধনী ব্যবসায়ী প্রাণকৃষ্ণ লাহার পৌত্র ও শ্যামাচরণ লাহার পুত্র। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে চুঁচুড়াতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতার হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি পৈতৃক ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর উহারই একজন অংশীদার হন। তদ্ভিন্ন তিনি নিজে পৃথকভাবে কতকগুলি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন। বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন জেলায় তাঁহার বিস্তৃত ভূসম্পত্তিও ছিল। তিনি অনাড়ম্বর, জীবন যাপনই পছন্দ করিতেন। লাহাবংশের সাধারণ দানশীলতার পরিচয় তাঁহার জীবনেও পাওয়া যায়। চুঁচুড়ার পৈতৃক ভবনে তিনি কবিরাজী ও পাশ্চাত্য প্রণালীর দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তথায় বহু দরিদ্র ছাত্রদের আহার ব্যয় নির্ব্বাহের ব্যবস্থাও তিনি করেন। তদ্ভিন্ন নিজ জমীদারীর অন্তর্গত অনেক দাতব্য চিকিৎসালয়ে তিনি নিয়মিত অর্থ সাহায্য করিতেন। কুমিল্লাতে কলেজ স্থাপনের সময়ে তিনি চারি হাজার টাকা দান করেন। শেষ জীবনে তিনি কলিকাতায় সিমুলিয়া অঞ্চলে তাঁহার পরলোকগত কন্যার স্মৃতি রক্ষার্থ "ললিত কুমারী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে (১৯৩৬ খ্রীঃ মার্চ্চ) কলিকাতা নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

চণ্ডীচরণ সেন—খ্যাতনামা বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী। ১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে

(১২৫১ বঙ্গাব্দের মাঘ) তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহাদের পৈতৃক নিবাস বাখরগঞ্জ জিলা। তাঁহার পিতার নাম নিমচাঁদ সেন। চণ্ডীচরণের অগ্রজাত কয়েকটি ভ্রাতা ও ভগিনী শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায়, তাঁহার পিতামাতা শোকাবেগ প্রশমিত করিবার জন্য প্রত্যহ চণ্ডী পাঠ করিতেন। তজ্জন্য তাঁহার জন্ম হইলে "চণ্ডীচরণ" নাম প্রদত্ত হয়। বাল্যকালে তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মেধাবী বলিয়া যেরূপ প্রশংসা লাভ করিতেন, চঞ্চল স্বভাব ও দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি বলিয়াও তিনি সেইরূপ অখ্যাতিও লাভ করেন। গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ সমাপন করিয়া ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে বরিশালে গমনপূর্ব্বক তত্রত্য সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন এবং ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে তথা হইতে কৃতীত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বরিশাল আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বরিশালে পাঠ্যাবস্থায় তিনি সাধু রামতনু লাহিড়ী, গিরিশচন্দ্র সেন, দুর্গামোহন দাস প্রভৃতি ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী কালীমোহন দাসের বাসায় থাকিয়া ফ্রি-চার্চ্চ-ইন্‌ষ্টিটিউশনে (Free Church Institution পরে উহার নাম হয় Duff College) অধ্যয়ন করিতে থাকেন। কিন্তু পদব্রজে ভবানীপুর হইতে নিমতলা যাতায়াতের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং কলেজ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। কিছুকাল ঢাকায় থাকিয়া আইন অধ্যয়নের চেষ্টা করেন। তাহাতে সফলকাম না হইয়া চাকুরীর চেষ্টায় কলিকাতায় যাওয়া স্থির করেন। ঠিক সেই সময়েই একজন ইংরেজ, বাঙ্গালা শিখিবার জন্য শিক্ষক অনুসন্ধান করিতেছিলেন। চণ্ডীচরণ সেই কাজ গ্রহণ করিয়া, চাকুরী গ্রহণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন এবং ঐ সামান্য অর্থের উপর নির্ভর করিয়া বহু ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুকাল বরিশালেই আইন ব্যবসায় করিয়া ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি বিচার বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে করিতে সব-জজের পদ প্রাপ্ত হন। বিচারপতিরূপে তিনি সূক্ষ্মবুদ্ধি, ন্যায়নিষ্ঠা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি মহৎগুণের জন্য দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। অজ্ঞাতনামা গ্রাম্য কবি রচিত নিম্ন লিখিত কবিতাটিই উহার সাক্ষ্য দিবে—

বুদ্ধেযেন বৃহস্পতি বিচারেতে দাশরথি
ধর্ম্মে যেন ধর্ম্মের নন্দন
দীন প্রতি দয়া অতি প্রজার কল্যাণে মতি
নাম সেন শ্রীচণ্ডীচরণ।

পাঠ্যাবস্থায় তিনি যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি অকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহারই ফলস্বরূপ, ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে তিনি ঢাকা নগরীতে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

চণ্ডীচরণের পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। খ্যাতনামা বাঙ্গালী মহিলা কবি কামিনী রায় তাঁহারই জ্যেষ্ঠা কন্যা। তাঁহার অপর কন্যা যামিনী সেন পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়া বহুস্থানে সুখ্যাতির সহিত কাজ করিয়াছিলেন। চণ্ডী-চরণের মৃত্যুকালে তাঁহার চারিপুত্র ও ও তিন কন্যা বর্ত্তমান ছিলেন। পুত্র কন্যাদের সকলকেই তিনি উচ্চশিক্ষা প্রদান করেন। তাঁহার এক পুত্র শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন বর্ত্তমান (১৯৩৮ খ্রীঃ) কলিকাতার একজন শ্রেষ্ঠ আইন ব্যবসায়ী।

চণ্ডীচরণ সাহিত্যিকরূপেই সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার রচিত মহারাজ নন্দকুমার, দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দ সিং, অযোধ্যার বেগম, ঝান্সির রাণী ও এই কি রামের অযোধ্যা নামক পুস্তকগুলি ভারতে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রথম যুগের ঘটনাবলী সংবলিত উপন্যাস। ঐ সকল পুস্তকে, তিনি যেরূপ নির্ভিক ভাবে, এবং দুষ্প্রাপ্য তথ্য সংযোগ করিয়া ঐ কালের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের নানারূপ অত্যাচারের কাহিনী বর্ণন করেন, তাহা যে কোনও রাজকর্ম্মচারীর পক্ষে দুরূহ। ঐ সকল গ্রন্থ রচনার ফলে তিনি শাসনকর্ত্তৃ-পক্ষের বিরাগ ভাজন হন এবং তৎফলে চাকুরীতে যথোচিত উন্নতি লাভ ঘটে নাই। উক্ত গ্রন্থ ভিন্ন তিনি "মুদ্রা-যন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদাতা লর্ড মেটকা-ফের জীবনী" "টমকাকার কুটীর" নামেও দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থখানি প্রসিদ্ধ ইংরেজি গ্রন্থ আঙ্কল্ টম্'স ক্যাবিন (Uncle Tom's Cabin) নামক গ্রন্থের অনুবাদ। আরও কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা তিনি রচনা করেন। কিন্তু তৎসমুদয় এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য।

১৯০০ খ্রীঃ অব্দে তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাহার কতিপয় বৎসর পরে কৃতী বয়প্রাপ্ত একটী কন্যা ও পুত্রের মৃত্যুতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন

চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ— খ্যাতনামা বাঙ্গালী স্মার্ত্ত পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। তাঁহার পিতার নাম ঈশানচন্দ্র চূড়ামণি। হুগলী জিলার কৈকালা গ্রামে তাঁহাদের নিবাস ছিল। তিনি খ্যাতনামা বাঙ্গালী স্মার্ত্ত অধ্যাপক মধুসূদন স্মৃতিরত্নের ছাত্র ছিলেন। চণ্ডীচরণ স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধে কতগুলি গ্রন্থ ও তাহাদের টীকা রচনা

করেন। ঐ সকল পুস্তক তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পারিচায়ক। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে (১৯৩১ খ্রীঃ এপ্রিল) তিনি দেহত্যাগ করেন।

চণ্ডীদাস—(১) প্রাচীন বাঙ্গালী পদ কর্ত্তা। এই নামে খুব সম্ভব একাধিক ব্যক্তি পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রসিদ্ধ পদ কর্ত্তারূপে দুইজন চণ্ডীদাসের নাম পরিচিত। তাঁহাদের মধ্যে একজনকে 'বড়ু' আর একজনকে 'দীন' অথবা 'দ্বিজ' এই বিশেষণের দ্বারা পৃথক করা হইয়া থাকে।

(বড়ু) চণ্ডীদাস খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। তাঁহার অপর এক নাম ছিল অনন্ত। বীরভূম জিলার নান্নুর নামক গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই চণ্ডীদাসের সহিত এক 'রজকিনী'র 'প্রেম' সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং তিনি বাশুলী দেবীর পূজক ছিলেন। এই শেষোক্ত বিষয় লইয়া নানারূপ বিচার বিতর্ক হইয়াছে এবং হইতেছে। কেহ বলেন উক্ত বাশুলী (অথবা বাসুলী) কোনও দেবী নহেন। তিনি 'সহজ' মতাবলম্বী একজন ডাকিনী অর্থাৎ সিদ্ধা। এই সহজিয়া মত প্রচারিকা বাশুলী চণ্ডীদাসকে ধোবানীর সহিত পরিচিত করাইয়া দেন এবং উভয়কে সহজিয়া মতানুসারে প্রেম সাধন করিতে প্ররোচিত করেন। এই বাশুলী নিত্যা নাম্নী এক বৌদ্ধ দেবীর সহচরী ছিলেন। মতান্তরে বাসুলি ও বিশালাক্ষী নামে ধর্ম্ম ঠাকুরের দুই আবরণ দেবতা ছিলেন। চণ্ডীদাস তাঁহাদেরই অন্যতম বাসুলীর পূজক ছিলেন। পূর্ব্বে যে রজকিনীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহার রামী অথবা বারিণী বলিয়াও নাম স্থা.ন স্থানে পাওয়া যায়। রামী রজকিনীর সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে চণ্ডীদাস সমাজে পতিত হন। পরে হয়ত কাহারও চেষ্টায় পুনঃ সমাজ ভুক্ত হইয়াছিলেন।

চণ্ডীদাস সুগায়কও ছিলেন। কথিত হয় স্থানীয় মুসলমান শাসনকর্ত্তার মহিষী চণ্ডীদাসের কীর্ত্তন শুনিয়া বিশেষ মোহিতা হন। তিনি চণ্ডীদাসের কীর্ত্তন শুনিবার জন্য অনেক সময়ে ছদ্মবেশে বিচরণ করিতেন। নবাব ইহা জানিতে পারিয়া চণ্ডীদাসকে বধ করিতে মনস্থ করেন। একবার চণ্ডীদাস যখন কোনও গ্রামের নাট-মন্দিরে কীর্ত্তনে মত্ত ছিলেন, তখন, নবাবের সৈন্য কামানের গোলায় নাটমন্দির ভূমিসাৎ করে এবং তৎসঙ্গে সপারিষদ কীর্ত্তন মত্ত চণ্ডীদাস মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই ঘটনা কাহারও মতে নান্নুরে কাহারও মতে কীর্ণহার নামক স্থানে সংঘটিত হয়।

চণ্ডীদাসের পদাবলীই লোক সমাজে

সমধিক পরিচিত। 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন' নামে একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থও চণ্ডীদাস রচনা করেন। উহা জয়দেবের গীত গোবিন্দের ন্যায় একখানি গীতি কাব্য। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা উহার বর্ণনীয় বিষয়। উহা জন্ম, তাম্বুল, দান, নৌকা, ভার, ছত্র, বৃন্দাবন, কালীয় দমন, যমুনা, হার, বাণ, বংশী ও রাধার বিরহ এই ত্রয়োদশটি 'খণ্ডে' বা অংশে বিভক্ত। উহার অধিকাংশ পদ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা ও বড়াই (দূতীর) উক্তি প্রত্যুক্তি।

চণ্ডীদাসের নামে যে সকল পদ প্রচলিত আছে, বলাবাহুল্য তাহার মধ্যে বহু পদই চণ্ডীদাসের রচনা নহে। ভাষা, ভাব, বর্ণনার কৌশল প্রভৃতি বিষয় সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলেই উহা প্রতীয়মান হইবে। 'সখি কেবা শুনাইল শ্যাম নাম, কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মন প্রাণ' প্রমুখ অত্যাধুনিক কালের পদও যে কি ভাবে চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত হইতেছে তাহাই বিস্ময়ের বিষয়।

চণ্ডীদাস—(২) এই নামে অপর যে কবির পরিচয় সম্প্রতি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তিনি দীন অথবা দ্বিজ চণ্ডীদাস নামেই পরিচিত। তিনি চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী। এবং পূর্ব্বোক্ত বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। তিনিও শ্রীকৃষ্ণের জীবন অবলম্বন করিয়া এক গ্রন্থ রচনা করেন। উহা "শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা" নামেই খ্যাত। তদ্ভিন্ন পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত প্রায় দুই হাজার পালা গান সম্বলিত এক পুঁথিও পাওয়া গিয়াছে, বিশেষজ্ঞগণ উহা দীন চণ্ডীদাসের বলিয়াই অনুমান করেন। "শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা" গ্রন্থে বাশুলী দেবীর উল্লেখ নাই এবং 'চণ্ডীদাস' এই নামের পূর্ব্বে বড়ু দ্বিজ প্রভৃতি বিশেষণও ব্যবহৃত হয় নাই।

শ্রীচৈতন্য প্রমুখ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যে শুদ্ধ বৃন্দাবন লীলার ভাব প্রচার করেন, দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যে উহা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বড়ু চণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের পদাবলীর ভাবধারার সহিত উহার বিশেষ প্রভেদ আছে। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীকে সেই জন্য পণ্ডিতগণ খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া অনুমান করেন। উভয় চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে এমন অনেক পদ পাওয়া যায়, যেগুলি তাঁহাদের কাহারও রচিত নহে। হয়ত চণ্ডীদাস নামে অপর কোনও অখ্যাতনামা কবির রচনা, নাম সাদৃশ্যে একত্র সংগৃহীত হইয়াছে, অথবা কবি যশঃ প্রার্থী অক্ষমের রচনা অজ্ঞাতভাবে মিলিত হইয়া পড়িয়াছে।

উভয় চণ্ডীদাসের মধ্যে কে বাস্তবিক বাশুলীর সেবক ছিলেন তাহা লইয়াও

মতদ্বৈধ আছে। চণ্ডীদাস পদাবলীর অনেকগুলিতে সহজিয়া মত ব্যক্ত হইয়াছে। এই সহজিয়া মত শ্রীচৈতন্য দেবের সময়েও বিশেষ বিস্তৃত লাভ করে নাই। ঐ গুলি আরও পরবর্ত্তী-কালের। ঐ সহজিয়া মতপরিপোষক পদগুলির অনেক স্থলে বাশুলী দেবীর উল্লেখ আছে, তাহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে দীন চণ্ডীদাসই বাশুলীর সেবক ছিলেন, বড়ু নহেন।

বাসুলী (অথবা বাশুলী) পদটি বাগীশ্বরী পদেরই অপভ্রংশ বলিয়া কেহ কেহ প্রচার করেন। চণ্ডীদাস পদাবলীর অনেকগুলি হইতে সরস্বতীর কৃপালাভের সম্ভাবনা অনুমান করা যায়।

চণ্ডীপ্রসাদ রায়—পাবনা জিলার অন্তর্গত পোতাজিয়ার রায় জমিদার বংশের আদি পুরুষ। তিনি মানসিংহের ভ্রাতা ভানুসিংহের সহিত সন্ধি করিয়া জমীদারী প্রাপ্ত হন। তিনি বারেন্দ্র কায়েস্থদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুলীন ছিলেন। এক সময়ে তিনি প্রসিদ্ধ চলন বিলের ডাকাত জমিদার বেণীমাধব রায়ের সহায়তায় বঙ্গের মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। সম্রাট আকবরের সুবেদার মানসিংহ উত্তরবঙ্গ স্বীয় শাসনে আনয়ন করিবার জন্য স্বীয় ভ্রাতা ভানুসিংহকে প্রেরণ করেন। ভানুসিংহ যুদ্ধ অপেক্ষা মৈত্রীর অনুরাগী ছিলেন। তিনি তাঁহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে জমিদারী প্রদান পূর্ব্বক মুঘল সম্রাটের অধীন করিয়াছিলেন।

চণ্ডীবর—কথিত আছে আসাম নরপতি দুর্লভনারায়ণের সহিত বঙ্গনরপতি ধর্ম্মনারায়ণের যুদ্ধ হইয়াছিল। তৎপরে যখন উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তখন ধর্ম্মনারায়ণ সাতজন ব্রাহ্মণ ও সাতজন কায়স্থকে সপরিবারে তাঁহার রাজ্যে বাস করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করেন। চণ্ডীবর সেই সপ্ত কায়স্থ পরিবারের অন্যতমের বংশধর ছিলেন। তিনি তৎকালীন কায়স্থ সমাজের দলপতি ছিলেন। এই সময়ে ভুটিয়ারা একবার বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া চণ্ডীবরের পুত্রকে লইয়া যায়। চণ্ডীবর তাহাদের অনুসরণ করিয়া তাঁহার পুত্রকে উদ্ধার করেন। এই চণ্ডীবরেরই পৌত্র সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্ম সংস্কারক শঙ্করদেব। শঙ্করদেব দেখ।

চণ্ডীহর—তিনি উড়িষ্যার সোমবংশীয় নরপতি অভিমন্যুর (দ্বিতীয়) পুত্র। তাঁহার তনয় দ্বিতীয় উদ্দ্যোত কেশরী। বিচিত্রবীর্য্য দেখ।

চণ্ডেশ্বর—(১) এই জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ১৫০৯ শকের (১৫৮৭ খ্রীঃ) পূর্ব্বে 'চণ্ডেশ্বর জাতক' নামে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৫০০ শকের পূর্ব্বে 'প্রশ্নচণ্ডেশ্বর' নামক গ্রন্থ রচনা

তিনি করিয়াছিলেন। তিনি সূর্য্য সিদ্ধান্তের উপর এক টীকাও রচনা করিয়াছেন।

চণ্ডেশ্বর—প্রসিদ্ধ মৈথিল কবি বিদ্যাপতির খুল্ল পিতামহ। তিনি মিথিলেশ হরিসিংহ দেবের একজন মন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁহার উপাধি ছিল "মহামত্তক সান্ধিবিগ্রহক" ছিল।। তিনি বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং অনেকগুলি ধর্ম্ম শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গুলি রত্নাকর নামে খ্যাত এবং কৃত্য, দান, বিবাদ, পূজা, শুদ্ধি, ব্যবহার ও রাজনীতি এই সাত খণ্ডে বিভক্ত। চণ্ডেশ্বর ঠাকুর একাধারে রাজমন্ত্রী সেনাপতি ও স্মৃতি সংগ্রহকার ছিলেন। তাঁহারই রচিত বিবাদ রত্নাকর গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি ১৪১৪ খ্রীঃ অব্দে তুলাপুরুষ দান করেন। চণ্ডেশ্বর ঠাকুরের সৈনাপত্যে মিথিলাপতি হরিসিংহ দেব, নেপালরাজকে পরাজয় করিয়া, ভাটগাঁও নামক স্থান অধিকার করেন। ঐ সকল অঞ্চলে তাঁহার বহুকীর্ত্তি এখনও বিদ্যমান আছে। চণ্ডেশ্বর ঠাকুরের পিতার নাম বীরেশ্বর ঠাকুর।

চতুরদাস, ভক্ত— রাঘব দাসজী তাঁহার রচিত ভক্তমাল গ্রন্থে অনেক সাধু, ভক্ত, সাধক ও ধর্ম্ম সাধনার প্রবর্ত্তক গুরুগণের নাম ও জীবনী প্রদান করিয়াছেন। চতুরদাস ভক্ত উক্ত ভক্তমাল গ্রন্থের এক উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার টীকা অতি উৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বত্র খুব সমাদৃত।

চতুর্ভুজ—একজন বাঙ্গালী কবি। তিনি 'হরি চরিত' নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়াছেন। তাহাতে বঙ্গের পালবংশের অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়।

চতুর্ভুজ মিশ্র—তিনি একজন জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'চতুর্ভুজমিশ্রানর্ব্বন্ধ।'

চত্তরশাল—(২) কোটার রাজা দুর্জন শাল অপুত্রক ছিলেন। তিনি তাঁহার সামন্ত নরপতি অন্তার রাজা অজিত সিংহের পুত্র চত্তর শালকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে ১৭৬৬ খ্রীঃ অম্বররাজ মধু সিংহ কোটা আক্রমণ করেন; কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে হারবীর চত্তর শালের নিকট পরাস্ত হন। চত্তর শালের মৃত্যুর পরে তাঁহার ভ্রাতা গোমান সিংহ ১৭৬৬ খ্রীঃ সালে কোটার রাজা হইয়াছিলেন।

চত্তরশাল রাও—(১) তিনি রাজপুতানার অন্তর্গত বুন্দির রাজা ছিলেন। তিনি রাও রতন সিংহের পৌত্র ও রাও গোপীনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি শা-জাহানের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ সম্মান লাভ করেন। শাজাহানের রাজত্বের শেষ সময়ে তাঁহার পুত্রেরা সিংহাসন লইয়া বিবাদ আরম্ভ

করেন। সেই সময়ে ১৬৫৮ খ্রীঃ অব্দ চত্তরশাল রাজকুমার দারার পক্ষ হইয়া আওরঙ্গজীবের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাও ভাও সিংহ বুন্দির রাজা হইয়াছিলেন। চত্তরশাল পত্তননগরে কিশোরী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

চন্দন—১৫০১ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হুশেনশাহ কামতাপুর আক্রমণ করিয়া ধ্বংশ করেন। তৎপরে কিছুদিন তথায় কোন প্রধান রাজা ছিলেন না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী স্বাধীন রাজা ছিল। মদন ও চন্দন নামে দুই ভ্রাতা মারালাবাস নামক স্থানের স্বাধীন রাজা ছিলেন।

চন্দন চন – মুসলমানেরা মুলতান অধিকার করিয়া তৎপ্রদেশ শাসন করিবার জন্য বহু হিন্দু কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। তন্মধ্যে চনন চন (চন্দন চাঁদ) ভগনাহি নামক স্থানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

চন্দনা—(১) জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাবীরের জ্ঞানে ও ধর্ম্মভাবে আকৃষ্ট হইয়া বহু নরনারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে চম্পারাজ্যের (বর্ত্তমান ভাগলপুর) অধিপতি দধিবাহনের কন্যা চন্দনা অন্যতমা ছিলেন। তিনি সন্ন্যাসিনী দলের অধিনেত্রী ছিলেন; অন্যমতে চন্দনা মহাবীরের মাতুল বৈশালীর রাজা চেতকের কন্যা ছিলেন। তিনি মহাবীরের শিষ্যা হইয়া সন্ন্যাসিনী দলের অগ্রনায়িকা হইয়াছিলেন। চন্দনার জীবন কাহিনী অতিশয় বিষাদপূর্ণ। একদা উদ্যানে ভ্রমণকালে বিদ্যাধর নামক এক দুষ্টপ্রকৃতির লোক তাঁহাকে হরণ করে এবং এক অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। রোরুদ্যমানা চন্দনাকে দেখিয়া অরণ্যবাসী একটী লোক তাঁহাকে লইয়া কৌশাম্বী নগরে গমনপূর্ব্বক বৃষভ সেন নামক একজন বণিকের নিকট বিক্রয় করে। বণিকপত্নী এই অপূর্ব্বরূপ লাবণ্যবতী রমণীর প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিত। এই সময়ে মহাবীর কৌশাম্বীনগরে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন। দলে দলে নরনারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছিলেন। চন্দনাও তাঁহার ধর্ম্মভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্যা শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্টা হইলেন।

চন্দ বরদাই –প্রসিদ্ধ হিন্দি কবি। তিনি ভারতের শেষ স্বাধীন হিন্দু নৃপতি চৌহানপতি পৃথ্বিরাজের সভা কবি ছিলেন। তিনি পঞ্জাবের এক ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত ছিলেন। কথিত আছে যে তিনি তপস্যা করিয়া দেবী সরস্বতীর বরে কবিত্ব শক্তি লাভ করেন বলিয়া 'বরদাই কবি চন্দ' নামে প্রখ্যাত হন। চন্দ কবি 'পৃথ্বিরাজ রসো' নামে একখানি মহাকাব্য রচনা করেন। উহা প্রকৃত পক্ষে মহারাজ পৃথ্বিরাজের জীবনী ও তাঁহার

রাজত্বের ইতিহাস। ঐ পুস্তকে তৎকালীন বহু ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ আছে। বহুকাল পর্য্যন্ত পুস্তকখানি ঐ যুগের একখানি প্রামাণিক ইতিহাসরূপে গৃহীত হইত। কিন্তু বর্ত্তমানকালে অন্যান্য বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদান হইতে লব্ধতত্ত্ব সমূহের সহিত তুলনায় চন্দ কবির কাব্য ইতিহাসের মর্য্যাদা হারাইয়াছে। বর্ত্তমানে উহা কেবল কাব্যরূপেই পঠিত ও আলোচিত হয়। পৃথ্বিরাজ রসোর কাব্য পাঞ্জাবী ভাষা মিশ্রিত হিন্দিতে রচিত। হিন্দি সাহিত্যে উহা অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। সাহিত্য রসিকগণ উহাকে মহাকাব্য রূপে গ্রহণ করিতে দ্বিধা করেন না। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু তিথি অজ্ঞাত।

চন্দ্র—সিন্ধুদেশের রাজা চচ ৬৩৭ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার ভ্রাতা চন্দ্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৬৮৮—৬৯৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দাহির সিংহাসনে আরোহণ করেন। চন্দ্র শেষ জীবনে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বৎসরাজ শিবিস্থানের অধিপতি ছিলেন। দাহির ও চচ দেখ।

চন্দ্র—(২) তিনি একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক। তাঁহার রচিত ব্যাকরণের নাম 'চান্দ্র ব্যাকরণ'। খ্রীঃ পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে কাশ্মীরপতি অভিমন্যুর রাজত্বকালে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

চন্দ্র—(৩) তিনি কাশ্মীরপতি ক্ষেমগুপ্তের মহিষী দিদ্দার সময়ে সেনাপতি ছিলেন। সামন্ত নরপতি রাজপুরীর অধীশ্বর পৃথ্বীপাল বিদ্রোহী হইলে, তিনি তাঁহাকে দমন করিতে যাইয়া পরাজিত হন।

চন্দ্রক—তিনি কাশ্মীরপতি তুঞ্জিনের রাজত্বকালে (১১৩ খ্রীঃ পূ—৭৭ খ্রীঃ পূঃ) বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি একখানা উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করেন। সেজন্য লোকেরা এই মহাকবিকে ব্যাসদেবের অবতার বলিয়া সম্মান প্রদান করিতেন।

চন্দ্রকর দেব—তিনি উড়িষ্যা দেশের একজন প্রাচীন রাজা। কথিত আছে তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পরবর্ত্তী তৎবংশীয় ১৮শ নরপতি। ৩৭৮১ কলিগতাব্দে (৭৮০ খ্রীঃ) তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। বিদেশীয় কর্ত্তৃক রাজ্য আক্রান্ত হইলে তাঁহার পিতা শোভন দেব রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ঝাড়খণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই স্থানেই শোভনদেবের পুত্র চন্দ্রকর দেব পিতার মৃত্যুর পরে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

চন্দ্রকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত—খাটুরার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি রামরুদ্র ন্যায়বাচস্পতির অন্যতম ছাত্র ছিলেন। তিনি বাড়ীতে চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক দেশ বিদেশের ছাত্রকে অধ্যাপন করিতেন।

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার (মহামহোপাধ্যায়),—দেশবিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। ১২৪৩ বঙ্গাব্দের ১৯শে কার্ত্তিক (১৮৩৬ খ্রীঃ নবেম্বর) ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত নেত্রকোণা মহকুমার সেরপুর নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ। তাঁহারা মানকোণের চক্রবর্ত্তীরূপে দেশে পরিচিত ছিলেন। চন্দ্রকান্তের পিতামহই সেরপুরে বাস স্থাপন করেন। বল্লাল কর্ত্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের ভট্ট নারায়ণ চন্দ্রকান্তের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন।

বাল্যে পিতার নিকটেই চন্দ্রকান্তের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। কিন্তু রাধাকান্ত অচিরেই দেহত্যাগ করাতে চন্দ্রকান্ত অনন্যোপায় হইয়া, প্রথমে পূর্ব্ববঙ্গের সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র বিক্রমপুরের অন্তর্গত পুড়াপাড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ দীননাথ ন্যায় পঞ্চাননের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তৎপরে নবদ্বীপে গমন করিয়া প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও হরিদাস শিরোমণির নিকট স্মৃতি; শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ ও প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্নের নিকট ন্যায়শাস্ত্র ও কাশীনাথ শাস্ত্রীর নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়ন সমাপনান্তে তিনি "তর্কালঙ্কার" উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ১২৬৮ বঙ্গাব্দে এক টোল প্রতিষ্ঠা করিয়া বিদ্যা দান করিতে আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে যাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া, এক্ষণে অন্যান্য বিষয়ও অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। সাহিত্য, অলঙ্কার দর্শনের অন্যান্য শাখা তিনি স্বয়ংই গৃহে অধ্যয়ন করেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অচিরেই দেশে প্রচারিত হইল এবং নানাস্থান হইতে বিদ্যার্থীগণ তাঁহার চরণে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তাঁহার অধ্যাপনা প্রণালীও অতি উৎকৃষ্ট ছিল। সকল বিষয়ই তিনি সমানরূপে শিক্ষা দান করিতে পারিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ক্রমে কলিকাতার বিদ্বজ্জন সমাজেও প্রচারিত হইল এবং পণ্ডিতকুলাগ্রগণ্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রমুখ পণ্ডিতগণ, কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃতের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রকান্ত প্রথমে তাহাতে বিশেষ সম্মত হন নাই।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ নামক কলিকাতার একজন উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী একবার সংক্রান্তি সম্বন্ধে একটি বিষয়ের মীমাংসার জন্য অনেক স্থানেই অনুসন্ধান করেন। কিন্তু কোথাও নিজ মনঃপূত উত্তর না পাইয়া চন্দ্রকান্তের নিকট তত্ত্বপ্রার্থী হন এবং তাঁহার মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কলি-

কাতায় আনয়ন করিবার জন্য উৎসুক হন। প্রতাপ বাবুর অনুরোধে চন্দ্রকান্ত গোভিল গৃহ্যসূত্রের কিয়দংশের এক ভাষ্য রচনা করেন। উহা কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির (Asiatic Society of Bengal) এক অধিবেশনে আলোচিত হয়। সমবেত পণ্ডিত মণ্ডলী তাহাতে চন্দ্রকান্তের অসাধারণ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনুরোধে চন্দ্রকান্ত উহা সম্পূর্ণ করেন। এসিয়াটিক সোসাইটির ব্যয়ে উহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক রচনায় চন্দ্রকান্তের পাণ্ডিত্যের পরিচয় সুদূর ইয়োরোপেও প্রচারিত হইল। তথাকার বিদ্বন্মণ্ডলী বাঙ্গালী অধ্যাপকের অনন্য সাধারণ বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলেন। ইহার কিছুকাল পরে, বহু পণ্ডিতের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে চন্দ্রকান্ত ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন।

এই সময় হইতে ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দের শেষভাগ পর্য্যন্ত তিনি সংস্কৃত কলেজে ছিলেন। তথায় অধ্যাপনাকালে কণাদ প্রণীত বৈশেষিক ও কপিলের সাংখ্য দর্শনে তাঁহার অধ্যাপনা সর্ব্বসাধারণের বিস্ময় উৎপাদন করে। শাস্ত্রের জটিলতম অংশগুলি তিনি অতি সরলভাবে ব্যাখ্যা করিয়া শিক্ষার্থীদের সংশয় ছেদন করিতে তাঁহার তুল্য অতি অল্প অধ্যাপকই সমর্থ ছিলেন।

চন্দ্রকান্তের প্রতিভা বহুমুখী ছিল। কাব্য, নাটক, বৈদিক ব্যাকরণ, স্মৃতি, দর্শন, ন্যায়, অলঙ্কার প্রভৃতি বহু বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বহু গ্রন্থ রচনা করেন। প্রত্যেকখানি হইতেই তাঁহার স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। বহু পাশ্চাত্য মনীষী চন্দ্রকান্তের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া অনেক বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার সহিত পত্র ব্যবহার করিতেন।

১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে চন্দ্রকান্ত এসিয়াটিক সোসাটির অন্যতম সম্মানিত সদস্য নির্ব্বাচিত হন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি বেদান্ত দর্শনের প্রবন্ধ রচনা করিয়া শ্রীগোপাল বসু মল্লিক প্রদত্ত বৃত্তি (৫০০০৲ মুদ্রা) প্রাপ্ত হন। এইরূপ অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াও তর্কালঙ্কার মহাশয় বিনয় সৌজন্য, পরমত-সহিষ্ণুতা, গুণগ্রাহিতা অনাড়ম্বরতা প্রভৃতি বিদ্বজ্জনোপযুক্ত মহৎ গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। যে কেহ কোনও কার্য্য উপলক্ষে তাঁহার সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহার গুণাবলীতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বমত দৃঢ়তা ও অনুকরণীয় ছিল কিন্তু তিনি কখনও অপরের বিচার বুদ্ধিকে হীনভাবে গ্রহণ করিতেন না। চন্দ্রকান্ত

প্রাচীনযুগের আদর্শ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার শিষ্যবর্গ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, কেহ তাঁহাকে ক্রুদ্ধ হইয়া কখনও অপরের প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনেন নাই। ক্রোধের যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও তিনি ক্রোধ দমনই শ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়া মনে করিতেন। ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ২০শে মাঘ কাশীধামে বঙ্গের গৌরবচন্দ্র চন্দ্রকান্ত অস্তগমন করেন।

চন্দ্রকান্ত মিত্র—তিনি কোন্নগরের মিত্রবংশীয়। তাঁহার পিতা গিরিশচন্দ্র মিত্র পাঞ্জাবে কমিসরিয়েট ডিপার্টমেন্টে চাকরী করিতেন। সেই সময়ে ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে অম্বালা সহরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ১৮৭৪ সালে ও মাতা ১৮৭৫ সালে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পিতৃব্য মহেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁহাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন। ১৮৮৯ সালে চন্দ্রকান্ত কোন্নগর হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং বৃত্তি প্রাপ্ত হন। পরে পাটনা কলেজ হইতে এফ, এ, ; বি, এ, ; এম, এ ও বি, এল পরীক্ষা পাশ করিয়া, পাটনা সহরেই ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০৬ সালে তিনি দিনাজপুরের রাজা গিরিজা প্রসন্ন বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গে ভারতের নানা তীর্থে ভ্রমণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র জগদীশনাথ রায় এম, এল, এ বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটরী নিযুক্ত হন। তিনি দানশীল, পরোপকারী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন লোক ছিলেন। ১৩৩৭ সালের ২৮শে ফাল্গুন সোমবার তিনি পরলোক গমন করেন। সেই সময়ে তাঁহার সুশীলকুমার, সুধীরকুমার, সুবিমল, সুদিন, সুভাষ, সুহাস, প্রতীপ ও দীলিপ নামে আট পুত্র বর্ত্তমান ছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান।

চন্দ্রকান্ত সিংহ—আসাম প্রদেশের আহম নরপতি কমলেশ্বর সিংহ ১৮১০ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে, বড় গোহাই পূর্ণানন্দ, কমলেশ্বরের ভ্রাতা চন্দ্রকান্ত সিংহকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। চন্দ্রকান্ত অল্প বয়স্ক বলিয়া সমস্ত রাজক্ষমতা বুড়া গোঁহাইয়ের হাতেই ছিল। চন্দ্রকান্তের অপর নাম সুদিন ফা ছিল। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বুড়া গোঁহাই পূর্ণানন্দের ক্ষমতায় ঈর্ষান্বিত হন এবং তাঁহাকে বধ করিবার জন্য তাঁহার প্রিয় পাত্র সতরামকে নিযুক্ত করেন। সতরাম অকৃতকার্য্য হইয়া প্রথমে নির্ব্বাসিত ও পরে নিহত হন। ইহার কিছুকাল পরে বড় ফুকন পরলোক গমন করেন। তাঁহার স্থলে বদনচন্দ্র নামে এক ব্যক্তি উক্ত পদে নিযুক্ত হন। এই বদনচন্দ্রও

তাঁহার পুত্রদের বর্ব্বরোচিত ব্যবহারে সকলেই অতিশয় উত্যক্ত হইয়াছিল। পূর্ণানন্দ বুড়া গোঁহাই তাঁহাকে বধ করিতে সংকল্প করিলেন। পুর্ব্বেই এই সংবাদ পাইয়া বদনচন্দ্র দেশ ত্যাগপূর্ব্বক বঙ্গদেশে পলায়ন করেন। এখানে ব্রহ্মদেশের এক রাজদূতের সঙ্গে পরিচিত হইয়া ব্রহ্মদেশে চলিয়া যান এবং তথা-কার রাজাকে আসাম আক্রমণ করিতে প্ররোচিত করেন, ব্রহ্মরাজ আসাম প্রদেশ আক্রমণ করেন। ১৮১৬ খ্রীঃ অব্দের শেষভাগে খিলাধারী নামক স্থানে আহম ও বর্ম্মাদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে বর্ম্মারা জয়লাভ করে। বুড়া গোঁহাই এই সময়ে পরলোক গমন করেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতেও আহম রাজ নিরাশ না হইয়া সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক কঠাল বাড়ী নামক স্থানে বর্ম্মাদের সম্মুখীন হন। কিন্তু ঐ যুদ্ধে বর্ম্মারাই জয়লাভ করে। বর্ম্মারা জোড়হাটনগর অধিকার করেন। রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহ পলায়নপূর্ব্বক গৌহাটীতে উপস্থিত হইলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি বদনচন্দ্রকেই পুনরায় বড় ফুকনের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বর্ম্মাদের সঙ্গে সন্ধি করিলেন। সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী চন্দ্রকান্ত সিংহ বর্ম্মারাজকে বহু অর্থ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে বাধ্য হন। ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে এপ্রিল মাসে বর্ম্মারা স্বদেশে ফিরিয়া যায়। এদিকে বড় ফুকন বদনচন্দ্র পূর্ব্বপদ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় পরাক্রান্ত হইলেন। চন্দ্রকান্ত সিংহ নামে মাত্র রাজা রহিলেন। বদনচন্দ্র সমস্ত রাজক্ষমতা অধিকার করিলেন। ভূতপূর্ব বুড়া গোঁহাইএর আত্মীয় স্বজনকে নিহত করিয়া তাঁহাদের সমস্ত ধন সম্পত্তি হস্তগত করিলেন। বড় বড়ুয়া ইতিমধ্যে ফুকন বদনচন্দ্রের সহিত বিবাদ করিয়া তাঁহাকে নিহত করিলেন। এই সংবাদ গৌহাটীস্থিত তদানীন্তন বড় গোঁহাই অবগত হইয়া সসৈন্যে জোড়হাটে আসিয়া চন্দ্রকান্ত সিংহকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা রাজেশ্বর সিংহের প্রপৌত্র ব্রজনাথকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। চন্দ্রকান্ত সিংহ রঙ্গপুরে পলায়ন করিলেন; ডেকা রাজাকে জোড়হাটে রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অচিরে নিহত হইলেন। ব্রজনাথ অঙ্গহীন বলিয়া তাঁহার পুত্র পুরন্দর সিংহ রাজা হইলেন। চন্দ্রকান্ত সিংহ ধৃত হইলে তাঁহার অঙ্গহানী করিয়া তাঁহাকে পুনঃ রাজপদের অনধিকারী করিলেন। ইতিমধ্যে বদনচন্দ্রের আত্মীয়ের নিকট বর্ম্মারাজ, বদনচন্দ্রের নিধন প্রভৃতি আসামের আভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া ১৮১৯ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পুনরায়

সেনাপতি অলমিঙ্গির অধীনে একদল সৈন্য আসাম বিজয়ের জন্য প্রেরণ করেন। নাজিরা নামক স্থানে বর্ম্মা সেনাপতি আহমদিগকে পরাস্ত করেন। আহমরাজ পুরন্দর সিংহ পলায়নপূর্ব্বক গৌহাটীতে আশ্রয় লইলেন। রাজচ্যুত চন্দ্রকান্ত সিংহ বর্ম্মা সেনাপতির সাহায্যে আবার রঙ্গপুরে আহম রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বর্ম্মা সেনাপতি কর্ত্তৃক বড় বড়ুয়া ও বুড়া গোঁহাই ধৃত ও নিহত হইলেন। তিনি পুরন্দর সিংহকে ধরিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু পুরন্দর সিংহ পলায়নপূর্ব্বক ইংরেজ রাজ্যে আশ্রয় লইলেন। এদিকে তদানীন্তন বুড়া গোঁহাই গৌহাটীতে আসিয়া বর্ম্মাদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া ইংরেজ রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা পুরন্দর সিংহ ও বুড়া গোঁহাই পুনঃ পুনঃ ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াও অকৃতকার্য্য হন। বর্ম্মা সেনাপতি বড় বড়ুয়ার স্থানে পটল নামে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পটল সেনাপতির বিরাগ উৎপাদন করিয়া নিহত হইলেন। এই বিজয়ে বর্ম্মা সেনাপতি আহম রাজার অনুমতি গ্রহণও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন না। চন্দ্রকান্ত বর্ম্মা সেনাপতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য প্রথমে গৌহাটী ও তৎপরে ইংরেজ রাজ্যে পলায়ন করিলেন। বর্ম্মা সেনাপতি তাঁহাকে ফিরাইয়া নিতে অনেক চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হন। সেইজন্য তিনি রাজার অনুগত বহু লোককে নিহত করেন। বর্ম্মা সেনাপতি একস্থানে বহু সৈন্য সমাবেশ না করিয়া, নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সুযোগে চন্দ্রকান্ত সিংহ রাজ্যের পশ্চিম অংশ অধিকার করিলেন। ইতিমধ্যে মিঙ্গি মহাবান্দুলা নামক বর্ম্মা সেনাপতি বহু সৈন্যসহ আসাম প্রদেশে উপনীত হইয়া চন্দ্রকান্তকে বিতাড়িত করিলেন। অবশেষে চন্দ্রকান্ত বর্ম্মা সেনাপতির অনুরোধে জোরহাটে গেলেন। তাঁহাকে রাজা ত করিলেনই না বর্ম্মা সেনাপতি তাঁহাকে বন্দী করিয়া রংপুরে লইয়া গেলেন। আসামের জলবায়ু সহ্য না হওয়ায় মহাবান্দুলা স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। এইদিকে ধীরে ধীরে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট বর্ম্মাদিগকে তাড়াইয়া সমস্ত আসাম প্রদেশ অধিকার করিলেন। অধিকতর যোগ্য বলিয়া পুরন্দর সিংহ কিছুদিনের জন্য রাজপদ লাভ করিলেন।

চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ—১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দে মণিপুররাজ গম্ভীর সিংহ পরলোক গমন করেন। এই সময়ে তাঁহার পুত্র চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ এক বৎসর বয়সে রাজা হন। মন্ত্রী নরসিংহ রাজকার্য্য পরি-

চালনা করিতে থাকেন। ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট মণিপুর লেভী নামক সৈন্যদল সম্পূর্ণভাবে মণিপুর রাজের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক একজন পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্ত করেন। ১৮৪৪ সালে রাজা চন্দ্রকীর্ত্তির জননী স্বীয় প্রিয় পাত্র নবীন সিংহের কুমন্ত্রণায় মন্ত্রী নরসিংহকে হত্যা করিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণে উদ্যোগী হন। কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া পুত্রসহ পলায়নপূর্ব্বক কাছাড়ে গমন করিলেন। মন্ত্রী নরসিংহ তৎপরে নবীন সিংহকে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিলেন। ছয় বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া ১৮৫০ সালে রাজা নরসিংহ পরলোক গমন করিলে, তাঁহার ভ্রাতা দেবেন্দ্র সিংহ রাজা হন। তিনি মাত্র তিন মাস রাজত্ব করেন। তৎপরে চন্দ্রকীর্ত্তি স্বীয় বাহুবলে পুন মণিপুর সিংহাসন লাভ করেন। ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৮৮৫ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি অতিশয় ধর্ম্ম ভীরু উদার চরিত নরপতি ছিলেন। তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শূরচন্দ্র রাজা হন। তাঁহারই সময়ে মণিপুর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। টিকেন্দ্রজিৎ দেখ।

চন্দ্রকেতু—মহানাদের কোনও রাজা। তিনি মহানাদ হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত এক অতি প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন

চন্দ্রগুপ্ত (প্রথম)—গুপ্তবংশীয় ঘটোৎকচের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত (প্রথম) ঐ বংশের তৃতীয় নরপতি। তিনিই প্রকৃতপক্ষে গুপ্তবংশের প্রথম সার্ব্বভৌম নৃপতি। তাঁহার রাজত্বের সময়ে গুপ্ত-রাজ্য বিশেষ বিস্তৃত ছিল না। মগধ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি স্থান লইয়া গুপ্ত রাজ্য গঠিত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবী কুমারী কুমারদেবীকে বিবাহ করেন এবং এই বৈবাহিক সম্বন্ধকে স্মরণীয় করিবার জন্য উভয়ের মূর্ত্তি অঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করেন। তিনি খ্রীঃ ৪র্থ শতাব্দীর প্রারম্ভেই রাজত্ব করেন। ইহার পর তৎপুত্র ইতিহাস প্রসিদ্ধ সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। নিজ অভিষেকবর্ষ হইতে চন্দ্রগুপ্ত এক সংবৎ প্রচলিত করেন। তাহা গুপ্তাব্দ বা গুপ্ত সংবৎ নামে পরিচিত।

চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়)—সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দেবগুপ্ত ইতিহাসে প্রধানতঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নামে প্রসিদ্ধ। ইনি গুপ্তবংশীয় ৫ম নরপতি। তাঁহার সিংহচন্দ্র, সিংহবিক্রম, দেবশ্রী অথবা দেবরাজ প্রভৃতি আরও কয়েকটি নাম পাওয়া যায়। ঐ গুলির কোনও কোনওটি তাঁহার উপাধি। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকারী বিক্রমাদিত্য নামেও সবিশেষ খ্যাত ছিলেন। তিনি খ্রীঃ ৪র্থ শতাব্দীর প্রারম্ভেই রাজত্ব করেন (খ্রীঃ ৪০০—৪১৪ অব্দ)। বাকাটক বংশীয় পৃথিবী-

সেনের পুত্র রুদ্রসেন (২য়), তাঁহার জামাতা ছিলেন। রুদ্রসেন পত্নী প্রভাবতীর মাতা কুবের নাগা, নাগ-বংশীয়া রাজকুমারী ছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত (২য়) শক জাতিদের সহিত যুদ্ধ করিয়া মালব ও সৌরাষ্ট্র অধিকার করেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথম ভাগে পাটলিপুত্রই রাজধানী ছিল। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিম ভারতে অধিকার স্থাপন করিয়া, উজ্জয়িনীতে রাজধানী স্থাপন করেন।

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা হিয়ান তাঁহার রাজত্বের সময়ে ভারতে আগমন করেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের এবং রাজ্যশাসন-প্রণালীর এক সুবিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তিনি "পরম ভাগবত"। কিন্তু তাঁহার অমাত্য ও সচিবগণের মধ্যে বৌদ্ধ, জৈন, শৈব প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। রাজকার্য্যের সুবিধার জন্য একটি মন্ত্রী পরিষদ ছিল। সমগ্র রাজ্য বিভিন্ন প্রদেশে (দেশ, ভুক্তি) এবং প্রদেশগুলি ক্ষুদ্রতর জনপদ (প্রদেশ বা বিষয়) অর্থাৎ জিলায় বিভক্ত ছিল। এই সকল ভুক্তি বা বিষয়গুলির শাসন-ভার গোপ্তৃ, উপরিক, মহারাজা, বিষয়-পতি প্রভৃতি নামধারী রাজকর্ম্মচারী-গণের উপর ন্যস্ত ছিল।

বসার, এলাহাবাদ, বাকাটক, রাঁচি, উদয়গিরির গুহা, প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপি এবং চন্দ্রগুপ্তের নামীয় মুদ্রা হইতে তাঁহার রাজত্ব সংক্রান্ত অনেক বিষয়ই অবগত হওয়া যায়। তাঁহার নামাঙ্কিত অনেক মুদ্রায় তাঁহার শ্রীবিক্রম, সিংহবিক্রম, অজিত বিক্রম, বিক্রমার্ক, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি উপাধির উল্লেখ আছে। দক্ষিণ ভারতের কানাড়ার অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতি চন্দ্রগুপ্তকে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে অনেকে অনুমান করেন যে, চন্দ্রগুপ্ত হয়ত ঐ সকল স্থানে অভিযান করিয়া তত্তৎদেশীয় রাজকুমারীগণকে নিজ অন্তঃপুরচারিণী করিয়াছিলেন। কিন্তু এবিষয়ে খুব বিশ্বাসযোগ্য কোনও প্রমাণ এযাবৎ পাওয়া যায় নাই। ইতিহাসে চন্দ্রগুপ্তের দুই মহিষীর নামই পাওয়া যায়। প্রথমা মহিষী ধ্রুবদেবীর গর্ভে গোবিন্দগুপ্ত ও কুমারগুপ্ত নামে দুই পুত্র এবং দ্বিতীয়া মহিষী কুবেরনাগার গর্ভে প্রভাবতী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কুমারগুপ্ত রাজা হন।

চন্দ্রগুপ্ত, (মৌর্য্য)—প্রাচীন ভারতের প্রথম সার্ব্বভৌম নৃপতি। তিনি খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গ্রীক দিগ্বিজয়ী বীর সেকেন্দরের (Alexander) সমসাময়িক ছিলেন। প্লুটার্ক (Plutarch), জষ্টিন (Justin)

প্রভৃতি বৈদেশীক ইতিহাসকারগণের বিবরণী, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য এবং পুরাণাদি হইতে প্রাপ্ত বিক্ষিপ্ত বিবরণী হইতে চন্দ্রগুপ্তের জীবনী সঙ্কলিত হইল।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া কীর্ত্তিত হন। এই মৌর্য্য কথার উৎপত্তি লইয়া মতভেদ আছে। পুরাণকার এবং অন্যান্য হিন্দু বিবরণীকারদের মতে চন্দ্রগুপ্তের জননী মুরার নাম হইতে মৌর্য্যবংশ খ্যাত হয়। মুরা তৎকালীন নন্দবংশীয় রাজার দাসী ছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য বিবরণী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক কারণ অবগত হওয়া যায়। তৎকালে মোরিয়, মোরি (অথবা গ্রীক মোরিজ) এই নামে এক জাতির উল্লেখ বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সাহিত্যে পাওয়া যায়। এই মোরিয় হইতেই মৌর্য্য শব্দের উৎপত্তি খুবই স্বাভাবিক। মোরিয়রা ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং হিমালয়ের পাদবর্ত্তী পিপ্‌ফলিবনে তাঁহারা বাস করিতেন। তাঁহারা খুব সম্ভব মগধের সামন্ত জাতি ছিলেন। সংস্কৃত মুদ্রারাক্ষস নাটকে চন্দ্রগুপ্তকে বৃষল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে, চন্দ্রগুপ্ত শূদ্র জাতীয় ছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর বিবরণী হইতে জানা যায় যে সেকেন্দরের সহিত চন্দ্রগুপ্তের সাক্ষাৎ হয় এবং সেকেন্দর কোনও কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া চন্দ্রগুপ্তের প্রাণ সংহারের আদেশ দেন। কখন, কিভাবে এবং কেন হঠাৎ চন্দ্রগুপ্ত সেকেন্দরের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তদ্বিষয়ে খুব বিশ্বাসযোগ্য কোনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, সেকেন্দরের মৃত্যুর সংবাদ ভারতে পৌঁছিলে, ভারতীয়েরা বৈদেশিক প্রভুত্বের অবসান করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পান এবং 'সন্দ্র কোট্টস' (Sandra Cottus) নামে একজন বীর পুরুষের অধিনায়কত্বে তাঁহারা ভারত হইতে গ্রীক প্রভুত্বের অবসান করেন। ভারতীয় কাহিনী হইতে জানা যায় যে, তৎকালীন মগধ রাজারা বিশেষ অত্যাচারী ছিলেন এবং তৎফলে প্রজাদিগের মধ্যে বিশেষ অসন্তোষ ও বিদ্রোহভাব বর্ত্তমান ছিল। এই উভয় বিবরণীর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ঐতিহাসিকগণ বলেন, চন্দ্রগুপ্ত হয়ত প্রথমে বিজয়ী গ্রীক সেনাপতি সেকেন্দরের সাহায্যে অত্যাচারী মগধ রাজবংশের ধ্বংস সাধন করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু কোনও কারণে তাহা সম্ভব হয় নাই। অতঃপর, সেকেন্দরের মৃত্যুর পর, পঞ্জাবের স্বাধীনতাকামী লোকেদের সাহায্যে তিনি গ্রীকদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিতে

সমর্থ হন। এই কার্য্যে তক্ষশিলাবাসী চাণক্য কৌটিল্য অথবা বিষ্ণুগুপ্ত নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার সহায় ছিলেন এবং এই চাণক্যের সাহায্যেই তিনি নন্দ-বংশের ধ্বংস সাধন করিয়া, মগধের সম্রাট হন। (চাণক্য দ্রষ্টব্য)।

চন্দ্রগুপ্ত প্রথমে মগধের অধীশ্বর হন। রাজধানীর অপেক্ষাকৃত নিকট-বর্ত্তী কোনও স্থান হইতে বিদ্রোহী হইয়া তিনি সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার সেই চেষ্টা বিফল হওয়ায় পরে, তিনি প্রান্তদেশ হইতে আক্রমণ করেন এবং ক্রমে সমগ্র দেশ অধিকার করেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পাঞ্জাবে উপনীত হন এবং গ্রীকদিগকে বিদূরিত করেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য দক্ষিণে কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তামিল জাতির ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, বর্ত্তমান তিনাভেলী পর্য্যন্ত মৌর্য্য সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তই যে দক্ষিণে এতদূর পর্য্যন্ত অভিযান করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ নিঃসংশয় নহেন। তবে ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে, বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণে সৌরাষ্ট্র পর্য্যন্ত চন্দ্রগুপ্তের অধিকার বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। পুষ্যগুপ্ত নামে একজন বৈশ্য জাতীয় ব্যক্তি সৌরাষ্ট্রে রাজ প্রতিনিধি ছিলেন।

সেকেন্দরের মৃত্যুর পর তাঁহার বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রধান প্রধান সেনাপতি-দেরমধ্যে বিভক্ত হইয়া পরে। তাঁহাদের মধ্যে সেলুকস (Seleukos) প্রধানতঃ ভারতের বাহিরে এসিয়ার অন্যত্র অধি-কৃত স্থানগুলির অধীশ্বর হন। সেলুকস ক্রমে ক্ষমতাশালী হইয়া, ভারত সীমা-নার অন্তর্গত সেকেন্দরের অধিকৃত স্থান-গুলি পুনরধিকর করিবার চেষ্টা করেন। সেই ব্যপদেশে চন্দ্রগুপ্তের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। চন্দ্রগুপ্ত তৎপূর্ব্বেই সমগ্র উত্তর ভারতের একচ্ছত্র অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সুতরাং সেলুকসের সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ঐ সংঘর্ষের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। গ্রীক ইতিহাসকারগণের বিবরণী হইতে ফলাফল মাত্র জানা যায়। সেলুকস খুব সম্ভব পরাজিত হইয়া ভারত জয়ের দুরাশা পরিত্যাগ করেন। সন্ধি স্থাপিত হইলে চন্দ্রগুপ্ত কয়েকটি গ্রীক অধিকৃত প্রদেশ লাভ করেন এবং বিনিময়ে সেলুকসকে পাঁচশত রণহস্তী প্রদান করেন। তদ্ভিন্ন সেলুকসের সহিত চন্দ্রগুপ্তের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই সংশ্রবে অনেকে বলেন চন্দ্রগুপ্ত সেলুকসের কন্যা হেলেনকে বিবাহ করেন। অনেকে তাহা স্বীকার করেন না। তাহার পর হইতে ভারত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সহিত গ্রীক নরপতিদের আর কোনও সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই।

বরঞ্চ তাঁহাদের মধ্যে যে বিশেষ সদ্ভাব বর্ত্তমান ছিল এবং পরস্পর উপহার বিনিময়াদি হইত তাহারও বিবরণ পাওয়া যায়। সেলুকস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থেনিস (Megasthenes) নামে এক দূত প্রেরণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে ছিলেন এবং সেই সময়ে এক বহু তথ্য-পূর্ণ মূল্যবান বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। মেগাস্থেনিসের বিবরণী হইতে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের আয়তন, সৈন্য বাহিনীর বিশালতা, রাজ্য শাসন প্রণালীর উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে অতি মূল্যবান তথ্য অবগত হওয়া যায়। বহু পাশ্চাত্য গ্রন্থকার তাহা হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়া পৃথক পৃথক ভাবে গ্রন্থ রচনা করেন। রাজনীতিক সংবাদ ভিন্ন, দেশের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অনেক মনোরম বিবরণও ঐ পুস্তক হইতে লাভ করা যায়। মেগাস্থেনিসের সকল বিবরণই যদিও নিঃসংশয় রূপে সত্য বলিয়া গৃহীত হয় নাই, তথাপি ঐ সকল বিবরণের গুরুত্ব সম্বন্ধে কেহই কিছুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করেন না।

চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য প্রণীত অর্থশাস্ত্র হইতেও মৌর্য রাজগণের (প্রধানতঃ চন্দ্রগুপ্তের) রাজ্য শাসন প্রণালীরও অতি বিস্তৃত ও মনোরম বিবরণী পাওয়া যায়। চাণক্যের (কৌটিল্যের) অর্থশাস্ত্রে রাজনীতিক, অর্থনীতিক সামাজিক প্রভৃতি সকল বিষয়েই যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং বিস্তৃতভাবে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে যে, তাহা হইতে ইহা স্বতঃই অনুমিত হয় যে, দুই সহস্র বৎসেরও অধিককাল পূর্ব্বে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে লোকে বিশেষ উচ্চ ও উৎকৃষ্ট ব্যবস্থার কথা অবগত ছিলেন।

জৈন সাহিত্য হইতে জানা যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত শেষ জীবনে জৈন মতাবলম্বী হন এবং পুত্র সিংহসেনের হস্তে রাজ্য ভার সমর্পণ পূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যে মহীশূর রাজ্যের শ্রবন বেলগোলা নামক স্থানে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। সেইখানেই তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। এই বিবরণ সর্ব্বজন গৃহীত নয়।

চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য লাভের ও সিংহাসন আরোহণের তারিখ লইয়া মতভেদ আছে। এবিষয়েও বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য, তারানাথের তিব্বতের ইতিহাস, হিন্দু পুরাণ প্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত বিবিধ বিভিন্ন প্রকার সন তারিখাদি লইয়া পণ্ডিতগণের গবেষণা এখনও কিছু সর্ব্বজনমান্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে নাই। চন্দ্রগুপ্ত চব্বিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীর অন্তভাগে স্বর্গারোহণ করেন।

খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীতে রচিত মুদ্রারাক্ষস নাটক হইতে আমরা চন্দ্রগুপ্তের প্রথম জীবনের এবং নন্দবংশের সহিত

তাঁহার সংঘর্ষের অনেক বিবরণ জানিতে পারি। তাহার সকলগুলি সম্পূর্ণ বিশ্বাস যোগ্য না হইলেও, অনেক বিষয় গ্রহণ করা যাইতে পারে। চন্দ্রগুপ্ত নন্দ-বংশীয় সম্রাট ধননন্দের সেনাপতি ছিলেন। কোনও কারণে প্রভুর বিরাগ ভাজন হওয়ায়, তিনি চাণক্যের পরামর্শে বিদ্রোহী হন। তাঁহার বিদ্রোহ সফল না হওয়াতেই, তিনি খুব সম্ভব পঞ্জাবে পলায়ন করেন। সেইখানেই আলেকজাণ্ডারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ সময়ে মগধের নন্দবংশ ভিন্ন আর কোন্ বংশ কোথায় রাজত্ব করিতেন, তাহার খুব সঠিক এবং বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। পঞ্জাবে পুরু ভিন্ন যোগেলাস নামক এক রাজার (অথবা জাতির) নাম পাওয়া যায়। তাঁহার রাজ্য শতদ্রু ও বিপাসার মধ্যবর্ত্তী কোনও স্থানে ছিল। অনেকখানি পূর্ব্ব অংশে প্রসিআই (Prasic) এবং গঙ্গারিদে (Gangaridae) নামক দুইটি পরাক্রান্ত জাতির সংবাদ আলেকজাণ্ডার অবগত ছিলেন। গ্রীক ইতিহাসকারগণের মতে শেষোক্ত স্থানের নরপতি অগ্রামেসের (Agrammes or Xandrames) বিশ সহস্র অশ্বারোহী, দুই লক্ষ পদাতিক, দুই সহস্র রথ এবং তিন সহস্র রণ হস্তী ছিল। তিনি অতি নীচাশয় ও অত্যাচারী রাজা ছিলেন বলিয়াও কথিত হন। এই দুই রাজা ভিন্ন অপর কোনও উল্লেখযোগ্য স্বাধীন নরপতির বিবরণ পাওয়া যায় না। অগ্রমেসকে ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ নন্দবংশেরই একজন রাজা বলিয়া গ্রহণ করেন এবং উগ্রসেনের পুত্র ঔগ্রসৈন্য বলেন। কেহ বা বলেন তাঁহারই ভারতীয় নাম ধননন্দ।

চন্দ্রগোমী—বিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক ও বৈয়াকরণিক। তিনি খুব সম্ভব বারেন্দ্র ভূমির অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার জীবিতকাল লইয়া মতদ্বৈধ থাকিলেও, সাধারণভাবে খ্রীঃ ৮ম শতাব্দীতে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া, ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের নাম ছিল অমর। তিনি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ স্থবির স্থিরমতির নিকট বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, বিদ্যাধর আচার্য্য অশোকের নিকট দীক্ষিত হন। তিনি 'শিষ্যলেখধর্ম্ম' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে শিষ্যের সহিত আলোচনার ফলে বহু দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। 'লোকানন্দ' নামে তিনি একখানি নাটকও রচনা করেন। বর্ত্তমানে কেবল উহার তিব্বতীয় অনুবাদ মাত্র পাওয়া যায়। 'ন্যায়সিদ্ধালোক' নামে তিনি ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থও রচনা করেন। চন্দ্রগোমী স্থবির অসঙ্গের যোগাচার মতাবলম্বী এবং বুদ্ধ অবলোকিতেশ্বর ও

তারা দেবীর উপাসক ছিলেন। তাঁহার অপর মূল্যবান পুস্তক সংস্কৃত ব্যাকরণ। উহা সাধারণতঃ 'চান্দ্র ব্যাকরণ' নামে প্রসিদ্ধ। তৎকালে কাশ্মীর, গান্ধার, নেপাল প্রভৃতি বৌদ্ধ প্রধান প্রদেশ গুলিতে তাঁহার পুস্তক অধীত হইত। প্রাকৃত বৈয়াকরণিক হেমচন্দ্র তাঁহার গ্রন্থে চান্দ্রব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন। জ্ঞানার্জ্জন ও ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশে চন্দ্রগোমী বহু দূরবর্ত্তী স্থান সমূহে ভ্রমণ করেন। তিনি সিংহলেও গমন করিয়াছিলেন। বিখ্যাত বৌদ্ধ জ্ঞানালোচনার কেন্দ্র নালন্দায় তিনি চন্দ্রকীর্ত্তির সহিত পরিচিত হন। চন্দ্রকীর্ত্তি বিশেষ সমারোহের সহিত চন্দ্রগোমীকে সম্বর্দ্ধনা করেন।

চীন পরিব্রাজক ইৎ-সিংএর বর্ণনায় চন্দ্র (গোমীর) বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত ব্যাকরণের বহু টীকা টীপ্পনি রচিত হইয়াছিল। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথের মতে চন্দ্রগোমী বহু গাথা বা স্তোত্র রচনা করেন।

চন্দ্রগোমীকে উপলক্ষ করিয়া ভারতীয় ও তিব্বতীয় সাহিত্যে এবং ইতিহাসে অনেক কাহিনী রচিত হইয়াছে। তাহাদের অধিকাংশেরই ঐতিহাসিক মূল্য বিশেষ নাই। পূর্ব্ববঙ্গের (বাকলার) চন্দ্র রাজবংশীয়দের ইতিহাসে উল্লিখিত চন্দ্রদ্বীপের সহিত চন্দ্রগোমীর নাম বিশেষভাবে জড়িত। অনেকে মনে করেন, চন্দ্রগোমীই প্রথম তথায় বসতি স্থাপন করেন বলিয়া, উহার নাম চন্দ্রদ্বীপ হয়।

অনেকের মতে, চন্দ্রগোমী নামে দুইজন পণ্ডিত ছিলেন। রারেন্দ্র ভূমির অধিবাসী চন্দ্রগোমী এবং নালন্দায় চন্দ্রকীর্ত্তি কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত চন্দ্রগোমী, দুই পৃথক ব্যক্তি। এই সকল পণ্ডিতগণের মতে চান্দ্র ব্যাকরণের রচয়িতাই সিংহল প্রভৃতি দেশে গমন করেন। এ বিষয়ে এখনও আলোচনা চলিতেছে।

চন্দ্র চন্দন—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকার। অষ্টাঙ্গ হৃদয় নামক গ্রন্থের পদার্থ চন্দ্রিকা নামে এক টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

চন্দ্রচূড় আদিত্য—তিনি আসামের একজন বৈষ্ণব কবি।

চন্দ্রচূড় তর্ক চূড়ামণি—তাঁহার জন্মস্থান নদীয়া জিলার অন্তর্গত ব্রহ্মশাসন গ্রাম। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র রাজা গিরীশচন্দ্রের সময়ে (১৮০২—১৮৪২ খ্রীঃ অব্দ) এই নিষ্ঠাবান্ তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ জগদ্ধাত্রী মাতার মূর্ত্তি প্রচার ও তন্ত্র হইতে তাঁহার পূজা পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেন। তৎপরে নদীয়া রাজবংশের চেষ্টায় এই পূজা সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়।

চন্দ্র দত্ত—জ্ঞান লক্ষ্মী বা জয় সংহিতা নামক তন্ত্র গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

চন্দ্র দেব—তিনি গাহড়বাল প্রদেশের

অধিপতি ছিলেন। ১০৯০—১০৯৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন।

চন্দ্রনাথ বসু—লব্ধ প্রতিষ্ঠ বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। ১৮৪০ খ্রীঃ (১২৫১ বঙ্গাব্দ ভাদ্র) মাসে হুগলী জিলার কৈকালা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম সীতানাথ বসু। গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি কিছুকাল কলিকাতার জেনারেল অ্যাসেম্বলী ইনষ্টিটিউশনে (General Assembly Institution ; বর্ত্তমান স্কটিশচার্চ্চ স্কুল) অধ্যয়ন করেন। পরে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ভর্ত্তি হন এবং তথা হইতে ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে অর্থাভাবে তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ প্রায় বন্ধ হইবার মত হয়। সৌভাগ্যক্রমে, অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে, একটি বৃত্তি লাভ করায়, উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। এই স্থানে দেশ বিখ্যাত রাসবিহারী ঘোষ তাঁহার সতীর্থ ছিলেন। এফ্ এ (First Arts) পরীক্ষায় রাসবিহারী প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এবং পরবর্ত্তী বি-এ পরীক্ষায় (১৮৬৫ খ্রীঃ) চন্দ্রনাথ প্রথম ও রাসবিহারী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। পরবর্ত্তী বৎসর এম্-এ পরীক্ষায় ইতিহাসে প্রথম স্থান এবং কৃতীত্বের সহিত আইন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

পাঠ্যাবস্থাতেই বক্তা ও লেখকরূপে চন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে পড়িবার সময়ে তিনি তত্রত্য বিতর্ক সভার (Debating Club) একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। কলেজে পড়িবার সময়ে তিনি কিছুকাল Calcutta University Magazine নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঐ পত্রিকায় তিনি একবার ইতিহাস পাঠের আবশ্যকতা সম্বন্ধে, এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। কলিকাতার তদানীন্তন ইংরেজ সমাজের মুখপত্র, অধুনা লুপ্ত "ইংলিশম্যান" (The Englishman) পত্রিকায় উহার বিশেষ প্রশংসা হয়।

অধ্যয়ন সমাপন করিয়া তিনি কিছুকাল হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার ধারণা জন্মিল যে, আইন ব্যবসায় করিতে গেলে, সকল সময়ে ঠিক বিবেকানুমোদিত কাজ করা চলে না। তজ্জন্য উক্ত ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া, প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করেন। কিন্তু ঐ স্থলেও নিজ বিবেক বুদ্ধি ব্যাহত হওয়ায় এবং কোনও কোনও উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারীর ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, উক্ত পদ পরিত্যাগ

করেন। ঐ কার্য্য ত্যাগ করাতে কিছুকাল তাঁহাকে বিশেষ অর্থ কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

ঐ সময়ে খ্যাতনামা কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জয়পুরের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার পরামর্শে চন্দ্রনাথ, জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিয়া জয়পুর গমন করেন। কিন্তু তথাকার নৈতিক অবস্থা ও জলবায়ু উভয়ই তাঁহার প্রতিকূল হওয়ায়, তিনি অল্পকাল পরেই জয়পুরের কাজ ছাড়িয়া দিলেন।

তাঁহার চরিত্রবল, বিদ্যাবত্তা ও কর্ম্মকুশলতা কর্ত্তৃপক্ষের অজ্ঞাত ছিল না। এই সময়েই বেঙ্গল লাইব্রেরীর কর্ম্মাধ্যক্ষের পদ শূন্য হওয়ায়, ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দের শেষভাগে, তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন এবং কয়েক বৎসর পর রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর, ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালা সরকারের অনুবাদকের (Translator) পদ প্রাপ্ত হন। সুদীর্ঘ সতের বৎসরকাল বিশেষ সুখ্যাতির সহিত কাজ করিয়া ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

চন্দ্রনাথ এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের এক উৎকৃষ্ট ফল। তিনি ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা ও কৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু উগ্র সনাতনী ভাব তাঁহার জীবনে প্রকাশ পায় নাই। ধীর প্রকৃতি, চিন্তাশীল, আদর্শ নৈতিক জীবনের অনুরাগী চন্দ্রনাথ অনেক বিষয়ে বাঙ্গালীর আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। চন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিভাও অতি উচ্চস্তরের ছিল। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলি গভীর ভাবের দ্যোতক। ভাষার প্রাঞ্জলতায় উহা পাঠকের চিত্তাকর্ষক। তাঁহার হৃদয় গভীর ধর্ম্মভাবে পূর্ণ ছিল এবং ভগবানের বিধান যে সর্ব্বদা মঙ্গলময় ইহা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন। তিনি নিম্ন লিখিত বাঙ্গালা পুস্তকগুলি রচনা করেন—ত্রিধারা; পৃথিবীর সুখ দুঃখ; হিন্দুত্ব; সংযম শিক্ষা; সাবিত্রী তত্ত্ব; বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি; কঃপন্থা; বেতালে বহু রহস্য এবং ফুল ও ফল। ইংরাজিতে বঙ্গীয় কৃষকের অবস্থা; অলিভার ক্রমওয়েলের জীবন চরিত। ভারতে উচ্চ শিক্ষা; ইংলণ্ডের ভারত শাসন প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত ক্যালকাটা রিভিউ (Calcutta Review) পত্রিকায় তিনি অনেক মূল্যবান পুস্তকের সমালোচনা করেন।

১৩১৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে (১৯ জুন) এই মনস্বী ইহলোক ত্যাগ করেন।

চন্দ্রনাথ মিত্র, রায় বাহাদুর—তাঁহার জন্মস্থান হুগলী জিলার বলাগড়ের নিকটবর্ত্তী চাঁদড়া গ্রাম। কিন্তু কর্ম্ম স্থান পাঞ্জাব প্রদেশে। ঐ প্রদেশে যে সকল বাঙ্গালী শিক্ষা বিস্তার করে অগ্রণী ছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্য-

তম। সিপাহী বিদ্রোহের দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে পূর্ত্তবিভাগে (Public Works Department) কর্ম্ম লইয়া তিনি লাহোর প্রবাসী হন। তৎপরে তিনি শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করেন। প্রথমে সেণ্ট্রাল মডেল স্কুলের হেড মাষ্টার, পরে গবর্ণমেণ্ট বুক ডিপোর কিউরেটার (Curator) হন। এই কাজ হইতেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পুনরায় পাঞ্জাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৯৮ সালে তিনি রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তিনি পাঞ্জাবে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্য সবিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় ভিক্টোরিয়া বালিকা বিদ্যালয়, পর্দ্দানশীন বালিকা ও মহিলাদের জন্য স্থাপিত হয়। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি লাহোর কালী বাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক ও ওরিয়েণ্টল কলেজ কমিটির সম্পাদক ছিলেন। শিকারপুর ও গুজরানওয়ালা জিলায় তাঁহার বিস্তৃত জমিদারী আছে। গুরু নানকের জন্মস্থান 'নানাকানা সাহেব' তাঁহারই জমিদারীর অন্তর্গত। ১৮৯৯ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহারই জামাতা ছিলেন।

চন্দ্রনারায়ণ—(১) শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত ইটার ব্রাহ্মণ রাজা সুবিদ নারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলমান হওয়ার পর তাঁহার নাম কামাল খাঁ হইয়াছিল।

চন্দ্রনারায়ণ—(২) তিনি পূর্ব্ব কোচ রাজ্যের অধিপতি রাজা রঘুদেবের পৌত্র ও রাজা পরীক্ষিতের পুত্র। তিনি বিজনী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। আহমপতি প্রতাপ সিংহের অধীনে করই বাড়ীর অন্তর্গত হাটশীলা নামক স্থানের সামন্ত নরপতিরূপে তিনি কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।

চন্দ্রনারায়ণ—(৩) পূর্ব্ব কোচপতি মহেন্দ্র নারায়ণের পুত্র ও বলী নারায়ণের পৌত্র। আহম নরপতি উদয়াদিত্য সিংহ তাঁহাকে দরংএর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

চন্দ্রপতি—একজন বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। নারায়ণদেব, কবিবল্লভ দেখ।

চন্দ্রপাল—এই মহাপণ্ডিত, মহামতি শীলভদ্রের সময়ে নালন্দার অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন।

চন্দ্রপ্রভ সূরী—জৈন ধর্ম্মাচার্য্য ও দার্শণিক পণ্ডিত। তিনি খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি 'পূর্ণিমাগচ্ছ' নামক জৈনদের

এক শাখা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার গুরুর নাম জয়সিংহ। ধর্ম্মঘোষ তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তিনি কতিপয় জৈনমত সম্বন্ধীয় দর্শন গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'দর্শন শুদ্ধি' অথবা 'সদ্যক্ত প্রকরণ' 'প্রমেয়রত্ন কোষ' ও 'ন্যায়াবতার বিবৃতি' প্রধান। শেষোক্ত পুস্তকখানি সিদ্ধসেন দিবাকর প্রণীত 'ন্যায়াবতারের' টীকা। তাহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক অনেক বৌদ্ধ আচার্য্যের নাম পাওয়া যায় এবং তৎকাল প্রচলিত চার্ব্বাক, সৌগত, বৈশেষিক, মীমাংসক, সাংখ্য, সৌধদন প্রভৃতি দার্শনিক মত আলোচিত হইয়াছে।

চন্দ্রপ্রভা—তিনি একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত। 'চন্দ্রোন্মীলন' নামক শাকুন গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

চন্দ্রফা—অন্য নাম চন্দ্ররাজ। স্বাধীন ত্রিপুরার অধিপতি মাধবের (কালাতর ফা) পুত্র। চন্দ্র ফা, চন্দ্র হইতে অধস্তন ৮৬তম এবং ত্রিপুর হইতে অধস্তন ৪১শ নরপতি ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র গজেশ্বর রাজপদ লাভ করেন। ত্রিপুর দেখ।

চন্দ্রবর্ম্মা—(১) মালবের বর্ম্মরাজবংশীয় নৃপতি। তাঁহার পিতার নাম সিংহবর্ম্মা। গুপ্তবংশীয় প্রথম সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত অথবা তাঁহার পিতা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলে, চন্দ্রবর্ম্মার নিকট পরাজিত হন। পরে সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রবর্ম্মাকে পরাজয় করিয়া তাঁহার ভ্রাতাকে সিংহাসন প্রদান করেন। চন্দ্রবর্ম্মা বঙ্গদেশেও অভিযান করেন : ফলাফল নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। তিনি বিষ্ণুপদ পর্ব্বতে লৌহনির্ম্মিত বিষ্ণুধ্বজ স্থাপন করেন।

চন্দ্রবর্ম্মা—রাজপুতানার মরুপ্রদেশের পুষ্করণা নগরের অধিপতি চন্দ্রবর্ম্মা ৪০৫ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম সিংহবর্ম্মা ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম নরবর্ম্মা। তিনি সিন্ধু নদীর মুখ ও বাহলীক দেশ হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। নরবর্ম্মার পৌত্র বন্ধু বর্ম্মা ৪৩৭ খ্রীঃ অব্দে, মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমার গুপ্তের রাজত্বকালে, মালবদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। প্রাচীন দশপুরে

জয়বর্ম্মা

সিংহবর্ম্মা

চন্দ্রবর্ম্মা — নরবর্ম্মা
বি-সং-৪৬১ খ্রীঃ ৪০৫

বিশ্ববর্ম্মা
বি-সং-৪৮০ খ্রীঃ-৪২৪

বন্ধুবর্ম্মা
বি-সং-৪৯৩, খ্রীঃ-৪৩৭
বি-সং-৫২৯, খ্রীঃ—৪৭২

(বর্ত্তমান মন্দশোর) ও বাকুড়া জিলার

অন্তর্গত শুশুনিয়া পর্ব্বতগাত্রে আবিস্কৃত শিলালিপি হইতে এই বংশের রাজাদের বংশাবলী দেওয়া গেল।— উপরে দেখ

চন্দ্রভান—পাতিয়ালার একজন ব্রাহ্মণ কবি। তিনি পারসী ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সম্রাট শাজাহানের পুত্র দারা শেকোর অধীনে তিনি কিছুকাল কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রভুর পরলোক প্রাপ্তির পরে তিনি কাশিতে আগমন করেন এবং তথায় ১৬৬২ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

চন্দ্রভারতী— খ্যাতনামা আসামী কবি। তাঁহার প্রকৃত নাম হরিচরণ। অনন্ত কন্দলি নামেও তিনি পরিচিত। তিনি আসামী ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। তাঁহাকে আসামের কৃত্তীবাস বলা হয়।

চন্দ্রমাধব ঘোষ, সার—খ্যাতনামা বাঙ্গালী বিচারপতি। ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে (১২৪৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন) তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুর। তাঁহারা বঙ্গজ কায়স্থ। তাঁহার পিতা দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ শাসন বিভাগের উচ্চপদাভিষিক্ত ছিলেন।

কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে থাকিবার সময়ে, তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। ১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন। কৌলিক প্রথানুযায়ী এগার বৎসর বয়সে টাকীর জমীদার কালীশঙ্কর চৌধুরীর কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

চন্দ্রমাধবের বাল্যাবস্থায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তজ্জন্য তিনি প্রথমে বিশেষ কৃতীত্বের সহিত জুনিয়ার স্কলারশিপ (Junior Scholarship) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত হয় এবং চন্দ্রমাধব সেই শিক্ষায়তন হইতে পরবর্ত্তী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। কিন্তু গণিত শাস্ত্রে তাদৃশ অধিকার না থাকায়, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও বিশেষ কৃতীত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন বিভাগে প্রবেশ করেন। পরবর্ত্তী বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। চন্দ্রমাধব প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, বর্দ্ধমানে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং ছয় মাসের মধ্যেই সরকারী উকিলের পদ লাভ করেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি সদর দেওয়ানী আদালতের অন্যতম উকিল হন।

১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে, চন্দ্রমাধব তথায় আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। দ্বারকা-

নাথ মিত্র, অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীনাথ দাস প্রভৃতি তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন বিভাগের অন্যতম অধ্যাপকও নিযুক্ত হন। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি বিচার-পতির পদ লাভ করেন এবং ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে অবসর গ্রহণ করেন। মধ্যে কয়েক মাস অস্থায়ী-ভাবে প্রধান বিচারপতির কাজও করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনো-নীত হইয়াছিলেন। অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে তিনি 'সার' (Knight) উপাধি প্রাপ্ত হন।

দেশের নানাবিধ জনহিতকর কাজের সহিতও তাঁহার যোগ ছিল। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য (Fellow) ও উহার আইন বিভাগীয় মন্ত্রণা সভার অধ্যক্ষ (Dean) হইয়া ছিলেন। বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান সোপানাবলীর মধ্যভাগে তাঁহার মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

১৯২৮ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে (১৩৩৫ বঙ্গাব্দের মাঘ) কলিকাতা নগরে তাঁহার দেহান্ত হয়।

চন্দ্রমুখ বর্ম্মা—তিনি আসামের প্রাগ-জ্যোতিষপুরের পুষ্যবংশীয় নরপতি মহাভূত বর্ম্মার পরে, রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার রাণীর নাম ভগবতী দেবী ছিল। তাঁহার পরে স্থিতবর্ম্মা রাজা হন। পুষ্যবর্ম্মা দেখ।

চন্দ্রমুখী—বারেন্দ্র কুল পঞ্জিকায় লিখিত আছে যে, কান্যকুব্জপতি চন্দ্রকেতুর কন্যা চন্দ্রমুখী বঙ্গের শ্রেষ্ঠ নরপতি আদিশূরের মহিষী ছিলেন। আদিশূর তাঁহারই চন্দ্রায়ণ ব্রত সম্পাদনার্থ কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন বেদাবিদ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ণ করিয়াছিলেন। আদিশূর দেখ।

চন্দ্ররাজ—তিনি কাশ্মীরপতি হর্ষ-দেবের (১০৮৯—১১০২ খ্রীঃ) একজন বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিলেন। রাজার জ্ঞাতি মল্লদেবের পুত্র উচ্চল ও সুস্সল কাশ্মীর সিংহাসন লাভে উদ্যোগী হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিলে, রাজার অনেক প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী বিদ্রোহী-দের পক্ষ অবলম্বন করেন। কিন্তু চন্দ্ররাজ প্রভৃতি বিশ্বস্ত মন্ত্রীরা কখনও রাজাকে পরিত্যাগ করেন নাই। মল্লদেব, চন্দ্ররাজ, ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি বিশ্বস্ত সেনাপতিরা যুদ্ধে নিহত হন।

চন্দ্র লেখা—কাশ্মীরের সামন্ত নর-পতি নাগরাজ সুশ্রবার দ্বিতীয়া কন্যা চন্দ্র লেখাকে বিশাখ নামে এক ব্রাহ্মণ কুমার বিবাহ করিয়াছিলেন। এই রূপবতী কন্যাকে কাশ্মীরপতি নর (অন্য নাম কিন্নর) কৌশলে হস্তগত করিতে

অসমর্থ হইয়া, বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া সসৈন্যে তাঁহার আলয় আক্রমণ করেন। বিশাখ পূর্ব্বেই ইহা অবগত হইয়া স্বীয় শ্বশুর সুশ্রবার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। নাগরাজ সুশ্রবা এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য নরপতি নরের কিন্নর নগরী ধ্বংশ করেন এবং পরে নরপতি নরকেও বিনষ্ট করেন।

চন্দ্রশেখর—একজন সংস্কৃত বৈয়াকরণিক। তিনি 'বৃত্তি-মৌক্তিক' এবং 'পিঙ্গল ছন্দঃসূত্র টীকা' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৬৭৬ শকাব্দে তাঁহার গ্রন্থ রচিত হয় বলিয়া, পণ্ডিতগণ অনুমান করেন।

চন্দ্রশেখর কর—যশোহর জিলার উপবিভাগে মির্জাপুর গ্রামে ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে (১২৬৮ সালে) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে পিতৃহীন হন। গুণবতী মায়ের যত্নে তিনি লেখাপড়া শিক্ষা করেন। ১২৮৮ সালে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২০৲ টাকা বৃত্তি পান। ১২৯০ সালে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হন। তিনি পাঠ্যাবস্থায় বাঙ্গালা ভাষায় 'শারদাবকাশ' নামক একখানা যুক্তাক্ষর বিহীন কবিতা পুস্তক প্রণয়ন করেন। তৎপরে তিনি অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহার রচনায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। অনাথ বালক, সুরবালা, সৎকথা, ছ আনাজ, পাপের পরিণাম প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচিত। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। কৃষ্ণনগরেই তিনি স্থায়ী অধিবাসী হইয়াছিলেন।

চন্দ্রশেখর ঘোষ, দেওয়ান—মেদিনীপুরের অন্তর্গত ধারেন্দার রাজবংশের দৌহিত্রবংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতামহ নন্দকিশোর ঘোষ উক্ত রাজবংশে বিবাহ করিয়া নদীয়ার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর হইতে আসিয়া তথায় বাস করেন। তিনি ১৭৬৭ খ্রীঃ অব্দে ধারেন্দার রাজা কার্ত্তিকরাম পালের সহিত মেদিনীপুরের জঙ্গল প্রদেশের বিদ্রোহ দমনে লেঃ ফারগুসান সাহেবকে (Lieut. Ferguson) সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি সহকারী সেনাপতি ছিলেন। বিখ্যাত দাতা বলিয়াও তিনি পরিচিত ছিলেন। মেদিনীপুর অঞ্চলে 'দাতাচন্দু' (চন্দ্রশেখর) বলিয়া একটী প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। কথিত আছে তিনি একবার একলক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজণ করাইয়াছিলেন।

চন্দ্রশেখর দাস—একজন যাত্রাওয়ালা। বাঙ্গালা দেশে যাত্রা এক অপূর্ব্ব জিনিষ। পৃথিবীর আর কোনও দেশে, কোনও সমাজে এই শ্রেণীর লোকশিক্ষাকর বিশুদ্ধ

আনন্দ দা.ক প্রণালী নাই। এই যাত্রার বলে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের বহুল উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বৈষ্ণবকুলতিলক এই চন্দ্রশেখর দাস বাঙ্গালা দেশে যাত্রার স্রষ্টা। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে যাত্রা ছিল না। চন্দ্রশেখর অদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য এবং জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার রচিত প্রথম যাত্রার পালার নাম 'হরবিলাস' তদনন্তর তাঁহার পালার সংখ্যা বাড়িয়া গেলে যাত্রাটী 'শেখরী যাত্রা' বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। তাঁহার শিষ্য জগদানন্দ হরিবিলাস পালায় 'রাই' সাজিতেন।

চন্দ্রশেখর পট্টনায়ক—তিনি ভাস্কর কৃত লীলাবতীর উপর উদাহরণ নামক এক টীকা রচনা করিয়াছেন।

চন্দ্রশেখর বসু—নদীয়া জিলার অন্তর্গত উলা বা বীরনগর গ্রামে বিখ্যাত জমিদার মিত্র মুস্তোফীদের দৌহিত্র বংশে ১১৪০ বঙ্গাব্দে (১৮৩৩ খ্রীঃ) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালিদাস বসু। তিনি একজন ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুরাগী বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত কতিপয় অতি সুচিন্তিত ও সুলিখিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রহিয়াছে। তন্মধ্যে 'প্রলয় তত্ত্ব,' 'পরলোকতত্ত্ব,' 'সৃষ্টি তত্ত্ব,' 'বেদান্তদর্শন' 'বেদান্তপ্রবেশ,' হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ,' 'অধিকারতত্ত্ব,' 'মানবকাব্য' ও 'বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি' প্রভৃতি প্রধান। এককালে বিজ্ঞজন সমাজে এই সকল গ্রন্থের খুব আদর ছিল। তাঁহার সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র শশিশেখর, দ্বিতীয় পুত্র রাজশেখর, চতুর্থ পুত্র গিরীন্দ্রশেখর, পৌত্র মৃগাঙ্ক ভূষণ প্রভৃতি বঙ্গ সমাজে সুপরিচিত।

চন্দ্রশেখর বাচস্পতি— নবদ্বীপের প্রধান স্মৃতির পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌমের পর তিনি প্রধান স্মৃতির পণ্ডিত ছিলেন। স্মৃতি প্রদীপ, স্মৃতিসার সংগ্রহ, সঙ্কল্প দুর্গ ভঞ্জন, ধর্ম্মবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার গভীর স্মৃতি শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচায়ক।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়— ১২৫৬ বঙ্গাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন বাহির করিলে, যে কয়জন তরুণ বয়স্ক ব্যক্তি তাঁহার আকর্ষণে সাহিত্য চর্চ্চা আরম্ভ করেন, চন্দ্রশেখর তাঁহাদের অন্যতম। সেই সময়ে ইংরেজী শিক্ষিত লোকদের মধ্যে অধিকাংশ স্বাধীন চিন্তাশীল (Free Thinker) ছিলেন। তাঁহারা জন ষ্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill), হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbart Spencer) প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের বই খুব অধ্যয়ন করিতেন। সেই সময়ে তাঁহারা ইংরেজ মনীষি কারলাইল, (Thomas Carlyle) জার্ম্মাণ কবি গেটের (Goethe) ইংরেজী অনুবাদ খুব অধ্যয়ন করিতেন। চন্দ্রশেখরও

তাঁহাদের প্রভাবাধীন হইয়া সেই সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই সময়েই বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীরও কিছু কিছু আলোচনা আরম্ভ হয়। তিনি পদাবলী সাহিত্যে খুব আকৃষ্ট হন। বৈষ্ণব সাহিত্যের আদর্শে তিনি তাঁহার রচনাকে 'মধুর-কোমল-কান্ত' করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি বি, এ, পাশ করিয়া পুটিয়া স্কুলে হেড্ মাষ্টারের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই স্থানেই তাঁহার পত্নী বিয়োগ হয়। এই সময়েই তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' রচিত হয়। তৎপরে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহরমপুরেই ওকালতী করেন। এই স্থানেই তিনি ১৩২৯ সালে পরলোক গমন করেন।

চন্দ্রশেখর সিংহ—কটক হইতে প্রায় ত্রিশ ক্রোশ পশ্চিমে খণ্ডপাড়া নামে একটী দেশীয় করদ রাজ্য আছে। নৃসিংহ মর্দরাজ ভ্রমরবর রায় সেই রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার পুরুষোত্তম ও শ্যামবন্ধু নামে দুই পুত্র ছিল। পুরুষোত্তম জ্যেষ্ঠ বিধায় রাজ্যের নিয়মানুসারে রাজা হন। শ্যামবন্ধু সামন্তশ্রেণী ভুক্ত হন। চন্দ্রশেখর এই শ্যামবন্ধুর পুত্র। বর্ত্তমান রাজা নটবর ভ্রমরবর রায়ের পিতৃব্য। রাজবংশীয় বলিয়া তাঁহার উপাধি সামন্ত। কিন্তু উড়িষ্যায় তিনি 'পাঠানি সান্ত' বলিয়া পরিচিত। শৈশবে তাঁহার মাতাপিত তাঁহাকে 'পাঠান বা পাঠানী সামন্ত বলিয়া ডাকিতেন। তাহাই অপভ্রংশ হইয়া 'পাঠানী সান্ত' হইয়াছে। বাল্যকালে চন্দ্রশেখর স্বীয় পিতৃব্যের নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁহার পিতৃব্য কিছু কিছু ফলিত জ্যোতিষ জানিতেন। তাঁহারই নিকট তিনি জ্যোতিষের লগ্ন, নক্ষত্র ইত্যাদি কিছু কিছু শিক্ষা করিয়া, দশ বার বৎসর বয়সেই সেইগুলি আকাশে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে প্রয়াসী হন। বালক চন্দ্রশেখর দেখিলেন যে, গণনায় যে রাশির যে উদয়কাল আসে ঠিক সেই সময়ে সেই রাশির উদয় হয় না; ইহা হইতে তাঁহার জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়নের অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। প্রতি রাত্রে তিনি আকাশে গ্রহ নক্ষত্রের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন যে গণনার সহিত তাহাদের অবস্থানের মিল হয় না। দেশে তখন এমন কেহ জ্যোতিষী ছিলেন না যে, তাঁহার নিকটে হইতে ইহার কারণ জানিয়া লইবেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্যোতিষানুরাগও বৃদ্ধি পাইল। গৃহস্থিত সিদ্ধান্ত শিরোমণি ও সূর্য্য সিদ্ধান্ত টীকার সাহায্যে অধ্যয়ন করিয়া ফেলিলেন। উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত দুই একটী যন্ত্র স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়া, তাঁহার সাহায্যে আকাশের গ্রহ নক্ষত্র বেধ করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর মধ্যে তাঁহার

'সিদ্ধান্ত দর্পণ' নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইল। তৎকালে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিত্য পূজার কালবোধক পঞ্জিকা এক খড়িরত্নদ্বারা (গণক) গণিত হইত। তাহা পুরাতন সারণী অবলম্বনে গণিত হইত বলিয়া, ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ ছিল; একেবারেই দৃক্‌সিদ্ধ ছিল না। চন্দ্রশেখর তদ্দর্শনে ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহার সংস্কার করিবার জন্য তিনি কৃতসংকল্প হইলেন। অনেক চেষ্টার পর পুরীর মন্দিরে জ্যোতিষী ও অপর পণ্ডিতদের এক সভা আহূত হইল। তাঁহাদের অনুমতি পাইয়া পাঠানি সামন্ত (চন্দ্রশেখর সিংহ) গ্রহ ও তিথ্যাদি গণনায় খড়িরত্নের উপদেষ্টা হইলেন। ক্রমে তাঁহারই গণিত পঞ্জিকা উড়িষ্যার একমাত্র পঞ্জিকা হইল। এইরূপে পঞ্জিকার সংস্কার করিয়া তাঁহার বহুকালের গগন পরিদর্শনের ফল সার্থক করিলেন। কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়া থাকেন, আমাদের পূজনীয় পিতৃপিতামহগণ জ্যোতিষের ন্যায় ব্যাবহারিক বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন না। পাঠানি সামন্তের কৃতকার্য্যতায় এই অপবাদ দূরীভূত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর সিংহ ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত 'সিদ্ধান্ত দর্পণ' ১৮১৪ শকে (১৮৯২ খ্রীঃ) মুদ্রিত হয়।

চন্দ্রশেখর সেন—১৮৫১ খ্রীঃ অব্দের ১৪ই আগষ্ট মালদহ জিলার বৈদ্যবংশীয় হরিমোহন সেনের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার মাতা কুমারিকা হইতে বদ্রিনাথ পর্য্যন্ত সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। মাতার সেই ভ্রমণানুরাগ পুত্রেও সংক্রামিত হইয়াছিল। তাঁহারই ফলে চন্দ্রশেখরের প্রসিদ্ধ 'ভূপ্রদক্ষিণ' গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি।

চন্দ্রশেখর স্কুলের শিক্ষা বেশী লাভ করিতে পারেন নাই। প্রথম জীবনে স্কুল ছাড়িয়া তিনি মালদহ নগরেই শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু কিছুকাল পরেই চাকরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতায় আসিয়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন। কলেজের পাঠ শেষ না হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি আসাম সীমান্তে মেডিক্যাল অফিসারের কাজ প্রাপ্ত হন। এখানে কিছুদিন চাকুরী করিয়া, কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া তিনি বিলাতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিতে গমন করেন। ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া তিনি দেশভ্রমণে বহির্গত হন (১৮৮৯ সালে)। এসিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রসিদ্ধ স্থানগুলি তিনি ভ্রমণ করিয়া তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ ভূপ্রদক্ষিণ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ।

চন্দ্রসিংহ নারায়ণ—তিনি ত্রিপুরার মহারাজ উদয় মাণিক্যের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। তিনি কোনও যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া 'চন্দ্রদর্প' নামক গৌরবজনক উপাধি লাভ করিয়া-

ছিলেন। মুঘল বাহিনীর সহিত চট্টগ্রামের যুদ্ধে তিনি সেনাপতি রঙ্গ নারায়ণের (রণাগণ নারায়ণ) সহকারী ছিলেন।

চন্দ্র সূরী—তিনি প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য বজ্রসেনের প্রধান শিষ্য ছিলেন। তিনি কড়িগচ্ছ সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু উক্ত সম্প্রদায় নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহারই নামে চন্দ্রগচ্ছ সম্প্রদায় নামে কথিত হইতে আরম্ভ হয়।

চন্দ্র সেন—(১) মারবারের (যোধপুর) রাজা মালব দেবের দ্বিতীয় পুত্র তাঁহার মাতা ঝালাবংশীয় রাজকন্যা ছিলেন। মালব দেব নানা ঘটনায় বিব্রত হইয়া মুঘল সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তিনি বহু মূল্য উপহারসহ স্বীয় দ্বিতীয় পুত্র চন্দ্র-সেনকে মুঘল দরবারে প্রেরণ করেন। ইহাতে সম্রাট আকবর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার রাজ্য বিকানীরপতি রায় সিংহকে প্রদান করিতে আদেশ দিলেন। অচিরে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। প্রথমে জয় লাভ করিলেও পরিণামে যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি শয়ন করিলেন। উগ্রসেন, ঐশকর্ণ ও রায় সিংহ নামে তাঁহার তিন পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ উগ্রসেন বিনাই নামক স্থানের প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

চন্দ্র সেন—(২) বারেন্দ্র কুলপঞ্জী মতে তিনি আদিশূরের বংশধর। আদিশূরের পরে তদ্বংশীয় লাউ সেন (লব সেন), নবজ সেন ও চন্দ্র সেন একশত ছাব্বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। চন্দ্র সেনের পুত্র ছিল না। এক মাত্র কন্যা প্রভা-বতীকে বিজয় সেন বিবাহ করেন। এই বিজয় সেনেরই পুত্র বল্লাল সেন, রাম-পাল নগরে ১০৩৩ শকে (১১১১ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন। বল্লাল মাতামহ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

চন্দ্র সেন—(৩) তিনি একজন আয়ু-র্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। 'রসোচন্দ্রোদয়' নামক আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

চন্দ্রাট—চিকিৎসা কালিকা প্রণেতা প্রসিদ্ধ ত্রিশটাচার্য্যের পুত্র চন্দ্রাট। চন্দ্রাট স্বীয় পিতার রচিত গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নানা গ্রন্থ হইতে সার উদ্ধার করিয়া 'যোগরত্ন সমুচ্চয়' নামে একখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। চন্দ্রাট সারোদ্ধার, বৈদ্য ত্রিংশটিকা, সুশ্রুত পাটশুদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থও তাঁহার রচিত।

চন্দ্রাদিত্য—চালুক্যবংশীয় রাজ-চক্রবর্ত্তী সম্রাট দ্বিতীয় পুলকেশীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। পল্লববংশীয় নরসিংহ বর্ম্মা চালুক্য রাজধানী বাদামী আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিলে, তিনি বেঙ্গিতে যাইয়া রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহা হইতে চালুক্য-বংশের আর এক শাখা উদ্ভূত হয়। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রথম বিক্রমাদিত্য চালুক্যবংশের পূর্ব্ব গৌরব কতক উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পুলকেশী (১ম ও ২য়) দেখ।

চন্দ্রাপীড়—তিনি কাশ্মীরের অধিপতি দ্বিতীয় প্রতাপাদিত্যের (৬৩৭—৬৮৭ খ্রীঃ) জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার মাতার নাম নরেন্দ্র প্রভা। এই রমণী পূর্ব্বে নোণ নামক এক বণিকের পত্নী ছিলেন। রাজা এই রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছেন জানিয়া, বণিক স্বইচ্ছায় তাঁহাকে রাজা প্রতাপাদিত্যের করে সমর্পণ করেন। নরেন্দ্র প্রভার গর্ভে চন্দ্রাপীড়, তারাপীড়, ও মুক্তাপীড় নামে তিন পুত্র জন্মে। রাজা ও রাণীর সদ্ব্যবহারে লোকেরা তাঁহাদের এই সমাজ বিরুদ্ধ অন্যায় কার্য্যের বিষয় ভুলিয়া গিয়াছিল। বাস্তবিক চন্দ্রাপীড় অতি উচ্চ হৃদয়বান নরপতি ছিলেন। একবার তাঁহার কর্ম্মচারীরা দেব মন্দির নির্ম্মাণার্থ এক চর্ম্মকারের বাস্তভিটা গ্রহণ উদ্যত হইয়াছিলেন। চর্ম্মকার দিতে অসম্মত হয়। রাজা ইহা জানিতে পারিয়া কর্ম্মচারীদিগকে তিরস্কার করেন। পরে রাজা সেই স্থান স্বয়ং প্রার্থনা করিলে, চর্ম্মকার সন্তুষ্ট চিত্তে তাহা প্রদান করিয়াছিল। চন্দ্রাপীড়ের ভ্রাতা তারাপীড়ের পরামর্শে এক ব্যক্তি চন্দ্রাপীড়কে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল। সেই ব্যক্তি ধৃত হইয়া রাজসমীপে নীত হইলে, মৃত্যু শয্যায় শায়িত নরপতি চন্দ্রাপীড় বলিলেন—ইহাকে ছাড়িয়া দেও, সে পরের প্ররোচনায় ইহা করিয়াছে। এই উন্নতমনা রাজাকে তাঁহার ভ্রাতা তারাপীড় হত্যা করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। চন্দ্রাপীড় প্রায় নয় বৎসর রাজত্ব করেন।

চন্দ্রাবতী—(১) এই মহিলা কবির জন্ম স্থান পূর্ব্ব ময়মনসিংহে। তাঁহার পিতার নাম বংশীদাস ভট্টাচার্য্য ও মাতার নাম সুলোচনা দেবী। তাঁহার পিতা একজন কবি ছিলেন। কন্যা পিতৃগুণ সম্পূর্ণই পাইয়াছিলেন। তাঁহার জীবন কাহিনী অতি বিষাদময়। চন্দ্রাবতী যে পাঠশালায় পড়িত সেই পাঠশালায় জয়চন্দ্র নামে এক ব্রাহ্মণ যুবকও অধ্যয়ন করিত। উভয়েই কবিতা লিখিতে পারিত, ক্রমে উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হয়। উভয় পক্ষেরই পিতামাতা তাঁহাদের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। এমন সময়ে জয়চন্দ্র এক মুসলমান যুবতীর প্রণয়ে পড়িয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। চন্দ্রাবতী আর বিবাহ না করিয়া, চির কুমারী রহিলেন। পিতা তাঁহার জন্য এক শিব মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। চন্দ্রাবতী সেই অবধি শিবারাধনায় জীবন অতিবাহিত করেন। জয়চন্দ্র পরে অনুতপ্ত হইয়া চন্দ্রাবতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার নিকট পত্র দেন। কিন্তু তিনি পত্রের উত্তরে সাক্ষাতের অসম্মতি জানাইলেন। তৎপরে জয়চন্দ্র একদিন উন্মত্তের ন্যায় পাটুয়ারী গ্রামে শিব মন্দির প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু

চন্দ্রাবতী মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন না। জয়চন্দ্র রক্তবর্ণ ফুল নির্য্যাসে মন্দিরের গাত্রে একটী কবিতা লিখিয়া মনের দুঃখে প্রান্তবাহী ফুলেশ্বরী নদীতে ঝম্ফ প্রদানপূর্ব্বক আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। ইহার অত্যল্পকাল পরেই একদিন চন্দ্রাবতী শিবারাধনা করিতে যাইয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন এবং সেই মূর্চ্ছা আর ভঙ্গ হইল না। এই মহিলা কবির জীবন অকালে পর্য্যবসান হইল। চন্দ্রাবতী সংগীতের আকারে সমস্ত রামায়ণ রচনা করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন কিন্তু মৃত্যু তাহা সম্পন্ন করিতে দেয় নাই। তাঁহার রচিত মনসা দেবীর গান, মলুয়া, কেনারাম প্রভৃতি সুপরিচিত। তাঁহার পিতার রচিত মনসার ভাসান গ্রন্থের কোন কোন স্থান তাঁহার রচিত।

চন্দ্রিকা দেবী—তিনি উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নরপতি প্রথম নরসিংহের ভগিনী ছিলেন। হৈহয় বংশীয় পরমার্দ্দীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পরমার্দ্দী নরসিংহের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। বাঙ্গালার মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি সমর সজ্জায় শয়ন করেন। ১২৭৮ খ্রীঃ অব্দে চন্দ্রিকা দেবী ভুবনেশ্বরে একটী বিষ্ণু মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

চমরাজেন্দ্র উদিয়ার, মহারাজা, সার—তিনি মহীশূর রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। মহীশূরের রাজা কৃষ্ণরাজ উদিয়ার তাঁহাকে পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। কৃষ্ণরাজের ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে মৃত্যু হইলে, তিনি রাজা হইয়াছিলেন। তিনি একজন ইংরেজ শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তিনি একজন উন্নতমনা রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে রাজ্যের আয় অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দের ২৭শে ডিসেম্বর তিনি কলিকাতা নগরে প্রাণত্যাগ করেন। তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণরাজ ১৮৯৫ সালে রাজা হন।

চম্প—তিনি মারবারের (যোধপুরের) অধিপতি রণমল্লের তৃতীয় পুত্র। তাহা হইতেই চম্পাবৎ বংশের উদ্ভব হইয়াছে। আহবা, কেটো, পালরি, হরশোল, রোহিত, জাবুল, খুলতান ও শিঙ্গারি নামক স্থান তাঁহার ভূমি বৃত্তি ছিল। তিনি যোধপুরের একজন প্রধান সামন্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা রাজস্থানে বহু বিস্তৃত হইয়াছে।

চম্পক—কাশ্মীরপতি হর্ষদেবের (১০৮৯—১১০২ খ্রীঃ) তিনি একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। প্রতি বৎসর নন্দীক্ষেত্রে সাতদিবস যাপন করিয়া সম্বৎসরের উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ তিনি দান করিতেন। ভারতীয় সভ্যতায় সমাজ সেবার ইহা এক আদর্শ।

চম্পতি ঠাকুর—একজন পদকর্ত্তা। তাঁহার ১৩টী পদ পাওয়া গিয়াছে।

চম্পৎ রায়—তিনি বুন্দেল খণ্ডের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র প্রদেশের রাজা ছিলেন। সেই সময়ে ঐ প্রদেশ মুঘল রাজ্য ভুক্ত ছিল। তিনি স্বদেশকে স্বাধীন করিবার জন্য মুঘল সম্রাট শাজাহানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে যখন সম্রাটের পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন তিনি আওরঙ্গজীবের পক্ষাবলম্বন করিয়া বার হাজারী মনসবদার হইয়াছিলেন। কিন্তু আওরঙ্গজীবের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তিনি তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে বাধ্য হন। তিনি ১৬৬৪ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র প্রসিদ্ধ ছত্রশাল বুন্দেল খণ্ডের স্বাধীন রাজা ছিলেন।

চম্পারাম জী—তিনি দাদুর একজন বিখ্যাত শিষ্য। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—দৃষ্টান্ত সংগ্রহ। তিনি যেমন ভক্ত তেমনি খুব বিদ্বান্‌ও ছিলেন।

চয়চাগ রায়—স্বাধীন ত্রিপুরাপতি ধন্যমাণিক্যের (১৪৯০—১৫২০ খ্রীঃ) তিনি প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ধন্য-মাণিক্যের সহিত বাঙ্গালার নবাব হোশেন শাহের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই সকল যুদ্ধেই সেনাপতি চয়চাগ রায় মুসলমান সৈন্যকে পরাজিত করেন। কেবল তাহাই নহে, এই বীর সেনাপতি চট্টগ্রাম হইতে মগ-দিগকে তাড়াইয়া আরাকানের কিয়দংশ ত্রিপুরা রাজ্যভুক্ত করেন। তাঁহার পরাক্রমে পার্ব্বত্য কুকিরা সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হইয়াছিল।

চরক—একজন প্রাচীন অয়ুর্ব্বেদা-চার্য্য। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম চরক সংহিতা। চরকের মতে আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদেরই শাখা অথবা অনুসৃত। 'ভাব প্রকাশ' নামক অপর প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ মতে আচার্য্য চরক অগ্নি-বেশাদি মুনি রচিত তন্ত্র সকলের সংস্কার করিয়া তাহাদের সার ভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক চরক সংহিতা প্রণয়ন করেন। উক্ত সংহিতা আট ভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি ভাগ এক একটি 'স্থান' নামে পরিচিত। চরক মুনি পুরুষপুরে (বর্ত্তমান পেশোয়ার) থাকিতেন এবং তিনি সম্রাট কনিষ্কের রাজবৈদ্য ছিলেন।

পাণিনি সূত্রে, মহাভারতে এবং আরও কোনও কোনও প্রাচীন গ্রন্থে চরক নাম দৃষ্ট হওয়ায় পণ্ডিতগণ অনু-মান করেন যে, চরক তাঁহার প্রকৃত নাম নয়, উপাধি মাত্র। প্রথমে চরক নামে (অথবা উপাধিধারী) কোনও আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য একখানি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন এবং পরবর্ত্তী চরক তাহার সংস্কার সাধন করেন। চরক সংহিতা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, সেই যুগে আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ সংস্কৃত ভাষার সাহায্যেই শিক্ষাদান করিতেন।

কাহারও কাহারও মতে যজুর্ব্বেদের

এক শাখার নাম চরক এবং যজুর্ব্বেদীয় ঐ শাখার ব্যাখ্যাতৃগণ চরক নামে পরিচিত ছিলেন। চরক সংহিতা প্রধানতঃ চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ হইলেও উহাতে মেধাতিথি গৌতমের আন্বিক্ষিকী মতও আলোচিত হইয়াছে। বৈশেষিক মতেরও অনেক বিষয় উহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই জন্য অনেকে চরক সংহিতাকে ঠিক আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ বলিতে সম্মত নহেন।

পুনর্ব্বসু আত্রেয়, অনেকের মতে, চরক সংহিতা অথবা ঐ শ্রেণীর একখানি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ রচনা করেন। পরে 'চরক' নামধেয় পণ্ডিত মণ্ডলীর কেহ উহার সংস্কার সাধন করেন। চরক, ও তন্নামীয় সংহিতাকে উপলক্ষ করিয়া এইরূপ বিভিন্ন মতই প্রচারিত আছে।

চরৎসিংহ—তিনি পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের পিতামহ ও সুকুর চকিয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধ সিংহের পৌত্র ও লোধ সিংহের পুত্র। ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দে চারিটী পুত্র রাখিয়া লোধ সিংহ পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে চরৎসিংহ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মাত্র দেড় শত অশ্বারোহী অনুচর সংগ্রহ করিয়া গুজরাণওয়ালা প্রদেশের অনেকগুলি গ্রাম অধিকার করেন। ঐ প্রদেশের প্রতাপশালী সর্দ্দার অমর সিংহের কন্যা দেশানকে তিনি বিবাহ করেন। ইহাতে তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল। ১৭৫৭ সালে তিনি একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। এই সময়ে মুসলমানেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াও কিছু করিতে পারে নাই। তাঁহার শৌর্য্য বলে সুকুর চকিয়া মিছিলের ক্ষমতা খুব বর্দ্ধিত হইল। ১৭৬২ সালের আহম্মদ শাহ আবদালীর আক্রমণ সময়ে, তিনি তাঁহাদের অনেক দ্রব্যজাত লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। তাঁহারাও তাঁহার দুর্গটী ভূমিসাৎ করিল। আহাম্মদ শাহের প্রত্যাবর্ত্তনের পরেই তিনি ওয়াজিরাবাদ, আহামদাবাদ ও ঝিলামের পশ্চিমস্থ প্রদেশগুলি অধিকার করিয়া লইলেন। তাঁহার ক্ষমতা লাভে অন্যান্য শিখ সর্দ্দারেরা অতিশয় ভীত হইলেন। শীঘ্রই ভাঙ্গী শিখদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ১৭৭৪ সালে তাহাদের সহিত যুদ্ধে চরৎ সিংহ নিহত হইলেন। মৃত্যুকালে তিনি তিন লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া যান। সেই সময়ে তাঁহার একমাত্র পুত্র মহাসিংহ মাত্র দশ বৎসরের বালক। তাঁহার পত্নী দেশান সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হইলেন। মহাসিংহ দেখ।

চরাতর—অন্যনাম বীর সিংহ বা চরাচর। স্বাধীন ত্রিপুরার রাজা অচঙ্গ ফনাইএর পুত্র চরাতর চন্দ্র হইতে অধস্তন ৫৩শৎ নৃপতি ছিলেন। তিনি

অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে তাঁহার ভ্রাতা আচঙ্গ ফা (সুরেন্দ্র ফা বা হাচুং ফা) রাজপদ লাভ করেন। ত্রিপুর দেখ।

চর্পট নাথ—কবীর পন্থী ভক্তবাণী সংগ্রহ গ্রন্থে তাঁহার অনেক বাণী সংগৃহীত আছে। তিনি একজন বিখ্যাত ভক্ত ছিলেন। হঠযোগ প্রদীপিকা গ্রন্থে হঠযোগ সিদ্ধা এক চর্পট নাথের উল্লেখ আছে। এই উভয় একই ব্যক্তি কিনা তাহা বলা কঠিন।

চর্য্যনাগ—উত্তর পশ্চিম ভারতের প্রাচীন নাগবংশীয় একজন রাজা। তিনি খুব সম্ভব খ্রীঃ ৩য় শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজত্ব করিতেন. তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার নাম বহিন নাগ। এবং ভবনাগ পরবর্ত্তী রাজা।

চষ্টন—তিনি উজ্জয়িনীর একজন শক জাতীয় ক্ষত্রপ। তাঁহার পিতার নাম যশামোতিক। ১৩০ খ্রীঃ অব্দে (৫২ শকে) তিনি বর্ত্তমান ছিলেন; তাঁহার পুত্র জয়দামন, পৌত্র রুদ্রদামন। এই রুদ্রদামন অন্ধ্ররাজ দ্বিতীয় পুলমায়ীকে পরাস্ত করিয়া, কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র ও আনর্ত্ত দেশ সমূহে একটী নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

চাতুদাস-একজন কায়স্থ জাতীয় বৌদ্ধ বৈয়াকরণিক। তাঁহার রচিত কারিকাগুলি উড়িষ্যায় পঠিত হয়। তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভে বৌদ্ধ বন্দনা আছে। চাতু কারিকার টীকাকারের মতে কায়স্থদের ইষ্ট দেবতা বৌদ্ধ।

চাঁদ—রাঠোরবংশীয় রাজা পুঞ্জ হইতে কান্ধবজ উপাধিক ত্রয়োদশটী রাজবংশ উদ্ভূত হইয়াছিল, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। মারবারের উত্তর প্রদেশে তিনি তারাপুর নামে একটী নগর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভুবন বিদিত ভাহিরা নামক নগরের চৌহান অধিপতির দুহিতার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি সেই বনিতার সহিত বারাণসীতে আসিয়া বাস করেন।

চাঁদ কুমারী—পঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের অন্যতম পুত্র খড়্গ সিংহের পত্নী। ১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দের ২৭শে জুন মহারাজা রণজিৎ সিংহ পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি মন্ত্রী ধ্যান সিংহের হস্তে জ্যেষ্ঠ পুত্র খড়্গ সিংহের তত্ত্বাবধানের ভার সমর্পন করিয়া যান। কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী রাজ্যলোভে কিছুকাল পরেই খড়্গ সিংহ ও তাঁহার পুত্র নেহাল সিংহকে হত্যা করেন। রাণী চাঁদ কুমারী ইহা বুঝিতে পারিয়া ধ্যান সিংহকে মন্ত্রীপদ হইতে অপসারিত করিয়া, উত্তম সিংহকে প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন। পদচ্যুত মন্ত্রী ধ্যান সিংহ, সেনাপতি গোপাল সিংহের সহিত মিলিত হইয়া রাণী চাঁদ কুমারীকে অপসারিত করিয়া রণজিৎ

সিংহের এক রক্ষিতার গর্ভজাত পুত্র সের সিংহকে সিংহাসন প্রদান করেন। রাণী চাঁদ কুমারী সের সিংহকে অতিশয় ঘৃণা করিতেন। সের সিংহ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই রাণী চাঁদ কুমারীকে হস্তগত করিতে সচেষ্ট হন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল চাঁদ কুমারীকে বিবাহ করেন। কিন্তু রাণী তাঁহার প্রস্তাব অতিশয় ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু সের সিংহ ইহাতেও নিরস্ত হইলেন না। কোনও প্রকারে তাঁহাকে হস্তগত করিতে না পারিয়া, এক ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করিয়া, তাঁহাকে ইহ-লোক হইতে অপসারিত করেন। সের সিংহের অর্থের লোভে, রাণীর পরি-চারিকারাই তাঁহাকে বিষ প্রদানে হত্যা করেন। এই বুদ্ধিমতি, স্বাধ্বী, তেজস্বিনী রাণীকুল মহিয়সী রাণী মন্ত্রীদের ষড়যন্ত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন।

চাঁদ গাজী—তিনি ভাওয়ালের প্রসিদ্ধ ফজল গাজীর বংশধর। তিনি চাঁদপ্রতাপ পরগণার জমিদার ছিলেন। তাঁহার পিতা দেলওয়ার খাঁ, এই স্থানে প্রথম আসিয়া জমিদারী পত্তন করেন। ধলে-শ্বরীর তীরে যে স্থানে তিনি বাসস্থান স্থাপন করেন, সেই স্থান এখন নদী চড়ায় পরিণত হইয়াছে। চাঁদ গাজীর সেনাপতি সঞ্জয় হাজরা ছিলেন। গাজী-বংশের দেওয়ান সঞ্জয়ের বংশধরেরাই পরে জমিদারী অধিকার করিয়াছেন।

চাঁদ রায়—(১) বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম। তাঁহার ভ্রাতার নাম কেদার রায়। তাঁহাদের রাজ-ধানী ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত শ্রীপুরে ছিল। তাঁহার বিধবা কন্যা স্বর্ণময়ীকে ঈশা খাঁ, বিশ্বাসঘাতক ব্রাহ্মণ অমাত্য শ্রীমন্ত খাঁর সাহায্যে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। যদিও ঈশা খাঁ ইহার সমুচিত প্রতিফল পাইয়াছিলেন, তবু এই অপমানেই কিছুকাল পরে, তিনি পরলোক গমন করেন। চাঁদ রায় বঙ্গের স্বাধীন নরপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে (১৬০১ খ্রীঃ) কেদার রায় মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ১৬০৪ খ্রীঃ অব্দে যুদ্ধে আহত হন। পরে এই আঘাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। কেদার রায় দেখ।

চাঁদ রায়—(২) তিনি রাজমহলের অধিবাসী একজন বিখ্যাত জমিদার ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি দস্যুবৃত্তি, পরস্বাপহরণ, পরস্ত্রী ধর্ষন প্রভৃতি কুকার্য্য করিয়া লোকের ভীতির কারণ হইয়াছিলেন। এমন কি বঙ্গের নবাবকে অগ্রাহ্য করিয়া রাজস্ব প্রদানেও অসম্মত হইলেন। নবাব সৈন্য প্রেরণ করিয়াও তাঁহাকে দমন করিতে পারিলেন না। কিন্তু এইভাবে বেশীদিন চলিল না। কিছুকাল পরেই তিনি উন্মাদরোগগ্রস্ত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর সন্তোষ রায় বহু চিকিৎসায়

অকৃতকার্য্য হইয়া, তাঁহাকে নরোত্তম ঠাকুরের নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। ইহার কিছুকাল পরেই তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জীবনেরও পরিবর্ত্তন হইল। দস্যুপতি পরম ভক্ত সাধু হইলেন। পরস্বাপহারী এখন পরম দাতা হইলেন। অবশিষ্ট জীবন সৎপথে থাকিয়া পরলোকগত হইলেন।

চাঁদ রায়—(৩) তিনি ১৬৬৫ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। নদীয়া জিলার বাগ-আচড়া গ্রামের তিনি জমিদার ও নবদ্বীপাধিপতি রুদ্র রায়ের দেওয়ান ছিলেন। তিনি কীর্ত্তিমান পুরুষ ছিলেন। তিনি নবদ্বীপাধিপতি রুদ্র রায়ের নির্দ্দেশ ক্রমে ব্রহ্মশাসন গ্রাম স্থাপন করিয়া বহু বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ পরিবারের বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন এবং অত্যুচ্চ এক শিব মন্দির তথায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি কোন কারণে বাগ আচড়ার সিদ্ধ পুরুষ মহাদেব মুখোপাধ্যায়ের ক্রোধ উৎপাদন করিয়া, তাঁহার অভিশাপে সবংশে নির্ব্বংশ হয়েন।

চাঁদ রায়—(৪) তিনি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। ১৬১৫ খ্রীঃ অব্দে ঢাকার নবাব কাশিম খাঁর তিনি কর-সংগ্রাহক কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি নবাবের কার্য্যে স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়া, নবাবের অতি প্রিয়পাত্র হন এবং প্রভূত ধন উপার্জ্জন করেন। প্রথমে নবাবের নিকট হইতে তিনি রায় রায়াণ এবং পরে ১৬১৬ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন এবং সেই সঙ্গে বাহিরবন্দ, ভিতরবন্দ, স্বরূপপুর, পাতিলাদহ, আমবাড়ী, সুজানগর, ইসলাম বাড়ী ও গয়বাড়ী নামক আটটী পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হন। চাঁদ রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায় ১৬৯৩ খ্রীঃ সালে রাজ্য প্রাপ্ত হন। তিনি ১৭২৩ সালে অপুত্রক পরলোক গমন করিলে তাঁহার সহধর্ম্মিনী রাণী সত্যবতী উত্তরাধি-কারিণী হন। রাণী সত্যবতী ১৭৮২ সালে পরলোক গমন করেন।

চাঁদ রায়—(৫) রাজা বসন্ত রায়ের পুত্র কচু রায়। তাঁহার ভ্রাতা চাঁদ রায়। কচু রায় নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে, চাঁদ রায় রাজা হন। চাঁদ রায়ের পর তৎপুত্র রাজারাম রাজা হন।

চাঁদ সাহেব—(১) সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে তিনি লাহোরের দেওয়ান ছিলেন। তিনি স্বীয় কন্যার সহিত ৬ষ্ঠ শিখ গুরু অর্জ্জুন সিংহের পুত্র হরগোবিন্দের বিবাহ দিতে চাহেন। এক সময়ে চাঁদ সাহেব গুরু অর্জ্জুনকে ভিক্ষুক বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। সেইজন্য গুরু অর্জ্জুন তাঁহার কন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহে অসম্মত হইলেন। চাঁদ সাহেব

এক লক্ষ টাকা উপহার দিতে চাহিলেন। অর্জ্জুন বলিলেন—আমার কথার অন্যথা হইবার নহে। আপনি পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য দিলেও এই বিবাহ হইবে না। ইহাতে চাঁদ সাহেব অত্যন্ত অপমানিত মনে করিয়া, সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট শিখদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। সম্রাট গুরু অর্জ্জুনের অনেক টাকা জরিমানা করেন। অর্জ্জুন সেই টাকা দিতে অসমর্থ হইলে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। কারাগারেই কষ্টে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহাতে সমস্ত শিখের মনে ধারণা জন্মিল যে চাঁদ সাহেবই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। অর্জ্জুনের পুত্র হরগোবিন্দ তখন এগার বৎসরের বালক। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, তিনি শিখদিগকে বুঝাইলেন যে, বল সঞ্চয় ব্যতীত মুসলমানদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। তদর্থে, শিকার, মাংসাহার ও তীর ধনু ছোড়া অভ্যাস চলিতে লাগিল। হরগোবিন্দই শিখদের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ স্পৃহা জাগ্রত করেন। কিছুদিন মধ্যেই বল সঞ্চয় করিয়া হরগোবিন্দ পিতৃবৈরী চাঁদ সাহেবকে বন্দী করিয়া, অশেষ যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করেন। হরগোবিন্দের সময় হইতেই শিখদের মধ্যে সামরিক শক্তির সঞ্চার হয়। হরগোবিন্দ দেখ।

চাঁদ সাহেব—(২) অন্য নাম হোশেন দোস্ত খাঁ। তিনি আর্কটের নবাব দোস্ত আলি খাঁর জামাতা এবং একজন বীর পুরুষ ছিলেন। ১৭৩৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি ত্রিচিন পল্লীর রাণীকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক প্রতারিত করিয়া উক্ত নগর অধিকার করেন। ১৭৪১ খ্রীঃ অব্দের ২৬শে মার্চ্চ মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া সাতারা দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। পরে ১৭৪৮ খ্রীঃ অব্দে ফরাসী শাসনকর্ত্তা ডুপ্লের অনুরোধে তিনি মুক্তি লাভ করেন। নিজামের পৌত্র মজাফর জঙ্গ তাঁহাকে কর্ণাটের নবাবী পদে বরণ করেন। ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া তাঁহার মস্তক, ইংরেজ কর্ত্তৃক আর্কটের নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত মোহাম্মদ আলী খাঁর নিকট, পাঠাইয়া দেন।

চাঁদ সুলতানা—ভারতের প্রসিদ্ধ পাঠান বীরাঙ্গনা। তিনি আহমদনগরে নিজাম শাহী রাজবংশের তৃতীয় ভূপতি হোশেন সাহের কন্যা। বিজাপুরের অধিপতি আলি আদিল শাহের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি বিধবা হন। তৎপরে কিছুকাল তিনি বিজাপুরে বাস করিয়া ১৫৮৪ খ্রীঃ অব্দে পিতৃরাজ্য আহমদনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৫৯৫ খ্রীঃ অব্দে আহমদনগর রাজ্যাধিপতি ইব্রাহিম নিজাম শাহ যুদ্ধে নিহত হইলে, রাজ্য মধ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা

উপস্থিত হইল। প্রথমে চাঁদবিবি মৃতরাজার নাবালক পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া রাজ্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বার্থান্বেষী কয়েকজন মন্ত্রী ও আমীর চাঁদবিবির কার্য্য অনুমোদন করিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আপন আপন পছন্দ মত লোককে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মৃতরাজার মন্ত্রী মিয়া মঞ্জুই প্রধান ছিলেন। তিনি বালক রাজা ও চাঁদবিবিকে দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং আহাম্মদ শাহ নামে এক ব্যক্তিকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু ইখলাস খাঁ প্রভৃতি অন্যান্য কয়েকজন আমীর, মিয়া মঞ্জুর ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে চতুর্দ্দিকে অশান্তি ও যুদ্ধ বিগ্রহের সূত্রপাত হইল। মিয়া মঞ্জু নিজ স্বার্থসিদ্ধির অন্য কোনও উপায় না পাইয়া মুঘল সম্রাট আকবর শাহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

এই সকল ঘটনার কিছু পূর্ব্ব হইতেই, সম্রাট আকবর দাক্ষিণাত্যের পাঠান রাজ্যগুলিকে নিজাধীনে আনিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তিনি এই উৎকৃষ্ট সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহার আদেশে রাজকুমার মুরাদ, খান্দেশের রাজা আলি খাঁ ও অন্যান্য সেনানী সহ আহমদনগরের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই সময়ের মধ্যে, পূর্ব্ব বিশৃঙ্খলা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত ইখলাস খাঁ, আভঙ্গ খাঁ প্রভৃতি ওমরাওগণ স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া, আহমদনগর রক্ষার কোনও চেষ্টা করিলেন না। তাঁহারা বরং স্বাধীনভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেশের এই ঘোরতর দুরবস্থার সময়ে চাঁদবিবি দেশের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন ও মুঘল আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য তৎপর হইলেন। তিনি রাজ্যের সকল সম্ভ্রান্ত লোককে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কলহ ত্যাগ করিয়া দেশ রক্ষার জন্য অগ্রসর হইতে আহ্বান করিলেন। তাঁহার উৎসাহ ও আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্তে প্রায় সকল আমীর ওমরাওগণ দেশ রক্ষার জন্য মিলিত হইলেন। ইতিমধ্যে মুঘল সৈন্য আহমদনগর দুর্গ আক্রমণ করিল। কিন্তু চাঁদবিবির অসাধারণ বীরত্বে, রণনৈপুণ্যে ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে মুঘল বাহিনীর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতে লাগিল। দীর্ঘকাল প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও রাজকুমার মুরাদ দুর্গ অধিকার করিতে আদৌ সমর্থ হইলেন না। অপর দিকে পাঠান সেনাপতিরা বাহিরের দিক হইতেও নানাভাবে মুঘল বাহিনীকে উত্যক্ত করিতে লাগিলেন। এই ভাবে

কিছুকাল গত হইলে আহমদনগরের দুর্গে খাদ্যাভাবের আশঙ্কা হইল। অপর দিকে মুঘল বাহিনীও প্রাণপণ চেষ্টায় বারংবার বিফল মনোরথ হইয়া, সন্ধির জন্য উৎসুক হইয়াছিল। সেই সময়ে চাঁদবিবি সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করিবামাত্র তাহারা সম্মত হইল। সন্ধির ফলে বেরার প্রদেশ মুঘলদিগকে প্রদান করা হইল।

মুঘলগণ যখন আহমদনগর আক্রমণ করেন, তখন মিয়ামঞ্জু বিজাপুরের সুলতানের নিকট সাহায্য লাভের আশায় গমন করিয়াছিলেন। সন্ধি স্থাপিত হইবার কিছুকাল পরে, তিনি বিজাপুর হইতে এবং ইখ্‌লাস খাঁ গোলকুণ্ডা হইতে সাহায্য লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আর সাহায্যের আবশ্যকতা না থাকাতে এবং শত্রুও প্রত্যাবর্ত্তন করাতে আবার পূর্ব্ব অশান্তি ও গৃহ বিবাদ আরম্ভ হইল। এবার চাঁদবিবি নিজ ক্ষমতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া, বিজাপুরের সুলতানের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার মধ্যস্থতায় সাময়িক ভাবে গৃহ বিবাদের শান্তি হইল এবং বাহাদুর শাহ আহমদনগরের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। কিন্তু অশান্তি এখানেই শেষ হইল না। বাহাদুর শাহের মন্ত্রী মোহাম্মদ খাঁ অতিশয় ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন এবং চাঁদবিবি ও বাহাদুর শাহকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া নানাদিকে নানাভাবে স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। চাঁদবিবি অনন্যোপায় হইয়া পুনরায় বিজাপুরের সুলতানের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বিজাপুর রাজ প্রেরিত সেনাপতি সুহাইল খাঁর সহিত মোহাম্মদ শাহের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। মোহাম্মদ খাঁও তখন পুনরায় মুঘলদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রাজকুমার মুরাদ মোহাম্মদ খাঁর আহ্বানে কালবিলম্ব না করিয়া আহমদনগরের নিকট উপস্থিত হইলেন। চাঁদবিবির প্রার্থনায় বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার পাঠান রাজাদ্বয় মুঘল আক্রমণ হইতে আহমদনগরকে রক্ষা করিবার জন্য সাহায্য করিতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই ক্ষুদ্র পাঠানরাজ্যকে উপলক্ষ করিয়া, দাক্ষিণাত্যে মুঘল ও পাঠানের বলপরীক্ষা চলিতে লাগিল। নিজ আহমদনগর রাজ্যও গৃহবিবাদ ও ষড়যন্ত্র হইতে মুক্ত ছিল না। বীরাঙ্গনা চাঁদবিবির সকল প্রকার বীরত্ব, দেশ রক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গের মহৎ দৃষ্টান্ত, কিছুই স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদিগের চেতনা সম্পাদন করিতে পারিল না। বাহিরে শত্রুর আক্রমণ, ভিতরে গৃহ শত্রুর ষড়যন্ত্র। এই উভয় বিপদের মধ্যে যখন চাঁদবিবির জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়া ছিল, তখন হামিদ খাঁ নামক এক দুর্ব্বৃত্তের হস্তে এই মহীয়সী মহিলার জীবনান্ত

ঘটিল। চাঁদবিবির মৃত্যুর অল্পকাল পরেই আহমদনগর রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল।

চাওপুলাই—তিনি আসামের আহম বংশীয় নরপতি সুখারাংফার কনিষ্ঠ পুত্র তাঁহার মাতা রাজনী কামতাপুরের (বর্ত্তমান কুচবিহার) রাজার কন্যা ছিলেন। ১৩৩২ খ্রীঃ অব্দে পিতার মৃত্যুর পরে জ্যেষ্ঠ পুত্র সুখরাংফা রাজা হইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত অত্যাচারী রাজা ছিলেন বলিয়া, রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁহার বিরোধী হয় এবং তাঁহার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করে। চাওপুলাই সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। রাজা সুখরাংফা ইহা জানিতে পারিলে, চাওপুলাই পলায়নপূর্ব্বক স্বীয় মাতুল কামতাপুর রাজের আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করেন। সুখরাংফা ইহাতে ভীত হইয়া তাঁহার সহিত মীমাংসা করিয়া ফেলেন। ১৩৬১ খ্রীঃ অব্দে সুখরাংফার মৃত্যু হইলে, তাঁহার কনিষ্ঠ সুতুফা রাজা হন। ১৩৭৬ খ্রীঃ অব্দে ছুটিয়ার রাজাকর্ত্তৃক সুতুফা নিহত হন।

চাকিতো—১৬ খ্রীঃ অব্দে পাঞ্জাবে নরপতি শালিবাহন স্বীয় নামে শালিবাহনপুর নামক নগর স্থাপন করেন। ইহা লাহোরের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। শালিবাহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলন্দ পিতার মৃত্যুর পরে রাজা হন। এই বলন্দের দ্বিতীয় পুত্র ভূপতি। ভূপতির পুত্র চাকিতো। পিতামহ বলন্দ চাকিতোকে গজনীর শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁহার সেনাপতি ও সর্দ্দারের পরামর্শে স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বোখারায় আধিপত্য লাভ করেন। তাঁহার নাম হইতে তাঁহার বংশধরেরা চাগতাই মুঘল নামে খ্যাত হয়।

চাচিক দেব—যশলমীরের রাজা কৈলুনদেব ১২১৬ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চাচিক দেব রাজা হইয়াছিলেন। তিনি খুব বীর পুরুষ ছিলেন। রাজা হইয়াই তিনি চুন্না রাজপুতদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের চতুর্দ্দশ সহস্র ধেনু অপহরণ করেন। ইহার কিছুকাল পরেই তিনি সোদারাজ আরাম সিংহের রাজ্য আক্রমণ করেন। আরাম সিংহ স্বীয় কন্যাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিয়া সন্ধি স্থাপন করেন। তৎপরে তিনি রাঠোরদের আক্রমণ হইতে স্বীর রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। ৩২ বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি ১২৪৮ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তৎপরে তাঁহার এক মাত্র পুত্র তেজরাও বসন্ত রোগে অকালে প্রাণত্যাগ করায়, তাঁহার পৌত্র কর্ণ সিংহ রাজা হইয়াছিলেন।

চাণক্য—প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ রাজনীতি বিশারদ পণ্ডিত। তিনি কৌটিল্য ও বিষ্ণুগুপ্ত নামেও পরিচিত। তদ্রচিত

'অর্থশাস্ত্র' নামক গ্রন্থেই উক্ত নাম দুইটি পাওয়া যায়। চাণক্য নামটি কোথা হইতে আসিল তাহা সঠিক জানা যায় না। নিজ রচিত গ্রন্থেই চাণক্য উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনিই নন্দবংশের ধ্বংস সাধন করেন। চাণক্য বা কৌটিল্য কর্তৃক নন্দবংশ ধ্বংসের উল্লেখ হিন্দু পুরাণ এবং বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যেও পাওয়া যায়। কিন্তু প্রধানতঃ কি ভাবে ও কাহার সাহায্যে তিনি নন্দবংশ ধ্বংস করেন এবং তাহার পর কি ঘটে, এসকল বিষয় অর্থশাস্ত্র হইতে জানা যায় না। চাণক্য তক্ষশিলাবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন। মুদ্রারাক্ষস নামক নাটকে নন্দরাজগণের সহিত চাণক্যের বিরোধ ও তৎফলে চাণক্যের প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা প্রভৃতি বিষয় উল্লিখিত আছে। জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে চাণক্যের সহিত চন্দ্রগুপ্তের সাক্ষাৎ কি ভাবে সংঘটিত হয় এবং কি ভাবে চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে সাহায্য করিয়া নন্দ-বংশ ধ্বংস করেন, সে বিষয়ে অনেক কাহিনী আছে। সেগুলির ঐতিহাসিক মূল্য বিশেষ নাই।

চামুণ্ড রায়—(১) তিনি পত্তনের অধিপতি ছিলেন। ১০১১ খ্রীঃ অব্দে গজনীর অধিপতি সুলতান মামুদ তাঁহাকে পরাস্ত করেন। চামুণ্ড রায় স্বীয় ভগিনী চাচিনী দেবীর প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করেন। ইহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি স্বীয় পুত্র বল্লভ হস্তে রাজ্য ভার সমর্পণপূর্ব্বক কাশীবাসী হন। ছয় মাস মধ্যে বল্লভ সেন বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করেন এবং তৎপরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্লভ সেন পত্তনের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

চামুণ্ড রায়—(২) জৈন সাহিত্যিক। তিনি প্রথম জীবনে গঙ্গাবংশীয় রাজাদের একজন বিশিষ্ট অমাত্য ও সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে প্রধানতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সাহিত্য আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। মহীশূর রাজ্যান্তর্গত শ্রবনবেলগোলা নামক স্থানের প্রসিদ্ধ বিরাট গোম্মত মূর্ত্তি তাঁহারই চেষ্টায় নির্ম্মিত হয়। (গোম্মত প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভের পুত্র)। কানাড়ী ভাষায় "চামুণ্ডরায় পুরাণ" রচনা করিয়া তিনি খ্যাতি লাভ করেন (আনুঃ ৯৭৮ খ্রীঃ)। তদ্ভিন্ন তিনি "গোম্মত-সার" নামক গ্রন্থের কানাড়ী ভাষায় একখানি টীকাও রচনা করেন। চামুণ্ড রায় খ্রীঃ দশম শতাব্দীর শেষার্দ্ধভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

চামুণ্ডা কায়স্থ—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—জ্বরতিমির ভাস্কর।

চারায়ণ—প্রাচীনযুগের একজন কামশাস্ত্রকার। মূল শাস্ত্রখানি কখন এবং কাহার দ্বারা রচিত হয় তাহা সঠিক জানা যায় নাই। পরবর্ত্তীকালে চারায়ণ,

সুবর্ণনাভ, কুচুমার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ উঁহার এক এক অধ্যায় পৃথক পৃথক ভাবে সংশোধন করেন। বিভিন্ন অর্থশাস্ত্রে চারায়ণের নাম পাওয়া যায়।

চারিত্রসুন্দর গণি—একজন জৈন কথা গ্রন্থকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম "মহীপাল চরিত্র"। উহা চৌদ্দ সর্গে বিভক্ত প্রায় বারশত শ্লোক নিবন্ধ এক মহাকাব্য। গ্রন্থকারের জীবিতকাল অজ্ঞাত।

চারু ভুইয়া—তিনি কামতাপুরের অধীনস্থ আসামের একজন সামন্ত নরপতি ছিলেন। হোশেন শাহ কামতাপুর (বর্ত্তমান কোচ বিহার) আক্রমণ করিবার কিছুদিন পরে, সামন্ত নরপতিরা স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। কোচরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হরিয় মণ্ডলের পুত্র বিশ্বসিংহ অতিশয় সাহসী বীর ছিলেন। তিনি নিকটবর্ত্তী সামন্ত নরপতিদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় ক্ষমতায় কামতাপুর অধিকার করেন। চারু ভুইয়া একজন পরাক্রান্ত সামন্ত নরপতি ছিলেন। তিনি বিশ্বসিংহকে প্রথমে বাধা দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন (১৫১৫ খ্রীঃ)।

চার্ণক, জব (Job Charnock)—তিনি ১৬৮০ সালে বাঙ্গালার ইংরেজদের বাণিজ্য কুটীর অধ্যক্ষ ছিলেন। এই সময়ে বাঙ্গালার নবাবের সহিত ইংরেজদের বিরোধ উপস্থিত হয়। ইহার ফলে চার্ণক সাহেব হুগলি পরিত্যাগপূর্ব্বক সুতানটী নামক স্থানে (কলিকাতার উত্তরভাগ) চলিয়া আসেন। এখানেও নবাব সৈন্য তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলে, তিনি উলুবেড়িয়া ও হিজলীতে চলিয়া আসেন। এখানেও নানা অসুবিধা হওয়ার ১৬৮৮ সালে তিনি মাদ্রাজে চলিয়া যান। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালার নবাবের উপর বিরক্ত হইয়া, প্রতিশোধ লইবার জন্য, আরব সাগরে মক্কাগামী মুঘলদের জাহাজ লুট করিতে লাগিল। সম্রাট আওরঙ্গজাব উপায়ান্তর না দেখিয়া, ইংরেজদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। তদনুসারে ১৬৯০ সালে বাঙ্গালার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ, চার্ণক সাহেবকে বাঙ্গালায় আনয়ন করেন। ১৬৯৫ সালে নবাবের অনুমতি লইয়া কলিকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুরে চার্ণক কুটী নির্ম্মাণ করেন। ইতিমধ্যে রহিম খাঁর বিদ্রোহে ভয় পাইয়া ১৬৯৮ সালে চার্ণক ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। পূর্ব্বোক্ত তিনটী গ্রামই বর্ত্তমান কলিকাতা। ইহার দুই বৎসর পরেই চার্ণক সাহেব পরলোক গমন করেন। বারাকপুরে তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

চার্ব্বাক—খুব সম্ভব চার্ব্বাক মতাবলম্বী কোনও সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নাম। কাহারও মতে বৃহস্পতির এক শিষ্যের

নাম চার্ব্বাক ছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এক নাস্তিক মতের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাহার সহিত চার্ব্বাক মতের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। চার্ব্বাক মতে "অনুমান" জ্ঞান লাভের অন্যতম উপায় নহে। চার্ব্বাক মতাবলম্বীরা "ধূর্ত্ত" ও "সুশিক্ষিত" এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। তাঁহারা বেদের প্রাধান্য মানিতেন না; অনাত্মবাদী ছিলেন। জয়ন্তকৃত "ন্যায় মঞ্জরী; মাধবকৃত "সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ"; গুণরত্নকৃত "তর্ক-রহস্য দীপিকা" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে চার্ব্বাক মতের পরিচয় পাওয়া যায়। চার্ব্বাক মতে পুনর্জন্ম নাই। "প্রত্যক্ষ" লব্ধ জ্ঞানই গ্রাহ্য। সুশিক্ষিত চার্ব্বাকেরা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন বটে কিন্তু মৃত্যুর সহিত উহারও বিনাশ হয়, এইরূপ বিশ্বাস করিতেন।

চালুক্য ভীমদ্রোহার্জ্জুন—তিনি বেঙ্গীর চালুক্যবংশীয় নরপতি গুণক বিজয়াদিত্যের ভ্রাতুষ্পুত্র ও যুবরাজ বিক্রমাদিত্যের পুত্র। তিনি ৮৮৮—৯১৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র বিজয়াদিত্য (তৃতীয়) রাজা হন। কুব্জবিষ্ণুবর্দ্ধন দেখ।

চালুক্যভীম বিষ্ণুবর্দ্ধন—তিনি বেঙ্গীর চালুক্যবংশীয় নরপতি অম্মবিষ্ণুবর্দ্ধনের ভ্রাতা। তাঁহার রাণীর নাম মেলাম্বা। তিনি ৯৩৪—৯৪৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বার বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র অম্মবিজয়াদিত্য রাজা হন। কুব্জবিষ্ণুবর্দ্ধন দেখ।

চাসনী পীর—তিনি শ্রীহট্টের বিখ্যাত দরবেশ শাহ জালাল এমনির অনুগত অন্যতম অনুসঙ্গী ছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান আরব দেশ ছিল। তাঁহারই উপর শাহ জালালের মাতুল প্রদত্ত মৃত্তিকা রক্ষা ও পরীক্ষার ভার ছিল। শ্রীহট্ট সহরের গোসাই পাড়া নামক স্থানে এখনও তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান আছে। শাহ জালাল এমনি দেখ।

চাহির দেব—তিনি দিল্লীর রাজা পৃথ্বীরাজের সহোদর ভ্রাতা। মোহাম্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধে ১১৯২ খ্রীঃ অব্দে পৃথ্বীরাজ ও তাঁহার পুত্র রণসিংহ নিহত হইলে, চাহির দেবের পুত্র বিজয় রাজকে মোহম্মদ ঘোরী আজমীরের সিংহাসনে স্থাপন করেন।

চিংতুংখম্বা বা ভাগ্যচন্দ্র—তিনি খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মনিপুর রাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতেই শ্রীহট্টের অধিকারীগণ মণিপুর রাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মণিপুরীদিগকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া হিন্দু সমাজে আনয়ন করেন। শান্তিপুরের গোস্বামীগণ রাজা চিংতুংখম্বাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার নাম ভাগ্যচন্দ্র রাখেন। তদবধি তাঁহারা মহাভারতোক্ত বভ্রুবাহনের বংশধর বলিয়া

পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। তদবধি রাজারাও একটী দেশী নাম ও একটী হিন্দু নাম গ্রহণ করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবৎ প্রভৃতি তাঁহাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ হইয়াছে।

চিক্‌নারাজ—আসামের সীদলী রাজবংশের তিনি আদি পুরুষ। কথিত আছে একদা এক ব্রাহ্মণ একটী পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকে পথি মধ্যে পাইয়া প্রতিপালন করেন। এই বালকই পরে সীদলির রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী কোন সময়ে রাণী চন্দ্রেশ্বরী সীদলীর শাসনকর্ত্রী হইয়াছিলেন।

চিতু—পিণ্ডারী দস্যুদের অন্যতম দলপতি। তাহাদের প্রধান আশ্রয় স্থান মালব প্রদেশ ছিল। মার্কুইস অব হেষ্টিং তাহাদিগকে দমন করেন। তাহাদের প্রধান দলপতি আমীর খাঁ দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, সৈন্যদিগের বিদায় দিয়া বড় লাটের অনুগ্রহে টঙ্ক নামক স্থানের অধিপতি হন। করিম খাঁ বস্তি জিলার জায়গীর পাইয়া তথায় বাস করেন। চিতু বশ্যতা স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়া, জঙ্গলে পলায়ন করেন কিন্তু তথায় ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হন।

চিত্তমচ্ছিক সণ্ডিক—একজন উচ্চ শ্রেণীর বৌদ্ধ সাধক। তিনি গৃহস্থাশ্রমেই থাকিতেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁহাকে "ধর্ম্ম কথিকগণের শ্রেষ্ঠ" উপাসক বলা হইয়াছে। যাঁহারা বুদ্ধদেবের উপদেশ নানাস্থানে প্রচার করিতেন, তাঁহাদিগকে 'ধর্ম্ম কথিক' বলা হইত। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, বৌদ্ধ উপাসকগণও ধর্ম্ম প্রচার করিতেন।

চিত্তরঞ্জন গোস্বামী—একজন প্রসিদ্ধ হাস্যরসিক অভিনেতা। নদীয়া জিলার অন্তর্গত শান্তিপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা লালমোহন গোস্বামী মহাশয় পাকুড় ষ্টেটে চাকুরী করিতেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন পাকুড় ষ্টেটে ও কিছুদিন ই, আই, আর রেলওয়েতে চাকুরী করেন। বাল্যকাল হইতে তিনি খুব রসিক ছিলেন এবং ব্যঙ্গ কৌতুক দ্বারা সকলকে খুব হাসাইতে পারিতেন। পঁচিশ বৎসর বয়সের সময় তিনি চাকরী পরিত্যাগ করেন এবং হাস্যকতুকাভিনয়কে জীবনের উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি কয়েকখানি চিত্রে অভিনয় করিয়াছেন, তন্মধ্যে —'বরের বাজার', 'খোকাবাবু', 'সরলা', (নির্ব্বাক), 'বিদ্রোহী', 'শুভব্রহস্পর্শ' এবং হিন্দি 'সীতা' (সবাক্) উল্লেখযোগ্য। দুই একবার তিনি রঙ্গমঞ্চেও অভিনয় করিয়াছেন। 'মেক্-আপ' এর সাহায্য না লইয়া তিনি

রকমের হাসি দেখাইতে পারিতেন। যে সমস্ত ব্যঙ্গ কৌতুক তিনি দেখাইতেন তন্মধ্যে বিগ কঙ্কর্কোর্ট, হরিনাথের শ্বশুর বাড়ী যাত্রা, নকড়ির নাট্যবিকার, বলবান জামাতা, প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধা মাতা, বিধবা স্ত্রী, চারটী পুত্র (সুললিত, সৌরীন্দ্র, আদিত্যমোহন, সরোজ-মোহন,) দুইটী অবিবাহিতা কন্যা, চারটী ভ্রাতা রাখিয়া ৫৫ বৎসর বয়সে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ১লা জ্যৈষ্ঠ পরলোক গমন করিয়াছেন।

চিত্তরঞ্জন দাস, দেশবন্ধু—বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা ও কবি। ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দের ৫ই নবেম্বর (১২৭৭ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক) ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত তেলিরবাগ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশে তাঁহার জন্ম হয়। ঐ বংশের বহু ব্যক্তি, উদারতা, স্বাধীনতা প্রিয়তা, দানশীলতা প্রভৃতি মহৎগুণের জন্য খ্যাত ছিলেন। চিত্ত-রঞ্জনের পিতার নাম ভুবনমোহন দাস এবং তাঁহার অপর দুই সহোদরের নাম প্রফুল্লরঞ্জন ও বসন্তরঞ্জন দাস। তন্মধ্যে শেষোক্তজনকে চিত্তরঞ্জনের অন্যতম জ্যেষ্ঠতাত কালীমোহন দাস দত্তক গ্রহণ করেন। দেশবিখ্যাত দুর্গামোহন দাস তাঁহার অপর জ্যেষ্ঠতাত।

ভুবনমোহন ও তাঁহার অগ্রজদ্বয় যৌবনকালে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে কালীমোহন শেষ জীবনে প্রায়শ্চিত্তান্তে হিন্দু ধর্ম্মে ফিরিয়া যান। চিত্তরঞ্জনও ব্রাহ্মমতে অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন। গোয়াল পাড়ার বিজনীরাজের প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ ব্রাহ্মণ বরদানাথ হালদার তাঁহার শ্বশুর ছিলেন। শেষজীবনে চিত্তরঞ্জন অনেকটা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রভাবাধীন হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কন্যা হিন্দুমতে তাঁহার পারলৌকিকাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

চিত্তরঞ্জনের বাল্যশিক্ষা কলি-কাতাতেই সম্পন্ন হয়। তিনি ভবানী-পুরের লণ্ডন মিশন সোসাইটীকর্ত্তৃক পরিচালিত (অধুনা লুপ্ত) বিদ্যালয় হইতে ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, সিবিল সার্ভিস (Civil Service) পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। এদেশে কলেজে পড়িবার সময়েই চিত্তরঞ্জন অল্পবিস্তর রাজনীতি চর্চ্চা করিতেন। তৎকালীন ছাত্রদের Students Association নামক সংঘের তিনি একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। দেশবিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উহার প্রথম পরিচালক (President) হন। এইভাবে প্রথমে সুরেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়া চিত্তরঞ্জন

রাজনীতি চর্চ্চায় শিক্ষানবিশী করেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালেও তিনি রাজনীতি চর্চ্চা হইতে বিরত থাকেন নাই। ঐ সময়ে খ্যাতনামা দাদাভাই নৌরজী বিলাতে পার্লামেণ্ট মহাসভার সদস্য হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। চিত্তরঞ্জন নৌরজীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া নানাস্থানে বক্তৃতা করেন। জেমস্ ম্যাকলীন (James Maclean) নামক এক ব্যক্তি ভারতবর্ষে ইংরেজ অধিকার উপলক্ষে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, ইংরেজগণ অস্ত্রবলেই ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছে এবং অস্ত্রবলেই তাঁহারা উহা রক্ষা করিবে। চিত্তরঞ্জন এক প্রকাশ্য বক্তৃতায় তীব্রভাবে ম্যাকলীনের প্রতিবাদ করেন।

১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে তিনি সিবিল সার্বিস পরীক্ষা প্রদান করেন। কিন্তু সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, অত্যধিক রাজনীতি চর্চ্চা করায়, তাঁহার অদৃষ্টে ঐ চাকুরী লাভ হয় নাই। যাহা হউক তিনি পরে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (Barriester) হইয়া ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে দেশে প্রত্যাগমন করেন এবং আইন ব্যবসায়ীরূপে হাইকোর্টে প্রবেশ করেন। ঐ সময়ে তাঁহার পিতা আইন ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণ করায়, উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে প্রথম কয়েক বৎসর তাঁহাকে বিশেষ সংগ্রাম করিতে হয়। ঐ সময়ে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee) মনোমোহন ঘোষ, উড্রফ (ইনি পরে হাইকোর্টের বিচারপতি হন। উড্রফ দ্রঃ) প্রভৃতি মনীষি সম্পন্ন ব্যক্তি আইন ব্যবসায়ীদের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেন। তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (পরে লর্ড সিংহ) ও হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

১৮৯৩ হইতে ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত কয়েক বৎসর চিত্তরঞ্জনের জীবনে উল্লেখ যোগ্য কিছু ঘটে নাই। কিন্তু এদেশে বঙ্গভঙ্গ জনিত স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার কিছুকাল পরেই, প্রধানত রাজনীতি সম্বন্ধীয় মকর্দ্দমার আসামী পক্ষের উকীলরূপে অল্পকালের মধ্যেই তিনি জনসমাজে বিশেষ পরিচিত ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসমিতির (Indian National Congress) অধিবেশনে তিনি প্রথম প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। ঐ বৎসরেরই আগষ্ট মাসে রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি 'বন্দেমাতরম' নামে একখানি জাতীয়তাবাদী দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। অরবিন্দ ঘোষ বরোদা কলেজের কাজ ত্যাগ করিয়া উহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন।

ঐ সময়েই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'সন্ধ্যা' নামে একখানি তীব্র জাতীয়তাবাদী দৈনিক বাঙ্গালা পত্রিকা এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রসিদ্ধ 'যুগান্তর' পত্রিকা পরিচালনা করিতেন। ঐ সকল পত্রিকাতেই তীব্র ভাষায় জাতীয়তাবোধ উদ্দীপক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। বলাবাহুল্য তৎফলে অল্পকালের মধ্যেই পত্রিকাত্রয় রাজরোষে পতিত হয় এবং উহাদের সম্পাদক ও মুদ্রাকর অভিযুক্ত হন। প্রথমে অরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হয়। চিত্তরঞ্জন দাস ঐ মকর্দ্দমায় অরবিন্দের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং ঐ একটি মকর্দ্দমা পরিচালনা উপলক্ষেই সমগ্র বাঙ্গালা দেশে তাঁহার খ্যাতি বিস্তার লাভ করে। তাহার এক বৎসর পরে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবও রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হন। সেই মকর্দ্দমাতেও চিত্তরঞ্জন উপাধ্যায়ের পক্ষাবলম্বন করিয়া অসাধারণ সূক্ষ্ম আইনের জ্ঞান, যুক্তি বিচারে তীক্ষ্ণতা প্রভৃতি ক্ষমতার পরিচয় দিয়া দেশবাসীকে চমৎকৃত করেন। এযাবৎ তিনি এই ভাবেই দেশের রাজনীতির সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিতেন। এই সকল মকর্দ্দমার ফল স্বরূপ আইন ব্যবসায়ে তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল। প্রথম কয়েক বৎসরের সংগ্রামের পর এই সময় হইতে তিনি সর্ব্বপ্রকার আর্থিক উদ্বেগ হইতে মুক্ত হইয়া হাইকোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজীবীরূপে পরিগণিত হন। ১৯০৮ খ্রী: অব্দে ইতিহাস খ্যাত 'মাণিকতলা বোমার মামলা' আরম্ভ হয়। ঐ মকর্দ্দমাতে আসামী পক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য প্রথমে অনেক আইনজীবী সম্মত হন এবং কেহ কেহ কাজ আরম্ভও করেন। কিন্তু নানাকারণে প্রধানতঃ উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাওয়া যাইবে না ভাবিয়া, তাঁহারা উহার সংস্রব পরিত্যাগ করেন। অরবিন্দ ঘোষও ঐ মকর্দ্দমার অন্যতম আসামী ছিলেন। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুরোধে, পারিশ্রমিক পাইবার সম্ভাবনা একরূপ পরিত্যাগ করিয়াই চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের পক্ষ অবলম্বন করেন। এই মকর্দ্দমা প্রায় আড়াই বৎসর চলিয়া ছিল। ভারতে এত দীর্ঘকাল ব্যাপী মকর্দ্দমা ইহার পূর্ব্বে আর অধিক হয় নাই। উভয় পক্ষে দুইশতের উপর সাক্ষী এবং চার হাজারের উপর দলিলাদি উপস্থিত করা হয়। আলিপুরের সেসন জজ মিঃ বিচক্রফটের উপর ইহার বিচার ভার অর্পিত হয়। এই সুদীর্ঘকাল অধ্যবসায়, ধৈর্য্য ও শ্রমশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক চিত্তরঞ্জন যেরূপ অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত উহা পরিচালনা করেন তাহাতে সমগ্র ভারতে তাঁহার খ্যাতি বিস্তার লাভ করে। বিচারে

অরবিন্দ মুক্তি পান, তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ও উল্লাসকর দত্ত নামক অপর এক আসামী প্রাণদণ্ড লাভ করেন। হাইকোর্টে পুনর্বিচার হয় তাহাতে বারীন্দ্রকুমার ও উল্লাসকর প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ প্রাপ্ত হন।

আলিপুরের বোমার মকর্দ্দমা শেষ করিয়াই চিত্তরঞ্জন ঢাকার প্রসিদ্ধ 'ষড়যন্ত্রের মামলা'তে পুলিনবিহারী দাস প্রমুখ আসামীগণের পক্ষ সমর্থন করেন।

১৯১৭ খ্রীঃ অব্দে ভবানীপুরে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনীতিক সভা'র অধিবেশন হয়। চিত্তরঞ্জন উহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এযাবৎ তিনি একরূপ গোপনভাবে, নেপথ্যে থাকিয়া দেশের রাজনীতির সহিত যোগরক্ষা করিতেছিলেন। এইবার তিনি প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া এপর্য্যন্ত যে সকল রাজনৈতিক প্রধান ঘটনা সংঘটিত হয় তাহাদের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। ১৯০৯ খ্রীঃ অব্দে লর্ড মিন্টোর শাসনকালে এদেশে কোনও কোনও বিষয়ে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটে। ফলে সর্ব্বপ্রথম একজন ভারতীয় (সার্ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ) বড়লাটের কার্য্যকরী সমিতির (Executive Council) সদস্য হন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন অল্পকাল পরেই পদত্যাগ করিলে, বিহারের খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী সার আলি ইমাম ঐ পদ লাভ করেন। ১৯১২ খ্রীঃ অব্দের দিল্লীর দরবারের রাজকীয় ঘোষণার বলে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। লর্ড কার্জ্জনের দ্বিধা বিভক্ত বঙ্গ পুনর্মিলিত হইয়া এক প্রদেশে পরিণত হয়। আসাম স্বতন্ত্র প্রাদেশিকত্ব লাভ করে এবং বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর একত্র মিলিত হইয়া একটি প্রদেশ গঠিত হয়। ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দে ইয়োরোপে মহাসমর আরম্ভ হওয়ায় কিছুকাল দেশের সকল শ্রেণীর লোকের চিন্তা দেশের আভ্যন্তরীন ব্যাপার হইতে অপসৃত হইয়া, আন্তর্জাতিক বিষয়ে আকৃষ্ট হয় তখন মধ্যপন্থী অনেক বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতা প্রচার করিতে থাকেন যে, ইংলণ্ডের ঐ গুরুতর রাষ্ট্রীয় বিপদের সময়ে ভারতে রাজনৈতিক সমস্যা লইয়া তাহাকে অধিক উত্যক্ত করা উচিত হইবে না। এমন কি মহাত্মা গান্ধীও সেই মতানুযায়ী হন এবং দেশের লোককে ইংলণ্ডকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে উৎসাহ প্রদান করেন। ঐ সময়ে বিলাতের রাজনৈতিক নেতৃগণও এইরূপ মতামত প্রকাশ করেন যে, ঐ যুদ্ধে ভারতবর্ষ যেরূপ রাজভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিল,

তাহার জন্য এদেশবাসীরা দায়ীত্বসম্পন্ন শাসনভার (Responsible Goverment) পাইতে পারিবে। এই সকল উৎসাহ ও আশাপূর্ণ বাক্যের উপর ভরসা করিয়া, ভারতীয় রাজনৈতিক-নেতৃগণের মধ্যে অধিকাংশই যুদ্ধের সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলন যথাসম্ভব কম করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত কলিকাতায় অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে চিত্তরঞ্জন যে অভিভাষণ প্রদান করেন, তাহাতে এক সম্পূর্ণ নূতন ধরণের বাণী প্রচার করেন। ইয়োরোপের শিল্প বাণিজ্য প্রধান অতি বাস্তব সভ্যতার বিরুদ্ধে তিনি দেশবাসীকে নূতন এক পন্থা প্রদর্শন করেন। তিনি দেশের রাজনীতিকে পল্লীউন্নয়ন কার্য্যে পরিণত করিতে চাহিলেন। তাঁহার অভিভাষণের মর্ম্মার্থ ছিল যে, যেহেতু গ্রামই হইতেছে দেশের বাস্তবিক প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র, গ্রামকে উপলক্ষ করিয়া দেশের সমুদয় রাজনৈতিক কর্ম্ম পদ্ধতি গড়িয়া উঠা উচিত। এই মত তিনি অবশিষ্টকাল দৃঢ়ভাবে পোষণ করিতেন এবং উহাকে ফলপ্রদ করিবার জন্য নানাভাবে চিন্তা ও ব্যবস্থা করিতেন।

ইয়োরোপীয় যুদ্ধের মধ্যভাগে এক দল ভারতবাসী প্রকাণ্ড বিদ্রোহদ্বারা ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের অবসান করিবার চেষ্টা করেন। ঐ সকল বিপ্লবীদের আয়োজন কর্ত্তৃপক্ষের গোচর হওয়াতে, ভারত সরকার 'ভারত রক্ষা' (Defence of India) নামে পরিচিত এক আইন বিধিবদ্ধ করেন। ঐ আইনের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ সঙ্কল্পচ্যুত হন নাই। ঐ আইনের বিরুদ্ধে কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট সভা হয়। চিত্তরঞ্জন সেই সভাতে জ্বালাময়ী ভাষায় যে বক্তৃতা করেন তাহাতে তাঁহার খ্যাতি আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই সময়ের মধ্যেই ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা, ভারতবাসীর স্বার্থের ও মঙ্গলের অনুকূলে কতদূর পরিবর্ত্তন করা যায়, তদ্বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের জন্য তাদানীন্তন ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগু (Mr Montague) ভারতবর্ষে আগমন করেন। মধ্যপন্থী রাজনৈতিক নেতৃগণ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুরোবর্ত্তী করিয়া, তাঁহাকে বিশেষ অভ্যর্থনা করেন। কিন্তু কংগ্রেসের এক পক্ষ মণ্টেগুর আগমনকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন নাই। চিত্তরঞ্জন, নবীন যুগের রাজনৈতিক নেতাদিগের পক্ষ হইতে ভারতবাসীর ন্যূনতম দাবী ভারতসচীবের নিকট প্রেরণ করেন। এই সকল আন্দোলনের মধ্যেই, তিনি একবার সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ করেন এবং বহু স্থানে

রাজনৈতিক বক্তৃতা প্রদান করেন। এই আন্দোলন উপলক্ষ করিয়াই, সুরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার ঘোরতর মতভেদ হয় এবং তিনি প্রকাশ্য ভাবে ও তীব্রভাবে সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ মধ্য-পন্থী রাজনীতিকগণকে আক্রমণ করিতে থাকেন। ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দে অমৃতসর নগরে জাতীয় মহাসমিতির যে অধি-বেশন হয়, তাহাতে প্রবর্ত্তয়িতব্য নূতন ভারতশাসন পদ্ধতির (রাজনৈতিক ইতিহাসে উহা মণ্টফোর্ড রিফর্ম Montford Reform, নামে খ্যাত। চেম্‌সফোর্ড, লর্ড দেখ) প্রতিবাদ করিয়া বক্তৃতা করেন এবং তৎপরে কলিকাতায় এক জনসভায় পূর্ব্বোক্ত ভারত রক্ষা আইনের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাই-বার সংকল্প প্রকাশ করেন, তাহাও সমর্থন করেন।

এই সময়ে মহাত্মা গান্ধীই প্রকৃতপক্ষে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান নেতার স্থান লাভ করেন। অন্যান্য প্রদেশসমূহ প্রায় এক বাক্যে তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লয়। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে চিত্তরঞ্জন মহাত্মা গান্ধীর সমুদয় প্রস্তাব বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করেন নাই। ১৯২০ খ্রীঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে মহাত্মা কর্ত্তৃক "অসহযোগ আন্দোলন" (Non-Co-operation Movement) আরম্ভ হয়। ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতাতে জাতীয় মহাসমিতির যে বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহাতে তিনি মহাত্মার অ-সহযোগ-নীতির বিরোধিতা করেন ; কিন্তু তৎ-সত্ত্বেও উহাকে রাজনৈতিক আন্দো-লনের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করা হয়। পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে যখন পুনরায় জাতীয় মহাসমিতির সাধারণ অধিবেশন হয়, তখন চিত্তরঞ্জন মহাত্মার নীতি স্বীকার করেন এবং তৎফলে পরবর্ত্তী জানুয়ারী মাসে আইন ব্যবসায় একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে নিজেকে উৎসর্গ করিলেন।

এই সময় হইতে মৃত্যুকালাবধি তিনি বাঙ্গালার একচ্ছত্র রাজনৈতিক নেতা হইলেন। মাত্র কয়েক বৎসর মধ্যেই তিনি তাঁহার অসাধারণ কর্ম্ম-পদ্ধতি, দূরদৃষ্টি, তীক্ষ্ণ রাজনীতি জ্ঞান প্রভৃতির পরিচয় দিয়া শাসক ও শাসিত সকল শ্রেণীর লোকের তুল্য শ্রদ্ধা ও প্রশংসা লাভ করেন। প্রভূত অর্থ উপার্জ্জনের পথ পরিত্যাগ করিয়া, তিনি সন্ন্যাসীর ন্যায় দেশের সকল শ্রেণীর লোকের সহিত সমভাবে সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়া লইলেন। তাঁহার সেই ত্যাগ ও মহান আদর্শের প্রভাবেই তিনি অল্পদিনেই সমগ্র বাঙ্গালীর হৃদয়ে যে আসন লাভ করিলেন, তাহা এদেশে আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই।

এই সময় হইতে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান কার্য্য ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী দিয়ে দেওয়া গেল। ১৯২১ খ্রীঃ অব্দে পূর্ব্ব বঙ্গের ও আসামের বহুস্থান রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য ভ্রমণ করেন ও ঢাকাতে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বৎসরের শেষভাগে ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারত পরিদর্শনে আগমন করেন। কংগ্রেস উহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সমগ্র দেশে সত্যাগ্রহ ঘোষণা করে। তৎফলে বাঙ্গালা দেশে যে আন্দোলন হয়, তাহাতে প্রথমে (ডিসেম্বর মাসে) তাঁহার পুত্র, পত্নী ও অন্যান্য কয়েকজন আত্মীয় গ্রেপ্তার হন। কয়েক দিন পরে, (১০ই ডিসেম্বর) চিত্তরঞ্জন স্বয়ংও গ্রেপ্তার হন। ঐ বৎসর আহমদাবাদ নগরে অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিচারাধীন বন্দী বলিয়া, সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে পারেন নাই। হাকিম আজমল খাঁ তাঁহার পরিবর্ত্তে কাজ করেন। পরবর্ত্তী জানুয়ারী মাসের ৬ই, বিচারে তিনি ছয় মাস কারাদণ্ড লাভ করেন। ছয় মাস পরে মুক্তি লাভ করিলে, কলিকাতাস্থ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে (পূর্ব্ব নাম মির্জ্জাপুর পার্ক) তাঁহাকে এক বিরাট সভায় অভিনন্দন প্রদান করা হয়। ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে গয়া নগরীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে, তিনি পূর্ব্ব রাজনৈতিক মত কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া, আইন সভায় (Legislative Council) প্রবেশ সমর্থ করেন। কিন্তু গয়ার অধিবেশনে উহা সমর্থিত না হওয়ায়, চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহরু নেতৃবর্গের সহিত মিলিত হইয়া, স্বরাজ্যদল নামে এক পৃথক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। কিন্তু পরবর্ত্তী বৎসর কোকনদে অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে রাষ্ট্র সভায় প্রবেশ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইলে, চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহরু প্রমুখ নেতৃবর্গের নেতৃত্বে স্বরাজ পন্থীরা অধিক সংখ্যায় রাষ্ট্র সভায় প্রবেশ করেন। ঐ নির্ব্বাচন দ্বন্দে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশরঞ্জন দাস (S. R. Das) প্রমুখ মধ্য পন্থী নেতারা পরাজিত হন। নির্ব্বাচনান্তে, সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নেতা রূপে চিত্তরঞ্জন মন্ত্রী মণ্ডল গঠন করিবার জন্য আহুত হন। কিন্তু তিনি অস্বীকৃত হইলে অন্য পক্ষীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু এই মন্ত্রী মণ্ডল দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। এক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা রাষ্ট্র সভায় চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে মন্ত্রীদিগের বেতন না মঞ্জুর হওয়ায় মন্ত্রীগণ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার পূর্ব্বে চিত্তরঞ্জন রাজনৈতিক কারণে প্রধানতঃ

চাকুরী বিভাগের উদ্দেশ্যে হিন্দু মুসলমান চুক্তি (Pact) রচনা করেন। তাঁহার ঐ কার্য্য দেশবাসী সন্তুষ্ট চিত্তে সমর্থন করে নাই। প্রধানতঃ হিন্দুরা উহার ঘোরতর প্রতিবাদ করে।

নূতন শাসন তন্ত্রের প্রথম স্বায়ত্ত শাসন লাভমূলক ঘটনা কলিকাতা পৌর তন্ত্রের (Municipality) কার্য্য সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আইন প্রণয়ন। ঐ নূতন বিধির বলে স্বরাজ্য দলই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় পৌরসভার সদস্য হন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন উহার প্রথম 'মহানাগরিক' (Mayor) নির্ব্বাচিত হন। ১৯২৪ খ্রীঃ অব্দের প্রায় মধ্যভাগে তারকেশ্বরের মোহান্ত সতীশচন্দ্র গিরির বিরুদ্ধে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং চিত্তরঞ্জনের নির্দ্দেশে জাতীয় মহাসমিতির পক্ষ হইতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হয়। মাসাধিককাল আন্দোলনের পর একটি আপোস হইলে আন্দোলন স্থগিত হয়।

১৯০৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে দেশে বিপ্লবী দল গড়িয়া উঠিতেছিল। চিত্তরঞ্জন রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া প্রথমাবধি গুপ্ত হত্যা প্রভৃতির বিরুদ্ধে মত প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, প্রকাশ্য আইন সঙ্গত ভাবে আন্দোলনই শ্রেষ্ঠ পন্থা। তবে একান্ত আবশ্যক হইলে আইন ভঙ্গ করিয়া আন্দোলন করাও চলিতে পারে। কিন্তু গুপ্ত হত্যামূলক বৈপ্লবিক কার্য্য দ্বারা বিশেষ ফল লাভ হয় না। ১৯২৫ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে তিনি এক ঘোষণা পত্র প্রচার করেন। তাহাতে শাসন কর্ত্তৃপক্ষের দমন নীতির যেরূপ তীব্র প্রতিবাদ করেন, উন্মার্গগামী বৈপ্লবিকদিগকেও সেইরূপ তিরস্কার করেন। ঐ বৎসর মে মাসে ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মিলনের সভাপতি রূপে তিনি স্বরাজ্য দলের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি মতবাদ (সম্মান জনক সর্ত্তের সহযোগীতা) প্রচার করেন, তাহাতে স্বরাজ্য দলের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং অনেকে প্রকাশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধতা করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ের মধ্যে তদানীন্তন ভারত সচীব (Secretary of State for India) লর্ড বার্কেনহেড (Lord Barkenhead) বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা লর্ড লিটন (Lytton) এবং বড়লাট লর্ড রেডিং (Reading) ও চিত্তরঞ্জনের মধ্যে নানা বিষয়ে আলোচনা, মতামত বিনিময় প্রভৃতি চলিতেছিল। প্রকৃত পক্ষে ঐ সময়ে কিছুকালের জন্য চিত্তরঞ্জন দাসই সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক অগ্রদূতরূপে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সকল আলোচনা প্রভৃতির ফল বিশেষ কিছুই হয় নাই।

অত্যধিক মানসিক ও শারীরিক

পরিশ্রম এবং দীর্ঘকালাভ্যস্ত সৌখিন জীবনের পরিবর্ত্তে, কঠোর সংগ্রামময় জীবন যাত্রার ফলে, অচিরেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং ১৯২৫ খ্রীঃ অব্দের প্রথমভাগে তিনি বিশ্রাম লাভের জন্য প্রথমে বাঁকিপুর ও তৎপরে দারজিলিং গমন করেন। এই শেষোক্ত স্থানে তাঁহার জীবনান্ত হয়।

চিত্তরঞ্জন যৌবনের প্রথম হইতেই সাহিত্য রসিক ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার প্রথম কবিতা পুস্তক 'মালঞ্চ' প্রকাশিত হয়। তৎপরে ক্রমে ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দে 'মালা', ১৯১৩ খ্রীঃ অব্দে 'সাগর সঙ্গীত', ও তাহার দুই বৎসর পরে 'অন্তর্যামী' নামক কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁহার অপর কাব্য গ্রন্থের নাম 'কিশোর কিশোরী'। এতদ্ভিন্ন তিনি কয়েক বৎসর 'নারায়ণ' নামক একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

চিত্তরঞ্জনের পূর্ব্ব পুরুষদের মধ্যে অনেকেই দানশীলতার জন্য খ্যাত ছিলেন। তাঁহার পিতা ভুবন মোহন (মৃত্যু ১৯১৪ খ্রীঃ) এক বন্ধুর জন্য প্রতিভূ হইয়া, ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দে দেউলিয়া হইতে বাধ্য হন। মাত্র সাত বৎসরের মধ্যে চিত্তরঞ্জন পিতার ঋণের সমুদয় অর্থ আদালতে জমা দিয়া দেউলিয়া হইতে পিতাকে মুক্ত করেন। তাঁহার এই অনন্যসাধারণ কার্য্যের জন্য তাঁহার প্রশংসা সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয়। চিত্তরঞ্জনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও বন্ধুরা জানেন যে, তিনি গোপন দানে কিরূপ মুক্ত হস্ত ছিলেন। প্রার্থীরা অনেক সময়ে অপ্রত্যাশিত অর্থ পাইয়া বিস্মিত হইতেন। এই দানে কখনও ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের জন্য চিন্তা মাত্র করিতেন না।

১৯২১ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে, বঙ্গদেশে যে হরতাল অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে তাঁহার একমাত্র পুত্র চিররঞ্জনকে আইন অমান্য করিতে প্ররোচিত করিয়া, তিনি বলিয়াছিলেন 'নিজের ছেলেকে ঘরে রেখে, পরের ছেলেকে বলতে পারি না জেলে যাও'। রাজনীতি ক্ষেত্রের কার্য্যসূত্রে এবং সামাজিক ব্যাপারে যাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়াছিলেন সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিতেন তাঁহার ন্যায় বন্ধুবৎসল, উদার হৃদয়, পরোপকারী ব্যক্তি বাঙ্গালা দেশে অধিক জন্মগ্রহণ করে নাই। বন্ধুবান্ধবগণকে অকপটে বিশ্বাস করিয়া তিনি অনেকবার প্রভূত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন। অনেক স্থলে আশা ভঙ্গ জনিত মনোকষ্ট পাইয়াছেন, তথাপি কেহ তাঁহাকে কখনও অনুযোগ করিতে শুনেন নাই। দেশের একাধিক মনীষী তাঁহার নিকট হইতে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অর্থ সাহায্য পাইতেন। তাঁহার প্রদত্ত অর্থই, কাহারও

কাহারও প্রধান জীবনাবলম্বন ছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে প্রকাশ্য ভাবে যোগদান অনেকটা পরে করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজনৈতি আন্দোলনের নানা বিভাগের জন্য অর্থ ব্যয় বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই করিতেন। দেহান্তরের কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতাস্থ নিজ বাসভবন জনহিতকর কাজের জন্য উৎসর্গ করিয়া ন্যাসরক্ষক (Trustees) নিযুক্ত করিয়া দেন। সেই স্থানে তাঁহার মৃত্যুর পর "চিত্তরঞ্জন সেবা সদন" নামে নারী-চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। ঐ প্রতিষ্ঠানটি ক্রমেই জনসাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ করিয়া দ্রুত উন্নতির পথে চলিয়াছে।

শেষজীবনে চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণব মতের বিশেষ প্রভাবাধীন হন। যদিও তাঁহার পিতা বরাবরই ব্রাহ্মসমাজে একজন নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন, চিত্তরঞ্জনও ব্রাহ্ম মতে অসবর্ণ বিবাহ করিয়া দীর্ঘকাল ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত বলিয়াই জনসমাজে পরিচিত ছিলেন। তথাপি রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রবেশ লাভের পর হইতেই তিনি দেশ প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং অনেক স্থলেই নিজেকে হিন্দু সমাজ ভুক্ত বলিয়াই পরিচয় দিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, পুত্র চিররঞ্জন প্রচলিত হিন্দু সমাজানুমোদিত প্রথাতেই পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হেতু বিশ্রাম লইবার জন্য তিনি ১৯২৫ খ্রীঃ অব্দের মে মাসের মধ্যভাগে দারজিলিং গমন করেন। তথায় বিশেষ ফল লাভ করেন নাই, ঠিক এক মাস পরে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে ১৬ই জুন তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। পর দিবস বিশেষ ব্যবস্থায়, রেল যোগে তাঁহার মৃতদেহ কলিকাতায় আনিত হয় এবং প্রভূত সমারোহ সহকারে সহর প্রদক্ষিণ করাইয়া, কালিঘাট কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে সৎকার করা হয়। এই উপলক্ষে যে জনসমাগম হইয়াছিল, ভারতবর্ষের কোনও জন নায়কের শ্মশান যাত্রায় এরূপ জনসমাগম কখনও হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে, তাঁহার দাহ স্থানের উপরে এক সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হয়।

চিত্রমতিকা দেবী—তিনি বঙ্গের পালবংশের শেষ নরপতি মদন পালের পট্ট মহিষী ছিলেন। মহাভারত পাঠ শ্রবণ করিয়া তিনি দক্ষিণা স্বরূপ চম্পাহিট্টি নিবাসী বটেশ্বর স্বামী শর্ম্মাকে পৌণ্ড্র ভুক্তির অন্তঃপাতী কোটিবর্ষ বিষয়ের কাষ্ঠগিরি গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

চিত্রসেন রায়, রাজা—চিতুয়া বরদার জমিদার শোভাসিংহের অধস্তন ৩য় পুরুষ তাঁহার পিতার নাম কীর্ত্তিচন্দ্র। পিতার মৃত্যুর পর চিত্রসেন বাদশাহের নিকট হইতে সনন্দ ও রাজা উপাধি

লাভ করেন (১৭৪০ খ্রীঃ)। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজ্যাধিকারী হন।

চিৎসুখাচার্য্য—তিনি একজন দার্শনিক পণ্ডিত। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—তত্ত্ব প্রদীপিকা। নিষ্কর্ম্ম সিদ্ধির টীকাকার জ্ঞানোত্তম মিশ্র তাঁহার গুরু ছিলেন। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

চিদম্বর—মধ্যযুগের একজন সংস্কৃত কবি। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম "রাঘব-পাণ্ডবীর-যাদবীয়"। উহাতে এক সঙ্গে 'রামায়ণ', 'মহাভারত' ও যদুবংশের আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। একই শ্লোক, বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করিলে বিভিন্ন বিবরণ হইবে। উক্ত কাব্য বক্রোক্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

চিদানন্দ—জৈন সাধক। তিনি খ্রীঃ ১৯০ সালের প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম কর্পূর চন্দ্র; চিদানন্দ উপনাম। জৈন প্রধান কাঠিওয়াড়ের অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন এবং জৈন দর্শনে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি প্রেমভক্তিমূলক বহু পদ রচনা করিয়াছিলেন। পদগুলি ভাব ও ভাষার মাধুর্য্যে অতি মনোরম। তদ্‌রচিত কয়েকখানি পুস্তকও পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি প্রধানতঃ পূর্ব্বোক্ত পদাবলীর সংকলন।

চিনকুলিজ খাঁ, নিজাম উলমলুক আসফ ঝা—হজরত মোহাম্মদের পর হজরত আবু বকর প্রথম খলিফা হন। হায়দরাবাদের নিজাম হজরত আবুবকরের বংশধর। তাঁহার পিতামহ আবিদ খাঁ সম্রাট শাহ জাহানের সময়ে ভারতবর্ষে আসেন এবং চারি হাজারী সেনাপতির কাজ প্রাপ্ত হন। কিন্তু ১৬৮৬ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট আওরঙ্গজীবের সময়ে গোলকুণ্ডা নগরের অবরোধকালে কামানের গোলায় নিহত হন। আবিদ খাঁর পুত্র গাজীউদ্দিন ফিরোজজঙ্গ। তাঁহার প্রকৃত নাম মীর সাহাবুদ্দিন। সম্রাট আওরঙ্গজীব তাঁহাকে আমীর শ্রেণীতে উন্নীত করিয়া গাজীউদ্দিন ফিরোজ জঙ্গ উপাধি প্রদান করেন। সম্রাট বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে তিনি গুজরাটের সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৭১০ খ্রীঃ অব্দে আহমদাবাদে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহারই পুত্র বিখ্যাত চিনকুলিজ খাঁ। ১৬৪৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা ও পিতামহের সঙ্গে থাকিয়া তিনি যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করেন। অচিরকাল মধ্যে একজন বিখ্যাত যুদ্ধা ও অসাধারণ রাজনীতিবিদ বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ১৭১৩ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট ফরোকশিয়ার তাঁহাকে নিজাম-উল-মলুক আসফ ঝা উপাধি প্রদানপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী পদ প্রদান

করেন। এই সময়ে মুঘল রাজত্বের পতন আরম্ভ হইয়াছে। তৎকালে বিহারের সুবাদার হোশেন আলী খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতা এলাহাবাদের সুবাদার আবদুল্লা খাঁর সাহায্যে ফরোক শিয়ার সম্রাট হইয়াছিলেন। সুতরাং সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় রাজ্যে যথেষ্ট ক্ষমতাশালী হইলেন। সম্রাট তাঁহাদের ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে যাইয়া নিহত হইলেন। অবশেষে ১৭১৯ খ্রীঃ অব্দে মোহাম্মদ শাহ সম্রাট হইলেন। তিনি চিনকুলিজ খাঁর সাহায্যে সৈয়দ হোশেন আলী খাঁকে নিহত ও আবুদুল্লা খাঁকে পদচ্যুত করিয়া চিনকুলিজ খাঁকে প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদান করিলেন। রাজ দরবারের অন্যান্য কর্ম্মচারীদের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তিনি নিজ রাজ্যে দাক্ষিণাত্যে চলিয়া গেলেন। ১৭24 খ্রীঃ অব্দে তিনি স্বাধীন রাজা বলিয়া দিল্লীর অধীনতা ছিন্ন করিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত অন্যান্য প্রদেশেও অনুসৃত হইল। এই বিচক্ষণ নরপতি ক্রমাগত তাঁহার রাজ্য সীমা বর্দ্ধন করিয়া ১৭৪৮ খ্রীঃ অব্দে ১০৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনিই ইংরেজদের সঙ্গে প্রথম সদ্ভাব স্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র চতুষ্টয়—গাজীউদ্দিন, নাসির-জঙ্গ, সলাবতজঙ্গ ও নিজাম আলী এবং দৌহিত্র মজাফরজঙ্গের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। নাসিরজঙ্গ নিজাম হইলেন। কিন্তু মজাফরজঙ্গ ফরাসীদের সাহায্যে ১৭৫১ খ্রীঃ অব্দে নাসিরজঙ্গকে পরাজিত ও নিহত করিয়া নিজাম হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে সলাবতজঙ্গ ফরাসীদের সাহায্যে নিজাম হইলেন। ১৭৬১ খ্রীঃ অব্দে নিজাম আলী তাঁহার ভ্রাতা সলাবতজঙ্গকে পরাস্ত করিয়া নিজাম হইলেন। ১৭৬৩ সালে সলাবতজঙ্গ নিহত হইলেন। নিজাম আলী ১৮৬৬ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৭৬৬ সালে ইংরেজ ও নিজামের মধ্যে প্রথম সন্ধি হয়। দেশীয় রাজ্যের মধ্যে নিজামই প্রথম ইংরেজদের প্রাধান্য স্বীকার করেন। পরে ১৭৯৮ সালে ও ১৮০০ সালে আরও দুইটী সন্ধি হয়। ১৮০৩ সালে নিজাম আলীর মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র নিজাম সেকেন্দর ঝা সিংহাসন লাভ করেন। ১৮২৯ সালে তিনি পরলোক গমন করেন এবং তাঁহার পুত্র নিজাম নাসিরউদ্দৌলা রাজ্য লাভ করেন। তিনি ১৮৫৭ সালে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র নিজাম অবজল-উদ্দৌলা রাজা হন। তাঁহার পুত্র আসফ ঝা নিজাম-উল-মলুক ১৮৬৯ সালে নিজাম হইয়াছিলেন। ১৮৬৬ সালের ১৮ই আগষ্ট তাঁহার জন্ম হয়। সুতরাং রাজ পদ লাভকালে তিনি নিতান্ত শিশু ছিলেন। তিনি একজন বদান্য নিজাম ছিলেন। ১৮৮৭ সালে সীমান্ত

যুদ্ধে ৬০ লক্ষ টাকা দান করেন। তিনি ১৯১১ সালে পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র ওসমান আলী খাঁ ফতেজঙ্গ নিজামের পদ লাভ করিয়াছেন। ১৮৮৬ সালে তাঁহার জন্ম হয়।

দেশীয় রাজ্যের মধ্যে হায়দরাবাদ রাজ্য সব চেয়ে বড়। ইহার পরিমাণ ফল ৮২৬৯৮ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা প্রায় এক কোটী বেয়াল্লিশ লক্ষ। রাজস্ব ৮ কোটী ৯২ লক্ষ।

চিনুভাই মাধবলাল, সর্দ্দার, সার —বোম্বাই প্রদেশের একজন ধনকুবের ব্যবসায়ী ও লোক হিতৈষী। ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতামহ এবং পিতাও উচ্চ শ্রেণীর ব্যবসায়ী ছিলেন। চিনুলালের পিতামহ রণছোড় লাল মাধবলাল সর্ব্ব প্রথম আহম্মদাবাদে কাপড়ের কল স্থাপন করেন। পিতামহ ও পিতার নিকট তিনি ব্যবসায় শিক্ষা করেন এবং ক্রমে তাঁহাদের মৃত্যুর পর নিজে বিস্তৃত ব্যবসায়ের কর্ত্তা হন। তিনি আহম্মদাবাদে পিতার নামে একটি "বিজ্ঞান গবেষণাগাড়" (Science Institute) এবং পিতার নামে ও পিতামহের নামে একটি শিল্প বিদ্যালয় (Technical Institute) স্থাপন করেন। এতদ্ভিন্ন সাধারণ শিক্ষার জন্য উচ্চ বিদ্যালয়, হাঁসপাতাল, সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি বহু সৎকার্য্যে অনেক লক্ষ টাকা দান করেন। তিনি দীর্ঘকাল আহম্মদাবাদ কাপড়ের কলের মালিকদের সঙ্ঘের (Mill Owners' Association) সভাপতি ছিলেন। তদ্ভিন্ন বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়ের সহিতও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। কিছুকাল তিনি আহম্মদাবাদ পুরতন্ত্রের (Municipality) সহঃ সভাপতি ছিলেন।

নানা সৎকার্য্যে তাঁহার সহানুভূতি ও দানশীলতার জন্য তিনি ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে সি-আই-ই (C. I.-E.) ১৯০৯ খ্রীঃ অব্দে "সর্দ্দার" এবং তাহার কয়েক বৎসর পরে "সার" (Knight) উপাধিতে ভূষিত হন।

চিন্তামণি—(১) তিনি রমল সম্বন্ধে 'রমল চিন্তামণি' ও রমলোৎকর্ষ' নামে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 'গ্রহগণিত চিন্তামণি' নামক গ্রন্থও তাঁহার রচিত।

চিন্তামণি--(২) কল্যাণ পণ্ডিতের পুত্র চিন্তামণি 'দশা চিন্তামণি' গ্রন্থের রচয়িতা।

চিন্তামণি—(৩) পণ্ডিত চিন্তামণি 'প্রশ্নতন্ত্র' নামে একখানা জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

চিন্তামণি—(৪) এই চিন্তামণি আচার্য্য 'ভাবচিন্তামণি' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। পরশুরাম মিশ্র ইহার একখানা টীকা রচনা করিয়াছেন।

চিন্তামণি—(৫) তিনি 'মুহূর্ত্ত মালা' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

চিন্তামণি—(৬) জ্ঞানরাজের পুত্র চিন্তামণি, জ্ঞানরাজ কৃত 'সিদ্ধান্তরাজ' গ্রন্থের একটী উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছেন।

চিন্তামণি ঘোষ—প্রবাসী বাঙ্গালী ব্যবসায়ী। তাঁহার পিতা উত্তর পশ্চিম ভারতের সরকারী কাজে নিযুক্ত ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই চিন্তামণি বাবুকে অর্থোপার্জ্জনে ব্রতী হইতে হয়। তিনি প্রথমে এলাহাবাদের পাইয়োনীয়ার (The Pioneer) নামক প্রসিদ্ধ ইংরেজি পত্রিকার কার্য্যালয়ে মাত্র দশ টাকা বেতন হিসাব রাখার কাজে নিযুক্ত হন। ঐ কাজে থাকিবার সময়ে নিজ কাজ সুচারুরূপে করিবার জন্য সকলেরই বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। উচ্চতন ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ তাঁহার কাজে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। কয়েক বৎসর পরে, ঐ আফিসের কাজ ছাড়িয়া এলাহাবাদের আবহ আফিসে দায়ীত্বপূর্ণ উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর ছিল। ঐ অল্প বয়সের যুবককে প্রধান কেরাণীর দায়ীত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করাতে অনেকে অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু আফিসের প্রধান কর্ত্তা (Metereologist) ইলিয়ট সাহেব বিশেষ পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হন এবং চিন্তামণি বাবুকেই উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। সেখানেও তিনি কার্য্য দক্ষতা, অধ্যবসায়, প্রভৃতি গুণের জন্য প্রশংসা ভাজন হন। কিন্তু সরকারী চাকরী বরাবর করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময়েই তিনি ছোট একটী মুদ্রণযন্ত্র ও কিছু অক্ষর লইয়া ছোট খাট ছাপার কাজ আরম্ভ করিয়া দেন। ক্রমে বেশী কাজ পাইতে আরম্ভ হওয়ায়, চাকরী ছাড়িয়া দিয়া বড় ভাবেই ছাপাখানার ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন এবং সাধুতা, অধ্যবসায় ও কার্য্য দক্ষতার গুণে মৃত্যুর পূর্ব্বে উহাকে ভারতের শ্রেষ্ঠ পুস্তক প্রকাশক ও মুদ্রালয় রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার এলাহাবাদের প্রধান কার্য্যালয়ে ইংরেজি, বাঙ্গালা আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, হিন্দি ও উর্দ্দু এই কয় ভাষায় মুদ্রণ কাজ হইত। নির্ভুল ও উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য তাঁহার এত চেষ্টা ছিল যে, অনেক সময়ে শত সহস্র মুদ্রা ক্ষতি স্বীকার করিয়াও, মুদ্রিত পুস্তকাদি নষ্ট করিয়া নূতন করিয়া ছাপিয়া দিতেন। তাঁহার মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত পুস্তকাদির দ্বারা যেন তাঁহার ব্যবসায়ের গৌরব হানী না হয়, ইহাই ছিল তাঁহার প্রধান চেষ্টা। মুদ্রাযন্ত্রের বিস্তৃতির সহিত তিনি অক্ষর ঢালাই, চিত্রাঙ্কন ও ছবির ব্লক (block) ইত্যাদি প্রস্তুত প্রভৃতি আনুষঙ্গিক প্রায় সমুদয় কার্য্যের ব্যবস্থাই ক্রমে করেন। সর্ব্ব বিষয়ে যথাসাধ্য স্বাবলম্বী হইবার জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি প্রস্তুত করিবার জন্যও যন্ত্র স্থাপন করেন। বস্তুতঃ

তাঁহার "ইণ্ডিয়ান প্রেস" সর্ব্ব বিষয়েই একটী আদর্শ যন্ত্রালয় ছিল। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর এত বৃহৎ প্রতিষ্ঠান অতি সামান্যই আছে। উহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয়। দশ টাকা বেতনের অতি সামান্য কেরাণীর কাজে জীবন আরম্ভ করিয়া, তিনি যে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাও সকলের আদর্শ স্থানীয় হইবার যোগ্য। পরিণত বয়সে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে, এলাহাবাদ নগরে এই কর্ম্ম-বীরের নশ্বর জীবনের অবসান হয়।

চিন্তামণি দীক্ষিত—বাৎস গোত্রীয় সাতারা নগরবাসী চিন্তামণি দীক্ষিত ১৭১৩ শকে (১৭৯১ খ্রীঃ অব্দে) 'গোলানন্দ' নামক বেধমন্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ এবং 'সূর্য্য সিদ্ধান্তের এক 'সারণী' প্রণয়ন করিয়াছেন। রমি নামে কোনও জ্যোতিষী এই গোলানন্দের টীকা লিখিয়াছেন।

চিন্তামণি দেবী—মানভূম জিলার সতের খানি তরফের জমিদার লাল-সিংহের পৌত্র, ভরতসিংহের পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁহার এক মাত্র কন্যা চিন্তামণি দেবীর সহিত মানভূম জিলার বেগুণ কোদর রাজবংশের রাজা দিগ-ম্বর সিংহের পুত্র জঙ্গরাম সিংহের বিবাহ হয়। জঙ্গরাম সিংহের মনো-মোহন, ভিক্ষাম্বর ও বৃন্দাবন নামে তিন পুত্র জন্মে। তাঁহাদের চিরন্তন জ্যেষ্ঠাধিকার প্রথানুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্র মনোমোহন সিংহ সতের খানি তরফের বর্ত্তমান জমিদার। লালসিংহ দেখ।

চিন্তামণি ভট্ট—প্রচীন সংস্কৃত কবি। তিনি "শুক সপ্ততি" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি খুব সম্ভব খ্রীঃ দশম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

চিন্তামণি রঘুনাথ আচার্য্য—তিনি মাদ্রাজের জ্যোতিষ বেধশালার প্রধান সহকারী ছিলেন। পাশ্চাত্য নাবিক পঞ্জিকা আধার করিয়া তিনি ১৭৯১ শক (১৮৬৯ খ্রীঃ) হইতে দৃগ্‌গণিত পঞ্চাঙ্গ নামে একখানি পঞ্জিকা তেলেগু ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। দুইটী রূপবিকারী তারা আবিষ্কার করাতে তাঁহার বেধ নৈপুণ্যের কুশলতা প্রকাশ পাইয়াছে। তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র রাঘবা-চার্য্য পিতার মৃত্যুর পরে উক্ত পঞ্চাঙ্গ প্রকাশ করিতেছেন।

চিন্ময় রায়, দেওয়ান—তিনি বাঙ্গা-লার নবাব মুরশিদকুলি খাঁর সময়ে তাঁহার জায়গীরের সামান্য মোহরের কাজে নিযুক্ত হন। স্বীয় সাধুতা ও কর্ম্ম নৈপুণ্যে তিনি ক্রমে, দেওয়ান আলম চাঁদের সহকারীর পদ প্রাপ্ত হন। আলীবর্দ্দী খাঁ তাঁহাকে রায় রায়ান উপাধি দিয়া খালসার দেওয়ানী পদ (প্রধান রাজস্ব সচীব) প্রদান করেন। আলীবর্দ্দী খাঁর সমদর্শিতা অতুলনীয় ছিল। হিন্দু নন্দলালই প্রথমে

তাঁহার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু হিন্দু উচ্চ রাজ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

চিমনাজী আপ্পা—(১) তিনি পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি একজন বিখ্যাত যুদ্ধা ছিলেন। পর্ত্তুগিজদের অধিকৃত অনেক স্থান তিনি স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। ১৭৪১ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহারই পুত্র প্রসিদ্ধ সদাশিব রাও ভাও, যাঁহার বুদ্ধির অভাবে ১৭৬১ খ্রীঃ অব্দে পাণিপথ যুদ্ধে মহারাষ্ট্র গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছিল।

চিমনাজী আপ্পা—(২) তিনি রঘুনাথ রাও এর কনিষ্ঠ পুত্র এবং প্রথম বাজী রাও পেশোয়ার পৌত্র। তিনি দ্বিতীয় মাধব রাও নারায়ণের মৃত্যুর পরে, পুনার পেশোয়ার গদি অন্যায় রূপে অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি পরে দ্বিতীয় বাজী রাও কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। ১৭৯৬ খ্রীঃ অব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর দ্বিতীয় বাজী রাও পুণার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

চিমনাজী বাপু—তিনি নাগপুরের অধিপতি প্রথম রঘুজী ভোঁসলের পৌত্র ও মাধুজী ভোঁসলের পুত্র। তাঁহার ভাল নাম খাণ্ডুজী ভোঁসলে। একবার পেশোয়ার মন্ত্রী নানাফড়নবিশ, মাধাজী সিন্ধে, মহীশূরপতি হায়দরআলী, নিজাম উল্ মুল্ক, নিজাম আলী ও মাধোজী ভোঁসলে মন্ত্রণা করিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে কৃতসংকল্প হন। কিন্তু ইহাতে মাধোজী ভোঁসলে তত উৎসাহী ছিলেন না। তিনি স্বীয় পুত্র চিমনাজী বাপুকে ১৭৭৯ খ্রীঃ অব্দের ১১ই অক্টোবর দশহরার দিনে ৪০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সহ প্রেরণ করেন। কথা ছিল চিমনাজী সত্বর বিহার প্রদেশ আক্রমণ করিবেন। কিন্তু ৩০ লক্ষ টাকা ঘুষ লইয়া তিনি যুদ্ধে বিরত হইয়াছিলেন।

চিমনাজী শাহু—১৭৬৪ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে তিনি নাগপুরের অধিপতি রঘুজী ভোসলে কর্ত্তৃক উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৭৬৬ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে ভবানী কালুয়া পণ্ডিত উক্ত পদে নিযুক্ত হইলে তিনি নাগপুরে গমন করেন।

চিরকীর্ত্তি— জনৈক সিদ্ধোপাসক। তিনি শঙ্করাচার্য্যের নিকট পরাস্ত হইয়া তাঁহার মতানুযায়ী হইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত শ্রীশৈল পর্ব্বতে ও অন্যান্য স্থানে তাঁহাদের সম্প্রদায় অবস্থান করিত। তাঁহারা দীর্ঘ জীবন লাভ প্রয়াসী ও আপাতরম্য সুখভোগ প্রয়াসী ছিলেন। সেজন্য বিচিত্র রম্য ভূষণে সজ্জিত হইতেন।

চিরঞ্জীবভট্টাচার্য্য—বঙ্গদেশের এক জন প্রাচীন পণ্ডিত। তাঁহার 'বিদ্বোন্মাদ তরঙ্গিনী' একখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

চিরঞ্জীব শর্ম্মা—প্রাচীন বাঙ্গালী পণ্ডিত। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ আদিশূর কর্ত্তৃক আনিত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রাঘবেন্দ্র। চিরঞ্জীবের পিতৃদত্ত নাম বামদেব। কিন্তু তিনি জ্যেষ্ঠতাত দত্ত চিরঞ্জীব নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। অতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার প্রতিভার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি স্বীয় পিতার নিকটেই প্রায় সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। দর্শন, অলঙ্কার, ছন্দ প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। তদ্‌রচিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে অলঙ্কার সম্বন্ধীয় "কাব্য বিলাস"; "বৃত্তরত্নাবলী", "মাধবচম্পু" ও "বিদ্বোন্মাদ তরঙ্গিনী"। শেষোক্ত গ্রন্থে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বেশভূষা আচার ব্যবহারের মনোহর বর্ণনা আছে। তদ্ভিন্ন নানা দার্শনিক আলোচনা ও বিচারও তাহাতে আছে। চিরঞ্জীব শর্ম্মা রঘুদেব ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহার গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাঢ় দেশে যশোবন্ত সিংহ নামক এক পরাক্রমশালী ভূম্যধিকারী ছিলেন। তাঁহার জীবিতকালে ঢাকায়, আর একবার টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় হইত। সেই জন্য তিনি শায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রসিদ্ধ দ্বার উন্মোচন করেন। চিরঞ্জীব শর্ম্মা এই যশোবন্ত সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া কথিত হন।

চিরাত দত্ত—তিনি মহারাজাধিরাজ কুমার গুপ্তের সময়ে পুণ্ড্র বর্দ্ধন ভুক্তির একজন শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই চিরাত দত্ত কর্ত্তৃক নিযুক্ত বেত্রবর্ম্মা নামক কুমারামাত্য কোটিবর্ষ নামক বিষয়ের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

চিলারী বা চিলা রায়—কোচবিহারের নরপতি বিশ্বসিংহ ১৫৪০ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নরসিংহ কিছু দিনের জন্য রাজপদ অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহার অগ্রজ মল্লদেব তাঁহাকে তাড়াইয়া নরনারায়ণ নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং স্বীয় অনুজ শুক্লধ্বজকে প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করেন। তিনি অতি ত্বরিত গতিতে পররাজ্য আক্রমণ করিয়া অধিকার করিতেন, সেজন্য লোকেরা তাঁহাকে চিলারী বা চিলা রায় বলিয়া অভিহিত করিত। শুক্লধ্বজ দেখ।

চুণীলাল চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার—কলিকাতার নিকটবর্ত্তী উত্তরপাড়া নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে গণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঔরসে ১২৬৫ বঙ্গাব্দের (১৮৫৮ খ্রীঃ) জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ হরনাথ সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন পূর্ব্বক সামরিক বিভাগের রসদ সরবরাহ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিছুকাল কার্য্য করিয়া

প্রচুর অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি বিখ্যাত 'হলদে বাটী' নির্ম্মাণ ও জমিদারী ক্রয় করিয়া অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন করেন। চুণীলালের পিতা গণেশ এফ-এ পাশ করিয়া অম্লশূল রোগের জন্য কিছুই করিতে পারেন নাই। তিনি ৪৫ বৎসর বয়সেই পরলোক গমন করেন। চুণীলাল পাঠ্যাবস্থায়ই হোমিও-প্যাথী চিকিৎসার দিকে আকৃষ্ট হন। ক্রমে প্রবেশিকা, এফ-এ ও বি-এ পাশ করিলেন। এদিকে হোমিওপ্যাথী অধ্যয়নেও তিনি খুব অগ্রসর হইলেন। ইতিমধ্যে একজন বিশিষ্ট লোককে আরোগ্য করায়, তাঁহার নাম চারিদিকে খুব প্রচারিত হয়। এই ব্যক্তির জীবনাশা এলোপ্যাথীর বড় বড় চিকিৎসকেরা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য স্থানীয় একজন এলোপ্যাথী ডাক্তারের নিকট শরীরতত্ত্ব, অস্থিতত্ত্ব, অস্ত্র প্রয়োগ প্রভৃতি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর মধ্যে এই সমস্ত বিষয় আয়ত্ত করিয়া, তিনি একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার বলিয়া সুপরিচিত হইলেন। কেবল স্বদেশে নহে সুদুর পাঞ্জাব ও মাদ্রাজ হইতেও তাঁহার আহ্বান আসিতে লাগিল। এই প্রকারে স্বদেশ স্বজাতির সেবা করিয়া দরিদ্র বিপন্নের বন্ধু চুণীলাল ১৩৩৬ সালের ১৫ই আষাঢ় একাত্তর বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্তোষ কুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, আইনের আশ্রয় না লইয়া পিতার ন্যায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, দ্বিতীয় পুত্র মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও বি, এস, সি, এম, বি, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক।

চুণীলাল বসু, রায়বাহাদুর, সি-আই-ই — বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক ও রাজকর্ম্মচারী। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পৈতৃক নিবাস চব্বিশ পরগণা জেলার চ্যাংকড়াপোতা গ্রামে। তিনি এফ্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন এবং যথাকালে কৃতীত্বের সহিত শিক্ষা সমাপন করিয়া কলেজ পরিত্যাগ করেন। ছাত্ররূপে তিনি একাধিক পুরস্কার, বৃত্তি ও পদক লাভ করেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার কর্ম্ম জীবন আরম্ভ হয়। তিনি সরকারী চিকিৎসক (Assistant Surgeon) রূপে কিছুকাল ব্রহ্মদেশেও বাস করেন। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, তিনি বাঙ্গালা সরকারের রসায়ন পরীক্ষক (Chemical Examiner) নিযুক্ত হন এবং ঐ কাজেই বরাবর নিযুক্ত ছিলেন। কিছুকাল তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপকও ছিলেন।

১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় সর্ব্ব প্রথম নিখিল ভারত চিকিৎসা সম্মেলন (All India Medical Congress) হয়। চুনীলাল অন্যতম সহ সভাপতি ছিলেন। ঐ সম্মেলনে তাঁহারই পঠিত এক প্রবন্ধের ফলে ভারত সরকার বিষ সংক্রান্ত এক আইন প্রণয়ন করেন।

চুনীলাল দেশীয় ও বিদেশীয় বহু জনহিতকর ও বিদ্বজ্জনসভার সদস্য ছিলেন। তাহাদের মধ্যে ইংলণ্ডের রসায়ন সঙ্ঘ (London Chemical Society), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, অন্ধ বিদ্যালয়, কলিকাতা অনাথ আশ্রম, মাদক নিবারণী সভা (Temperance Federation) প্রভৃতি প্রধান। তিনি বাঙ্গালীদের মধ্যে দ্বিতীয় কলিকাতার সেরিফ (Sheriff) নিযুক্ত হন। বাঙ্গালী মহেন্দ্রলাল সরকার প্রথম শেরিফ ছিলেন। মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানানুশীলন সভায় (Indian Association for the Cultivation of Science) তিনি অনেক দিন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্রবন্ধাদি রচনা করেন।

চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি বাঙ্গালী ছাত্রদের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের জন্য নানাভাবে বিশেষ চেষ্টা করেন। এই বিষয়ে তাঁহার রচিত "বাঙ্গালীর খাদ্য" একখানী প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি রায়বাহাদুর ও ১৯১৫ খ্রীঃ অব্দে সি-আই-ই (C. I. E.) উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯৩০ খ্রীঃ অব্দে আগষ্ট মাসে (১৩৩৭ বঙ্গাব্দে, শ্রাবণ) রাঁচি নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

চূড়ামন সিংহ—বর্ত্তমান ভরতপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই ভরতপুর দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। আওরঙ্গজীব শেষবারে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধের সরঞ্জাম ও অর্থ প্রেরণ করিলে, চূড়ামন তাহা লুণ্ঠন করেন এবং সেই অর্থ দ্বারাই ভরতপুর দুর্গ নির্ম্মিত হয়। আওরঙ্গজীব সেই বারেই দাক্ষিণাত্যে গতায়ু হন। ইহা চূড়ামনের পক্ষে শুভযুগ হইল। এই সময়ে সিংহাসন লইয়া আওরঙ্গজীবের পুত্রদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। শাহজাদা মোয়াজিম স্বীয় ভ্রাতা আজীমকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়া সম্রাট হইলেন। তাঁহার পরে জাহান্দর শাহ, ফরুক শিয়ার, রফি-উদ-দরজাত, রফি উদ্দৌলা পর পর নামে মাত্র সম্রাট হইলেন। তৎপরে ১৭১৯ সালে মোহাম্মদ শাহ সম্রাট হইলেন। তিনি অন্যতম মন্ত্রী সৈয়দ হোসেন আলী খাঁকে কৌশলে বধ করিলেন। ইহাতে তাঁহার ভ্রাতা সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ বিদ্রোহী হইয়া জাঠ নরপতি চূড়ামন প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া, সম্রাট মোহাম্মদ শাহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত

হইলেন। এই যুদ্ধে চূড়ামন সিংহ ১৭২০ খ্রীঃ অব্দে নিহত হন। তৎপরে তাঁহার পুত্র (মতান্তরে ভ্রাতা) বদন সিংহ ভরতপুরের রাজা হন।

ভরতপুর রাজবংশাবলী।

(১) চূড়ামন সিংহ মৃত্যু—১৭২০)
|
(২) বদন সিংহ
|
(৩) সুরজমল সিংহ
|
(৪) জবাহীর সিংহ

(৫) রতন সিংহ (৭) নবল সিংহ
|
(৬) কেহরি সিংহ

(৮) রণজিৎ সিংহ

(৯) রণধীর সিংহ (১০) বলদত্ত সিংহ

বলবন্ত সিংহ

যশোবন্ত সিংহ

চূড়ামণি—এই পণ্ডিত 'দিব্য চূড়ামণি নামক জাতক গ্রন্থের প্রণেতা।

চূড়ামণি কায়স্থ—তিনি আসামের একজন কায়স্থ কবি। তাঁহার রচিত 'জ্যোতিষ চূড়ামণি' পাটীগণিত ও জরিপ পরিমিতি সম্বন্ধীয় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

চূড়ামণি দাস—তিনি একজন পদকর্ত্তা। তাঁহার রচিত ৯টী পদ পাওয়া গিয়াছে।

চেতক—বিদেহের রাজা চেতক জৈন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীরের একজন প্রধান সহায়ক ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি জৈন ধর্ম্ম গ্রহণও করিয়াছিলেন।

চেদো—তিনি কনৌজের রাঠোর বংশীয় জয়চন্দ্রের বংশধর। মোহাম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক জয়চন্দ্র নিহত হইলে, তাঁহার পৌত্র শিবাজী স্বদেশ পরিত্যাগ, পূর্ব্বক রাজপুতানার মরুভূমিতে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহারই বংশধরেরা বর্ত্তমান যশল্মীরের অধিপতি। শিবাজী—অশ্বত্থামা—দুহর—রায় পাল—কহ্নল—জহ্লন—চেদো। এই চেদোর পুত্র থীদো। যশল্মীরের ভট্টী-দের ঐতিহাসিক গ্রন্থে ইহাদের কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। চেদো ও থীদো খুব বীর ছিলেন, প্রান্তবর্ত্তী রাজাদের, সহিত তাঁহাদের অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহ চলিত।

চৈতন্যদাস—তিনি একজন পদকর্ত্তা। তাঁহার রচিত ১৫টী পদ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীনিবাস আচার্য্যের পিতা গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ চাখান্দি গ্রামে বাস করিতেন। গঙ্গাধর পরে চৈতন্য-দাস নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—'রসভক্তিচন্দ্রিকা' ও 'দেহভেদতত্ত্বনিরূপণ'।

চৈতন্যদেব—বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সাধক শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, গৌরাঙ্গ, মহাপ্রভু, প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেখ।

ছগনলাল ঠাকুরদাস মোদি— গুজরাটি সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। তিনি সুরাটনগর নিবাসী একজন তুলা ব্যবসায়ীর পুত্র। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের (বি-এ) উপাধি লাভ করিয়া শিক্ষা বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘকাল বড়োদা রাজ্যে শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গুজরাটি ভাষায় তিনি অনেকগুলি বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

ছত্রমাণিক্য— তিনি ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের ২য় পুত্র। কল্যাণ মাণিক্যের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দ দেব, গোবিন্দ মাণিক্য উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক রাজা হইয়াছিলেন। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ দেব তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া, ছত্রমাণিক্য উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক রাজা হইয়াছিলেন (১৬৬০ খ্রীঃ)। এই সময়ে প্রসিদ্ধ ফরাসী দেশীয় ভ্রমণকারী জন বাপ্‌টিষ্টা টেবার-নিয়ার ভারত ভ্রমণে আগমন করেন। ত্রিপুরা রাজ্য ও ছত্রমাণিক্যের সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছেন। এই সময়ে বাঙ্গালার সুবাদার সুজা, তাঁহার ভ্রাতা সম্রাট আওরঙ্গজীবের ভয়ে ত্রিপুরার মধ্য দিয়া আরাকানে পলায়ন করেন ও পরে তথায় নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হন। অনু-মান ছয় বৎসর রাজত্ব করিয়া ছত্র-মাণিক্য পরলোক গমন করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পুনর্ব্বার ১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দে রাজা হন এবং ছত্রমাণিক্যের পুত্র কুমার উৎসব রায় কাদরা, আমিরাবাদ প্রভৃতি পরগণা বৃত্তি স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

ছত্রশাল বুন্দেলা— মধ্যভারতের বুন্দেল খণ্ডের অন্তর্গত মহোবা রাজ্যাধি-পতি চম্পৎ রায়ের চতুর্থ পুত্র। ১৬৫০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ছত্রশালের মাতুলের বিশ্বাসঘাতকতায় চম্পৎ রায় নিহত হইলে, ছত্রশাল ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দাক্ষিণাত্যে পলায়ণপূর্ব্বক মিরজা রাজা জয়সিংহের অধীনে মুঘল সৈন্যদলে প্রবেশ করেন (১৬৬৫ খ্রীঃ)। পুরন্দর দুর্গ অধিকারকালে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা সম্রাট আওরঙ্গজীবের প্রিয়-পাত্র হন। পাঁচ বৎসর পরে জয়সিংহের অধীনে কাজ ছাড়িয়া তাঁহারা পলায়ন-পূর্ব্বক শিবাজীর শরণাপন্ন হন। কিছু-কাল শিবাজীর সৈন্যদলে কাজ করিয়া, তাঁহারই পরামর্শে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে থাকেন। এই অভিলাষে তিনি পার্শ্ববর্ত্তী অনেক হিন্দু রাজার সহিত পরামর্শ ও তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু কেহই সাহস করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন না। এই সময়ে সম্রাট আওরঙ্গজীবের আদেশে ফিদাই খাঁ একবার হিন্দুদের

মন্দির ধ্বংস করিতে আগমন করেন। কিন্তু অকৃতকার্য্য হন। ছত্রশাল ঝান্‌সী প্রদেশকে পরকীয় শাসন হইতে মুক্ত করেন। মহারাজ ছত্রশাল বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হইলে মুসলমানেরা আবার বুন্দেলখণ্ডের স্বাধীনতা হরণে প্রয়াসী হন। মোহাম্মদ খাঁ বঙ্গস নামক মুঘল সেনাপতি বহু সংখ্যক সৈন্যসহ বুন্দেল খণ্ড আক্রমণ করেন। ছত্রশাল এই সময় বাজীরাও পেশওয়ের সৈন্য সাহায্যে মোহাম্মদ খাঁ বঙ্গসকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও প্রায় বন্দী করেন। মোহাম্মদ খাঁ বঙ্গস ছত্রশালকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তিনি বাজীরাও পেশওয়েকে উপকারের প্রতিদান স্বরূপ বুন্দেল খণ্ডের অন্তর্গত বার্ষিক ৩৩৷৷০ লক্ষ টাকা আয়ের এক প্রদেশ প্রদান করেন। ঝান্‌সী ঐ রাজ্যেরই অন্তর্গত। ছত্রশাল ১৭৩৩ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। ছত্রপতি শিবাজীর যেমন রামদাস গুরু ছিলেন, তেমনি মহারাজ ছত্রশালেরও প্রাণনাথ নামক এক সন্ন্যাসী গুরু ছিলেন। প্রাণনাথের মন্ত্রণা বলেই ছত্রশাল কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

ছত্রসিংহ—হিমালয়ের পাদদেশবর্ত্তী পাঞ্জাবের অন্তর্গত চম্বা রাজ্যের অন্যতম ভূপতি। তিনি মুঘল বাদশাহ আরঙ্গজীবের সমসাময়িক ছিলেন। ১৬৭৮ খ্রীঃ অব্দে আওরঙ্গজীব, রাজ্যস্থ সমুদয় হিন্দুমন্দির ভূমিসাৎ করিবার আদেশ দিয়া এক পরোয়ানা প্রচার করেন। তাহারই প্রত্যুত্তর স্বরূপ চম্বারাজ ছত্রসিংহ নিজ রাজ্যের সমুদয় মন্দিরের চূড়ায় স্বর্ণকলস নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। সেই সকল স্বর্ণ কলস আজিও বর্ত্তমান আছে।

ছত্রসিংহ, রাজা—আসামের অন্তর্গত জয়ন্তিয়ার রাজা বড় গোসাঞী (২য়) সন্ন্যাসী হইলে, ছত্রসিংহ রাজা হইয়া ১৭৭০—১৭৮০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। শ্রীহট্টের কোন কোন স্থানের অধিবাসীর উপর অত্যাচার করায় ইংরেজ কর্তৃক তাঁহার রাজ্য আক্রান্ত হয়। তখন অর্থ দণ্ড দিয়া তিনি নিষ্কৃতি লাভ করেন। তাঁহার পরে বিজয় নারায়ণ রাজা হইয়া ১৭৮০—১৭৯০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

ছপাতি মিয়া, ফকির—তিনি ছপাতি পাগলা নামে সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন। ময়মনসিংহ জিলার সুসঙ্গ পরগণার শঙ্করপুরে তাঁহার বাসস্থান ছিল। ১৮০২ খ্রীঃ অব্দে তিনি গারো পাহাড় অঞ্চলে একটী অভিনব রাজ্য স্থাপনের প্রয়াসী হন। প্রথমে তিনি গারো প্রভৃতি পাহাড়ী লোককে বশীভূত করিতে প্রয়াসী হন এবং কিয়ৎ পরিমাণ কৃতকার্য্যও হন। পরে পাহাড়ীরা তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে

পারিয়া প্রতিকুল হয়। বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ছপাতি মিয়া তখন অনন্যোপায় হইয়া ময়মনসিংহের কালেক্টার এফ, লি, গ্রোস সাহেবের সহিত দেখা করিয়া গবর্ণমেন্টের ৫০।৬০ হাজার টাকা আয় হইবে বলিয়া তাঁহাকে পাহাড় অঞ্চল দখল করিতে প্ররোচিত করেন। কিন্তু তৎকালীন বোর্ড অব রেভিনিউর সভোরা কালেক্টারের অভিমত অনুসারে কাজ করিতে সম্মত না হওয়ায়, ছপাতি মিয়ার রাজ্যস্থাপন কৌশল ব্যর্থ হয়।

ছাক্রু রায়—নামান্তর চিত্রসেন বা শুক্র রায়। স্বাধীন ত্রিপুরার নরপতি গঙ্গা রায়ের পুত্র ছাক্রু রায়, চন্দ্র হইতে অধস্তন ১১৩ তম এবং ত্রিপুর হইতে অধস্তন ৬৮তম নরপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তৎপুত্র প্রতীত রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। ত্রিপুর দেখ।

ছীতম জী—তিনি একজন কবীর পন্থী ভক্ত সাধু। কবীর পন্থী ভক্তবাণী সংগ্রহ গ্রন্থে তাঁহার অনেক বাণী সংগৃহীত আছে।

খাঁ—বাঙ্গালার নবাব হুশেন সাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর পুত্র। পরাগল খাঁ চট্টগ্রামে আসিয়া পরাগলপুর স্থাপন পূর্ব্বক তথায় বাস করিতে থাকেন। বিদ্যানুরাগী ছুটি খাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী নামক একজন বাঙ্গালী কবি মহাভারতের অন্তর্গত অশ্বমেধ পর্ব্বের বাংলায় পদ্যে অনুবাদ করেন।

ছেংথুম ফা—নামান্তর সিংহ তুঙ্গ ফা বা কীর্ত্তিধর। স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি ছেঙ্গাচাগের পুত্র ছেংথুম ফা চন্দ্র হইতে অধস্তন ১৪০ তম এবং ত্রিপুর হইতে অধস্তন ৯৫ তম নরপতি ছিলেন। তৎকালে হীরাবন্ত নামে গৌড়েশ্বরের এক সামন্ত নৃপতি মেহেরকুল প্রদেশে বাস করিতেন। হীরাবন্ত একদা গৌড়েশ্বরের জন্য বহু মূল্যবান্ উপঢৌকন লইয়া যাইতে ছিলেন। ত্রিপুরাপতি সেই সমস্ত ভেট ও মেহেরকুল রাজ্য বলপূর্ব্বক অধিকার করিলেন। গৌড়ের তদানীন্তন মুসলমান অধিপতি ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে এক বিপুল সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। ত্রিপুরাপতি ছেংথুম ফা এই বিপুল সৈন্য বাহিনী দর্শনে ভীত হইয়া, সন্ধি করিতে অভিলাষী হন, কিন্তু তাঁহার মহিষী মহারাণী ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী, সন্ধি করিতে অসম্মত হইয়া, স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি অসংখ্য অরাতি সৈন্য নিপাত করিয়া রাজ্যসীমা মেঘনা নদীর তীরদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিলেন (১২৪০ খ্রীঃ অব্দে)। ছেংথুম ফার মৃত্যুর পরে, তাঁহার পুত্র আচোঙ্গ ফা রাজপদ লাভ করেন। ত্রিপুর দেখ।

ছেঙ্গাচাগ— নামান্তর ধর্ম্মধর বা ছেংকাচাগ। স্বাধীন ত্রিপুরাপতি মেঘরাজের পুত্র ছেঙ্গাচাগ, চন্দ্র হইতে অধস্তন ১৩৯ তম এবং ত্রিপুর হইতে অধস্তন

৯৪ তম নরপতি ছিলেন। তিনি নিধিপতি নামক একজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত দ্বারা তাঁহার রাজধানী কৈলাসহর নগরে বৃহৎ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনের পরে, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ছেংথুম ফা (কীর্ত্তিধর) সিংহাসনে আরোহণ করেন। ছেঙ্গাচাগ খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। ত্রিপুর দেখ।

ছেঙ্গফনাই— নাগান্তর নৃসিংহ বা সিংহ ফণী। স্বাধীন ত্রিপুরার অধিপতি থারঙ্গ ফার (রামচন্দ্র) পুত্র ছেঙ্গফনাই, চন্দ্র হইতে অধস্তন ১২৪ তম এবং ত্রিপুর হইতে অধস্তন ৭৯ তম নরপতি ছিলেন। তিনি অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে, তাঁহার ভ্রাতা ললিত রায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। ত্রিপুর দেখ।

ছোটপর্ব্বত রায়—আসামের অন্তর্গত জয়ন্তিয়ার রাজা। তিনি ১৬৩৬—১৬৩৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে যশোমন্ত রায় রাজা হইয়াছিলেন।

ছোটপীর—একজন বিখ্যাত দরবেশ। তিনি শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ দরবেশ শাহ জালাল এমনির অন্যতম অনুগত শিষ্য।

ছোটপূর্ণ—যামুনাচার্য্যের পুত্র। তিনি পিতার মৃত্যুর পরে অন্যান্য শিষ্যদের সঙ্গে মঠ পরিচালনা করিতেন। যামুনাচার্য্য দেখ।

জ

জগজ্জীবন ঘোষাল, কবি—'মনসা মঙ্গল' নামক বৃহৎ কাব্যের রচয়িতা। তিনি দিনাজপুরের অন্তর্গত কোচ আমোরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজা প্রাণনাথের সমসাময়িক ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার গ্রন্থ খুব প্রচলিত ছিল।

জগজ্জীবন মিশ্র—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বংশীয় শ্রীহট্টবাসী জগজ্জীবন মিশ্র মহাশয় 'মনঃ-সন্তোষিনী' নামক একখানা ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে মহাপ্রভুর শ্রীহট্ট ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে।

জগতুঙ্গ—তিনি উড়িষ্যার তুঙ্গবংশীয় নরপতি। তাঁহার পুত্র সলাণতুঙ্গ ও পৌত্র গয়াড়তুঙ্গ। তুঙ্গবংশীয় এই শাখার মাত্র এই তিনজন রাজারই নাম পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা শাণ্ডিল্য গোত্রীয় এবং পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরের অন্তর্গত রোহিত গিরি হইতে তথায় গমন করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। এই বংশের আর একখানা তাম্রশাসনে বিনীততুঙ্গ (প্রথম) তাঁহার পুত্র খড়্গাতুঙ্গ এবং খড়্গাতুঙ্গের পুত্র বিনীততুঙ্গ (দ্বিতীয়) এই তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়। তাঁহারাও শাণ্ডিল্য গোত্রীয় এবং রোহিত গিরি হইতে তথায় গমন করিয়াছেন। কিন্তু গয়াড়তুঙ্গ প্রভৃতির সহিত তাঁহাদের কি সম্পর্ক তাহা এখনও জানা যায় নাই। শেষোক্ত রাজাদের ও তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু সন তারিখ কোনটাতেই নাই।

জগৎবল্লভ—একজন বাঙ্গালী কবি। তাঁহার রচিত একখানা মনসার ভাষাণ পাওয়া গিয়াছে।

জগৎ মাণিক্য—তিনি ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ ছত্রমাণিক্যের প্রপৌত্র। তিনি বাংলার নবাবের সাহায্যে ১৭৩২ খ্রীঃ অব্দে রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহারই সময়ে ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্র 'রোসনাবাদ' নাম প্রাপ্ত হইয়া জমিদারীতে পরিণত হয়। তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য মুঘল সেনাপতি আকা সাদেক খাঁ কুমিল্লা নগরে প্রতিষ্ঠিত হন।

জগৎ রায়—(১) তিনি বর্দ্ধমানরাজ কৃষ্ণরায়ের পুত্র। পাঠানদের সহায়তায় চিতোয়া বরদার জমিদার শোভাসিংহ বিদ্রোহী হইয়া বর্দ্ধমানের রাজা কৃষ্ণ রায়কে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়া বর্দ্ধমান অধিকার করেন। কিন্তু শোভাসিংহ নিহত হইলে, কৃষ্ণরায়ের পুত্র জগৎ রায় পুন রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি জমিদারী আরও বৃদ্ধি করিয়া করদ রাজা বলিয়া সনদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জগৎ রায়—(২) একজন বাঙ্গালী কবি। অনুমান ১৫৬২ শকে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত মহিষাড়া পরগণার

অধীন ভুলুই নামক গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রঘুনাথ রায় ও মাতার নাম শোভা দেবী। ভাষা কবিতায় তিনি 'রামায়ণ' গ্রন্থ রচনা করেন। দুর্গা 'পঞ্চরাত্রি' নামীয় তাঁহার অপর একখানি কাব্য গ্রন্থ আছে। ইহার শেষাংশ রচিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি পরলোকগত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র রামপ্রসাদ উক্ত অসমাপ্ত কার্য্য সমাপ্ত করেন।

জগৎ সিংহ—(১) শ্রীহট্টের অন্তর্গত প্রতাপগড়ের উত্তরে জগৎ সিংহ নামে একজন স্বাধীন নরপতি ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে উক্ত স্থান জগৎ সিংহগড় নামে খ্যাত ছিল।

জগৎ সিংহ—(২) অম্বরাধিপতি মান-সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি এক হাজার সৈন্যের অধিনায়ক নিযুক্ত হইয়া পিতার সমভিব্যাহারে বঙ্গদেশে আগমন করেন। এইস্থানে ক্রমে তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশিত হয়। রাজা মানসিংহ কিয়দ্দিবসের জন্য বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাপথের যুদ্ধে যোগদানার্থ গমন করিলে, জগৎ সিংহ পিতৃপদে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্য গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই অতিরিক্ত সুরা পান হেতু মৃত্যুমুখে পতিত হন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহার কন্যাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন।

জগদানন্দ—একজন প্রসিদ্ধ যাত্রা ওয়ালা। বঙ্গদেশে যাত্রার প্রচলয়িতা চন্দ্রশেখর দাসের তিনি শিষ্য ছিলেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বাল্যকালেই বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। জগদানন্দ স্বীয় গুরু চন্দ্র শেখর অপেক্ষা উচ্চদরের কবি ছিলেন। জগদানন্দের গানের শব্দবিন্যাস, ওজ-স্বিতা, মাধুর্য্য এবং ভাব এত সুন্দর যে, এক একটা গান পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিদিগের কবিতার সহিত তুলনীয় হইতে পারে। জগদানন্দ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার অধিবাসী ছিলেন। জগদানন্দ প্রণীত বহু গীতের মধ্যে কতক বটতলা হইতে প্রকাশিত 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে এবং 'অমৃত বাজার' পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'পদকল্পতরুতে' প্রকাশিত হইয়াছে।

জগদানন্দ গিরি গোস্বামী—একজন তান্ত্রিক সাধক। ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত দেবীদ্বার থানার এলকাধীন ওয়াহিদপুর গ্রামে গিরিবংশে ১৩০২ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে (১৮৯৫ খ্রী:) তান্ত্রিকাচার্য্য জগদানন্দ গিরি মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম দুর্গাচরণ গিরি ও মাতার নাম নিত্যময়ী দেবী। তাঁহারা উভয়েই তান্ত্রিক মতে সাধনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতামহ প্রসিদ্ধ তান্ত্রিকাচার্য্য সংযোগানন্দ গিরি

একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তাঁহাদের আদি নিবাস শ্রীহট্টে ছিল। সংযোগানন্দ গিরি সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক ওয়াইদপুর আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। ময়নামতী পাহাড়ে ব্রহ্মানন্দ গিরির শেষ পুরুষ মঙ্গল গিরির দৌহিত্রীর সঙ্গে সংযোগানন্দ গিরির বিবাহ হয়। তাঁহাদের বংশধরেরা শ্রীহট্ট জিলায় বাস করিতেছেন।

শৈশবকালেই জগদানন্দ গিরির পিতৃ বিয়োগ ঘটে এবং সেই সময় হইতেই অনুমান দুই হাজারেরও অধিক শিষ্যের ভার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয়। এই সব দৈব দুর্ব্বিপাকে ও নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থার জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু নিজের চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ের বলে বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। আঠার বৎসর বয়সে তিনি দারপরিগ্রহ করেন। ছাব্বিশ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার প্রথমা স্ত্রী পরলোক গমন করেন। তৎপর তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়া সুচারুরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। সংসার কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও সর্ব্বদা তান্ত্রিক কার্য্যগুলি নিয়মিতভাবে সমাধা করিয়া তিনি 'বাক্‌সিদ্ধ' পুরুষ হইয়াছিলেন। তিনি অতি সংগোপনে তান্ত্রিক কার্য্য পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা অনেকেরই ছিল না। কোন কোন সময়ে তাঁহার ২।১টী অলৌকিক ঘটনা সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হইত এবং তাহাতেই সকলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি সামান্য লোক ছিলেন না। কোন এক সময়ে স্থানান্তরে শিষ্য বাড়ীতে তিনি "ভৈরবীচক্র" করিয়াছেন, এমন সময় অল্প বয়স্ক একটি বোবা বালক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাঁহার পায়ে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। এই ভাবে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় অতীত হইয়া গেল, সকলেই নিস্তব্ধভাবে বসিয়া ব্যাপার কি হয় দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ তিনি বালকটিকে বলিয়া উঠিলেন যে—"এখনি তোমার বাক্য স্ফুরিত হইবে।" তাঁহার সাধনার বলে বাস্তবিক পক্ষে তাহাই হইল। বালকটি উঠিয়া সুন্দর রূপে কথা কহিতে লাগিল। তাঁহার এই অলৌকিক কার্য্য দর্শনে সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার জীবনে এমন অলৌকিক ঘটনা আরও অনেক দৃষ্ট হইয়াছে।

তিনি শান্ত প্রকৃতি, বিনয়ী, মিষ্টভাষী ও পরোপকারী ছিলেন। অনেক গরীব দুঃখীকে তিনি সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করিতেন। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে (১৯৩২ খ্রীঃ) মাত্র

সাঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি বিধবা স্ত্রী (হিরণ্ময়ী দেবী), কনিষ্ঠ ভ্রাতা (ক্ষিরোদানন্দ গিরি), তিনটী শিশু কন্যা (নির্ম্মলা, মনোরমা, ইন্দুবালা) ও একটী মাত্র শিশুপুত্রকে (যোগানন্দ) বর্ত্তমান রাখিয়া গিয়াছেন। আজকাল তান্ত্রিক সাধক বড় দেখা যায় না। তিনিই বোধ হয় বর্ত্তমান সময়ের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। সংযোগানন্দ গিরি দেখ।

জগদানন্দ ঠাকুর—তিনি বৈষ্ণবকুল তিলক রঘুনন্দন গোস্বামীর বংশধর। তাঁহার পিতার নাম নিত্যানন্দ ঠাকুর। তাঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস বর্দ্ধমানের অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রাম। জগদানন্দ বীরভূম জিলার জোলফাই গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'ভাষা শব্দার্ণব। সর্ব্বানন্দ, কৃষ্ণানন্দ ও সচ্চিদানন্দ নামে তাঁহার তিন সহোদর ছিল। জগদানন্দের কবিতার ললিত শব্দ বিন্যাস খুব আছে, যদিও কবিত্ব খুবই কম। 'জগদানন্দের খসড়া' ললিত শব্দের ভাণ্ডার বলিলেই হয়। ১৭০৪ শকে (১৭৮২ খ্রীঃ) তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যু দিন উপলক্ষে প্রতি বৎসর তাঁহার জন্মস্থানে একটী মেলা হয়।

জগদানন্দ দাস— একজন পদকর্ত্তা। তাঁহার পাঁচটি পদ পাওয়া গিয়াছে।

জগদানন্দ রায়—১১৭৬ বঙ্গাব্দের ৩রা আশ্বিন নদীয়া জিলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম অভয়ানন্দ রায়. জগদানন্দ ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা,' 'সাধারণী,' 'সাহিত্য,' 'ভারতী' প্রভৃতি মাসিক পত্রে তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতি লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বোলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি একজন অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রহিয়াছে।

জগদিন্দ্রনাথ রায়, মহারাজা—সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ভূম্যধিকারী। তিনি রাজসাহী জিলারই এক গরীব ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন। নাটোরের মহারাজা গোবিন্দনাথের নিঃসন্তানা বিধবা মহারাণী ব্রজসুন্দরী তাঁহাকে দত্তক গ্রহণ করেন। ১২৭৫ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে, (১৮৬৮ খ্রীঃ অক্টোবর) তাঁহার জন্ম হয়। নাটোরের ভূম্যধিকারীগণ বংশানুক্রমে মহারাজা উপাধি ধারণের অধিকারী। ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি উক্ত উপাধির সনন্দ ও খেলাৎ প্রাপ্ত হন।

প্রথমে রাজসাহীর কলেজ সংলগ্ন বিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুকাল কলেজে

অধ্যয়ন করেন। অসুস্থতার জন্যই প্রধানতঃ কলেজ ত্যাগ করিতে হয়। ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে আইনানুসারে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি নিজহস্তে সম্পত্তি পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তি হইলেও তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতির সহিত দেশের সর্ব্বপ্রকার রাজনীতিক আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন। বাঙ্গালার ধনী জমিদারদিগের মধ্যে তিনিই প্রথম প্রকাশ্যভাবে জাতীয় মহাসমিতির সদস্য হন। তাঁহারই উৎসাহে ও উদ্যোগে ১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দে নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনীর অধিবেশন হয়। প্রথম বাঙ্গালী সিবিলিয়ান (Civilian) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর উহার সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯০৩ খ্রীঃ অব্দে বহরমপুর সহরে অনুষ্ঠিত উক্ত অধিবেশনে তিনি সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯০১ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের সংশ্রবে যে ভারতীয় শিল্প প্রদর্শনী হয় মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ, সেই বৎসরের অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ প্রদান করেন, তাহাতে তাঁহার রাজনীতিজ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ বৎসরই তিনি মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী প্রমুখ ভূম্যধিকারীগণের সহিত মিলিত হইয়া 'বঙ্গীয় ভূম্যধিকারী সঙ্ঘ' (Bengal Landholder's Association) স্থাপন করেন। ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দে বড়লাট লর্ড কার্জ্জনের প্রস্তাবিত বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদ করিয়া কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সভাভবনে স্থান সংকুলান না হওয়ায় বাহিরে, উন্মুক্ত স্থানে এক অতিরিক্ত সভা হয়। জগদিন্দ্রনাথ তাহাতে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া ওজস্বিনী ভাষায় বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি দুইবার (১৮৯৫ ও ১৮৯৭ খ্রীঃ) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের পরিচালিত ক্রিকেট খেলার দল (Natore Eleven) এককালে দেশীয় খেলোয়াড়দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। মহারাজা স্বয়ংও নানারূপে বলচর্চ্চা করিতেন এবং উৎকৃষ্ট মল্ল ছিলেন।

সাহিত্য চর্চ্চাও মহারাজের এক বিশেষ প্রিয় কার্য্য ছিল। দীর্ঘকাল তিনি 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি সুকবিও ছিলেন; তাঁহার রচিত কয়েকখানি কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি অধ্যয়নশীল ছিলেন। তাঁহার নিজের পুস্তকাগারে বহু মূল্যবান পুস্তক সংগৃহীত ছিল। অভিজাত

ও ধনী বংশের সন্তান হইয়াও তিনি অমায়িক, সরল ব্যবহারের জন্য বিশেষ লোকপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার নিরহঙ্কার, আনন্দদায়ক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইতেন।

বাহিরের জাঁকজমক, খ্যাতি প্রতিপত্তির জন্য তাঁহার আদৌ স্পৃহা ছিল না। তিনি গোপনে বহু দুস্থ ব্যক্তিকে দান করিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে (১৯২৬ খ্রীঃ জানুয়ারী) মোটর সংঘর্ষে আহত হইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

জগদীশ গঙ্গোপাধ্যায়--একজন যাত্রাওয়ালা। তিনি পূর্ব্ববঙ্গবাসী এবং 'বেগের' গাঙ্গুলী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহারই যাত্রার দলের প্রসিদ্ধ 'বালকের' নাম গোবিন্দ অধিকারী ছিল।

জগদীশচন্দ্র বসু—জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, আচার্য্য, শিক্ষাব্রতী দেশহিতৈষী। তাঁহাদের নিবাস ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত রাড়িখাল নামক গ্রাম। ময়মনসিংহ নগরে পিতার কর্ম্মস্থলে ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দের ৩০শে নবেম্বর (১২৬৪ বঙ্গাব্দের ১৪ই অগ্রহায়ণ) জগদীশচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ভগবান্‌চন্দ্র বসু উচ্চ সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত (Deputy Magistrate) ছিলেন। রাজকার্য্য উপলক্ষে তাঁহাকে নানাস্থানে গমন করিতে হইত। জগদীশচন্দ্রের বাল্যকাল অনেক সময় ফরিদপুর, বর্দ্ধমান, কাটোয়া প্রভৃতি স্থানে অতিবাহিত হয়। ফরিদপুরের এক বাঙ্গালা স্কুলে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। সেই সময়ে সহরে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল এবং পদস্থ ব্যক্তগণের পুত্রগণ সকলেই সেইখানেই শিক্ষা লাভ করিতেন। তাহা সত্ত্বেও ভগবানচন্দ্র পুত্রকে প্রথমে বাঙ্গালা পাঠশালাতেই প্রেরণ করেন। তিনি বলিতেন 'নিজ মাতৃ ভাষায় প্রথমে অধিকার না জন্মিলে বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।' তদ্ভিন্ন তিনি ইহাও মনে করিতেন যে দেশের সকল শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিবার সুযোগ না পাইলে পুত্রের চরিত্র গঠন অসম্পূর্ণ হইবে। এই জন্য ভগবানচন্দ্র পুত্রকে অপেক্ষাকৃত সামান্য অর্থসম্পন্ন পরিবারের ছাত্রদের সহিত বাঙ্গালা বিদ্যালয়েই প্রেরণ করেন।

শৈশব হইতেই প্রকৃতির সহিত জগদীশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ মৈত্রী ছিল। পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা সকলের জন্যই তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। পিতা ভগবানচন্দ্র ঐ আকর্ষণ আদৌ দোষাবহ মনে করিতেন না, বরঞ্চ ঐ আকর্ষণের ফলে যাহাতে পুত্রের মন ক্রমশঃ জিজ্ঞাসু হয়; প্রকৃতির নানারূপ লীলা বৈচিত্র্যের মধ্যে পুত্র যাহাতে বৈজ্ঞানিক বিষয়ের স্বাদ লাভ করে, তজ্জন্য তাঁহার আন্ত-

রিক ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল এবং তাঁহার ঐ ইচ্ছা ও চেষ্টা যে পরবর্ত্তী জীবনে যে জগদীশচন্দ্রের জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

জগদীশচন্দ্র প্রথমে কলিকাতায় হেয়ার স্কুলে (Hare School) ভর্ত্তি হন। পরে তথা হইতে সেণ্ট জেভিয়ারে (Saint Xavier) প্রবেশ করেন। ষোল বৎসর বয়সেই তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে বিভাগে প্রবেশ করেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক লাফোঁ (Father Lafont) তখন ঐ কলেজের অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার শিক্ষা-নৈপুণ্যে জগদীশচন্দ্র প্রকৃতি বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তে পদার্থ বিদ্যাতেই অধিক আকৃষ্ট হন এবং ক্রমে কৃতীত্বের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহ (F. A. ও B. A.) উত্তীর্ণ হন।

এই সময়ে জগদীশচন্দ্রের পিতা নানা কারণে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। সেইজন্য জগদীশচন্দ্রের ইচ্ছা হয় যে, সত্বর পাঠ্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া, অর্থোপার্জ্জন করিয়া পিতাকে ঋণমুক্ত করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল ইংলণ্ডে যাইয়া সিবিল সার্বিস (Civil Service) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু ভগবানচন্দ্র নিজে শাসন বিভাগে দীর্ঘ-কাল কাজ করিয়াও, পুত্রকে ঐরূপ সরকারী কাজে আবদ্ধ থাকিতে দেখিতে ইচ্ছা না করায়, অনেক বিবেচনার পর পরিশেষে চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করা স্থির হয় এবং অধ্যয়নার্থ তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। তাহার কিছু-কাল পূর্ব্বে আসামে অবকাশকাল যাপন করিতে যাইয়া তিনি এক কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। অসুস্থ অবস্থাতেই সমুদ্র যাত্রা করিতে হয় পথে পীড়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ইংলণ্ডে যাইয়াও উহার উপশম হয় নাই। অনেক চিকিৎসার পরও যখন কিছুতেই সুস্থ হইতে পারিলেন না, তখন বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের পরামর্শে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া, বিজ্ঞানে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের উচ্চ উপাধি লাভের জন্য কেম্ব্রিজ (Cambridge) বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেন। কয়েক বৎসর তথায় থাকিয়া উপাধি লাভ করেন। পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও উপাধি (B. Sc) লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

তৎকালে মিঃ ফসেট (Fawcett) ইংলণ্ডের ডাক বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ (Post Master General) ছিলেন। তাঁহার সহিত জগদীশচন্দ্রের ভগিনীপতি স্বনাম খ্যাত আনন্দমোহন বসুর বিশেষ সৌহার্দ্দ হইয়াছিল। আনন্দমোহনের সহিত জগদীশচন্দ্রের সম্পর্কের কথা জানিয়া ফসেট সাহেব তদানীন্তন ভারত সচিব লর্ড কিম্বালির (Lord Kimber-

ley) নিকট জগদীশচন্দ্রের জন্য শিক্ষা বিভাগে একটি চাকুরীর জন্য সুপারিশ করেন। কিন্তু ঠিক তখন নিযুক্ত করিবার মত কাজের সন্ধান না থাকাতে, জগদীশচন্দ্র ফসেট সাহেবের নিকট হইতে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড রিপনের (Lord Ripon) নিকট পরিচয় পত্র সহ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ভারতে আসিয়া বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি জগদীশচন্দ্রকে শিক্ষা বিভাগে একটি কাজ দিবার জন্য বাঙ্গালার ছোটলাটের মারফৎ শিক্ষা বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ (Director) মহাশয়কে নির্দ্দেশ দেন। বড়লাটের নির্দ্দেশে সর্ব্বাধ্যক্ষ মহাশয় আদৌ সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি প্রথমে প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগে একটি চাকুরী দিতে স্বীকার পাইলেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র তাহা গ্রহণ করিলেন না। কিছুকাল পরে বড়লাটের নিকট হইতে পুনরায় তাগিদ আসাতে ডিরেক্টার সাহেব বাধ্য হইয়া জগদীশচন্দ্রকে শিক্ষা বিভাগের উচ্চতর শ্রেণীতে (Indian Educational Service) একটি অস্থায়ী চাকুরী প্রদান করেন (১৮৮৪ খ্রীঃ)।

জগদীশচন্দ্র চাকুরী পাইলেন বটে কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, সেই পদাভিষিক্ত একজন ইংরেজ অধ্যাপককে যে বেতন দেওয়া হইবে, তাহাকে তদপেক্ষা অনেক কম বেতন দেওয়া হইবে। এই বৈষম্যমূলক ব্যবহারে জগদীশচন্দ্রের জাতীয় মর্য্যাদা আহত হইল এবং তিন বৎসর পর্য্যন্ত বিরক্তি বশতঃ, বেতন বাবদ প্রেরিত অর্থের কপর্দ্দকও গ্রহণ করিলেন না। তিন বৎসর পরে কর্ত্তৃপক্ষ জগদীশচন্দ্রের দাবীর ন্যায্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে পূর্ণ বেতন দিতে সম্মত হইলেন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী তিন বৎসরের বেতনও সেই হারে প্রদান করিলেন। এক্ষণে জগদীশচন্দ্র একত্রে বহু অর্থ প্রাপ্ত হইয়া উহার প্রায় সমুদয় পিতৃ ঋণ পরিশোধার্থে প্রদান করিলেন

অধ্যাপকরূপে প্রথমাবধি জগদীশচন্দ্র বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন তাঁহার ছাত্রবর্গ এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, বিজ্ঞানের জটিলতম বিষয়গুলিও তিনি অতি পরিষ্কার রূপে, সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া ছাত্রদেরে বোধগম্য করাইতে পারিতেন। তৎফলে পদার্থ বিদ্যা অধ্যয়নার্থীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। কিন্তু কেবল অধ্যাপনা কার্য্যেই নিযুক্ত থাকা জগদীশচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল না। প্রথমাবধি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে মৌলিক গবেষণার জন্য তাঁহার আগ্রহ ছিল। কিন্তু এবিষয়ে তাঁহার নানারূপ অসুবিধা ও বাধা ছিল। প্রথমত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোনওরূপ সহানুভূতি ও সাহায্য পাইবার আশা ছিল না।

ভারতবাসীরাও যে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে গবেষণা করিতে সমর্থ, এরূপ ধারণা সেই সময়ে কর্তৃপক্ষেরা কল্পনার মধ্যেও আনিতেন না। জগদীশচন্দ্র অধ্যাপকের পদ লাভ করিলেন, তখন কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ, 'ভারতীয়েরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অধ্যাপনা করিতে অসমর্থ' এই কারণ দর্শাইয়া, তাহার নিয়োগে আপত্তি প্রদর্শন করেন। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও জগদীশচন্দ্র নিরুৎসাহ হন নাই। কলেজে অধ্যাপনার জন্য তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। তাহা সত্ত্বেও যে সামান্য অবসর পাইতেন তাহাই বিজ্ঞানানুশীলনেই নিয়োগ করিতেন। নিজের বেতনের অর্থ হইতেই সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত। কোনওরূপ অতিরিক্ত আর্থিক সাহায্য পাইতেন না। নিজের বিবেচনা অনুযায়ী দেশীয় কারিগর দ্বারা আবশ্যকানুযায়ী যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহাকে কাজ করিতে হইত। বিজ্ঞানানুশীলনের জন্য কত গভীর ও আন্তরিক আগ্রহ ছিল, তাহা ইহা হইতেই সহজে অনুমেয়। কয়েক বৎসর গবেষণা করিবার পর, ১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে ইংলণ্ডের 'রয়েল সোসাইটি' (Royal Society) নামক বিদ্বৎ পরিষৎ তাঁহার গবেষণা মূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে সম্মত হইলেন এবং এই কাজের জন্য অর্থ সাহায্যও করিতে লাগিলেন। তাঁহার গবেষণার মূল্য উপলব্ধি করিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কোনওরূপ পরীক্ষা গ্রহণ না করিয়াই তাঁহাকে সম্মানজনক "বিজ্ঞানাচার্য্য" (Doctor of Science) উপাধি দান করিলেন। অনেক পাশ্চাত্য মনীষী তাঁহার কার্য্যে আকৃষ্ট হইয়া পত্রাদি দ্বারা উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন। কিন্তু এদেশে কর্তৃপক্ষগণের নিকট তিনি উপযুক্ত সহানুভূতি লাভ করিতেন না। উহার মূলে ছিল ভারতবাসীদের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চর্চ্চা করার সামর্থ্যের প্রতি সন্দেহ। এই সময়ে জগদীশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সদস্য (Fellow) ছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্ত্রণা সভায় অনেক সময়ই তিনি স্বাধীন ভাবে মতামত প্রকাশ করিতেন বলিয়া, কর্তৃপক্ষ তাঁহার উপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। বোধ হয় এই কারণেও তাঁহারা জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য বিশেষ সাহায্য করিতে আগ্রহশীল ছিলেন না। অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া তাঁহারা প্রেসিডেন্সী কলেজে উন্নততর প্রণালীতে বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য মাত্র বার্ষিক আড়াই হাজার টাকা প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। অতঃপর জগদীশচন্দ্র, তাঁহার বিজ্ঞান চর্চ্চার ফল পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের সম্মুখে উপ-

স্থিত করিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিতে মনস্থ করিলেন। এবিষয়ে তিনি প্রথমে সরকারী সাহায্য প্রার্থী হইয়া বিফল হন। এই কার্য্যের জন্য অর্থ ব্যয়, সেই সময়ে শাসনকর্তৃপক্ষদের বিবেচনায় সম্পূর্ণ অপব্যয় বোধ হইত। যাহা হউক, পরিশেষে সুবুদ্ধির উদয় হওয়াতে তাঁহারা জগদীশচন্দ্রের ইংলণ্ড গমনের ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হইলেন। সেই অর্থ সাহায্য পাইয়া তিনি সস্ত্রীক ইংলণ্ডে উপনীত হইলেন। "অদৃশ্য আলোক" সম্বন্ধে তাঁহার নূতন আবিষ্ক্রিয়া বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রদর্শন করিবার জন্যই তিনি "ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েসন" (British Association) কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন। ঐ বৎসরই জগদীশচন্দ্র লিবারপুল নগরে পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিক সঙ্ঘে তিনি প্রথম নিজের আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য লর্ড কেলভিন (Lord Kelvin), সার জে, জে, টমসন (Sir J. J. Thomson), অলিভার লজ (Sir Oliver Lodge) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সমবেত পণ্ডিতগণ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্ক্রিয়ার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলেন এবং সকলেই এক বাক্যে তাঁহার প্রভূত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি লণ্ডন নগরে প্রসিদ্ধ রয়েল সোসাইটিতে (Royal Society) আরও কোন কোন বিষয়ে তাঁহার আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সেই স্থানেও তাঁহার আবিষ্ক্রিয়ার মৌলিকত্বে সকলেই আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার যশঃ পাশ্চাত্য জগতের নানাস্থানে পরিব্যাপ্ত হয়। ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারি, জার্ম্মান দেশের রাজধানী বার্লিন প্রভৃতি স্থান হইতে তাঁহার নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। তিনি উক্ত স্থান সমূহেও গমন করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন এবং সর্ব্বত্রই প্রভূত যশ ও অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেন। ফরাসী দেশে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান সংসদ (Societe-de-Physique) তাঁহাকে অন্যতম সম্মানীত সদস্যের (Honorary Member) পদে বরণ করেন। জার্ম্মেনির ও অন্যান্য নানাস্থানে একাধিক পাশ্চাত্য মনীষিদের সহিত পরিচিত হইয়া, পাশ্চাত্য জগতে ভারতের গৌরব দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করিয়া সেইবারের মত ১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

জগদীশচন্দ্রের এই অভিযানের প্রধান সুফল এই হইয়াছিল যে, ভারতবাসীর বিজ্ঞান চর্চ্চায় অক্ষমতা সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা পাশ্চাত্য পণ্ডিত মণ্ডলীর মনে ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইল। ইংলণ্ডের রাজনীতিবিদ্ ও বৈজ্ঞানিকগণ, জগদীশচন্দ্রের কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া

তাঁহাকে বিজ্ঞান চর্চ্চায় সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে আগ্রহশীল হইলেন এবং তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ একসঙ্গে তদানীন্তন ভারত সচিবকে এই বিষয়ে অনুরোধ করিয়া এক পত্র প্রেরণ করিলেন (১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দের মে মাস)। ভারত সচিবও উহার প্রয়োজনীতা উপলব্ধি করিয়া বড়লাট লর্ড এলগিনকে (Lord Elgin) অনুরোধ করিলেন। বড়লাটও বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালা সরকারকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু এদেশে সরকারী কর্ম্মপদ্ধতির মহিমায় ১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দের প্রস্তাবিত বিষয়টি ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দে কার্য্যে পরিণত হইল। তখন জগদীশচন্দ্রের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার সময় হইয়া আসিয়াছিল। প্রধানতঃ তাঁহারই বিজ্ঞান চর্চ্চার সাহায্যের জন্য প্রস্তাবিত গবেষণাগার (Labortory)। তাঁহাকে আর অধিকাল কাজ করিতে হয় নাই। চাকুরীতেও তাঁহার নায্য প্রাপ্তি অনেক দিন পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। তাঁহার অপেক্ষা অনেক বয়ঃ কনিষ্ঠ এবং তাঁহার পরবর্ত্তী অধ্যাপক শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তাদের অননুমেয় ব্যবস্থার গুণে তাঁহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া উন্নতি লাভ করেন। বিজ্ঞান সাধনায় সমাহিতচিত্ত জগদীশচন্দ্রের তদ্বিষয়ে লক্ষ্য মাত্র ছিল না। অবসর গ্রহণের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মাত্র এই অবিচারের প্রতীকার করা হয়। তৎফলে তিনি অপ্রাপ্ত বেতন বাবদ অনেক অর্থ একত্রে লাভ করেন।

১৯০০ খ্রীঃ অব্দে ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারী নগরীতে এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হয় এবং তাহার সংশ্রবে একটি বিজ্ঞান সম্মেলনও হয়। তথায় নিজ গবেষণা লব্ধ বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য তিনি ভারত সরকার কর্তৃক প্রেরিত হন। পূর্ব্বের ন্যায় এইবারেও সমবেত বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া চমৎকৃত হন এবং তাঁহার খ্যাতি অধিকতর বিস্তৃত লাভ করে। প্যারি হইতে তিনি লণ্ডনে গমন করেন। সেখানে প্রথমে রয়েল সোসাইটিতে বক্তৃতা করিয়া সমাদর ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিন্তু পরবর্ত্তী এক বক্তৃতায় সার জন বার্ডন স্যাণ্ডারসন (Sir John Burdon Sanderson) নামক প্রসিদ্ধ শারীরবিজ্ঞানবিদ্ (Physiologist) জগদীশচন্দ্রের গবেষণার ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া, বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। তৎফলে কিছুকাল ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সংশয় উপস্থিত হয়। ইহার জন্য জগদীশচন্দ্রকে পুনরায় আর একটি বিজ্ঞান সভায় নিজের গবেষণা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিতে হয়। এইবারে তাঁহার বক্তৃতা সকলের সমাদর লাভ করে এবং তখনকার মত বিরুদ্ধমতা-

বলম্বীগণ প্রতিকূল সমালোচনা করিতে বিরত থাকেন। কিন্তু কিছুকাল পরে কেহ কেহ এইরূপ মত প্রচার করিতে থাকেন যে, জগদীশচন্দ্র নূতন কিছুই বলেন নাই। তাঁহার কথিত বিষয়, তৎপূর্ব্বেই অপর একজন বৈজ্ঞানিক প্রচার করিয়াছেন। ইহার ফলে পুনরায় আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং অনুসন্ধানের ফলে নির্দ্ধারিত হইল যে, জগদীশচন্দ্রই উক্ত বিষয়ে প্রথম গবেষণা ও আবিষ্কার করেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কয়েক বৎসর আরও গবেষণা করিবার পর পুনরায় ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে ভারত সরকারের ব্যয়ে জগদীশচন্দ্র তাঁহার গবেষণালব্ধ ফল পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। এইবারে, সামান্য কিছুকাল ইংলণ্ডে থাকিয়া, তিনি আমেরিকায় গমন করিলেন এবং একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিজ্ঞান পরিষদে বক্তৃতা প্রদান করিয়া খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। কয়েক বৎসর পরে ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দে, পাশ্চাত্য জগতের একাধিক বিদ্বৎ-পরিষৎ হইতে আহূত হইয়া, তিনি পুনরায় ইয়োরোপে গমন করেন। এই বারে তিনি বহু সাবধানে ও যত্ন সহকারে নিজ গবেষণার উপযুক্ত অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি ও বহু প্রকার ভারতীয় বৃক্ষলতাদি সঙ্গে লইয়া যান। প্রথমে ইংলণ্ডের কতিপয় প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্বৎ পরিষদে বক্তৃতা প্রদান করিয়া, নিজ মত সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথমে যাহারা তাঁহার মত তাদৃশ আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করেন নাই, এইবারের ব্যাখ্যান ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ফলে তাঁহারাও নিঃসন্দেহ হইলেন। অতঃপর তিনি প্রথমে পুরাতন অষ্ট্রীয়া হাঙ্গারীর (Austria Hungary) রাজধানী বিয়েনা (Vienna) নগরীতে বক্তৃতা করেন ও পূর্ব্বেরই ন্যায় খ্যাতি লাভ করেন। তৎপরে প্যারিতে আর একবার বক্তৃতা প্রদান করিয়া জার্ম্মেনিতে গমন করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হন। সুখের বিষয় অতি অল্পের জন্য তিনি প্রভূত দুর্ভাগ্যের হস্ত হইতে অব্যাহতি পান : ঐ সময়েই (আগষ্ট, ১৯১৪ খ্রীঃ) ইয়োরোপের মহাসমর আরম্ভ হয়। জগদীশচন্দ্র যদি ৪ঠা আগষ্টের পূর্ব্বে জার্ম্মেনীতে উপস্থিত হইতেন তাহা হইলে শত্রু পক্ষীয় দেশের প্রজারূপে তাঁহাকে বিষম বিপদে পড়িতে হইত। অনন্তর তিনি পুনরায় আমেরিকায় গমন করিলেন এবং তদ্দেশীয় হার্ভার্ড (Harvard) ফিলাডেলফিয়া (Philadelphia) প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় এবং নানাস্থানের খ্যাতনামা বিদ্বৎ পরিষদে বক্তৃতা প্রদান করিয়া সেই দেশেও স্ব-মত প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এইরূপে বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র সমুদয় পাশ্চাত্য জগতে

ভারতের গৌরব প্রচার করিয়া ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সরকারী চাকুরীর নিয়মানুসারে ১৯১৩ খ্রীঃ অব্দেই তাঁহার অবসর গ্রহণ করিবার কথা ছিল। কিন্তু তাঁহাকে আরও দুই বৎসর কাজ করিবার অনুমতি দেওয়া হয় এবং ১৯১৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি যখন অবসর গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি চাকুরী করিবার সময়ে যে বেতন পাইতেন সেই বেতনই তাঁহাকে পেন্সন স্বরূপ দিবার ব্যবস্থা হইল। তাঁহার অসাধারণ কৃতীত্বের নিদর্শন স্বরূপ তিনি ১৯০২ খ্রীঃ অব্দে সি-আই-ই (C. I. E.), ১৯১১ খ্রীঃ অব্দে সি-এস্-আই, (C. S. I.) এবং ১৯১৬ খ্রীঃ অব্দে সার্ (Knight) উপাধি প্রাপ্ত হন। তদ্ভিন্ন ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাক সম্মানিত ভাবে 'বিজ্ঞানাচার্য্য' (Honorary D. Sc.) উপাধি প্রদান করেন।

নিজে বিজ্ঞান আলোচনা ও গবেষণা করিতে আরম্ভ করিয়া যে অসুবিধা ভোগ করিয়াছিলেন ও বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মনে বিশেষ ভাবে জাগরূক ছিল। এদেশীয় কৃতী জিজ্ঞাসু ছাত্রেরা যাহাতে গবেষণার সুযোগ প্রাপ্ত হয় তজ্জন্য ১৯১৭ খ্রীঃ অব্দের ৩০শে নবেম্বর (১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৪) তাঁহার বাস ভবনের সন্নিকটে "বসু বিজ্ঞান মন্দির" নামে এক সর্ব্বাবয়ব পূর্ণ বিজ্ঞান গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন এবং "ভারতের গৌরব ও জগতের কল্যাণ কামনায়" সেই বিজ্ঞান মন্দির "দেব চরণে নিবেদন" করিলেন। ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা ও তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তিনি তাঁহার সমস্ত অর্থ প্রদান করেন। ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তাঁহার নিম্ন লিখিত বাণী দেশবাসীর বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। উহা তাঁহার মনের কোন্ ভাব প্রকাশ করিতেছে তাহা সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন —'ভারতবাসিরা কেবলই ভাব প্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধান কার্য্য কোনও দিনই তাহাদের নয়, এই এক কথা চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই; সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মাণও এদেশে কোনও দিন হইতে পারে না, তাহাও কতদিন শুনিয়াছি। তখন মনে হইল যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে, কেবল সেই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্ম্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে।" ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে সঙ্গীত রচনা করিয়া দেন ("মাতৃমন্দিরপুণ্য অঙ্গন কর মহোজ্জ্বল আজ হে" ঐ গানের প্রথম কলি)। সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রণালীতে, প্রাচীন

ভারতের ভাস্কর্য্যের অনুকরণে উহা নির্ম্মিত ও সেই ভাবে উহা মণ্ডিত ও সজ্জিত।

অবসর গ্রহণের পরেও তিনি আরও তিন বার ইয়োরোপে গমন করেন। ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দে, তাঁহার নিজ উদ্ভাবিত "ক্রেস্কোগ্রাফ" (Crescograph) যন্ত্র ও তাহার সাহায্যে গবেষণা প্রণালী ও তৎলব্ধফল বৈজ্ঞানিক জগতে প্রচার করিতে যান। এই যাত্রায় স্কটল্যাণ্ডের (Scotland) এবার্‌ডিন (Aberdeen) বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে এল্ এল্ ডি (LL. D.) উপাধি প্রদান করেন এবং ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান পরিষদ রয়েল সোসাইটি (Royal Society) তাঁহাকে সদস্য (Fellow) মনোনয়ন করেন। ঐ পরিষদের সদস্য পদ লাভ যে কোনও বৈজ্ঞানিকের পক্ষে পরম গৌরবের বিষয়। তাহার কয়েক বৎসর পরে, জাতিসঙ্ঘের (League of Nations) আহ্বানে জেনেভাতে গমন করেন এবং ১৯২৮ খ্রীঃ অব্দে শেষবারের মত ইয়োরোপের নানাস্থানে গমন করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। বলা বাহুল্য সর্ব্বত্রই পূর্ব্বের ন্যায় সম্মান ও খ্যাতি লাভ করেন।

তাঁহার সপ্ততি বর্ষ পূর্ণ হইলে গুণমুগ্ধ দেশবাসীগণ 'সপ্ততিতম জয়ন্তী'র অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রদর্শন করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানের অগ্রণী ছিলেন এবং তদুপলক্ষে বিশেষ কবিতা রচনা করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করেন। সেই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, রামমোহন লাইব্রেরী, বৃহত্তর ভারত পরিষৎ, প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ এবং ভারতের নানা বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও তাঁহাকে অভিনন্দন করা হয়। ইয়োরোপ ও আমেরিকার বহু বৈজ্ঞানিক, পত্রিকা সম্পাদক এবং অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তি, এমন কি মিশর ও চীন দেশ হইতেও তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি অনেক সময়ে দারজিলিং, গিরিডি প্রভৃতি স্বাস্থ্য নিবাসে অথবা কলিকাতার দক্ষিণস্থ ফলতা নামক স্থানে গঙ্গা তীরে তাঁহার উদ্যান বাটিতে অবস্থান করিতেন। দারজিলিংএ বাঙ্গালা সরকার তাঁহাকে একটি উদ্যান করাইয়া দিয়াছিলেন। সেই খানে তাঁহার গবেষণা কার্য্যের উপযুক্ত বহু বিভিন্ন প্রকারের বৃক্ষলতাদি সংগৃহীত হইয়াছিল।

জগদীশচন্দ্র প্রথমে পদার্থবিদ্যা সংস্পৃষ্ট বিদ্যুত তরঙ্গ লইয়া গবেষণা করিতে আরম্ভ করেন। এই গবেষণার ফলে তিনিই জগতে প্রথম আবিষ্কার করেন যে, বিনা তারেও বিদ্যুত তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে পারে। এই বিষয় প্রথম ১৮৯৪ খ্রীঃ

অব্দে নবেম্বর মাসে তাঁহার গবেষণাগারে একটি পরীক্ষা (Experiment) করেন। এক ঘরে উদ্ভূত বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পার্শ্ববর্ত্তী রুদ্ধদ্বার গৃহে প্রবেশ করিয়া একটি পিস্তল ছুড়িল। ইহাই পৃথিবীতে বিনা তারে বার্ত্তা প্রেরণের (Wireless Telegraphy) প্রথম সূচনা। পর বৎসর এই বিষয়েই তিনি আরও উন্নততর ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন যে বিদ্যুৎ তরঙ্গ দুইটি রুদ্ধ দ্বার গৃহ ভেদ করিয়া তৃতীয় গৃহে পৌঁছিল এবং তথায় ঐ বিদ্যুৎ তরঙ্গের প্রভাবে কতকগুলি ক্রিয়া সম্পাদিত হইল। এই দ্বিতীয় পরীক্ষার সময়ে বঙ্গের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা সার উইলিয়ম ম্যাকেঞ্জী (Sir William Mackenzie) উপস্থিত ছিলেন। এই বিদ্যুৎ সম্পর্কীয় গবেষণা কয়েক বৎসর চলিবার পর জগদীশচন্দ্রের জিজ্ঞাসু মনে আর এক প্রশ্নের উদয় হয় এবং তৎফলে গবেষণার ধারা এক ভিন্ন পথে চলিতে আরম্ভ করে। এই গবেষণার বিষয় ছিল জড়ের সহিত চেতনের সম্বন্ধ। এই গবেষণার ফলে তিনি আবিষ্কার করিলেন যে, চেতন বস্তুর ন্যায় জড়বস্তুও বাহিরের প্রভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এবং জড়বস্তুরও চেতনের ন্যায় শ্রান্তি বোধ হয় এবং আছে। এক কথায় আমরা যাহাকে জড় বলি তাহা বাস্তবিক জড় নহে, তাহাও একরূপ চেতন। তাঁহার এই সম্পূর্ণ নূতন আবিষ্কার বহুদিন পর্য্যন্ত পণ্ডিত মণ্ডলী সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহারা জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের সত্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

আজীবন নীরস বৈজ্ঞানিক চর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিয়াও জগদীশচন্দ্র মাতৃ ভাষায় সেবা অবহেলা করেন নাই। তাঁহার বৈজ্ঞানিক চর্চ্চার প্রথম যুগেই তিনি অধুনা লুপ্ত দাসী পত্রিকাতে তাঁহার প্রথম বাঙ্গালা প্রবন্ধ "ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে" প্রকাশিত হয়। পরে প্রধানতঃ গবেষণার সুবিধার জন্য ইংরেজি বৈজ্ঞানিক পত্রিকাদিতে প্রবন্ধ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেও বাঙ্গালাতে প্রবন্ধ রচনা বন্ধ হয় নাই। সহজ ভাষায়, সর্ব্ব সাধারণের উপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ একাধিক পত্রিকাতে প্রকাশ হয়। বিদেশে অবস্থান কালেও বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকাদি পাঠ করিবার জন্য উন্মুখ থাকিতেন। কবি রবীন্দ্রনাথের সহিত আমরণ তাঁহার গভীর সৌহার্দ্দ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে উপলক্ষ করিয়া কয়েকটি মনোজ্ঞ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ১৯১১ খ্রীঃ অব্দে ময়মনসিংহ নগরে সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিরূপে গমন করিয়া তিনি বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয়ে এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান

করেন। কয়েক বৎসর পরে বিক্রমপুর সম্মিলনীর সভাপতিরূপে প্রদত্ত তাঁহার অভিভাষণ চিরদিন দেশবাসীর অন্তরে নিবদ্ধ থাকিয়া কর্ম্ম জীবনে অনুপ্রেরণা প্রদান করিবে। কয়েক বৎসর তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

জগদীশচন্দ্রের সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে তাঁহার দেশাত্মবোধ ও স্বজাতীয়তা কত গভীর ও আন্তরিক ছিল। পরবর্ত্তী জীবনের তাঁহার যে গবেষণা জড় ও চেতনের পার্থক্য দূর করিয়াছিল, তাঁহার প্রেরণা তিনি পাইয়াছিলেন আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিগণের বাণী হইতে। এই কথা তিনি ইংলণ্ডে এক বক্তৃতা প্রদান কালে স্বীকার করিয়াছিলেন। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার যে কি গভীর শ্রদ্ধা ছিল, তাহা, তাঁহার বিজ্ঞান মন্দির যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই উপলব্ধি করিবেন। সমস্ত আয়োজন ও ব্যবস্থার মধ্যে প্রাচীন ভারতের প্রভাব উজ্জ্বল রহিয়াছে। বন্ধুবান্ধবগণকে লিখিত পত্রে, মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধে যেখানেই সুযোগ পাইয়াছেন, মনোহর ভাষায় দেশের সকল জিনিষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বিদেশে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, চিরদিন বিদেশীয় প্রথায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোচনায় নিযুক্ত থাকিলেও মনে প্রাণে তিনি খাঁটি, গভীর স্বদেশপ্রেমিক বাঙ্গালীই ছিলেন।

১৯৩৭ খ্রী: অব্দের শেষভাগে স্বাস্থ্য লাভের জন্য তিনি যখন গিরিডিতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। মোটরযান যোগে তাঁহার মৃতদেহ কলিকাতায় আনিত হইয়া পর দিবস যথাযোগ্য সমারোহের সহিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দাহ করা হয়।

জগদীশচন্দ্র তাঁহার চরম পত্রদ্বারা নগদ অর্থ ও সম্পত্তি বাবদে প্রায় আঠার লক্ষ টাকা বিবিধ জনহিতকর কার্য্যে দান করিয়া যান। তন্মধ্যে বসু বিজ্ঞানমন্দির ও তৎসংলগ্ন উদ্যান ও ভবনাদি পূর্ব্বেই ন্যাস সম্পত্তি (Trust Property) রূপে বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য দান করিয়াছিলেন।

জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী—খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। ১২৬৫ বঙ্গাব্দের ২৩শে কার্ত্তিক নদীয়া জিলার অন্তর্গত শান্তিপুরে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম উমাচরণ লাহিড়ী। নদীয়া জিলার মাজদিয়া গ্রামে তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান। ১৮৭৬ খ্রী: অব্দে হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা

ডফ (Duff) কলেজ হইতে এফ্-এ (F. A) পরীক্ষায় দিয়া উত্তীর্ণ হন।

কলেজের পড়া শেষ করিয়া জগদীশচন্দ্র ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিয়া কলিকাতা ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঔষধালয় স্থাপন করেন। তিনি চিকিৎসা বিষয়ক অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। যথা—১। হোমিওপ্যাথিক মতে গৃহচিকিৎসা, ২। হোমিওপ্যাথিক বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন, ৩। ওলাউঠা চিকিৎসা, ৪। নরশরীর তত্ব, ৫। জ্বর চিকিৎসা, ৬। চিকিৎসা তত্ব, ৭। ভৈষজ্য তত্ব, ৮। সদৃশ চিকিৎসা বা প্র্যাকটিশ অব মেডিসিন। এতদ্ব্যতীত তিনি 'হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক' নামে বাঙ্গালা ভাষায় ও 'ইণ্ডিয়ান মেডিকেল্ রেকর্ড' (Indian Medical Record) নামে ইংরেজি ভাষায় দুইখানা চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকা চালনা করিতেন। তিনি একটি 'হোমিওপ্যাথিক স্কুল' ও 'লাহিড়ী এণ্ড কোং' নামে হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় স্থাপন করেন এবং স্বগ্রামে তাঁহার মাতার নামে একটি দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দের ৭ই ডিসেম্বর (অগ্রহায়ণ ১৩০২ বঙ্গাব্দ) তিনি পরলোক গমন করেন।

জগদীশ তর্কালঙ্কার—তিনি নবদ্বীপের এক জন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দির প্রথমভাগে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা মিথিলার অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। তিনি পিতার তৃতীয় পুত্র। জগদীশ অল্প বয়সেই পিতৃহীন হন। পিতার মৃত্যুর পরে জ্যেষ্ঠ ষষ্ঠীদাস সংসারের কর্ত্তা হইলেন। তিনি চৈতন্যানুরক্ত পরম বৈষ্ণব ছিলেন। সংসারের কর্ত্তব্য কাজেরপ্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। তাঁহার ফলে কনিষ্ঠ চারিটী সহোদরের বিদ্যাশিক্ষা এবং অন্তবিধ কোন প্রকার উন্নতি হইল না। জগদীশও অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল হইলেন। কথিত আছে একদিন পক্ষী শাবক আহরণার্থ এক তালবৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক যেমন পক্ষীনীড়ে হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন, অমনি এক বিষধর সর্প তাঁহাকে দংশন করিবার জন্য ফণা বিস্তার করিল। জগদীশ মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়াই অনতিবিলম্বে সর্পের গলদেশ মুষ্টিবদ্ধ করিলেন। সর্প তাহার শরীরদ্বারা জগদীশের হস্ত বেষ্টন করিল। জগদীশ সুতীক্ষ্ণ তাল বৃন্তের প্রান্তভাগে সর্পের গ্রীবাদেশ ঘর্ষণ করিয়া কর্ত্তনপূর্ব্বক নিম্নে নিক্ষেপ করিলেন। বালকের এই অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের কার্য্য মনোযোগ সহকারে এক সন্ন্যাসী অব-

লোকন করিতেছিলেন। বালক বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলে, তিনি তাঁহাকে সমীপে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব ও সাহসের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ আলাপের পরে তাঁহার পারিবারিক অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিয়া, স্বয়ং তাঁহাকে শিক্ষা দিতে যত্নবান্ হইলেন। বিধাতা কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া, কাহার ভাগ্য পরিবর্ত্তন করেন, তাহা জানা খুব কঠিন। ধীরে ধীরে জগদীশেরও মতি পরিবর্ত্তিত হইল। দারুণ দরিদ্রতার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে অধ্যয়নে অগ্রসর হইতে হইল। এই সময়ে অর্থাভাবে তৈলের অভাবে দিবাভাগে সংগৃহীত বংশপত্র জ্বালিয়া, রাত্রিতে পাঠ শিক্ষা করিতে হইত। অধুনাতন ছাত্রের নিকট ইহা অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। এইরূপে কাব্যাদি শেষ করিয়া তৎকালীন নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য গমন করেন। ভবানন্দ ছাত্রের প্রতিভা ও পাঠানুরাগ দর্শনে অতিমাত্র প্রীত হইলেন। পাঠসমাপনান্তে অধ্যাপকের নিকট তর্কালঙ্কার উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে প্রতিবাসীর সাহায্যে চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার অধ্যাপনার গুণে অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার টোলে বহু ছাত্রের সমাগম হইতে লাগিল। দরিদ্র জগদীশের সকলকে স্থান দিবার সামর্থ ছিল না। অধ্যাপক বিদায়ের অর্থে তাঁহার অভাব মোচন হইত না। বিশেষতঃ অধ্যাপনার ব্যাঘাত হইবে মনে করিয়া দূরদেশের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না। তদবস্থায় অর্থাগমের নূতন উপায় চিন্তনে তিনি নিযুক্ত হইলেন।

সেই সময়ে চৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্মান্দোলনে দেশের জনসাধারণের মধ্যে নূতন জীবনের সঞ্চার হইয়াছিল। এতাবৎকাল শাস্ত্রালোচনা কেবল ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের ভিতরেই আবদ্ধ ছিল, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, সেই অধিকার সকলকেই প্রদান করিলেন। সুতরাং শূদ্রও শাস্ত্রপাঠ ও রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবং তাহাদের মধ্যেও জ্ঞানালোকের উদ্ভব হইতে লাগিল। সুপণ্ডিত বুদ্ধিমান জগদীশ এই সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি জ্ঞানী, আচারনিষ্ঠ ও ধার্ম্মিক শূদ্রকেও শিষ্য করিতে লাগিলেন। অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার শিষ্য সংখ্যা ৩৬৫ পরিবারেরও অধিক হইল। তিনি তখন এই নিয়ম করিলেন যে, এক এক শিষ্য পরিবারকে, বৎসরের তাঁহার একদিনের খরচ বহন করিতে হইবে। এই উপায়ে বৎসরের ৩৬৫ দিনের ব্যয় অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল। তিনি অর্থ চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া গ্রন্থ প্রণয়নে মনোযোগী হইলেন।

তন্মধ্যে 'শব্দশক্তি প্রকাশিকা,' 'তর্কামৃত,' গঙ্গেশ উপাধ্যায়কৃত 'অনুমান ময়ূখ,' গ্রন্থের ভাষ্য 'প্রস্তাববাদ,' বৈশেষিক শাস্ত্রীয় 'দ্রব্যভাষ্যে'র টীকা, রঘুনাথের 'ন্যায়লীলাবতী প্রকাশ' প্রভৃতি দীধিতি গ্রন্থের টীকা প্রসিদ্ধ। তাঁহার টীকা ভাষ্য প্রভৃতি 'জাগদীশী' নামে খ্যাত। তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থ অদ্ভুত বিচার শক্তি ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

জগদীশের রঘুনাথ ও রুদ্রেশ্বর নামে দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে 'সাংখ্য তত্ত্ব-বিলাস' নামক গ্রন্থ রঘুনাথের কৃত। রুদ্রের পুত্র রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ 'শব্দ শক্তি প্রকাশিকা' নামক গ্রন্থের 'সুবোধিনী' নামে এক টীকা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বংশধরেরা এখনও কেহ কেহ নবদ্বীপে বাস করিতেছেন।

জগদীশনাথ রায়—তিনি একজন স্বনাম ধন্য পুরুষ। কাঁচরা পাড়ার (২৪পরগণা) বৈদ্যবংশে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি পুলিশ বিভাগে অতি সামান্য কাজে প্রবেশ করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে পরে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে বোধ হয় এই সম্মানিত পদে তিনিই প্রথম নিযুক্ত হন। জয়পুরের মহারাজার প্রধান মন্ত্রী সংসারচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার জামাতা ছিলেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বিষবৃক্ষ' জগদীশনাথকে উৎসর্গ করেন। জগদীশ রায়ের পুত্র খগেন্দ্রনাথ রায় একজন বিশিষ্ট সাহিত্য সেবী। কলিকাতা জগদীশনাথ রায়ের লেন তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে।

জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাধারণতঃ তিনি জে সি ব্যানার্জ্জি নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাল্যকালে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে (বালাখানা শাখা) পড়াশুনা করেন। তার পর জেনারেল এসেম্ব্লিতে পড়িয়া শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে যোগদান করেন। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের পাঠ সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি চাকুরীতে যোগ না দিয়া ইঞ্জিনীয়ারিং কন্‌ট্রাক্টর হিসাবে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে থাকেন। তিনি এই সময়ে যদিও বড় রকমের কোন কাজ পাওয়ার সুযোগ পান নাই, তাহা হইলেও তিনি তাঁহার ছোটখাট কাজকর্ম্মে যে নৈপুণ্য দেখান, তাহাতেই বুঝা গিয়াছিল যে, ভবিষ্যতে তাঁহার উন্নতি অবধারিত। ১৯১০ সালে তিনি সর্ব্বপ্রথম একটি বড় কাজ পান। প্রেসিডেন্সী কলেজের বেকার ল্যাবরেটরী নির্ম্মাণের ভার তাঁহাকে দেওয়া হয়। তিনি এক বৎসরেরও কম সময়ে বরাদ্দমত অর্থেই বাড়ীটি নির্ম্মাণ করেন। তার পর ১৯১২ সাল হইতে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে কাজ পাইতে থাকেন।

কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজ গৃহ, ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট, সালকিয়ার সরকারী লবণ গোলা, নূতন রয়েল এক্সচেঞ্জ গৃহ ও কলিকাতায় বড় বড় হোটেল তিনি নির্ম্মাণ করেন। এই সময় বহু কাজে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও তিনি "ষ্ট্যাণ্ডার্ড রিবেট বোল্ট এণ্ড নাট ওয়ার্কস" নামক একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া বল্টু, পেরেক, স্ক্রু ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া দেশের একটি অভাব দূর করেন। ইউনিভারসিটির বিজ্ঞান কলেজের বাড়ীটি দক্ষতার সহিত নির্ম্মাণ করিয়া তিনি বিশেষ প্রশংসালাভ করেন। স্বাধীনভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করার পর অতি স্বল্পকাল মধ্যেই তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বড় বড় বাড়ী নির্ম্মাণের ভার প্রাপ্ত হন। বাড়ী নির্ম্মাণের কাজ ছাড়াও তিনি বহু শিল্পকার্য্যে (কয়লার খনি, চা বাগান, লোহার কারখানা, ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস, ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন) এবং কাপড়, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্যাদি আমদানী রপ্তানীর কাজে লিপ্ত হন। বাঙ্গালার বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার-অব-কমার্সের ভাইস প্রসিডেণ্ট এবং উহার প্রতিনিধি হিসাবে গত ১২ বৎসর যাবৎ কলিকাতা পোর্টের একজন কমিশনার ছিলেন। কলিকাতা পোর্টের কমিশনার হিসাবে তিনি নানা কার্য্যে নিজ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ২৮শে চৈত্র (১০ই এপ্রিল ১৯৩৭) পরলোক গমন করিয়াছেন।

জগদীশ মুখোপাধ্যায়—১২৬৮ বঙ্গাব্দের ১৮ই ভাদ্র খুলনা জেলার অন্তর্গত বারুইখালি গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহাদের বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবার ছিল। তাঁহার জননী অতি পুণ্যশীলা আদর্শ গৃহিণী ছিলেন। জননীর আদর্শ চরিত্র ও ধর্ম্মানুরাগ জগদীশের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের বিশেষ সহায় হইয়াছিল। তাঁহার পিতার নাম কালীকুমার মুখোপাধ্যায় ও মাতার নাম প্যারীদেবী।

গ্রাম্য বিদ্যালয়েই তাঁহার প্রথম বিদ্যারম্ভ হয়। এই স্থান হইতে বৃত্তি লাভ করিয়া যশোহর জিলা স্কুলে ভর্ত্তি হন। তাঁহার পিতৃব্য পুত্র জ্যেষ্ঠ শ্রীশচন্দ্র তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। উভয়ে এক বাসায় এক সঙ্গে থাকিতেন এবং জ্যেষ্ঠ শ্রীশচন্দ্র কণিষ্ঠ জগদীশকে খুব ভালবাসিতেন। উভয় ভ্রাতা যশোহর হইতে পাশ করিয়া কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজে (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) ভর্ত্তি হন। তন্মধ্যে জগদীশ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। এফ, এ পরীক্ষায়ও উভয় ভ্রাতা কৃতকার্য্যতা লাভ করেন এবং জগদীশ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। কিন্তু বি, এ, পরীক্ষায় জগদীশ কৃতকার্য্য,

শ্রীপ অকৃতকার্য্য হন। পরে শ্রীশচন্দ্র বি, এ ও ল পাশ করিয়া ওকালতি আরম্ভ করেন। জগদীশ শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন। তিনি অশ্বিনী-কুমার দত্ত মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন। সুতরাং পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই অশ্বিনী বাবু তাঁহাকে স্কুলে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। মণি কাঞ্চণের যোগ হইল। তিনি এই স্কুলে ও পরে কলেজেই আজীবন কাটাইয়াছেন।

১৮৮৪ সালের জুন মাসে ব্রজমোহন স্কুল স্থাপিত হয়। পর বৎসর ১৮৮৫ সালে বি, এ পাশ করিয়া জগদীশ উক্ত স্কুলে কার্য্যে নিযুক্ত হন। তখন লোকে ইহাকে ব্রাহ্ম স্কুল বলিত, কারণ স্কুল স্থাপন কর্ত্তা অশ্বিনী বাবু ব্রাহ্ম সমাজ ভুক্ত ছিলেন। কিছুদিন পরে স্কুলটী গবর্ণমেণ্টের বিষ নয়নে পুড়িয়াছিল। এই স্কুলের সঙ্গে তখন কলেজও হইয়াছিল। স্কুল হইতে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াও বৃত্তি পাইল না। কিন্তু কিন্তু একনিষ্ঠ কর্ম্মী মহাত্মা জগদীশ তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন।

তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে বড় একটা যোগ দিতেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন আদর্শ মানব, আদর্শ সমাজ সেবক, আদর্শ ভক্ত ও আদর্শ ঋষি। তিনি প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম সংস্রবে আসিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার আদর্শ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তিনি দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তন্মধ্যে বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই আদর্শ যোগীকে এই নীরব সমাজ সেবকে যে দেখিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে। এক সময়ে অশ্বিনী বাবু ও তাঁহার সহকর্ম্মী জগদীশ বাবু বরিশালের সমস্ত সৎকার্য্যের প্রাণ ছিলেন। তাঁহাদের নৈতিক চরিত্রের প্রভাব সমস্ত ছাত্র মণ্ডলীর উপর অসম্ভব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন আদর্শে একটী সমাজ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার নাম অমৃত সমাজ।

১৩২৯ সালের ২৪শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার (১০ই নবেম্বর ১৯২২) তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

জগদীশ্বর গুপ্ত—১২৫২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে নদীয়া জিলার অন্তর্গত মেহেরপুর গ্রামে মাতুলালয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গোপীকৃষ্ণ গুপ্ত ও মাতার নাম রাধা-সুন্দরী দেবী। তাঁহার পিতামহ প্রাণ-কৃষ্ণ গুপ্ত একজন খ্যাতনামা কবিরাজ ছিলেন। তিনি শাক্ত ছিলেন।

গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষা সমাপন করিয়া ১২৬৩ খ্রীঃ অব্দে কৃষ্ণনগর কলেজ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন এবং ক্রমে তথা হইতে বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় মাসিক চৌদ্দ

টাকা ও এফ-এ পরীক্ষায় মাসিক পঁচিশ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই নিমিত্ত তাঁহাকে বহু নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করার পর পিতা ও মাতুলের নিকট হইতে সাহায্য বন্ধ হইলে তিনি বৃত্তি প্রাপ্ত অর্থে কোনওরূপে দিন যাপন করিতেন।

যথা সময়ে বি-এল পাশ করিয়া তিনি প্রথমে দিনাজপুরে যাইয়া ওকালতী আরম্ভ করেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলে তিনি তথা হইতে মেদিনীপুরে যাইয়া ওকালতী আরম্ভ করেন। তৎপরে ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি কাঁথীর অস্থায়ী মুন্সেফ নিযুক্ত হন। পরে বহু স্থানে বদলী হইয়া শেষে নওয়াখালিতে আসেন। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে ২৯শে জানুয়ারী এক বৎসরের ছুটি লইয়া সমগ্র ভারত পর্য্যটন করেন।

কুষ্টিয়ার অবস্থানকালে তিনি একটি ব্রাহ্ম সমাজ ও স্কুল গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি পৈতৃক আবাস ভূমি শ্রীখণ্ড গ্রামে একটি স্কুল গৃহ নির্ম্মাণ করাইতে ছিলেন; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। কার্য্যোপলক্ষে তিনি যে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন সর্ব্বত্রই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। খুলনা জিলার বাগের হাটে অবস্থান কালে তিনি কৃষ্ণদাস গোস্বামী প্রণীত 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থ সম্পাদনে ব্রতী হন। এই দুরূহ ও ব্যয় সাধ্য কার্য্যে তিন বৎসর কাল সময় অতিবাহিত হয়। তৎপরে 'শ্রীচৈতন্য লীলামৃত', 'মেঘদূত', 'লীলাশুক' ও 'রামমোহন রায় চরিত' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। মেঘদূত গ্রন্থখানি কালিদাস কৃত সংস্কৃত মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ। সাময়িক পত্রেও তাঁহার রচিত বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির দ্বারা সাহিত্য ও ধর্ম্ম সমাজের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে।

ভারতের বহুস্থানে পর্য্যটন করিয়াও তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল না হইয়া মন্দের দিকে যাইতে লাগিল এবং ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে আষাঢ় তারিখে (১৮৯২ খ্রীঃ অব্দের ৮ই জুলাই) তিনি পরলোক গমন করেন।

জগদীশ্বরভঞ্জ— তিনি ময়ূরভঞ্জের রাজা ছিলেন। দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খাঁ বাঙ্গালার নবাব সরফরাজ খাঁর ভগিনীপতি ছিলেন। সরফরাজ খাঁর সময়ে (১৭৩৯—১৭৪০ খ্রীঃ) তিনি উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন। আলীবর্দ্দী খাঁ সরফরাজ খাঁকে হত্যা করিয়া

বাঙ্গালার নবাব হন। তিনি নবাব হওয়াতে মুর্শিদ কুলি খাঁ বিদ্রোহী হন। আলীবর্দ্দী খাঁ তাঁহাকে দমন করিবার জন্য সসৈন্যে উড়িষ্যায় আগমন করেন। জগদীশ্বরভঞ্জ মুর্শিদ কুলি খাঁর পক্ষে থাকাতে আলীবর্দ্দী খাঁ, মুর্শিদ কুলি খাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াও বন্দী করিতে পারেন নাই। মুর্শিদ কুলি খাঁ সপরিবারে মছলিপত্তনে পলায়ন করেন। জগদীশ্বরভঞ্জের সহিত সন্ধি করিয়া আলীবর্দ্দী খাঁ বঙ্গদেশে আগমন করেন। ইতিমধ্যে আলীবর্দ্দী খাঁর সেনাপতি মোস্তাফা খাঁ, রাজা জগদীশ্বরভঞ্জকে প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া, স্বীয় দরবারে আনয়ন করেন। জগদীশ্বরভঞ্জ দরবারে প্রবেশ করিবা মাত্র, মোস্তাফা খাঁ, মীরজাফর আলী খাঁকে, জগদীশ্বরভঞ্জকে হত্যা করিবার জন্য আদেশ দেন। জগদীশ্বর তৎক্ষণাৎ অসি গ্রহণপূর্ব্বক কয়েকজনকে যমালয়ে প্রেরণ করেন। এবং মোস্তাফা খাঁর-দিগে সবেগে অগ্রসর হন; কিন্তু মীরজাফর খাঁর অস্ত্রাঘাতে সানুচর নিহত হন (১৭৪১ খ্রীঃ)।

জগদেকমল্ল—তিনি চালুক্যবংশের কল্যাণের নরপতি তৃতীয় সোমেশ্বরের পুত্র। ১১৩৮—১১৫০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন, তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় তৈলপ রাজা হন। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের সময় হইতেই সামন্ত নরপতিরা প্রাধান্য লাভ করিতে আরম্ভ করে। বিক্রমাদিত্যের পরে তাঁহারা তাঁহাদের প্রভু চালুক্যপতিদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন নরপতির ন্যায়ই চলিতে আরম্ভ করেন। বনবাসী নামক স্থানের সামন্ত নরপতি বিজ্জল কাকতীয়দিগকে দমন করিয়া প্রধান সেনাপতি হন। অবশেষে ১১৫০ খ্রীঃ অব্দে তিনি তাঁহার প্রভু দ্বিতীয় তৈলপকে বন্দী করিয়া স্বয়ং চালুক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন।

জগদেক মল্ল ২য় বা জয়সিংহ ২য়—খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর পরে চালুক্যবংশীয় রাজাদের অধিকার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বে চালুক্য রাজগণ কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে রাজত্ব করিতেন। পশ্চিমদিকের চালুক্য রাজগণ দক্ষিণাপথের পশ্চিমাংশে রাজত্ব করিতেন। উভয় বংশের লাঞ্ছনা বরাহ মূর্ত্তি ছিল। পশ্চিম চালুক্য-বংশীয় নরপতি (দ্বিতীয়) জগদেক মল্লের সুবর্ণ মুদ্রা কলিকাতা চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।

জগদ্দেব—একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত। তিনি ১৫৫২ শকের (১৬৩০ খ্রীঃ) পূর্ব্বে 'স্বপ্ন-চিন্তামণি' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

জগদ্ধর—তিনি মিথিলার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও স্মৃতি শাস্ত্রকার চণ্ডেশ্বর ঠাকুরের বংশধর। তাঁহার পিতার নাম রত্নধর

এবং মাতার নাম দময়ন্তী। তিনি মিথিলার রাজার প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তিনি বাসবদত্তার টীকা 'তত্ত্বদীপনী', কালিদাসের মেঘদূতের টীকা 'রসদীপিকা', শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার টীকা 'গীতা প্রদীপ', চণ্ডীর টীকা 'দুর্গা টীকা' প্রভৃতি ব্যতীত ভবভূতির মালতী মাধব নাটকের এক সর্ব্বোৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন। সম্ভবত তিনি খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়া ছিলেন।

জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ—তিনি ১২৪৩ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত পুরাপাড়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। জগদ্বন্ধু তাঁহার পিতৃব্য নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের টোলে অধ্যয়ন করেন। মাত্র ছয় বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া অতিশয় দারিদ্রতার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় প্রায় ত্রিশখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি মুদ্রিত হইয়াছে। অর্থাভাবে অবশিষ্টগুলি মুদ্রিত করিতে পারেন নাই। ১৩১১ সালের ১৯শে বৈশাখ তিনি পরলোক গমন করেন।

জগদ্বন্ধু দত্ত—খ্যাতনামা বাঙ্গালী ব্যবসায়ী। বরিশাল জিলার বানরীপাড়া গ্রামে ১২৭৯ বঙ্গাব্দে তাঁহার জন্ম। গ্রাম্য পাঠশালার সামান্য শিক্ষা লাভ করিয়া যৌবনের প্রারম্ভে গ্রামেই একটি ক্ষুদ্র দোকান খুলিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু উহাতে সফলতা লাভ করিতে না পারিয়া অর্থাভাবে বিশেষ দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েন এবং মনোদুঃখে দুইবার আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করেন। অবশেষে সামান্য কয়েকটি টাকা লইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। এখানেও কিছুকাল বিশেষ অর্থ কষ্ট ভোগ করেন। পরে বিশেষ অধ্যবসায় বলে তিনি এক প্রকার লিখিবার কালী আবিষ্কার করেন এবং ঐ কালী (J. B. D. মার্কা কালীর বড়ি ও গুঁড়া) বিক্রয় করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করেন। তিনি ধর্ম্মপ্রাণ বৈষ্ণব ছিলেন। কলিকাতার বাগবাজার পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ গৌড়ীয় মঠের মন্দির তাঁহারই প্রদত্ত অর্থে নির্ম্মিত হয়। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ (১৯৩০, সেপ্টেম্বর) তিনি পরলোক গমন করেন।

জগবন্ধু, প্রভু—তিনি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নিবাস ফরিদপুর জিলায় ছিল। তিনি কিছুকাল ইংরেজী স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া অধ্যয়ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিনাম সংকীর্ত্তনরূপ

মহাযজ্ঞ সাধনে নিযুক্ত হন। পাবনার 'বুড়োশিব' নামক এক মুসলমান সাধকের সহিত তাঁহার খুব সদ্ভাব ছিল। পরে বুড়োশিব নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। কিন্তু কোথায় অন্তর্হিত হন, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। কলিকাতার বাবাভারতী (তখন প্রেমানন্দ ভারতী) আমেরিকা যাইবার পূর্ব্বে কিছুদিন তাঁহার অনুচর ছিলেন।

প্রভু জগবন্ধুর সাধননিষ্ঠা দর্শনে বহু লোক তাঁহার শিষ্য শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। সুললিত কণ্ঠে স্বরচিত কীর্ত্তন যখন প্রভু স্বয়ং গান করিতেন তখন সকলে শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন।

শেষজীবনে কঠোর বৈরাগ্য সাধনে প্রবৃত্ত হন। দিবারাত্র একটা গৃহে দ্বার বন্ধ করিয়া ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতেন। মধ্যাহ্নকালে একবার মাত্র গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন। সেই সময়ে আহার্য্য সামগ্রী গৃহে রক্ষিত হইলে কোনও দিন কিছু আহার করিতেন কোন দিন কিছুই গ্রহণ করিতেন না। এই প্রকারে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য সাধনে পনের বৎসর অতিবাহিত করিয়া একদা সমাধিতেই দেহত্যাগ করেন। বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন।

জগদ্বন্ধু বসু, ডাক্তার—১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে দণ্ডিরহাটের প্রসিদ্ধ বসু বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রাধামাধব বসু। তিনি গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ সমাপন করিয়া, ঢাকা কলেজে প্রবিষ্ট হন। ১৮৪৯ সালে তিনি ঢাকা কলেজ হইতে জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। প্রথম বাৎসরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক চৌদ্দ টাকা বৃত্তি পান ও ডাক্তার এলান ওয়েবারের সহকারীরূপে নিযুক্ত হন। তিন বৎসর মধ্যে ধাত্রী বিদ্যার পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম হইয়া স্বর্ণ পদক ও প্রথম শ্রেণীর প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হন। তৎপরে G. M. C. B. পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া তিনি প্রথমে সিম্যান হাস্পাতালের (Seamen's Hospital) ভার প্রাপ্ত হন। পরে তিনি মেডিকেল কলেজের এনাটমির ডিমনষ্ট্রেটার নিযুক্ত হন। তৎপরে কেম্বেল মেডিকেল স্কুলের মেটেরিয়া মেডিকার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই কার্য্য হইতেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৬৩ সালে তিনি M. D পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং Faculty of Medicine এর সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৮৮৯ সালে M. B এবং ১৮৯০ সালে M. D পরীক্ষার তিনি পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৮৭ সালে যাঁহাদের উদ্যোগে কলি-

কাতা মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। তিনি চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাময়িক পত্রে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে সংগীত ও নৃত্যে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান জন্মে। ভারতের অথবা ভিন্ন দেশের বিশেষ সংগীতজ্ঞ অথবা নৃত্যকলা বিশারদা বাইজী আসিলে, তাঁহাদের পরীক্ষার ভার তাঁহার উপরই পড়িত। এতদ্ব্যতীত চিত্রবিদ্যা, সূচীবিদ্যা, রত্ন পরীক্ষায়ও তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। কলিকাতার কনসেন্ট বিলের আন্দোলনে তিনি বিরোধী ছিলেন। কৃপণ বলিয়া তাঁহার দুর্নাম ছিল। কিন্তু সৎকার্য্যে অর্থ দানের দৃষ্টান্ত, তাঁহার জীবনে বিরল নহে। স্বগ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয় তাঁহারই অর্থে প্রতিষ্ঠিত। ১৮৯৮ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

জগদ্বন্ধু বসু, লালা—ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার শ্রীনগর গ্রামে প্রসিদ্ধ বসু জমিদার বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম লালা কৃষ্ণচন্দ্র বসু। তাঁহার পিতামহ লালা কীর্ত্তিনারায়ণ বসু হইতেই এই বংশের উন্নতির সূত্রপাত হয়। জগদ্বন্ধু বসু মহাশয় পিতা ও পিতামহের সমস্ত গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণে ঐ অঞ্চলের লোকেরা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। প্রতি বৎসর ব্রহ্মপুত্র স্নান উপলক্ষে শ্রীনগরে প্রায় ৩০।৪০ হাজার অতিথির সমাগম হইত। একবার বোধ হয় তাঁহারও অধিক অতিথির সমাগম হইয়াছিল। মজুত জ্বালানা কাঠের অভাব হইল। সেজন্য জগদ্বন্ধু বড় বড় আটচালা ঘর ভাঙ্গিয়া দিয়া, অতিথির জ্বালানা কাঠের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

তিনি ঢাকায় অসিলে ঢাকার মহামান্য মহানুভব নবাব বাহাদুর তাঁহার জন্য ভোজ্য বস্তুর উপহার পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রী নিঃসন্তান ছিলেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে রাজেন্দ্রকুমার ও ব্রজেন্দ্রকুমার নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

জগদ্বন্ধু ভদ্র—শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক। ১২৪৮ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামকৃষ্ণ ভদ্র। ঢাকা জিলার পানকুণ্ড গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। গ্রাম্য পাঠশালায় কিছু শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি অগ্রজ কমলাকান্তের নিকট থাকিয়া নারায়ণগঞ্জের ইংরেজি স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করেন। পরে তথা হইতে ঢাকা বাঙ্গালা বাজারের আর একটি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং সেই বিদ্যালয় হইতে কয়েক বৎসর পরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন

এবং দশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি এফ্-এ (First Arts) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি-এ পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু অর্থা-ভাবে এক বৎসরের মধ্যে অধ্যয়ন ত্যাগ করিতে হয়। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তিনি প্রথমে যশোহরে সরকারী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত হন। তথায় তিনি দশ বৎসর কাজ করেন। তাঁহার শিক্ষকতার গুণে তিনি যে সকল বিষয় পড়াইতেন, সেইসকল বিষয়ে দশ বৎসরের মধ্যে একটি ছাত্রও অকৃত-কার্য্য হয় নাই। এইরূপ অসাধারণ সাফল্যের জন্য ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেন। যশোহর হইতে তিনি পাবনা গমন করেন।

বাল্যকাল হইতেই তিনি সাহিত্যানু-রাগী ছিলেন। মাত্র দ্বাদশ বর্ষ বয়ক্রম কালে তিনি ব্রজলীলা বিষয়ে একটি সুবৃহৎ পাঁচালী রচনা করেন। পরবর্ত্তী জীবনে কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত কবিতা কুসুমাঞ্জলি নামক মাসিক পত্রিকা, ঢাকা নগরী হইতে প্রকাশিত প্রসিদ্ধ 'ঢাকা প্রকাশ', মুরশিদাবাদের 'ভারত রঞ্জন', চুঁচুড়ার 'এডুকেশন গেজেট', কলিকাতার 'অমৃত বাজার পত্রিকা', কবি হরিশ চন্দ্র মিত্রের 'মিত্র প্রকাশ', কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'বান্ধব', এবং 'অনুসন্ধান' প্রভৃতি বহু পত্রিকায় নানা বিষয়ে তাঁহার সুচিন্তিত জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধে'র অনুকরণে তিনি 'ছুছুন্দরী বধ' নামে ব্যঙ্গ কাব্য প্রকাশ করেন। উহা অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। কলেজে পড়িবার সময়ে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'তপতী উদ্ধার' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। 'ভারতের হীনাবস্থা' (মিত্রাক্ষর কাব্য), গৌরপদ তরঙ্গিনী' নামে দুইখানি পুস্তক, একখানি নাটক, বিদ্যালয় পাঠ্য কতিপয় পুস্তকও তিনি রচনা করেন। তদ্ভিন্ন তিনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীও সম্পাদন করিয়াছিলেন।

জগদ্রাম— একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। তাঁহার রচিত একখানা জাতক পদ্ধতি আছে।

জগদ্রাম ভাদুড়ী—বঙ্গদেশে পূর্ব্বে মৃন্ময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পূজার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না। বারেন্দ্র ভূমির রাজা জগদ্রাম ভাদুড়ী প্রথমে মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গড়াইয়া নব রাত্রীর ব্রত সমাধা করেন। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশও মাটির মূর্ত্তি পূজার প্রবর্ত্তক। প্রথম প্রথম লোকে ইহাকে আগমবাগীনী কাণ্ড বলিত।

জগদ্রাম রায়—'রামায়ণ', 'দুর্গাপঞ্চ রাত্র' আত্মবোধ' প্রভৃতি গ্রন্থের কবি। তাঁহার পিতার নাম রঘুনাথ রায়, মাতার নাম শোভাবতী দেবী। জন্ম-

স্থান বাঁকুড়া জেলার শিখর ভূমির অন্তর্গত ভুলুই গ্রাম। ইহা রাণীগঞ্জ রেল ষ্টেসন হইতে তিন মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে দামোদর নদের অপর পারে অবস্থিত। জগদ্রামের বংশধরগণ এখনও তথায় বাস করিতেছেন। তিনি পঞ্চকুটের অধিপতি রঘুনাথ সিংহের আদেশে রামায়ণ রচনা করেন। তাঁহার রামায়ণের নাম অদ্ভুত রামায়ণ। ১৭৯০ খ্রীঃ অব্দে (১৭১২ শকে) তাঁহার রামায়ণ শেষ হয়। এই রামায়ণে প্রচলিত রামায়ণের সপ্ত কাণ্ড ছাড়া পুষ্করা কাণ্ড নামে একটী অতিরিক্ত কাণ্ড আছে। এই রামায়ণখানা কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষাও বড়। মূল অদ্ভুত রামায়ণের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ মিল নাই। বলিতে কি ইহার অধিকাংশ স্বকপোল কল্পিত স্বতন্ত্র কাব্য।

কবির রচিত দুর্গাপঞ্চ রাত্র গ্রন্থের বিষয় শরৎকালে রাবণ বধার্থ শ্রীরামের দুর্গা পূজা।

জগদ্রাম কবি ও সাধক ছিলেন। তাঁহার রচনা সর্ব্বত্র প্রাঞ্জল নহে বলিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণের ন্যায় তাঁহার গ্রন্থ সর্ব্বত্র আদৃত হয় নাই। তিনি খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম রামচন্দ্র রায়। তাঁহারা রাঢ়ী শ্রেণীর শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ।

জগন্নাথ—(১) একজন তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুরের মহারাজ জয়সিংহের তিনি প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। জয়সিংহের আদেশে তিনি আরবী 'মিস্তাজী' গ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত সম্রাট' নাম দিয়া সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেন। এই মিস্তাজী গ্রন্থ প্রাচীন যবন টলেমী কৃত সিদ্ধান্তের আরবী অনুবাদ। সিদ্ধান্ত সম্রাটে অনেক আরবীয় জ্যোতির্ব্বিদের গণনার ক্রম আছে। জগন্নাথ ১৬৪০ শকে (১৭২২ খ্রীঃ) ইউক্লিডের রেখা গণিতের আরবী অনুবাদ সংস্কৃত রেখা গণিত রচনা করেন। এই দুই অনুবাদের জন্য জয়সিংহ জগন্নাথকে অনেক গ্রাম দান করেন। ১৬৭২ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজীব জয়সিংহকে শিবাজির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। সেই সময়ে জগন্নাথের সহিত জয়সিংহের সাক্ষাৎ হয়। তিনি অল্প বয়সেই জগন্নাথকে বেদবেদাঙ্গ ও দর্শনাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত দেখিয়া দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সঙ্গে করিয়া আনেন এবং আরবী ও পারস্য ভাষা শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করেন। অল্পকাল মধ্যেই এই উভয় ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত হইলেন। ইহা দেখিয়া আওরঙ্গজীব তাঁহাকে প্রধান সভা পণ্ডিতের পদ প্রদান করেন। এই পদে অবস্থানকালেই তিনি অনেক আরবী গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ করেন।

জগন্নাথ—(২) একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত। তিনি 'পর্ব্বস্বভাব' নামে গ্রহণ বিষয়ে এক গ্রন্থ রচনা করেন। তদ্ভিন্ন ১৬৫০ শকে (১৭২৮ খ্রী:) তিনি সিদ্ধান্ত সম্রাট নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন।

জগন্নাথ—(৩) একজন বাঙ্গালী কবি। তাঁহার রচিত একখানা মনসার ভাসান পাওয়া গিয়াছে।

জগন্নাথ—(৪) বিহারীমলের কনিষ্ঠ পুত্র ও রাজা ভগবান দাসের ভ্রাতা। তিনি আড়াই হাজার সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন এবং অধিকাংশ সময় মান-সিংহের সৈন্যাপত্যাধীন হইয়া কাজ করিতেন। তিনি রাণা প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলেন এবং চিতোর যুদ্ধে রণ কৌশল ও সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। আকবরশাহের অনুগ্রহে তিনি রতনভর জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। জাহাঙ্গীর বাদশাহ তাঁহাকে পাঁচ হাজারী সেনাপতির পদে উন্নিত করেন।

জগন্নাথ কালোয়াৎ—তিনি সম্রাট শাজাহানের সময়ের একজন সঙ্গীতাচার্য্য ছিলেন। সম্রাট তাঁহাকে 'মহাকবিরাজ' উপাধি দিয়াছিলেন।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন—হুগলী জিলার অন্তর্গত ভাগীরথী তীরস্থ ত্রিবেণী নামক গ্রামে ১৬৯৫ খ্রী: অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রুদ্রদেব তর্কবাগীশ ও মাতার নাম দয়া দেবী। তাঁহার মাতামহ বাসুদেব ব্রহ্মচারী দৌহিত্রের জন্ম কামনায় জগন্নাথ দেবের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। দৌহিত্রের জন্ম সংবাদ শ্রবণে তিনি ইহা জগন্নাথ দেবের অপার করুণা বলিয়া মনে করিয়া, তাঁহার নাম জগন্নাথ রাখিলেন। বালক পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলে বিদ্যারম্ভ হইল। পিতা রুদ্রদেব স্বয়ং তাঁহাকে মুখে মুখে ব্যাকরণ ও অভিধান শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পরে দুই চারি খানি সাহিত্য গ্রন্থ তাঁহাকে পড়াইলেন। এই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বালক অচিরে এই সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া বাঁশবেড়িয়াস্থিত জ্যেষ্ঠতাত ভবদেব ন্যায়ালঙ্কারের টোলে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আগমন করেন। ইহার পূর্ব্বেই ৮ম বর্ষে তাঁহার মাতৃ বিয়োগ হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠতাতের নিকট দ্বাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উক্তশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। তৎপরে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। পরিণয়ান্তে তিনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নার্থ কামালপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রঘুদেব বাচস্পতির নিকট গমন করেন। অধ্যাপক এই অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান অন্তে-বাসীকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার প্রতিভার পরি-চয় পাইয়া, তিনি অতি যত্নের সহিত তাঁহাকে ন্যায়ের জটিল বিষয়ে শিক্ষা

দিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য অনুরাগী ছাত্র তাঁহার গুরুর নিকট ন্যায়শাস্ত্রে কৃত প্রবেশ লাভ করিয়া, তর্কপঞ্চানন উপাধি লাভ করিলেন।

এই সময়ে চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়সে তিনি পিতৃহীন হইলেন। পিতার অবস্থা কখনও স্বচ্ছল ছিল না। অতি কষ্টে গৃহের তৈজসপত্র কিছু বিক্রয় করিয়া পিতৃ দায় হইতে উদ্ধার হইলেন।

এখন তাঁহার অধ্যাপক জীবন আরম্ভ হইল। তাঁহার অধ্যাপনা গুণে চতুর্দ্দিক হইতে ছাত্র আসিতে লাগিল। ইতি-মধ্যেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রতিভাও চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। শোভা-বাজারের রাজা নবকৃষ্ণদেব, মুরশিদা-বাদের নবাবের দেওয়ান নন্দকুমার রায়, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, (১৭১০—১৭৮৩ খ্রীঃ) গবর্ণর জেনা-রেল ওয়ারেন হেষ্টিংস, (১৭৭২—৮৫ খ্রীঃ) সার জন শোর (১৭৯৩—১৭৯৮ খ্রীঃ) প্রভৃতি বড় বড় ইংরেজ রাজকর্ম্ম-চারীর সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহারা অনেক সময়ে অনেক বিষয়ে বিশেষতঃ রাজ্যশাসন বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। সদর দেও-য়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি হেরিংটন সাহেব ও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সার উইলিয়ম জোন্‌স তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। সময়ে সময়ে শেষোক্ত ব্যক্তি সস্ত্রীক তাঁহার আলয়ে যাইয়া উপস্থিত হইতেন। কথিত আছে তাঁহারই ব্যয়ে তর্কপঞ্চাননের গৃহে দস্যু ভয় নিবারণার্থ প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট অনেক দুরূহ ধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যবস্থার অনুবাদ তাঁহার দ্বারা করাইয়া লইতেন। সার জনশোর ও সার উইলিয়ম জোন্‌সের অনুরোধে তর্কপঞ্চানন 'অষ্টাদশ বিবাদের বিচার গ্রন্থ' ও 'বিবাদ ভঙ্গার্ণব' নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়া গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করেন। এই কার্য্যের জন্য গ্রন্থ সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মাসিক সাত শত টাকা বৃত্তি এবং এবং গ্রন্থ সমাপ্তির পরেও মাসিক তিন শত টাকা বৃত্তি পাইতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার গুণ মুগ্ধ দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র অনেক নিষ্কর ভূমি ও ত্রিবেণীস্থিত একটী জলাশয় তাঁহাকে দান করেন। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় উখুড়া পরগণায় তাঁহাকে সাতশত বিঘা নিষ্কর ভূমি প্রদান করেন। রাজা নবকৃষ্ণ দেব তাঁহার বাটীর ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে একখানা নিষ্কর তালুক দান করেন।

যে ব্যক্তি সামান্য অবস্থার মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া অতিকষ্টে অধ্যয়ন করিয়া অধ্যাপনার কার্যে ব্রতী হইয়া-ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বার্ষিক চারি হাজার টাকা আয়ের নিষ্কর ভূমি

ও নগদ একলক্ষ টাকা রাখিয়া যান। বোধ হয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মধ্যে তিনিই প্রথম ইংরেজের বৃত্তি ভোগী হইয়াছিলেন। মৃত্যু—১৮০৯ খ্রীঃ অব্দ।

তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে একটী মনোরম কাহিনী আছে। একদা গঙ্গার ঘাটে তিনি তর্পণাদি করিতেছিলেন। এমন সময়ে দুইজন ইয়োরোপীয় নৌকাযোগে তথায় আগমন করিয়া কলহে প্রবৃত্ত হন। পরে বিচারালয়ে উপস্থিত হইলে, তর্কপঞ্চানন সাক্ষ্য দিতে তথায় নীত হইলেন। তিনি বিদেশী ভাষায় অনভিজ্ঞ হইয়াও অবিকল তাহাদের কথাবার্ত্তা পুনরুল্লেখ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিচারক তদ্দৃষ্টে অতি মাত্র বিস্মিত হইয়াছিলেন।

জগন্নাথ দাস—(১) একজন বৈষ্ণব সাধক ও গ্রন্থকার। তিনি নীলাচলের কপিলেশ্বরপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ভগবান পাণ্ডা ও মাতার নাম পদ্মাবতী। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন। একদা শ্রীচৈতন্য দেব তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন—'তুমি অতি বড় লোক'। তদবধি তাঁহার সম্প্রদায়স্থ লোকেরা 'অতি বড় বা অতি বড়া' নামে প্রসিদ্ধ হন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ—১। 'প্রেমসাধন', ২। 'ব্রহ্মাণ্ড ভূগোল' ৩। 'দূতীবোধ' প্রভৃতি।

জগন্নাথ দাস—(২) বাঙ্গালী বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। তাঁহার রচিত তিনটি পদ পাওয়া গিয়াছে।

জগন্নাথ দ্বিজ—একজন বাঙ্গালী কবি। তিনি 'দিনাজপুরের কবিতা' নামক পুস্তক ও 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী' রচনা করেন। পাবনার কবি রামপ্রসাদ মৈত্রের ন্যায় তিনি সমসাময়িক ঐতিহাসিক কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার জন্মস্থান দিনাজপুর।

জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ—তিনি একজন বড় আলঙ্কারিক পণ্ডিত ছিলেন। অলঙ্কার শাস্ত্রে তাঁহার রচিত 'রস গঙ্গাধর' গ্রন্থ অতিশয় প্রসিদ্ধ। তাঁহার 'পীযূষলহরী' প্রভৃতি স্তোত্র এবং 'ভামিনী বিলাস' কাব্যে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি দিল্লীর সম্রাট শাজাহান বাদ্শাহের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। কথিত আছে, তিনি সম্রাট শাজাহানের রাজ সভায় অলঙ্কার শাস্ত্রের বিচারে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অপ্পয় দীক্ষিত ও ভট্টোজী দীক্ষিতকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। অপ্পয় দীক্ষিতের 'চিত্র মীমাংসা' ও ভট্টোজী দীক্ষিতের 'প্রৌঢ় মনোরমা' খণ্ডন করিবার জন্য, তিনি 'চিত্র মীমাংসা খণ্ডন' ও 'মনোরমা কুচমর্দ্দন' নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। ভট্টোজীর একজন শিষ্য 'মনোরমা কুচমর্দ্দন কীচক বধ' নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া জগন্নাথের অশিষ্টতার সম্যক উত্তর দিয়াছিলেন। কেহ কেহ

বলেন, তিনি শাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার কোপানলে পতিত হইয়া নিহত হন। মতান্তরে তিনি দিল্লী হইতে পলায়নপূর্ব্বক কাশীতে গমন করিয়া আত্মরক্ষা করেন।

জগন্নাথ প্রসাদ বসু মল্লিক—হাবড়া জিলার অন্তর্গত আন্দুল গ্রামের প্রসিদ্ধ বসু মল্লিক বংশে তিনি উনবিংশ খ্রীঃ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং স্বয়ং অনেক সংগীতও রচনা করিয়াছিলেন। তাহার অধিকাংশই প্রণয় সম্বন্ধীয়। তিনি 'শব্দকল্প তরঙ্গিনী' ও 'শব্দকল্প লতিকা' নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে শব্দকল্প লতিকা গ্রন্থ, প্রসিদ্ধ সংস্কৃত 'অমরকোষ' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। উহা ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে এবং শব্দকল্প তরঙ্গিনী ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি 'রত্নাবলী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। মহেশচন্দ্র পাল নামক এক ব্যক্তি নামতঃ ইহার সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু কাব্যত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ই সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিতেন।

জগন্নাথ বড়ুয়া—বর্ত্তমান যুগের আসামের একজন সর্ব্বজন মান্য নেতা ও দেশহিত ব্রতী। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে আসামের যোড়হাট নগরে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে প্রবেশিকা এবং তাহার চারি বৎসর পরে, তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনিই আসামের উত্তর অঞ্চলের প্রথম ঐ সম্মানের অধিকারী হন। সেই জন্য সাধারণ লোক মধ্যে তিনি বি-এ জগন্নাথ নামেই খ্যাত ছিলেন। কৃতীত্বের সহিত প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষায় (Assam Civil Service Examination) উত্তীর্ণ হইয়াও কোন সরকারী চাকুরী গ্রহণ না করিয়া, পৈতৃক ভূমিতে চা-বাগান করেন এবং ঐ ব্যবসায়ে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া, প্রভূত ধনের অধিকারী হন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে সকল মনীষী আসামবাসীদের সর্ব্ব-প্রকার উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিয়াছেন জগন্নাথ বড়ুয়া তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। এবিষয়ে, তাঁহারই বিশেষ বন্ধু মানিকচন্দ্র বড়ুয়া, তাঁহার প্রধান সহকর্মী ছিলেন। বর্ত্তমান যুগে আসামের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য তাঁহাদের চেষ্টার কথা আসামবাসীগণ চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। জগন্নাথ ও মানিকচন্দ্রই এক-রূপ আসামের রাজনৈতিক আন্দোলনের স্রষ্টা ছিলেন

জগন্নাথবড়ুয়া সুবক্তা ছিলেন তাঁহার ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতা সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিত। সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ডের (Edward

VII) রাজ্যাভিষেকের সময়ে তিনি সরকারী আমন্ত্রণে, আসামবাসীদের প্রতিনিধিরূপে ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

জগন্নাথ বিদ্যাপঞ্চানন—একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত। তিনি চব্বিশ পরগণা জিলার অন্তর্গত কুশদহের মাটিকোমড়া গ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিত রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারের বংশধর ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামশরণ ন্যায়বাচস্পতির দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। স্মৃতি শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার ব্যবস্থা অকাট্য ছিল। তাঁহার চারি পুত্র—রামচন্দ্র শিরোমণি, অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য, রামকমল চূড়ামণি ও তারিণীচরণ ভট্টাচার্য্য। রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার দেখ।

জগন্নাথ মিশ্র—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতা। তিনি শ্রীহট্টের ভরদ্বাজ গোত্রীয় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার বাসস্থান ঢাকা দক্ষিণ পরগণায় ছিল। তাঁহার পিতার নাম নীলকণ্ঠ মিশ্র ও মাতার নাম শোভা দেবী। তিনি শ্রীহট্টের অন্তর্গত জয়পুরের নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করেন। তখন জগন্নাথ মিশ্রের ন্যায় শচীদেবীর পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীও নবদ্বীপে বাস করিতেন। নবদ্বীপে শচীদেবীর প্রথম আটটি কন্যা সন্তান হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তৎপরে একটি পুত্র সন্তান জন্মে। পিতামাতা তাহার নাম বিশ্বরূপ রাখেন। বিশ্বরূপের আট বৎসর বয়সের সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বরূপ ষোল বৎসর বয়সের সময় সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া গৃহত্যাগী হন। তখন শ্রীচৈতন্য আট বৎসর বয়স্ক বালক। শ্রীচৈতন্য উপনয়নের পরে এগার বৎসর বয়সের সময় জগন্নাথ মিশ্র পরলোক গমন করেন।

জগন্নাথ রায়, মাধব রায়—তাঁহারা সাধারণতঃ জগাই মাধাই নামে খ্যাত ছিলেন। নবাব সরকারে তাঁহারা উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশ জাত হইয়াও অতিশয় মদ্যপায়ী ছিলেন। তাঁহাদের অন্যবিধ দুষ্কার্য্যের কথাও শোনা যায়। তাঁহারা একদিন মত্ততাবস্থায় নিত্যানন্দ প্রভুকে কলসীর কাণাদ্বারা আঘাত করিলে তাঁহার মস্তক হইতে রক্তধারা পতিত হয়। ইহাতেও নিত্যানন্দ প্রভু ক্রুদ্ধ না হইয়া প্রেমভরে তাঁহাদেরে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহাদের জীবন চিরকালের জন্য পরিবর্ত্তন হইল। হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইল। বিষয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা একেবারে ভক্ত শ্রেণীতে পরিণত হইলেন।

জগন্নাথ রায় (হাজী)—খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজের

অন্তর্গত আখড়া সমাজে জগন্নাথ রায় নামে একজন সমাজপতি ছিলেন। নবাব সরকারে তাঁহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি যথেষ্ঠ ছিল। জগন্নাথ নবাব সরকারে ফৌজদারের কর্ম্ম করিতেন এবং রায় উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তথাকার প্রধান মুসলমান কর্ম্মচারী হাজী সাহেবের কন্যা তাঁহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হন। প্রথমে অকৃতকার্য্য হইলেও পরে জগন্নাথ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া হাজী কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার হিন্দু পত্নীর গর্ভজাত পুত্রের নাম সৃষ্টিধর রায়। জগন্নাথ মুসলমান হইয়াও হিন্দুর প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই।

জগন্নাথ সিংহ শর্ম্মা—তিনি ময়মনসিংহের অন্তর্গত সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহের (১১৫৬—১২২৮ বঙ্গাব্দ) চতুর্থ পুত্র। তিনি 'জগদ্ধাত্রী গীতাবলী' নামে একখানা কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

জগন্নাথ সেন—একজন বাঙ্গালী কবি। তাঁহার রচিত একখানা মনসার ভাসান পাওয়া গিয়াছে।

জগন্মোহন—তিনি একজন জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'জ্যোতিঃ সার সাগর'। ১৫২৫ শকে (১৬০৩ খ্রীঃ) 'মুহূর্ত্ত চিন্তামণি' নামক গ্রন্থের পীযূষধারা নাম্নী টীকা গোবিন্দ দৈবজ্ঞ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে জগন্মোহনের গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

জগন্মোহন গোসাঞি—প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত বাঘাসুরা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহা হইতে 'জগন্মোহিনী' নামে একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

জগন্মোহন তর্কালঙ্কার—খ্যাতনামা বাঙ্গালী পণ্ডিত। চব্বিশ পরগণা জিলার বড়িশা-বেহালার নিকটবর্ত্তী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে ১২৩৫ বঙ্গাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রাঘবেন্দ্র ন্যায়বাচস্পতি। বাল্যকালে তাঁহার পাঠাভ্যাসে অমনোযোগীতা দর্শনে প্রথমে সকলেই নিরাশ হইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে, সুবুদ্ধির উদয় হওয়াতে প্রথমে কলিকাতা গমন করিয়া, এক আত্মীয়ের গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুকাল পরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া কলেজের এক অধ্যাপকের গৃহে রন্ধন কার্য্য করিবার বিনিময়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথা হইতে, বিশেষ অধ্যবসায় বলে কলেজের পরীক্ষায় কৃতীত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করিলেন। তদবধি আর পরের গলগ্রহ না হইয়া স্বাবলম্বী হইয়াই পাঠ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে অধ্যয়ন শেষ করিয়া উপাধি লাভ করিলেন।

অধ্যয়ন শেষ করিয়াই তিনি

সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থশালাধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। ঐ কাজ করিতে করিতে তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার চণ্ডকৌশিকী গ্রন্থের টীকা দীর্ঘকাল সংস্কৃতে এম্-এ পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য ছিল। অনেকগুলি তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থও তিনিও সম্পাদন করেন. তাঁহার অনুদিত মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে যে মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত হয়, তিনিও তাহার অনুবাদকদের অন্যতম ছিলেন।

তিনি "ভাবপ্রকাশ যন্ত্রালয়" ও "পুরাণ প্রকাশ" যন্ত্রালয় নামে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া বহু সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ ও প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করেন। "পরিদর্শক" নামে একখানি বাঙ্গালা দৈনিক পত্রিকা এবং একখানি বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকাও তিনি কিছুকাল প্রকাশ করেন।

পরবর্ত্তী জীবনে তিনি তন্ত্র শাস্ত্রের আলোচনাতেই বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করেন এবং তন্ত্রশাস্ত্রানুযায়ী নানাবিধ সাধন করেন। ঐ সময়ে অনেক লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। শেষজীবনে তিনি কুলাবধূতাচার্য্য ও পূর্ণানন্দ তীর্থনাথ নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

সংস্কৃত কলেজে চাকুরী করিবার সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে অধ্যাপনা ও করিতেন। অধ্যাপক রূপেও তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। ১৩০৬ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে (১৯০০ খ্রীঃ মার্চ্চ) তাঁহার দেহান্ত হয়।

জগন্মোহিনী দেবী—তিনি উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের কন্যা। বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় উড়িষ্যা দেশ আক্রমণ করিলে, রাজা প্রতাপরুদ্র গোদাবরী নদীর দক্ষিণস্থ সমুদয় প্রদেশ ও স্বীয় কন্যাকে তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া সন্ধি স্থাপন করেন। রাণী জগন্মোহিনীর অন্য নাম তুকা ছিল। বিবাহের পরে স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া, তিনি কোডাপা জিলার অন্তর্গত কম্বম নামক স্থানে সন্ন্যাসিনীর ন্যায় জীবন যাপন করিয়াছিলেন।

জগবন্ধু রায়—তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'নারী না দেবী—পুরুষ না দানব। তাঁহার গ্রন্থের প্রতি পাদ্য বিষয় নারীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে না শিখিলে দেশের উন্নতি হইবে না।

জগভান— রাজপুতানার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে কাত্তি নামক ক্ষত্রিয় জাতির বাস ছিল। যশল্মীরপতি শালিবাহন (১১৬৭—৭২ খ্রীঃ) রাজা হইয়াই উক্ত প্রদেশ আক্রমণ করেন। কাত্তিপতি জগভান স্বদেশ রক্ষার্থ প্রাণপণ যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না, রণস্থলেই তিনি শয়ন করিলেন। তাঁহার রাজ্য শালিবাহন অধিকার করিলেন।

জগমোহন—একজন বাঙ্গালী কবি। তাঁহার বিরচিত লক্ষ্মীর চরিত্র বিষয়ে 'লক্ষ্মী মঙ্গল' নামক একখানা বই পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে দুর্ব্বাসার শাপে ইন্দ্রের লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইবার বিবরণ আছে।

জগমোহন বসু—রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। তিনি ভবানীপুরে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সমসাময়িক (১৮২৯ খ্রীঃ অব্দে মার্চ্চ; ১২৩৫ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন) সংবাদ পত্রে প্রকাশিত বিবরণী হইতে জানা যায় যে বিদ্যালয়টি সুপরিচালিত হইত।

জগমোহন বাচস্পতি—নাটোরের অন্তর্গত কালীগ্রামে তাঁহার বাস ছিল। তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন। তৎকালীন দিনাজপুরের রাজা তাঁহার গণনায় সন্তুষ্ট হইয়া কালীগ্রামস্থ কালীমাতা বিগ্রহের জ্যোতিষী পণ্ডিত পদে তাঁহাকে পুরুষানুক্রমে নিযুক্ত করেন। এখনও তাঁহার বংশধরগণ উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

জগমোহন বিশ্বাস— নওয়াখালী জিলার নিমক মহলের দেওয়ান রামহরি বিশ্বাসের পুত্র জগমোহন বিশ্বাস লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে, দশশালা বন্দোবস্তের কালে এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের রাজা ও জমিদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিবার দেওয়ানী ভার প্রাপ্ত হইয়া এলাহাবাদে আগমন করেন। পূর্ব্বে তীর্থ যাত্রীদের একটা কর দিতে হইত। তিনি এককালীন দুই লক্ষ টাকা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদান করিয়া সমস্ত তীর্থ যাত্রীদের এই কর চিরকালের জন্য রহিত করাইয়া দেন।

জগমোহন মিত্র—একজন বাঙ্গালী কবি। তাঁহার রচিত একখানা মনসার ভাসান পাওয়া গিয়াছে।

জগরাণী দেবী—তাঁহার স্বামী পণ্ডিত ভবানী দয়াল। দক্ষিণা আফ্রিকার নেটাল নগরের 'হিন্দু' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন ভারতীয়দের প্রতি ঘোরতর নির্য্যাতন চলিতেছিল সেই সময়ে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ব্রত ধারিণী এই বীর রমণী মহাত্মা গান্ধীর পত্নীর সহিত কয়েকবার কারাগারে গমন করিয়াছেন। ১৯২২ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

জগা সাধু—তিনি সাধক শ্রেষ্ঠ দাদুর একজন অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। তিনি ছায়ার ন্যায় দাদুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। বৃদ্ধাবস্থায় তিনি দাদুর সমুদয় কার্য্যভার গ্রহণ করেন। দাদু বার্দ্ধক্য বশতঃ দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতে অসমর্থ হইলে, তিনিই তৎপরিবর্ত্তে গমন করিতেন।

জঙ্গ বাহাদুর, মহারাজা, সার—নেপালের সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয় বংশে ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে এই প্রতিভাবান বীর পুরুষের জন্ম হয়। ১৮৪৬ সালে নেপালের

মহারাজা রাজেন্দ্রবিক্রম শাহের রাজত্ব-কালে, রাজ্যে একটী অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহার ফলে যুবরাজ সুরেন্দ্র বিক্রম সিংহ রাজা হন (১৮৪৭ খ্রীঃ)। রাণী লক্ষ্মী দেবী ও মহারাজ রাজেন্দ্র বিক্রম কাশীতে নির্ব্বাসিত হন এবং জঙ্গ বাহাদুর প্রধান সেনাপতি বা মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন। এই বিচক্ষণ মন্ত্রীর বুদ্ধি-বলে বহুকাল প্রজ্বলিত অন্তর্বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। মহারাজ রাজেন্দ্র বিক্রম শাহ স্বীয় পুত্রের বিরুদ্ধেই দণ্ডায়-মান হইবার জন্য চেষ্টা করিয়া, ব্যর্থকাম হন। ১৮৪৭ সালে মহারাজা সুরেন্দ্র বিক্রম শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র ত্রৈলোক্য বিক্রম শাহ ভূমিষ্ঠ হন।

জঙ্গ বাহাদুর ইংরেজ রাজের সহিত সর্ব্বদা সদ্ভাব রক্ষার্থ সচেষ্ট ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দের শিখ যুদ্ধের সময়ে তিনি ইংরেজদিগকে আট রেজিমেণ্ট সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ধন্যবাদসহ তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

এখানে জঙ্গ বাহাদুরের উন্নত হৃদয়ের পরিচায়ক একটী বিষয় উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। শিখ যুদ্ধের অবসানে লাহোরের রাণী চাঁদকুমারীকে চুনার-গড়ে বন্দিনী করিয়া রাখা হইয়াছিল। তিনি তাঁহার চাকরাণীর সহিত বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বাহির হইয়া পড়েন। চারি পাঁচ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার পলায়নের সংবাদ ইংরেজ কর্ম্মচারীরা জানিতেই পারেন নাই। এদিকে তিনি একখানা ক্ষুদ্র নৌকায় পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হন। তথা হইতে কখনও নৌকায়, কখনও গাড়ীতে, কখনও পদব্রজে এই-রূপে নেপাল সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন আমার স্বামী তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া নেপালে যাইয়া অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার সাহায্যার্থ নেপালে যাইতেছি। রাণী চাঁদকুমারী নেপাল রাজ্যে উপস্থিত হইয়াই রাজ-দরবারে তাঁহার অবস্থা জানাইয়া সাহায্য প্রার্থী হইলেন। কিন্তু জঙ্গ বাহাদুর বন্ধুত্বের খাতিরেও তাঁহাকে ইংরেজদের হস্তে সমর্পণ করিলেন না। রাণীর বাসের জন্য একটী বাগান বাড়ী প্রদত্ত হইল। চারিজন পাঞ্জাবী চাকর দুইজন পাঞ্জাবী চাকরাণী রাণীর পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত হইল। এতদ্ব্যতীত রাণী ইংরেজ সর-সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে যাহাতে না পারেন, তাহার জন্য দুইজন বিশ্বস্ত নেপালী মহিলা নিযুক্ত হইলেন। রাণী মাসিক আট শত টাকার বৃত্তি ও দৈনিক আটা, ঘি, ডাল প্রভৃতির সিধা পাইতেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টও এই ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইলেন।

১৮৫০ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি কুমার রাণাজী, কর্ণেল জগৎ সমসের প্রমুখ নয়জন গুর্খা অফিসার,

একজন জ্যোতিষী, একজন চিকিৎসক, একজন চিত্রকর, একজন সুবাদার ও চারিজন পাঁচকসহ ইংলণ্ড যাত্রা করেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে যথেষ্ঠ সমাদরের সহিত গ্রহণ করেন। নানা-বিধ উপাধি দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করেন। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ২১টী তোপধ্বনীর ব্যবস্থা হয়। ১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নেপাল-পতি স্বীয় সেনাপতি ও মন্ত্রীকে অতি সমাদরে গ্রহণ করেন। বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের কিছুকাল পরেই তাঁহার বিরুদ্ধে একটী ষড়যন্ত্র হয়; কিন্তু অচিরেই বিদ্রোহীরা ধৃত হইয়া প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জঙ্গ বাহাদুর প্রধান দুই একজনের বধ দণ্ড বিধান করিয়া অপর অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়া, নেপাল হইতে নির্ব্বাসিত করেন। কেবল তাহাই নহে অল্প কয়েক বৎসর পরেই তাঁহাদিগকে নির্ব্বাসন হইতে স্বদেশে আনয়ন করেন এবং একেবারে মুক্ত করিয়া দেন। এই ক্ষমা প্রদর্শন দ্বারা তিনি বহু লোকের হৃদয় জয় করেন।

জঙ্গ বাহাদুরের জীবনের আর একটা প্রধান ঘটনা ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দে তীব্বতের সহিত যুদ্ধ। এই যুদ্ধে তিনি জয় লাভ করিয়া নেপালের ক্ষাত্র শক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। তীব্বতীয়েরা পরাজিত হইয়া বার্ষিক দশ হাজার টাকা রাজকর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সন্ধি করেন।

তীব্বত যুদ্ধের অবসানের পরেই ১লা আগষ্ট (১৮৫৬ খ্রীঃ) তারিখে স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাম বাহাদুরের হস্তে মন্ত্রীত্ব ভার সমর্পণপূর্ব্বক অবসর গ্রহণ করেন। মন্ত্রিত্ব পদ লইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ অনেক রক্তপাত ও নরহত্যা হইয়াছে। ইহার অবসান করিবার জন্যই তিনি জীবিত থাকিতেই উক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি বাম বাহাদুরকে মন্ত্রীপদে স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এক বৎসর পূর্ণ না হইতেই ১৮৫৭ সালের ২৫শে মে বাম বাহাদুর পরলোক গমন করিলেন। সুতরাং বাধ্য হইয়া তিনি আবার মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে ভারত-বর্ষে সীপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। জঙ্গ বাহাদুর এই সময়ে সসৈন্যে স্বয়ং অযোধ্যা প্রদেশে উপস্থিত হইয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে যথেষ্ঠ সাহায্য করেন। এমন কি লক্ষ্ণৌ অধিকার তাঁহারই সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হয়। বিদ্রোহের অবসানে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তরাই অঞ্চলের বিস্তৃত ভূমি খণ্ড নেপাল গবর্ণমেণ্টকে প্রদান কারন এবং জঙ্গ বাহাদুর জি, সি, বি, এবং জি, সি, এস, আই নামক সম্মানিত উপাধিতে ভূষিত হন।

এই বিচক্ষণ সেনাপতি নেপালের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন। ইংলণ্ড ভ্রমণকালে তথাকার অনেকগুলি দুগ্ধবতী গাভী এবং কয়েকটী ষাঁড় স্বদেশের গো জাতির উন্নতির জন্য ক্রয় করিয়া আনেন। বোম্বাই হইতে উৎকৃষ্ট অশ্ব সংগ্রহ করিয়া স্বদেশের অশ্বের উন্নতির সাধন করিবার জন্য আনয়ন করিয়াছিলেন।

উৎকৃষ্ট তোপ ও বন্দুক প্রস্তুত করিবার জন্য একবার তিনি কারখানা পরিদর্শন করেন। মিস্ত্রি উন্নত প্রণালিতে অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া প্রধান সেনাপতির নিকট বিশেষ পুরস্কার লাভ করিয়াছিল।

বিদ্যা শিক্ষার দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। নেপাল দরবার লাইব্রেরী তাঁহারই যত্নে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বহু মূল্যবান হস্ত লিখিত গ্রন্থাদি তাহাতে সংগৃহীত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে। তিনি সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। কতকগুলি বাঙ্গালী কোচবিহার অঞ্চল হইতে যাইয়া নেপালে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। নেপালিরা তাঁহাদিগকে অতিশয় ঘৃণা করিতেন। তাঁহাদেরে জল অনাচরণীয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া জানিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারা উচ্চবর্ণের হিন্দু, তখন তিনি প্রকাশ্য দরবারে তাঁহাদের জল পান করিলেন এবং অন্যান্য সর্দ্দারেরাও তাঁহার পদানুসরণ করিলেন। তদবধি বাঙ্গালীরা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু বলিয়া সমাজে পরিগৃহীত হইলেন। অন্যান্য অনেক সামাজিক বিষয়ে তিনি সংস্কার পন্থী ছিলেন। রাজ্য হইতে সতীদাহ ও দাসত্ব প্রথা তাঁহারই আদেশে বিদূরীত হইয়াছিল।

১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে চিন সম্রাট তাঁহাকে খোয়াং পিং পিম্‌মা কো-কো-কং ওয়াং সিয়াং (অর্থাৎ যোদ্ধৃনায়ক, সর্ব্বকর্ম্মে সুদক্ষ, সাহসী প্রজার শক্তিশালী রাজা) নামক বিশেষ উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। এই সঙ্গে সম্রাট প্রদত্ত উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দরবারে ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের সম্মুখে এই উপাধি ও পরিচ্ছদ প্রদত্ত হইয়াছিল। এই উপাধির মধ্যে তাঁহার স্বদেশবাসীকে 'সাহসী' বলিয়া উল্লেখ করায় তিনি অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন।

১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি দ্বিতীয়বার বিলাত যাইবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু বোম্বে পর্য্যন্ত যাইয়াই একটী আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। বোম্বাই নগরে ভ্রমণকালে হঠাৎ তাঁহার ঘোড়া ভয় পাওয়ায় তিনি ঘোড়া হইতে পড়িয়া যাইয়া বক্ষে আঘাত প্রাপ্ত হন। চিকিৎসকের পরামর্শে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৮৭৫ সালে প্রিনস্ অব ওয়েলস (পরে ভারত সম্রাট সপ্তম

এডওয়ার্ড) ভারত ভ্রমণে আগমন করেন। তিনি নেপালের জঙ্গলে শিকার করিতে যাইয়া জঙ্গ বাহাদুরের অতিথি হন এবং তাঁহার সহিত বিশেষ সখ্য ভাব স্থাপিত হয়।

এই শক্তিশালী স্বদেশ প্রেমিকেরও শত্রু কম ছিল না। ১৮৭৫ সালে একজন সন্ন্যাসী নিজেকে লক্ষণের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং প্রচার করিলেন যে, মনস্কামনা দেবী জঙ্গ বাহাদুরকে হত্যা করিয়া স্বর্ণযুগ আনয়ন করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ দিয়াছেন। দলে দলে মুর্খ লোক তাঁহার দলপুষ্টি করিতে লাগিল। জঙ্গ বাহাদুর একদল সৈন্য পাঠাইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া দ্বাদশজন দলপতি ও লক্ষণ সন্ন্যাসীকে বন্দী করিলেন। লক্ষণ সন্ন্যাসীকে মনস্কামনা দেবীর মন্দিরের সম্মুখে ফাঁসীদেওয়া হইল। অন্যান্য দলপতিরাও বধদণ্ড প্রাপ্ত হইল।

পূর্ব্বেই তাঁহার প্রিয় ভ্রাতা বাম বাহাদুর পরলোক গত হইয়াছিলেন। ১৮৭৬ সালের মে মাসে পুত্র নর জঙ্গ বাহাদুর, নবেম্বর মাসে অন্যতম পুত্র বাবর জঙ্গ বাহাদুর পরলোক গমন করেন। এইসকল মৃত্যুতে তিনি বড়ই কাতর হইয়াছিলেন। ১৮৭৭ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী গোবিন্দ দ্বাদশী তিথিতে বাগমতী নদী তীরে এই মহাপ্রাণ ব্যক্তি নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন। বর্ত্তমান নেপালের সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলে তাঁহার হস্ত ছিল।

জঙ্গাল বলহু—তিনি আসামের রাজা অরিমত্তের অন্যতম পুত্র। নওগাং জেলার সহরি মৌজায় তাঁহার রাজধানী ছিল। এখনও তথায় একটি ভগ্ন দুর্গের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। কথিত আছে যে তিনি কাছারীদের কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া স্বয়ং কল্লাং নদীতে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। অরিমত্ত দেখ।

জঙ্গিফা—নামান্তর রাজচন্দ্র বা জনক ফা। স্বাধীন ত্রিপুরার অধিপতি যুঝারু ফার তনয় জঙ্গিফা, চন্দ্র হইতে অধস্তন ১১৯তম এবং নরপতি ত্রিপুর হইতে অধস্তন ৭৪তম নরপতি ছিলেন। তিনি চতুর্দ্দশ দেবতার ভক্ত ছিলেন এবং রাজ্যের নানাস্থানে তাঁহাদের অর্চ্চনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দেবরায় রাজ্য লাভ করেন। ত্রিপুর দেখ।

জজ্জ—কাশ্মীরপতি জয়াপীড়ের শ্যালক। জয়াপীড় দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলে, জজ্জ সুযোগ বুঝিয়া কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করেন। তিন বৎসর পরে জয়াপীড় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক স্বীয় অন্যতম শ্বশুর জয়ন্তের সাহায্যে জজ্জকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পুনরায় সিংহাসন লাভ করিলেন। জজ্জ যুদ্ধকালে শ্রীদেব নামক চণ্ডাল জাতীয় এক ব্যক্তির হস্তে নিহত হন।

জনক—(১) তিনি কাশ্মীরপতি গোধরের পৌত্র ও সুবর্ণের পুত্র। তিনি রাজা হইয়া প্রজাদিগকে যথার্থ জনকেরই মত পালন করিয়াছিলেন। তিনি অনেক বিহার নির্ম্মাণ, ব্রহ্মত্র দান ও জালোর নামে বৌদ্ধ মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পর শচীনর রাজা হইয়াছিলেন।

জনক—(২) তিনি কাশ্মীরপতি অনন্ত দেবের সময়ে (১০২৮—১০৮১ খ্রীঃ) দ্বারপতি ছিলেন। তিনি বিদ্রোহী ভামরপতি লক্ষ্মণ চন্দ্রকে নিহত করেন।

জনক—(৩) তিনি কাশ্মীরপতি হর্ষ-দেবের সময়ে (১০৮৯—১১০২ খ্রীঃ) অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার পিতা সূর্য্যবর্ম্ম চন্দ্র কাশ্মীরপতি কলস রাজের সময়ে (১০৮১—১০৮৯ খ্রীঃ) প্রধান সেনাপতি ছিলেন. জনক বিদ্রোহী হইয়া উচ্চলের পক্ষ আশ্রয় করেন। পরে উচ্চল রাজা হইলে তাঁহার ক্ষমতা অতিশয় বর্দ্ধিত হয়। উচ্চল কৌশলে ভীমাদেব প্রভৃতি ভামর প্রধানদের সহিত তাঁহার বিরোধ সংঘটন করাইয়া দেন। অবশেষে ভীমাদেবের হস্তেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়।

জনকজী সিন্ধিয়া—তিনি গোয়ালিয়র রাজ্যের অধিপতি দৌলত রায়ের পোষ্য পুত্র। দৌলত রায়ের মৃত্যুর পরে তাঁহার মহিষী বৈজা বাইজী জনকজীকে ১৮২৮ খ্রীঃ পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। জনকজী রাও সিন্ধিয়া ১৮৪৩ খ্রীঃ অব্দে অপুত্রক পরলোক গমন করিলে তাঁহার মহিষী জয়াজী রাও সিন্ধিয়াকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন।

জনাব আলি—বাঙ্গালী মুসলমান সাহিত্যিক। তিনি বাঙ্গালা ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। হুগলী জিলার বসা গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। চারি খণ্ডে বিভক্ত 'নক্‌সে সোলেমানি', 'ফজিলাতে বারচাঁদ' প্রভৃতি পুস্তক তিনি রচনা করেন।

জনার্দ্দন—(১) প্রাচীন বাঙ্গালী কবি। তাঁহার রচিত 'চণ্ডী' নামক গ্রন্থ একটি ব্রত কথা মাত্র। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরও পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

জনার্দ্দন—(২) একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত। ১৪১১ শকের (১৪৮৯ খ্রীঃ) পূর্ব্বে 'বিবাহ পটল' নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন।

জনার্দ্দন কর্ম্মকার—একজন বিখ্যাত লৌহ শিল্পী। তাঁহার বাসস্থান শ্রীহট্ট জিলার পাঁচগাও নামক স্থানে ছিল। ১০৪৭ হিঃ সালে তাঁহার নির্ম্মিত জোহান কোষা, নামক তোপ এখনও শ্রীহট্ট কাটরার দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে এক বটবৃক্ষ তলে পতিত আছে। তাঁহার নামানু-সারে তদ্বংশীয়েরা 'জনাইয়ের গোষ্ঠী' নামে খ্যাত।

জনার্দ্দন দ্বিজ—তিন শত বৎসরেরও

প্রাচীন তাঁহার রচিত একখানা 'মঙ্গল চণ্ডীর ব্রতকথা' পাওয়া গিয়াছে।

জনার্দ্দন শেট—এই বিখ্যাত জনার্দ্দন শেট ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর দালাল ছিলেন। তিনি এই দালালি করিয়া যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন করেন। তাঁহারই পুত্র বৈষ্ণব চরণ শেট ব্যবসায় দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহাদের কুলদেবতা গোবিন্দ জীউ টাঁকশালের নিকটে এক দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

জনার্দ্দন সান্যাল—তিনি সাঁতোরের রাজা কংস নারায়ণের পুত্র। তিনি অতিশয় পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার ক্ষমতায় মগদিগের গর্ব্ব খুব খর্ব্ব হইয়াছিল।

জবহরবাঈ—১৫৩৩ খ্রীঃ অব্দে গুর্জ্জর-পতি সুলতান বাহাদুর খাঁ, পৃথ্বিরাজ কর্ত্তৃক মজফর খাঁর বন্দীর প্রতিশোধ লইবার জন্য, চিতোর আক্রমণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত দুর্গ অবরোধ রাখিয়াও কিছু করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে লাব্রি খাঁ নামক একজন পর্ত্তুগিজ সেনানীর সাহায্যে চিতোর দুর্গের একাংশ বারুদ দিয়া ধ্বংস করেন। তখন রাঠোরকুল সম্ভূতা শিশোদীয় রাজমহিষী জবহর বাঈ সেই ভগ্নপথ রোধ করিয়া দুর্গ রক্ষার চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও সফল কাম হইলেন না। যুদ্ধ ক্ষেত্রেই শত্রু হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়।

জমালি—জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাবীরের অন্যতমা স্ত্রী যশোদার গর্ভে অনুজ্ঞা নামে এক কন্যা জন্মিয়াছিল। সেই অনুজা জমালি নামক এক যুবককে বিবাহ করেন। জমালি মহাবীরের শিষ্য ছিলেন; কিন্তু পরে তাঁহার মত হইতে স্খলিত হইয়া যায়। জমালির কন্যার নাম শেষবতী বা যশোবতী।

জম্বু স্বামী—তিনি রাজগৃহের এক বণিকের পুত্র ছিলেন। পিতার অনুরোধে তিনি আটটি বিবাহ করিয়া গৃহে যেদিন প্রত্যাগত হইলেন, সেইদিন রাত্রিতেই প্রভা নামক এক দস্যু কর্ত্তৃক তিনি আক্রান্ত হন। এই প্রভব বিন্ধ্য নামক জয়পুরের রাজার পুত্র ছিলেন। এই ঐন্দ্রজালিক রাজপুত্র প্রভব, দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু জম্বুস্বামীর উপর তাঁহার ইন্দ্রজাল বিদ্যা কিছুমাত্র কার্য্যকরী হইল না। পরন্তু তাঁহার উপদেশে প্রভব দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক জম্বুস্বামীর শিষ্য হইয়াছিলেন। খ্রীঃ পূর্ব্ব ৪০৩ অব্দে জম্বুস্বামী পরলোক গমন করিলে, তাঁহার প্রধান শিষ্য প্রভব তাঁহার স্থান অধিকার করেন।

জয়কৃষ্ণ দাস—বৈষ্ণব গ্রন্থকার। "শ্রীচৈতন্য পরিষদ জন্মস্থান নিরূপণ" নামক গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। নামেই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় বোঝা যায়।

উক্ত গ্রন্থখানি প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত। তিনিই "রসকল্পলতা" নামক গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম কেনারাম। জয়কৃষ্ণ গুরুদত্ত নাম, পিতার নাম রামমোহন। হুগলী জিলার আরামবাগ পরগণায় তাঁহার বাস ছিল। তিনি গীত গোবিন্দের বাঙ্গালা পদ্য অনুবাদ করেন।

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়— হুগলী জিলার অন্তর্গত উত্তর পাড়ার প্রসিদ্ধ জমীদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা। কনৌজ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম শ্রীহর্ষ তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ। জয়কৃষ্ণ ১৮০৮ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে, (১২১৬ বঙ্গাব্দে ভাদ্র) উত্তর পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতার হিন্দু স্কুলে কয়েক বৎসর মাত্র অধ্যয়ন করিয়া ১৮২১ খ্রীঃ অব্দে, তিনি পিতার কর্ম্ম-স্থল মীরাটে গমন করেন এবং তথায় সামরিক বিভাগে এক আপিসে কেরা-ণীর কর্ম্মে নিযুক্ত হন। কার্য্য দক্ষতা গুণে অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার পদো-ন্নতি হয়। পিতাপুত্র কার্য্য ব্যপদেশে ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত উত্তর ভারতেই অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৮২৭ খ্রীঃ অব্দে ভরতপুর দুর্গ অধিকার কালে তাঁহারা ভরতপুরে উপস্থিত ছিলেন এবং যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে লুণ্ঠিত ধনের অংশ প্রাপ্ত হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ সময়ে তাঁহারা লব্ধ অর্থ হইতে ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন।

দেশে আসিবার পরও জয়কৃষ্ণ কয়েক বৎসর চুঁচুড়া ও হুগলীতে নানা বিভাগে সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া, স্বীয় সম্পত্তি পরি-চালনাতেই ব্রতী হন। তাঁহার বৃদ্ধা-বস্থায়, ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে তিনি একটি জাল দলিল সংক্রান্ত মকদ্দমায় জড়িত হইয়া পড়েন এবং নিম্ন আদালতের বিচারে তাঁহার ছয় মাস সশ্রম কারা-দণ্ড লাভ করেন। হাইকোর্টের বিচারে তিনি অংশতঃ মুক্তি পান, পরে বিলা-তের প্রিভি কাউন্সিলের (Privy Council) বিচারে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তি লাভ করেন।

জয়কৃষ্ণ স্বয়ং উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে না পারিলেও, বিদ্যা চর্চ্চার উৎসাহ দাতা ছিলেন। মীরাটে অব-স্থান কালে তত্রত্য সেনাবারিকের সং-শ্লিষ্ট পুস্তাকাগারের বহু পুস্তক পাঠ করিয়া নিজের অতৃপ্ত জ্ঞান পিপাসার নিবৃত্তি করিতেন। উত্তর পাড়ার উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, উত্তর পাড়া কলেজ; তত্রত্য সাধারণ পাঠাগার ও পুস্তকালয় (Public Library) প্রভৃতি স্থাপন করিয়া তিনি জনসাধারণের অশেষ হিত সাধন করেন। উহাদের প্রত্যেকটির জন্য তিনি বহু অর্থ দান করেন এবং পর-

বর্ত্তীকালের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ভূসম্পত্তিও দান করেন। সর্ব্বসমেত একত্রিশটি বিদ্যালয় তাঁহার অর্থ সাহায্যে পরিচালিত হইত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ কল্পে ও এইরূপ আরও অনেক সদনুষ্ঠানে তিনি বহু লক্ষ টাকা দান করেন। উত্তর পাড়ার সাধারণ পাঠাগারের জন্য তিনি বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। একাধিক রাজ প্রতিনিধি (Viceroy) ও বহু উচ্চ পদস্থ ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী ঐ পাঠাগার পরিদর্শন করিয়া উহার ভূয়সী প্রশংসা করেন

কৃষক প্রজাদের সুবিধা ও উপকারের জন্য তিনি নানারূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অনেক জলাভূমিকে কৃষিকার্য্যের উপযোগী করিয়া, সেতু নির্ম্মাণ ও খাল খননে অর্থ সাহায্য করিয়া, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া, তিনি দরিদ্রের কৃতজ্ঞতা ভাজন হন উত্তর পাড়ায় হাঁসপাতাল স্থাপন তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। দুর্ভিক্ষ অথবা অন্য কোনও রূপ প্রাকৃতিক বিপ্লবের সময়ে তিনি সর্ব্বপ্রকারে বিপন্ন ব্যক্তিদিগের সাহায্য কল্পে বহু অর্থ ব্যয় করেন। বঙ্গীয় কৃষকদের জীবন যাত্রা প্রণালী উপলক্ষ করিয়া পুস্তক রচনার জন্য তিনি পাঁচ শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন। হুগলী কলেজের অধ্যাপক লালবিহারী দে "গোবিন্দ সামন্ত" নামে ইংরেজিতে পুস্তক রচনা করিয়া উক্ত পুরস্কার লাভ করেন।

দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিশীল আন্দোলনের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। কলিকাতা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে (British Indian Association) স্থাপয়িতাদের তিনি অন্যতম ছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসমিতির (Indian National Congress) দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বেই তিনি দৃষ্টি শক্তিহীন হইয়াছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে তিনি পরলোক প্রাপ্ত হন। মৃত্যুকালে তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে মধ্যম প্যারীমোহন মাত্র বর্ত্তমান ছিলেন।

জয়কৃষ্ণ রায়—নবাব হরকৃষ্ণ রায়ের মৃত্যুর পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জয়কৃষ্ণ রায় শ্রীহট্টের কাননগু ও দস্তিদারের পদে নিযুক্ত হন (১৭০৫ খ্রীঃ)। জয়কৃষ্ণের পুত্র জীবনকৃষ্ণ জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

জয়গুপ্ত প্রকাণ্ড যশা—মগধের গুপ্ত বংশীয় নরপতি। তাঁহার একটী স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার রাজত্বের কাল এখনও নির্ণিত হয় নাই। সম্ভবতঃ তিনি খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন।

জয়গোপাল গোস্বামী— বাঙ্গালী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। ১২৩৬ বঙ্গাব্দে শান্তিপুরে অদ্বৈত-বংশে তাঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম রমানাথ গোস্বামী। শৈশবেই মাতৃহীন হওয়ায় পিতৃব্য ও তৎপত্নী কর্ত্তৃক লালিত পালিত হন। পিতা রমানাথ সঙ্গীত চর্চ্চায় অত্যধিক মনোযোগ দেওয়ায় পুত্রের শিক্ষার জন্য বিশেষ কিছুই করেন নাই।

পল্লীর পাঠশালায় বাঙ্গালা শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি চতুষ্পাঠীতে প্রেরিত হন এবং তথায় ক্রমে ক্রমে কাব্য ও ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি ও তাঁহার বন্ধু মদনগোপাল গোস্বামী বৈষ্ণব সাহিত্য অধ্যয়ন করেন।

কর্ম্ম জীবনে তিনি দীর্ঘকাল শান্তি-পুরে এক বিদ্যালয়ে প্রধান পণ্ডিতের কাজ করেন। ঐ সময়ের মধ্যে কিছু ইংরেজিও শিক্ষা করেন। গণিত শাস্ত্রে তৎপূর্ব্বে তাঁহার তাদৃশ জ্ঞান ছিল না। কিন্তু চেষ্টার ফলে তিনি উহাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন এবং 'গণিত বিজ্ঞান' নামে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উক্ত গ্রন্থখানি দীর্ঘকাল বিদ্যালয় পাঠ্য ছিল এবং প্রায় এক লক্ষ খণ্ড বিক্রয় হয়।

কবি মধুসূদন, হেমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ও সৌহার্দ্দ্য ছিল। তাঁহারা জয়গোপালের বিদ্যাবত্তায় ও সরল ব্যবহারে বিশেষ প্রীত ছিলেন। সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বাল্য-কালে তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহারা পুনরায় মিলিত হইয়া শাস্ত্রাদি আলোচনা করিতেন।

গোস্বামী মহাশয় অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে 'সাহিত্য মুক্তাবলী,' 'সীতাহরণ,' 'বাসবদত্তা,' (অনুবাদ), 'শৈবলিনী' ও 'রত্নযুগল' (উপন্যাস), 'চারুকথা' 'গোবিন্দ দাসের করচা' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভূদেব বাবুর এডুকেশন গেজেটে তিনি সোয়ান (Swan) এই ছদ্ম নামে অনেক গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সীতাহরণ বহুকাল Indian Civil Service পরীক্ষার অন্যতম পাঠ্য ছিল। এই সকল পুস্তক রচনা ভিন্ন তিনি বহু লুপ্ত প্রায় পুঁথি নিজ হস্তে লিখিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন।

গোস্বামী মহাশয় বিনয়ী সদালাপী ও পরদুঃখকাতর ব্যক্তি ছিলেন। নব-দ্বীপের পণ্ডিত মণ্ডলীকর্ত্তৃক শিরোমণি উপাধিতে ভূষিত হইয়াও তিনি কখনও উহা ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু তাঁহার আত্মসম্মানবোধ অতি তীক্ষ্ণ ছিল। আত্মমর্য্যাদায় আঘাত প্রাপ্ত হইলে তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ হইতেন।

তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর কথকও ছিলেন। শ্রীচৈতন্য দেবের সন্ন্যাস গ্রহণ উপলক্ষ করিয়া তিনি নূতন প্রণালীতে কথকথার এক পুঁথি রচনা করেন। তাঁহার রচিত বহু কথকথার পালা আছে।

১৩২৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে ছিয়াশী বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার পাঁচ পুত্র বর্ত্তমান ছিলেন।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার—খ্যাত-নামা বাঙ্গালী পণ্ডিত। বর্ত্তমান যশোহর জেলার অন্তর্গত বজরাপুর গ্রামে ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কেবলরাম তর্কপঞ্চানন নাটোর রাজের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। কেবলরামের পাঁচ পুত্র। তন্মধ্যে রঘূত্তম সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও জয়গোপাল সর্ব্ব কনিষ্ঠ। রঘূত্তমকে স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কেবলরাম ১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দে বৃদ্ধ বয়সে জয়-গোপালকে সঙ্গে লইয়া কাশীবাসী হন। রঘূত্তম অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়া "বাণীকণ্ঠ" উপাধি ও একখানি তালুক লাভ করেন।

জয়গোপাল কাশীতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তথা হইতে দেশে প্রত্যাগমন করিয়া ১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দে প্রথম বিবাহ করেন। ছয়চল্লিশ বৎসর বয়ক্রমকালে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে পিতার মৃত্যুর দুই বৎসর পর শ্রীরামপুরের পাদ্রী কেরী সাহেবের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। নিজ প্রতিভাবলে তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় ষোড়শ বর্ষ ব্যাপি সসম্মানে অধ্যাপনা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারা-শঙ্কর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তিনি তৎকালীন সুপ্রীম কোর্টের (Supreme Court) অন্যতম জজ পণ্ডিতের পদও লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামপুরের পাদরী কেরী ও মার্শ-ম্যানের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ থাকিয়া সুপ্রসিদ্ধ কৃত্তিবাসের রামায়ণ বিশেষরূপে পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া মুদ্রিত করেন। তিনি একজন সুকবিও ছিলেন; কবি বিল্বমঙ্গল রচিত হরিভক্তি মূলক সংস্কৃত কবিতা-গুলির বঙ্গানুবাদ ও ষড়ঋতুবর্ণনা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করেন। তিনি ফারসী ভাষায় একখানি অভিধান প্রণয়ন করেন। নানা স্থান হইতে সংগৃহীত অনেক বিভিন্ন পুঁথি অবলম্বনে কবিকঙ্কন চণ্ডীর এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। উহা ১৮১৯ খ্রীঃ অব্দের মধ্যভাগে মুদ্রিত হইয়াছিল (১২২৬ বঙ্গাব্দে)। তিনি সংস্কৃত কলেজে কাব্যের অধ্যাপক ছিলেন। রাজা

রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-সভার তিনি একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন এবং উক্ত সভা কর্ত্তৃক পরিচালিত পরীক্ষাদি নির্ব্বাহ করিতেন। সমসাময়িক পত্রিকাতে প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায় যে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দের মধ্যভাগে একটি বাঙ্গালা ইংরেজি অভিধান সংকলন করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দের মধ্যভাগে তিনিই প্রথম কাশীদাসী মহাভারত সম্পাদন করিয়া মুদ্রিত করেন। তিনি কিছুকাল 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

জয়গোপাল দাস—বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবি। "গোবিন্দ মঙ্গল" নামে তিনি একখানা কাব্য রচনা করেন। উহাতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। লেখকের পরিচয় অজ্ঞাত। তিনি পশ্চিম বঙ্গের লোক ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

জয়গোবিন্দ গোস্বামী—হাস্যরসের কবি। তিনি নাটোরের নিকটবর্ত্তী বাজুরভাগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত বহু হাস্যরসাত্মক কবিতা বারেন্দ্র অঞ্চলের লোকের কণ্ঠস্থ আছে।

জয়গোবিন্দ দাস—একজন বৈষ্ণব কবি। অনুমান ১৮০৮ খ্রীঃ অব্দে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বেণাপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহাদের উপাধি বসু চৌধুরী। তাঁহার পিতার নাম গোকুলচন্দ্র বসু। জয়গোবিন্দ সনাতন গোস্বামী প্রণীত 'বৃহদ্ভাগবতামৃত' গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ করেন। তিনি ১২৬৪ বঙ্গাব্দে পরলোক গমন করেন।

জয়গোবিন্দ লাহা— কলিকাতার প্রসিদ্ধ লাহাবংশীয় ব্যবসায়ী ও ভূম্যধিকারী। ১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম প্রাণকৃষ্ণ লাহা। কিছুকাল হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়া, তিনি পৈতৃক ব্যবসায়ে যোগদান করেন। দেশের সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কার্য্যের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। ত্রিশ বৎসর কাল তিনি কলিকাতা পৌরসভার (Municipality) অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলিকাতার শেরিফ (Sheriff) নিযুক্ত হন। দুই বৎসর পরে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার (Imperial Legislative Council) সদস্য হন। তাহার চারি বৎসর পরে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। তিনি কলিকাতার একজন অবৈতনিক বিচারপতি (Honorary Magistrate), কারা পরিদর্শক এবং কলিকাতা বন্দরের পরিচালক সমিতির একজন সদস্যও (Port Commissioner) ছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়শনের (British India Association) সহঃ সভাপতি এবং বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সঙ্ঘের

(Bengal National Chamber of Commerce) সহঃ সভাপতিও ছিলেন। নানা সৎকার্য্যে তিনি দান করিতেন। বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে এক লক্ষ টাকা দান করেন। তাঁহারই অর্থানুকুল্যে কলিকাতা পশুশালায় (Zoo) একটি রাসায়নিক বিজ্ঞানাগার (Chemical Laboratory) নির্ম্মিত হয়। ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি সি-আই-ই (C. I. E) উপাধি লাভ করেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। গ্রহ নক্ষত্রাদি পর্যাবেক্ষণ করিবার জন্য তিনি অনেক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্যানে বিভিন্নপ্রকার বৃক্ষলতাদি দর্শন করিবার জন্য বাঙ্গালার ছোট লাটও তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইতেন। ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র অম্বিকাচরণ লাহা।

জয়গোবিন্দ সোম এম, এ, বি, এল—তিনি শ্রীহট্টের অন্তর্গত আথালিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পাঠ্যাবস্থায়ই তিনি খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ১৮৬৫ সালে তিনি দর্শন শাস্ত্রে এম, এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। তৎপরে তিনি বি, এল্ পরীক্ষা পাশ করিয়া হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। তিনিই শ্রীহট্টের প্রথম এম, এ, বি, এল্। দেশীয় খ্রীষ্টানদের মধ্যে তিনিই প্রথম বঙ্গভাষায় 'আর্য্যদর্শন' নামে মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। দেশের সকল প্রকার উন্নতিকর কার্য্যে তিনি অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। স্ত্রী শিক্ষা প্রচলনার্থ স্থাপিত প্রাচীন অন্যতম সমিতি 'শ্রীহট্ট সম্মিলনী'র তিনি আজীবন সভাপতি ছিলেন। ১৯০০ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

জয়চন্দ্র বা জয়চাঁদ—কনৌজের অধিপতি গোবিন্দচন্দ্রের পৌত্র ও বিজয়চন্দ্রের পুত্র। দিল্লীর অধিপতি অনঙ্গপালের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিজয়চন্দ্র বিবাহ করিয়াছিলেন। আর কনিষ্ঠা কন্যাকে আজমীরপতি সোমেশ্বর বিবাহ করেন। কনৌজপতি গোবিন্দ রাজচক্রবর্ত্তী হইবার জন্য একবার দিল্লী আক্রমণ করিয়াছিলেন। সেই কারণে উভয় রাজ্যের রাজাদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। সেই জন্য দিল্লীপতি অপুত্রক অনঙ্গপাল জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র জয়চন্দ্রকে অতিক্রম করিয়া, কনিষ্ঠ দৌহিত্র সোমেশ্বরের পুত্র পৃথ্বীরাজকেই দিল্লীর সাম্রাজ্য মৃত্যুকালে প্রদান করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজের এই প্রাধান্য লাভে, জয়চন্দ্র অতিশয় মনঃক্ষুন্ন হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য এক রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন। চিতোরপতি সমর সিংহ পৃথ্বীরাজের ভগিনী পৃথাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই জন্য উভয়ের

মধ্যে খুব সদ্ভাব ছিল। তাঁহারা জয়চন্দ্রের প্রাধান্য স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না। জয়চন্দ্র সেজন্য উভয়ের স্বর্ণ মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া দৌবারিক পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাজসূয় যজ্ঞান্তে জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তার স্বয়ম্বর কালে সংযুক্তা পৃথ্বীরাজের মূর্ত্তির গলে মালা অর্পণ করিলে রাজসভার ছদ্মবেশে উপস্থিত পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে অশ্ব পৃষ্ঠে আরোপিত করিয়া প্রস্থান করিলেন। জয়চন্দ্র ইহাতে অত্যন্ত অপমানিত মনে করিয়া, প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং মোহাম্মদ ঘোরীকে দিল্লী আক্রমণ করিতে আহ্বান করিলেন। মোহাম্মদ ঘোরী গৃহ বিবাদের এই উৎকৃষ্ট সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। ১১৯১ খ্রীঃ অব্দে প্রবল এক সৈন্যদল লইয়া তিনি দিল্লী আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সেইবারে পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিতে বাধ্য হন। দুই বৎসর পরে তিনি পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে আগমন করিলেন। এইবার পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত হইলেন। জয়চন্দ্র মনে করিয়াছিলেন মোহাম্মদ ঘোরী ইহাতেই নিরস্ত হইবেন, কিন্তু ফলে তাহা হইল না। পর বৎসরই মোহাম্মদ কনৌজ আক্রমণ করিলেন। জয়চন্দ্র যুদ্ধ ক্ষেত্রেই শয়ন করিলেন। জয়চন্দ্রের পুত্র হরিশচন্দ্র ১২০০ সাল পর্য্যন্ত সন্ধি সূত্রে কনৌজে রাজত্ব করিয়াছিলেম। কেহ কেহ বলেন জয়চন্দ্র পলায়ন করিতে যাইয়া গঙ্গা গর্ভে জলনিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

জয়চাঁদ—নগরকোটের (কাঙ্গারা) রাজা। তিনি দিল্লীর মুঘল সম্রাট আকবর শাহের সমকালবর্ত্তী ছিলেন।

জয়চাঁদ অধিকারী—একজন যাত্রাওয়ালা। রামযাত্রায় তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত পাতাইহাটে তাঁহার নিবাস ছিল।

জয়চাঁদ পাল চৌধুরী—তিনি রাণাঘাটের প্রসিদ্ধ পাল চৌধুরীদের বংশধর। এই নির্ভীক তেজস্বী স্পষ্টবাদী জমিদারের সাক্ষ্যতেই বঙ্গের নীলকরের অত্যাচারের পথ বন্ধ হইবার পথ সুগম হয়। ইহার সাক্ষ্যের বিশেষত্ব এই যে, তিনি স্বয়ংই একজন নীলকর। তাঁহার নিজের বত্রিশটী নীলকুঠী ছিল এবং তিনি নয়টী নীল কুঠীর আংশিক মালিক ছিলেন। নীল চাষ বন্ধ হইলে তাঁহার আয় যথেষ্ট কমিবার আশঙ্কা ছিল। তবু কেবল প্রজাদের মঙ্গল কামনার বশবর্ত্তী হইয়া, সত্যকথা বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। তাঁহাকে বিচারক প্রশ্ন করেন—'গত বিশ বৎসর যাবৎ প্রজারা নীল চাষ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া আসিতেছে, তবু কেন তাঁহারা চাষ করিল?' ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন—'তাহাদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিয়া তাহা-

দিগকে নীল চষিতে বাধ্য করিয়াছে। গুদামে বন্ধ করিয়া প্রহার, গৃহদাহ প্রভৃতি অমানুষিক অত্যাচার তাহাদের প্রতি হইত।' তৎকালীন বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা এই সমস্ত বিবরণ পাঠ করিয়া, এই অত্যাচার দমনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। বলিতে কি তাঁহাদের মত জন কয়েক দৃঢ়চেতা ব্যক্তির চেষ্টাতেই নীলের অত্যাচার দেশ হইতে সমূলে উৎপাটিত হয়। নীল কাহিনী জানিবার জন্য দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক দ্রষ্টব্য।

জয়তীর্থ—একজন টীকাকার। তিনি মাধবাচার্য্য রচিত 'গীতা ভাষ্য' ও ভগবদগীতা তাৎপর্য্য নির্ণয়' নামক গ্রন্থদ্বয়ের 'প্রমেয়দীপিকা' এবং 'ন্যায়দীপিকা' নামে দুইখানি টীকা রচনা করেন।

জয়দত্ত—(১) তিনি কাশ্মীরের দিগ্বিজয়ী নরপতি জয়াপীড়ের (৭৫২—৭৮২ খ্রীঃ) প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি জয়পুর প্রাসাদ সমীপে একটী ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়াছিলেন।

জয়দত্ত—(২) গুপ্তবংশীয় নরপতি বুধ গুপ্তের সময়ে (৪৮১ খ্রীঃ) উপরিক মহারাজ জয়দত্ত পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং তাঁহার অধীনে আয়ুক্তক সাণ্ডক বা গাণ্ডক কোটিবর্ষ বিষয়ের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

জয়দত্ত—(৩) তাঁহার পিতার নাম বিজয় দত্ত। এই মহাসামন্ত জয়দত্ত, অশ্ববৈদ্যক নামে অশ্বচিকিৎসার একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

জয়দাম—তিনি সৌরাষ্ট্রপতি চষ্টনের পুত্র। তিনি খ্রীঃ প্রথম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পুত্র রুদ্রদামন (প্রথম)। জয়দামের দুই প্রকার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

জয়দেব—(১) বাঙ্গালী সংস্কৃত কবি। তিনি খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। বীরভূম জিলার অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব (কেঁদুলি) গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম রমাদেবী। কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়া তিনি কিছুকাল গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেনের রাজকবি হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি কিছুকাল উৎকলের কোনও রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন বলিয়াও কেহ কেহ মনে করেন।

জয়দেব 'গীতাগোবিন্দ' নামে সংস্কৃত ভাষায় এক সুমধুর কাব্য রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়। গ্রন্থখানি স্থানে স্থানে আদি রসাত্মক হইলেও, একটি মধুর ভাবপূর্ণ উৎকৃষ্ট কাব্য। ঐ কাব্য রচনা সংশ্রবে নানারূপ অলৌকীক কাহিনী প্রচলিত আছে।

জয়দেবের পত্নীর নাম পদ্মাবতী। এ সম্বন্ধেও একটী সুন্দর আখ্যায়িকা

প্রচলিত আছে। কথিত আছে এক ব্রাহ্মণ স্বীয় কন্যাকে জগন্নাথ দেবকে প্রদান করিতে শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন। তথায় দৈববাণী হয় তুমি এই কন্যা জয়দেবকে সম্প্রদান কর। ব্রাহ্মণ তখনই সন্ন্যাসীবেশী জয়দেবকে সেই মন্দিরেই জগন্নাথ সমীপে দান করিলেন। পদ্মাবতী যেমন অসাধারণ রূপবতী ছিলেন তেমনি সাধ্বী ও পতিব্রতা ছিলেন। জন্মস্থান কেন্দুবিল্বেই জয়দেবের দেহান্ত হয়। এখনও প্রতি বৎসর মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে তাঁহার স্মরণার্থ তথায় মেলা হইয়া থাকে।

গীতগোবিন্দ, বাঙ্গালা, হিন্দী, উড়িয়া আসামী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায় এবং ইংরেজী, ল্যাটিন প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। উদয়নাচার্য্য, কমলাকর, নারায়ণ ভট্ট, বিট্‌ঠল দীক্ষিত, বিশ্বম্ভর ভট্ট, শঙ্কর মিশ্র প্রভৃতি প্রায় ত্রিশজন খ্যাতনামা পণ্ডিত এই গ্রন্থের টীকা ও ভাষ্য রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। সার উইলিয়ম জোন্‌স ইহার সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী অনুবাদ করেন। স্বনাম খ্যাত পণ্ডিত ল্যাসেন ইহার ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেন। তৎপরে প্রসিদ্ধ কবি, লাইট অব এসিয়া প্রণেতা এডউইন আর্ণল্ড ইহাকে ইংরেজী পদ্যে অনুবাদ করেন।

জয়দেব কিছুকাল বৃন্দাবনের কেশী-ঘাটে অবস্থান করিয়াছিলেন। কথিত আছে কোন ভক্ত জয়দেবের অবস্থানের জন্য তথায় একটা মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন। জয়দেব সেই মন্দিরে রাধামাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতেন। পরে বিগ্রহের সেবার্চ্চনার ভার অপর হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন। জয়দেবের মৃত্যুর পরে জয়পুরের মহারাজা সেই বিগ্রহ স্বীয় রাজ্যের ঘাটি নামক স্থানে অপসারিত করেন।

কবীর, দাদু, প্রভৃতি মধ্য যুগের অ-বাঙ্গালী ভক্তগণের বাণীর মধ্যে জয়দেবের বাণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহারা অনেক স্থলে গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু জয়দেবের গীতগোবিন্দের ভাব হইতে সেই সব বাণীর ভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতর।

জয়দেব—(২) তিনি জয়দেব পীযূষ বর্ষ নামেও খ্যাত ছিলেন তাঁহার পিতার নাম মহাদেব মিশ্র ও মাতার নাম সুমিত্রা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'চন্দ্রালোক' ও 'প্রসন্নরাঘব' (নাটক)। তিনি খ্রীঃ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। চন্দ্রালোক একখানা অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ছন্দো নিয়ম সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া কাব্যাদর্শ-কার দণ্ডীর ন্যায় জয়দেবও অনুষ্টুভের আশ্রয় লইয়াছেন। কিন্তু দৃষ্টান্তগুলি তাঁহার নিজের রচিত। তাঁহার জন্মস্থান বিদর্ভ দেশ।

জয়দেব—(৩) তিনি মিথিলার বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত। সাধারণতঃ তিনি পক্ষধর মিশ্র নামেই পরিচিত। পক্ষধর মিশ্র দেখ।

জয়দেব (৪)বাঙ্গালী কবি। খুব সম্ভব চট্টগ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি কালিকা পুরাণ পদ্যে অনুবাদ করেন।

জয়দেব—(৫) একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত। তিনি প্রশ্ননিধি নামে একখানা জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

জয়দেব—(৬) একজন আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিত। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—রসামৃত।

জয়দেব—(৭) নেপালের লিচ্ছবীবংশীয় মহারাজা শিবদেবের পুত্র মহারাজ জয়দেব কামরূপপতি হর্ষদেবের কন্যা রাজ্যমতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি ৭৫৩ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

জয়দেব তর্কবিশারদ—তিনি রাজসাহীর অন্তর্গত সাঁতোড়ের রাজা রামকৃষ্ণ সান্যালের অন্যতম সভা পণ্ডিত ছিলেন। রামকৃষ্ণ খুব বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। জয়দেব ১৭২০ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

জয়দেব দাস—একজন বাঙ্গালী কবি। তাঁহার রচিত একটী মাত্র মনসার ভাসান পাওয়া গিয়াছে।

জয়ধ্বজ সিংহ—আসামে আহমবংশীয় একজন রাজা। তাঁহারই রাজত্বকালে আহম রাজবংশ হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুর ধর্ম্ম ও সভ্যতার পরিপোষক হন। তাঁহারই রাজত্বকালে মুঘল সেনাপতি মীরজুমলা আসাম আক্রমণ করেন। জয়ধ্বজের মৃত্যুর পর তৎপুত্র চক্রধ্বজ সিংহাসনে আরোহণ করেন

জয়নন্দী—প্রাচীন ভারতের একজন আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। তিনি চরক সংহিতার একখানি টীকা রচনা করেন।

জয়নাথ—উচ্ছকল্পের নরপতি জয়নাথ মগধের গুপ্তবংশীয় নরপতিদের সামন্ত নরপতি ছিলেন। কিন্তু স্কন্দ গুপ্তের মৃত্যুর পরে (৪৬০ খ্রীঃ অব্দের পরে) তিনি স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

জয়নাথ ঘোষ, মুন্সী—তিনি কুচবিহারের মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সময়ে 'রাজোপাখ্যান' নামে কুচবিহারের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একখানি ইতিহাস রচনা করেন। এই গ্রন্থে কুচবিহার সম্বন্ধে অনেক জানিবার বিষয় আছে।

জয়নারায়ণ ঘোষাল—কলিকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠে ভূকৈলাস নামক স্থানের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল। তাঁহাদের বংশগত পদবী বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ বংশীয় অধস্তন যদুনাথ সর্ব্বপ্রথম কুল ভঙ্গ করিয়া ঘোষাল পদবী লাভ করেন। বর্ত্তমান কলিকাতার অন্য অংশ প্রাচীন গোবিন্দপুর গ্রামে ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দের

(১১৫৯ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন) সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার জন্ম হয়। জয়নারায়ণের বাল্যকালেই তাঁহার পিতামহ কন্দর্প-নারায়ণ ঘোষাল, গোবিন্দপুর ত্যাগ করিয়া আরও দক্ষিণে বর্ত্তমান খিদির-পুরে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন।

জয়নারায়ণ বাল্যকাল হইতেই বিশেষ মেধাবী ছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন এবং পঞ্চদশ বৎসর বয়সে মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে চাকুরী গ্রহণ করেন। মাত্র চারি বৎসর ঐ চাকুরী করিয়া তিনি কলিকাতায় প্রত্যা-গমন করেন। উহার কয়েক বৎসর পরে রাজস্বসংক্রান্ত কোন বিষয়ের মীমাংসার জন্য, কর্ণেল সেক্সপীয়ারের (Colonel Shakspeare) অধীনে যশোহর গমন করেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য ১৭৯৬ খ্রীঃ অব্দে যশোহর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় কর্ত্তৃপক্ষ এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, ওয়ারেন হেষ্টিংস (Warren Hastings) সুপারিশ করিয়া তদানীন্তন দিল্লীর মুঘল বাদশাহ মোহাম্মদ জাহন্দার শাহের নিকট হইতে জয়নারায়ণের জন্য একটি সনন্দ আনাইয়া দেন। সেই সনন্দ বলে ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি ও তিন হাজারী মনসবদারের পদ লাভ করেন।

অতঃপর জয়নারায়ণ প্রধানতঃ ব্যবসা বাণিজ্যেই আত্মনিয়োগ করেন এবং বুদ্ধিবলে অল্পকাল মধ্যেই প্রচুর ধন সম্পত্তি লাভ করেন। কয়েক বৎসর মধ্যেই শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি কাশীধামে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন (১৭৯১ খ্রীঃ)। তথায় একবার গুরুতর পীড়ায়, অপর কোনও চিকিৎ-সায় ফল লাভ না করিয়া, কাশী প্রবাসী হুইটলি নামক এক ইংরেজ বণিকের উপদেশ মত চিকিৎসা করাইয়া রোগ-মুক্ত হন এবং কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার অনুরোধে একটি ইংরেজি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দে কাশী জঙ্গমবাড়ী মহলায়, নিজ বাসভবনে উক্ত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পরে আটচল্লিশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে উহার জন্য এক ভবন নির্ম্মিত হয়। উক্ত শিক্ষায়তনটি, ভারতের প্রাচীনতম ইংরেজি শিক্ষায়তনগুলির অন্যতম। উক্ত বিদ্যালয়ে ইংরেজি, বাঙ্গালা, হিন্দী সংস্কৃত ও ফারসী ভাষা এবং সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতিষ প্রভৃতিও শিক্ষা দেওয়া হইত। পূর্ব্বোক্ত হুইটলী সাহেব ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, জয়নারায়ণ কর্ত্তৃক উক্ত বিদ্যা-লয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে, জয়নারায়ণ, শিক্ষায়তনটির স্থায়ীত্বের জন্য উহার ভার

কাশীর তদানীন্তন প্রধান খ্রীষ্টধর্ম্মাচার্য্য (Chaplain) রেভাঃ ডানিয়েল কোরির (Reverend Daniel Corrie) পরামর্শে, চার্চ্চ মিশনারী সোসাইটি (Church Missionary Society) নামক প্রতিষ্ঠানের হস্তে সমর্পণ করেন। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে উক্ত খ্রীষ্টধর্ম্ম সঙ্ঘ উহার ভার গ্রহণ করেন। জয়নারায়ণ উহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসিক দুই শত টাকা আয়ের সম্পত্তি ন্যস্ত সম্পত্তিরূপে (Trust Property) দান করেন। তখন হইতে উহা মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের অবৈতনিক বিদ্যালয় নামে পরিচিত হইল। উহার দরিদ্র ছাত্রগণকে আহার ও অন্যান্য ব্যয় সংকুলানের জন্য বৃত্তি দেওয়া হইত। ১৮১৯ খ্রীঃ অব্দ হইতে উক্ত বিদ্যালয়টি ভারত সরকারের নিকট হইতে বাৎসরিক তিন সহস্র মুদ্রা সাহায্য প্রাপ্ত হইতে লাগিল। বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদের ভারতে ইংরেজি শিক্ষার ইতিহাস (History of English Education in India) গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দে তদানীন্তন বড়লাট যখন বারাণসী গমন করেন, তখন জয়নারায়ণ কাশীধামে একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপনের অভিলাষ জানাইয়া একটি আবেদন প্রেরণ করেন তাহাতে জয়নারায়ণ ঐ বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নগদ বিংশতি সহস্র মুদ্রা এবং তৎসহ ভূসম্পত্তি দান করিতে সম্মত হন। ঐ প্রার্থনা মঞ্জুর হইলে, ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে ঐ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বোক্ত খ্রীষ্টধর্ম্মাচার্য্য কোরি সাহেব তাহার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন।

জয়নারায়ণ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। কলিকাতা কালীঘাটের কালী প্রতিমার চারিটি রৌপ্য নির্ম্মিত হস্ত তিনি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ভূকৈলাসে বিরাট প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া, দেবদেবীর বিগ্রহ স্থাপন করেন। কাশীধামে তিনি গুরুকুণ্ড পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা ও ধাতুময় গুরু প্রতিমা স্থাপন করেন।

জয়নারায়ণ সাহিত্য রসিকও ছিলেন। শঙ্করী সঙ্গীত, ব্রাহ্মণার্চ্চন চন্দ্রিকা, জয়নারায়ণ কল্পদ্রুম, কাশীখণ্ডের বঙ্গানুবাদ, করুণানিধান বিলাস প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তকও তিনি রচনা করেন। ১২২৮ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে (১৮২০ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর) কাশীধামেই তাঁহার দেহান্ত হয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র উত্তরাধিকারী কালীশঙ্কর ঘোষাল পরে রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন— তিনি ১৮০৪ খ্রীঃ অব্দে ২৪ পরগণার অন্তর্গত মুচাদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হরিশ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন। জয়-

নারায়ণ চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সেই পিতার নিকট ব্যাকরণ, অমরকোষ, কাব্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হন। ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার অধ্যাপক খ্যাতনামা পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় পরলোক গমন করিলে, তিনি কলিকাতায় উপকণ্ঠে শালিখা নামক স্থানে টোল স্থাপন করিয়া অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। তৎপরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিমচাঁদ শিরোমণি মহাশয় অবসর গ্রহণ করিলে, তাঁহার স্থলে ১৮৪০ সালের ১১ই মে তিনি ন্যায়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তখন তাঁহার বেতন ৯০৲ টাকা ছিল। কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও তিনি তাঁহার টোল রক্ষা করিয়াছিলেন। শালিখায় স্থানের অভাব হওয়ায় তিনি কলিকাতার নারিকেল ডাঙ্গায় জমি ক্রয় করিয়া উঠিয়া আসেন। তাঁহার কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, হরিশ্চচন্দ্র বিদ্যাভূষণ রামকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি এবং টোলের ছাত্রগণ মধ্যে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি পেনসন গ্রহণ করিয়া কাশীবাসী হন। এখানে তাঁহার নিকট দণ্ডী, পরমহংস, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সাধু সন্ন্যাসী ও অপরাপর বিদ্যার্থী আসিয়া যোগ, ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করিত। কাশী নরেশ তাঁহার জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আজীবন একটী বৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদর্শন, সংগ্রহ পদার্থতত্ত্ব সার, প্রভৃতি ১১ খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে কাশীতেই তিনি পরলোক গমন করেন।

জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়—একজন বাঙ্গালী কবি। তিনি 'রাধাকৃষ্ণ বিলাস' নামক কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার মধুর ব্রজলীলা গ্রথিত। ইহার প্রত্যেক অধ্যায় প্রারম্ভে ভাব মধুর 'ধূয়া' আছে।

জয়নারায়ণ রায়—(১) তিনি বাংলার নবাব মুরশিদ কুলি খাঁর সময়ে সহকারী কাননগু ছিলেন। দর্পন নারায়ণ রায় কাননগু ছিলেন। তাঁহাদের সাক্ষর ব্যতীত দিল্লীর সম্রাটের নিকট হিসাব পত্র গৃহীত হইত না। একবার প্রধান কাননগু তিন লক্ষ টাকা না পাইলে সাক্ষর করিতে অসম্মত হন। মুরশিদ কুলি খাঁ উপায়ান্তর না দেখিয়া জয়নারায়ণকে সাক্ষর করিতে বলেন। জয়নারায়ণ হিসাবে সাক্ষর করিয়া নবাবের বিশেষ প্রিয়পাত্র।

জয়নারায়ণ রায়—(২) তিনি বিক্রমপুরের অন্তর্গত জপসা গ্রামের দেওয়ান কৃষ্ণরামের পৌত্র ও রাম প্রসাদ রায়ের পঞ্চ পুত্রের অন্যতম। তাঁহার অগ্রজ রামগতি ও রামগতির কন্যা আনন্দময়ী উভয়েই সুকবি ছিলেন। জয়নারায়ণের রচিত গ্রন্থের নাম 'চণ্ডীকাব্য'। তাঁহার

গ্রন্থ আদিরস প্রধান। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী সহ 'হরিলীলা' নামে আর একখানী কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

জয়নারায়ণ সিংহ—আসামের অন্তর্গত জয়ন্তিয়ার রাজা রামসিংহ (প্রথম) পরলোক গমন করিলে, জয়নারায়ণ সিংহ রাজা হন। তিনি ১৭০৮—১৭৩১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কাছাড়ের অধিপতি তাম্রধ্বজের পুত্র শূরদর্পনারায়ণও নয় বৎসর বয়সে ১৭০৮ খ্রীঃ অব্দে পিতার মৃত্যুর পরে কাছাড়ের রাজা হন। ঐ সময়ে জয়ন্তিয়াপতির ভ্রাতা স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে লইয়া পলায়ন পূর্ব্বক কাছাড় রাজ্যে প্রবেশ করেন। এই অপরাধে জয়নারায়ণ কাছাড় আক্রমণ পূর্ব্বক বিধ্বস্ত করেন। শূরদর্পনারায়ণ পলায়নপূর্ব্বক খাসপুরে যাইয়া রাজধানী স্থাপন করেন। জয়নারায়ণ সিংহের মৃত্যুর পরে বড় গোসাঞি (২য়) সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৭৩১—১৭৭০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

জয়নারায়ণ সেন—তাঁহার রচিত একখানা চণ্ডীকাব্য আছে। তাঁহার গ্রন্থে সেকালের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ সেকালের পণ্ডিতগণ কিভাবে সভারোহণ করিয়া তর্ক করিতেন ও কি কি গ্রন্থে তাঁহারা সমধিক ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাঁহাদের বেশভূষা কেমন ছিল, কিরূপ আসনে বসিয়া তাঁহারা বিচার করিতেন ইত্যাদি বিষয় বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে।

জয়নাল আবেদিন—(১) দিল্লীর রাজমন্ত্রী দবিরউদ্দৌল্লা খাজা ফরিদউদ্দিনের (হিঃ ১২৪৪) পুত্র। মাধ্যাকর্ষণ ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা সংক্রান্ত নানা প্রকার যন্ত্র তিনি স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি বাসভবনের গৃহগুলিতে এত বিভিন্ন প্রকারে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে সজ্জিত করিয়া রাখিতেন যে, উহাকে হঠাৎ দর্শনে মানমন্দির বলিয়া বোধ হইত। তাঁহার পিতা আল্লামা ফজ্জল হোসেন খাঁ লক্ষ্ণৌ-এর রাজমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনিও জ্যোতির্ব্বিদ্যা সংক্রান্ত যন্ত্রবিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

জয়নাল আবদিন—(২) এই কবির জন্ম স্থান দাক্ষিণাত্যের শ্রীরঙ্গ পত্তনে। টিপু সুলতানের আদেশে একটী উদ্দিপনাময়ী কবিতা তিনি রচনা করেন। তাহা উক্ত সুলতানের আদেশে প্রতি শুক্রবারে মহীশূরের প্রতি মসজিদে পঠিত হইত।

জয়নাল আবদিন, সুলতান—তিনি সুলতান সেকেন্দরের পুত্র। ১৪২৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি তাঁহার ভ্রাতা আলীশাহকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নানা

প্রকারে রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার সময় রাজধানী বিবিধ হর্ম্মারাজিতে শোভিত হয়। বায়ান্ন বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি ১৪৭৪ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র হায়দর শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মাত্র এক বৎসর রাজত্ব করিয়া গৃহচূড় হইতে পতনে গতায়ু হন। তৎপরে তাঁহার পুত্র সুলতান হাসন সিংহাসনে আরোহণ করেন।

জয়ন্ত—(১) তিনি বঙ্গের অন্তর্গত পুণ্ডবর্দ্ধন রাজ্যের রাজা ছিলেন। জয়াপীড় দেখ।

জয়ন্ত—(২) মধ্যযুগের একজন দেশ বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। অনেক স্থলে তিনি জয়ন্ত ভট্ট নামেও উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম পণ্ডিতচন্দ্র। তাঁহারা খুব সম্ভব কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। "ন্যায় মঞ্জরী" নামে একখানি প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। উহাতে তিনি তাঁহার সমকালবর্ত্তী ও পূর্ব্বগামী প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিতদের মতাবলী আলোচনা করিয়া অশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি বৌদ্ধ ন্যায়ের বিশেষ বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি আচার্য্য ভট্টপাদের অভিহিতান্বয়বাদ এবং আচার্য্য প্রভাকরের অন্বিতাভিধানবাদ বিশেষ নিরপেক্ষতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। মৈথিল পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্রের অনেক বাক্য উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ আছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত জৈন দার্শনিক পণ্ডিত নিজ পুস্তকে জয়ন্তের অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। জয়ন্ত খুব সম্ভব খ্রীঃ দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

জয়ন্ত চন্দ্র—জিলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অধীন ১১৬ নং লাট তালুকের উত্তরাংশে একটি মন্দির আছে। ইহা 'জটার দেউল' নামে খ্যাত। এই মন্দিরের নিকটে প্রাপ্ত একখানি তাম্রপট্ট হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এই মন্দিরটী চন্দ্রবংশীয় জয়ন্ত চন্দ্র কর্ত্তৃক ৯৭৫ খ্রীঃ অব্দে (৮৯৭ শকাব্দ) নির্ম্মিত হইয়াছিল। চন্দ্র বংশীয় আরও কয়েক জন রাজার নাম পাওয়া যায় কিন্তু তাঁহাদের বিশেষ বিবরণ এখনও অজ্ঞাত।

জয় পাল—(১) তিনি পাঞ্জাবের ব্রাহ্মণ শাহীবংশীয় নরপতি ভীম পালের পুত্র। জয়পাল আনুমানিক ৯৬৫ —১০০১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত পঞ্জাবে রাজত্ব করেন। এই সময়ে গজনীনগরে তুরস্কবংশীয় আলপ্তগিনের ক্রীতদাস ও সেনাপতি সবুক্তিগীন রাজা ছিলেন। তিনি আলপ্তগিনের কন্যাকে বিবাহও করিয়াছিলেন। তিনি পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়া

কয়েকটী দুর্গ অধিকার করেন এবং বহু ধন ও ক্রীতদাস লইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করেন (৯৭৭ খ্রীঃ)। রাজা জয়পাল এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে গজনী রাজ্যে অভিযান করেন। কিন্তু দারুণ তুষারপাতে জয়পালের সৈন্য অধিক অগ্রসর হইতে পারিল না। অগত্যা পরাজিত জয়পাল এক লক্ষ দিরহাম ক্ষতিপুরণ স্বরূপ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

জয়পাল প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান না করায় সবুক্তিগীন আবার পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। এবার পাঞ্জাবে একজন প্রতিনিধি রাখিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। বলা বাহুল্য পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও বহু ধন রত্ন ও ক্রীতদাস লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি আর এদেশে আসেন নাই।

সবুক্তিগীনের মৃত্যুর পরে সুলতান মামুদ গজনার রাজা হইয়াছিলেন। ১০০১ খ্রীঃ অব্দে তিনি পঞ্জাব আক্রমণ করিলেন। বৃদ্ধ রাজা জয়পাল পেশোয়ারের নিকট তাঁহাকে বাধা দিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। পরে কর প্রদানে সম্মত হইয়া মুক্তি পাইলেন। এই অপমান তাঁহার নিকট তীব্র বোধ হওয়ায় তিনি অগ্নিতে প্রবেশপূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জন করিলেন (১০০১ খ্রীঃ)। তৎপরে তাঁহার পুত্র অনঙ্গ পাল রাজা হন।

জয়পাল—(২) পালবংশীয় নরপতি দেবপালের খুল্লতাত পুত্র। দেবপালের রাজত্বকালে তিনি উৎকলরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন।

জয়পাল দীক্ষিত—তিনি একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। 'মধুকোষ' নামে মাধব কর প্রণীত নিদানের একখানা উৎকৃষ্ট টীকা তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন।

জয়বর্দ্ধন—(১) খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে থানেশ্বরে বর্দ্ধনরাজগণের অভ্যুদয় হয়। তাঁহারা প্রাচীন ভারতের পৌরববংশীয় ছিলেন। এই বংশের প্রথম রাজার নাম পুষ্পভূতি বর্দ্ধন। পুষ্পভূতির পুত্র জয়বর্দ্ধন গুপ্ত-সম্রাটগণের এক রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। ঐ সময়ে গুপ্ত সম্রাটগণের প্রতিভা খর্ব্ব হইতেছিল। সেই সুযোগে ৫৯০ খ্রীঃ অব্দে জয়বর্দ্ধনের পুত্র প্রভাকর বর্দ্ধন পশ্চিম ভারতে এক বিশাল রাজ্য স্থাপন করিয়া মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন।

জয়বর্দ্ধন—(২) তিনি বঙ্গের একজন প্রাচীন রাজা। গুপ্তবংশের অবসানের পরে তিনি বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া, পণ্ডিতগণ মনে করেন। তাঁহার সম্বন্ধে অন্য বিবরণ অজ্ঞাত।

জয়ভট্ট—(১ম) তিনি ব্রোচ ও নদীপুরের (বর্ত্তমান রাজপিপলা রাজ্যের অন্ত-

র্গত নন্দোরী) গুর্জ্জরবংশীয় নরপতি। তাঁহারা নিজদিগকে মহাভারতোক্ত কর্ণের বংশধর বলিয়া বলেন। তাঁহারা ভীম মলের গুর্জ্জরবংশীয় নরপতিদের সামন্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহাদের বংশে ছয়জন রাজার নাম পাওয়া যায়। তাঁহাদের নামও তারিখ এইরূপ—দদ্দ (১ম) ৫৮০ খ্রীঃ, জয়ভট্ট (১ম) ৬০৫ খ্রীঃ দদ্দ (২য়) ৬৩৩ খ্রীঃ, জয়ভট্ট (২য়) ৬৫৫ খ্রীঃ, দদ্দ (৩য়) ৬৮০ খ্রীঃ, জয়ভট্ট (৩য়) ৭০৬—৭৩৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত।

জয়মঙ্গল—তিনি একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার। তাঁহার রচিত ভট্টি কাব্যের টীকা অতি প্রসিদ্ধ। তিনি টীকাকার মল্লিনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী।

জয়মতী—(১) আসামের তুঙ্গখুঙ্গিয়াবংশীয় গোবর রাজার পুত্র গদাপাণির পত্নী। পাতিব্রত্যের জন্য আসামবাসীদের শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়া এখনও পূজিত হইতেছেন। ১৬৭৯ খ্রীঃ অব্দে চামগুরীয়া বংশীয় চুলিঙ্গফাকে মন্ত্রীগণ সিংহাসনে স্থাপন করেন। চুলিঙ্গফা নিজ সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিবার জন্য রাজবংশীয় সকলকেই গুপ্তভাবে হত্যা করাইতে লাগিলেন অথবা নানাভাবে অঙ্গে ক্ষত জন্মাইয়া সিংহাসন লাভের অযোগ্য করিতে লাগিলেন। জয়মতীর স্বামী গদাপাণিকে এইভাবে হত্যা করিবার চেষ্টা করাতে গদাপাণি জয়মতীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ছদ্মবেশে পলায়নপূর্ব্বক গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। চুলিঙ্গফা গদাপাণির সন্ধান পাইবার জন্য জয়মতীর উপর অকথ্য অত্যাচার করিতে লাগিলেন। গদাপাণি সংবাদ পাইয়া ছদ্মবেশে আসিয়া, জয়মতীকে জানাইলেন যে, তিনি যেন গদাপাণির সংবাদ বলিয়া দিয়া সকল যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্ত হন। কিন্তু জয়মতী তাহাতে সম্মত হইলেন না। প্রায় একমাস কাল অসহ্য যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

জয়মতী—(২) তিনি কাশ্মীরের রাজা কলসের (১০৮১—১০৮৯ খ্রীঃ) অন্যতমা মহিষী। তিনি স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হইয়াছিলেন।

জয়মল্ল—(১) দিল্লীশ্বর আকবর চিতোর আক্রমণ করিলে যে সকল সামন্ত নরপতি চিতোর রক্ষার্থ শোণিত দান করিয়াছিলেন জয়মল্ল তাঁহাদের অন্যতম। তিনি বেদনোরের অধিপতি এবং রাঠোর কুলের অন্যতম শাখা মৈরতিয়া গোত্রে সমুদ্ভূত। তাঁহার মত সাহসী বীর একমাত্র পুত্ত। অসংখ্য তাতার ও পাঠান সৈন্য নিপাত করিয়া জয়মল্ল শত্রু নিক্ষিপ্ত বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হন এবং আকবরের স্বহস্ত নিক্ষিপ্ত গুলিতে প্রাণত্যাগ করেন। জয়মল্ল ও পুত্তের লোক বিস্ময়কর বীরত্ব অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য সম্রাট আকবর দিল্লীতে আপন

প্রাসাদের সিংহদ্বারে অত্যুচ্চ বেদিকোপরি তাঁহাদের উভয়েরই হস্ত্যারূঢ় দুইটি পাষাণ প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

জয়মল্ল—(২) মিবারের রাণা রায়মল্ল সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ ও জয়মল্ল নামে তিনটি বীর্য্যবান পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই তিন ভ্রাতার মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব ছিল না। জয়মল্ল একদা জ্যেষ্ঠ সঙ্গকে হত্যা করিতেও চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ব্যবহারে পিতা রাণা রায়মল্ল অতিশয় দুঃখিত ছিলেন। জয়মল্ল, চালুক্যবংশীয় রাও শূরতানের রূপবতী ও বীর্য্যবতী কন্যা তারাবাইকে অবৈধ উপায়ে লাভ করিতে যাইয়া শূরতানকর্ত্তৃক নিহত হন।

জয়মাণিক্য—স্বাধীন ত্রিপুরার অধিপতি উদয়মাণিক্যের পুত্র। তাঁহার পিতা স্বীয় জামাতা অনন্ত মাণিক্যকে হত্যা করিয়া রাজ্য লাভ করেন। জয়মাণিক্যের সেনাপতি রঙ্গনারায়ণ প্রবল হইয়া স্বহস্তে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন। তাঁহার অন্যতম সেনাপতি, মহারাজ দেবমাণিক্যের পুত্র কমলদেব, রঙ্গনারায়ণ ও জয়মাণিক্য উভয়কে বধ করিয়া পৈতৃক সিংহাসন লাভ করেন। জয়মাণিক্য ১৫৯৬—১৫৯৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত মাত্র দেড় বৎসর রাজত্ব করেন।

জয়মাল বর্ম্মা—আসামের কামরূপের শালস্তম্ভবংশীয় একজন রাজা। তিনি বীরবাহু নামেও পরিচিত। তাঁহার পিতা বনমাল সিংহাসন ত্যাগ করিলে তিনি রাজা হন (৮৬০ খ্রীঃ)। তিনিও (৮৭৬ খ্রীঃ) পিতার ন্যায় সিংহাসন পরিত্যাগ করিলে তাঁহার তাঁহার অন্যতম পুত্র বলবর্ম্মা (তৃতীয়) রাজা হন।

জয়মাল বীরবাহু—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি। বঙ্গের পালবংশীয় নরপতি দেবপালের খুল্লতাত পুত্র ও অন্যতম সেনাপতি জয়পালকর্ত্তৃক তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন।

জয়রত্ন—কাশ্মীরবাসী পণ্ডিত ভাবরত্নের শিষ্য জয়রত্ন 'জ্ঞান রত্নাবলী' নামে একটি জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করেন।

জয়রাজ—কাশ্মীরপতি কলস রাজের অবরোধবাসিনী কন্যার পুত্র জয়রাজ, রাজা উৎকর্ষের রাজত্বকালে (১০৮৯ খ্রীঃ) নির্দ্দিষ্ট বেতন পাইতেন। কলস রাজের অন্যতম পুত্র বিজয়মল্ল জ্যেষ্ঠ হর্ষের পক্ষাবলম্বন করিয়া যখন উৎকর্ষকে সিংহাসনচ্যুত করেন, তখন জয়রাজ বিজয়মল্লের সহিত উৎকর্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হর্ষদেব রাজা হওয়ার পরে জয়রাজের অতিশয় প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। অবশেষে তিনি হর্ষদেবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। এই অপরাধে প্রথমে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হন এবং পরে নিহত হন।

জয়রাম—(১) একজন জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি 'খেচর কৌমুদী' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

জয়রাম—(২) দক্ষিণ ভারতের একজন জ্যোতিষী। তাঁহার জন্মস্থান খান্দেশ। তিনি ১৬৬৭ শকে (১৭৪৫ খ্রীঃ) 'রমলামৃত' নামে একখানা জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করেন।

জয়রাম—(৩) একজন জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি 'গ্রহগোচর' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

জয়রাম—(৪) তিনি একজন প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকার। 'চিকিৎসাসার রত্ন সংগ্রহ' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

জয়রাম—(৫) প্রাচীন ভারতের একজন পণ্ডিত। তিনি 'গীতাসারার্থ সংগ্রহ' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

জয়রাম তর্কালঙ্কার—উত্তর বঙ্গের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। তাঁহার নিবাস পাবনা জিলায় ছিল। জয়রামের পিতা পুঁটিয়ারাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি খুব সম্ভব খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন।

জয়রামদ্বিজ—একজন বাঙ্গালী কবি। তাঁহার রচিত একটি মনসার ভাসান পাওয়া গিয়াছে।

জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন—খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর খ্যাতনামা বাঙ্গালী নৈয়ায়িক। তিনি রামভদ্র সার্ব্বভৌম নামক প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি উত্তর ভারতেও বিস্তৃতি লাভ করে। নদীয়ার মহারাজা রামকৃষ্ণ, জয়রামের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ন্যায় সিদ্ধান্ত মালা' খুব সম্ভব ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দে রচিত হয়। তদ্ভিন্ন তিনি নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলিও রচনা করেন—(১) তত্বচিন্তামণি দীধিতিগূঢ়ার্থ বিদ্যোতন। (২) তত্বচিন্তামন্যালোক বিবেক। (৩) ন্যায়সিদ্ধান্ত মালা। (৪) শব্দার্থমালা। (৫) গুণদীধিতি বৃত্তি। (৬) গুণদীধিতি বিবৃতি। (৭) ন্যায়কুসুমাঞ্জলি কারিকা ব্যাখ্যা। (৮) পদার্থ মণিমালা। (৯) কাব্য প্রকাশতিলক।

জয়রাম ভট্ট—একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। ১৫৭২ শকে (১৬৫০ খ্রীঃ) তিনি 'জাতককামধেনু' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

জয়লক্ষণ—একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। তিনি ভাস্করাচার্য্যের 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' নামক গ্রন্থের উপর এক অতি উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

জয়শঙ্কর—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—আয়ুর্ব্বেদ-শব্দার্থদীপক বা ঔষধ-নামাবলী।

জয়সিংহ (জয়সিয়া)—(১) চচনামা নামক আরবী গ্রন্থ অনুসারে তাঁহার নাম জয়সিয়া। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত নাম জয়সিংহ। তিনি সিন্ধু দেশের অধিপতি দাহিরের পুত্র। মোহাম্মদ বিন কাশিম যখন দেবল নগর ধ্বংস করেন, তখন তিনি নিরুন নামক স্থানে অবস্থান

করিতেছিলেন। দেবল বন্দরের অধিকাংশ বৌদ্ধ ও যোদ্ধা নিহত হয়। অবশিষ্ট লোকেরা কতক বশ্যতা স্বীকারপূর্ব্বক এবং বাকী পলায়নপূর্ব্বক জয়সিয়ার রাজ্যে আসিয়া জীবন রক্ষা করে। জয়সিয়া পিতৃ আদেশে ব্রাহ্মণাবাদ রক্ষার জন্য গমন করেন; কিন্তু বিন কাশিম তথায় প্রবেশ করিতে পারিলেন না। আলোরের যুদ্ধে দাহিরের পতনের পরেও, তিনি নানাস্থানে থাকিয়া বিন কাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি রাজপুতনার মরুভূমিতে চিতোর নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, বিনকাশিমকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন দাহির দেখ।

জয়সিংহ—(২) ১০১৯ খ্রীঃ অব্দে চালুক্যবংশীয় নরপতি প্রথম বিক্রমাদিত্য, মালবপতি ভোজরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইলে, তাঁহার ভ্রাতা জয়সিংহ রাজ্যাধিকারী হন। তিনি ভোজরাজকে পরাজিত করিয়া ভ্রাতৃনিধনের প্রতিশোধ লইয়া ছিলেন। ১০৪০ খ্রীঃ অব্দে জয়সিংহের মৃত্যুর পরে প্রথম সোমেশ্বর রাজা হন।

জয়সিংহ—(৩) মধ্যযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী উড়িষ্যার এক রাজা। সম্ভবতঃ তিনি তুঙ্গবংশীয় নরপতিদের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। ঢেঁকালেন রাজ্যে তাঁহার একখানা তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার রাজধানী মন্দাকিনী নামক স্থানে ছিল। উক্ত তাম্রশাসনে ৯৯ সাল লিখিত আছে। যদি উহা হর্ষদেবের সাল হয়, তবে ৭০৪ খ্রীঃ অব্দে (৬০৫—৯৯) তিনি বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

জয়সিংহ—(৪) একজন চালুক্যবংশীয় নরপতি। তিনিই প্রথম উত্তর প্রদেশ হইতে বিন্ধ্যপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যে রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার পৌত্র প্রথম পুলকেশী বাতাপিপুরে (বর্ত্তমান বাদামী) রাজধানী স্থাপন করেন। পুলকেশী দেখ।

জয়সিংহ—(৫) চেদিবংশীয় গয়কর্ণ ও অহ্লন দেবীর পুত্র। তিনি কলচুরির (দাহল) অধিপতি ছিলেন।

জয়সিংহ—(৬) চালুক্যবংশীয় নরপতি দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি বনবাসী নামক স্থানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। চালুক্যবংশের চির শত্রু চোল রাজার প্ররোচনায় তিনি স্বীয় ভ্রাতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া বন্দী হন।

জয়সিংহ—(৭) দণ্ডভুক্তির অধিপতি জয়সিংহ বঙ্গের পালবংশীয় নরপতি রামপালের অন্যতম সামন্ত নরপতি ছিলেন।

জয়সিংহ—(৮) তিনি মণিপুরের রাজা ছিলেন। ১৭৬৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি ব্রহ্মদেশের রাজাকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। কিন্তু আহম নরপতি রাজেশ্বর সিংহের

সাহায্যে তিনি বর্ম্মারাজকর্ত্তৃক মণিপুর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কেলেম্বাকে (অথবা বেরংকে) নিহত করিয়া স্বীয় সিংহাসন অধিকার করেন।

জয়সিংহ—(৯) চালুক্যবংশীয় রাজ-চক্রবর্ত্তী দ্বিতীয় পুলকেশীর অন্যতম ভ্রাতা। পুলকেশী তাঁহাকে গুজরাটের অন্তর্গত লাট প্রদেশে স্থাপন করেন। তাঁহা হইতে পশ্চিম চালুক্যবংশ আরম্ভ হয়। তিনি ৬৯৭ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন এবং তাঁহার বংশ তথায় ৯০৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। পুলকেশী (প্রথম ও দ্বিতীয়) দেখ।

জয়সিংহ—(১০) মহারাষ্ট্র দেশের প্রথম চালুক্যবংশীয় প্রথম নরপতি। তিনি রাষ্ট্রকূটপতি গোবিন্দ নরপতিকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, স্বীয় বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পুত্র রণরাগ। রণ-রাগের পুত্র পুলকেশী (প্রথম) হইতেই তাঁহাদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিশেষ রূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পুলকেশী প্রথম দেখ।

জয়সিংহ—(১১) তিনি উদয়পুরের রাণা রাজ সিংহের দ্বিতীয় পুত্র। পিতার মৃত্যুর পরে ১৬৮১ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভীমসিংহ স্বেচ্ছায় অগ্রজসত্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন ভীমসিংহ দেখ। জয়-সিংহের প্রথম কার্য্য দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজীবের সহিত সন্ধি বন্ধন। তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি 'জয় সমুদ্র' নামক সরোবরের প্রতিষ্ঠা। একটী প্রসন্ন সলিলা গিরিতরঙ্গিনীর মধ্যভাগে একটী বিশাল বাঁধ স্থাপন করিয়া তিনি 'জয় সমুদ্র' নামে একটী সুবিশাল সরোবর স্থাপন করেন। ভারতবর্ষে যত সরোবর আছে, ইহা তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার পরিধি ৩০ মাইলের ন্যূন নহে।

রাণা জয়সিংহের জীবন পারিবারিক বিবাদে অশান্তিময় হইয়াছিল। জয়-সিংহের প্রধানা মহিষীর গর্ভজাত সন্তান অমরসিংহ। রাণা প্রধানা মহিষীর প্রতি অনুরক্ত না হইয়া কনিষ্ঠা রাণী কমলার প্রতি সমাসক্ত হইয়াছিলেন। রাণী কমলা, প্রধানা রাণী ও তৎপুত্র অমরসিংহকে অতিশয় ঘৃণা করিতেন। ইহার ফলে অমর সিংহ, সিংহাসন অধি-কার করিয়া পিতাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। অবশেষে পিতা পুত্রে সন্ধি হইল বটে কিন্তু মনের মিলন হইল না। বিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি ১৭০০ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলেন এবং অমর সিংহ রাণা হইলেন।

জয়সিংহ—(১২) তিনি দণ্ডভুক্তির (বর্ত্তমান মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশ, দাঁতন কি?) অধিপতি ছিলেন। বঙ্গের পাল-বংশীয় নরপতি রামপালের (১০৫৭—১০৮৭ খ্রীঃ) তিনি সমসাময়িক এবং খুব সম্ভব তাঁহার সামন্ত নরপতি ছিলেন।

জয়সিংহ উৎকলপতি কর্ণকেশরীকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন।

জয়সিংহ—(১৩)খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর একজন জৈন গ্রন্থকার. তিনি 'হম্মীরমদ মর্দ্দন' নামে একখানি নাটক রচনা করেন। গুজরাতের মুসলমান আক্রমণ ও তাহার পরিণতিই উহার প্রতিপাদ্য বিষয়।

জয়সিংহ আত্তারিওয়ালা—একজন শিখ রাজা। তিনি লাহোরের অধিপতি রণজিৎ সিংহের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাবুলের আফগান অধিপতি কামরাণের আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরে আফগান পক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহারাজ রণজিতের পক্ষভুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দে ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলগাজীরা রণজিৎ সিংহকে সিন্ধু নদীর পশ্চিমভাগ হইতে বিদূরীত করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই সময়ে রণজিৎ সিংহের সেনাপতি ফুলাসিংহ ও জয়সিংহের বীরত্বে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।

জয়সিংহ বল্লভ (প্রথম)— বেঙ্গীর চালুক্যবংশীয় নরপতি কুব্জবিষ্ণু বর্দ্ধনের অন্যতম পুত্র। তিনি তেত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন (৬৩৩—৬৬৬ খ্রীঃ)। তাঁহার পরে তাঁহার ভ্রাতা ইন্দ্ররাজ ছয় মাস রাজত্ব করেন। কুব্জবিষ্ণুবর্দ্ধন দেখ।

জয়সিংহ বল্লভ (দ্বিতীয়)—তিনি বেঙ্গীর চালুক্যবংশীয় নরপতি মঙ্গি যুবরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ৬৯৬—৭০৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তের বৎসর তিনি রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা কোক্কিলি রাজা হন। কুব্জবিষ্ণু বর্দ্ধন দেখ।

জয়সিংহ মির্জা—তিনি অম্বরের (জয়পুরের) নরপতি মানসিংহের ভ্রাতা জগৎ সিংহের পৌত্র। মানসিংহের পুত্র ভাওসিংহ অতি অকর্ম্মণ্য নরপতি ছিলেন: মাত্র কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৬২১ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন তৎপরে তাঁহার পুত্র মাহাসিংহ রাজা হন: তিনিও মদ্যপায়ী ও লম্পট ছিলেন বলিয়া অকালে প্রাণত্যাগ করেন। তৎপরে জয়সিংহ অম্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের পত্নী যোধাবাইএর অনুগ্রহে তিনি অম্বর সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজাব তাঁহাকে ১৬৬২ খ্রীঃ অব্দে ছত্রপতি শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তাঁহারই বুদ্ধি কৌশলে শিবাজী বশ্যতা স্বীকার করিয়া মুঘল দরবারে উপস্থিত হন। আওরঙ্গজাব এই সুযোগে শিবাজীকে বন্দী করেন। এইরূপ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকেও আওরঙ্গজাব বিশ্বাস করিতেন না। জয়সিংহের কীরত সিংহ নামে এক পুত্র ছিল। আওরঙ্গজাব তাঁহাকে প্রলোভনে বশী-

ভূত করিয়া জয়সিংহকে তাঁহাদ্বারা অহিফেনে বিষ মিশ্রিত করিয়া হত্যা করেন। ১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দে জয়সিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামসিংহ রাজা হন। তৎপরে তাঁহার পুত্র বিষণ সিংহ অল্পদিন রাজত্ব করে। এই বিষণ সিংহেরই পুত্র জয়সিংহ সোবে ১৬৯৯ খ্রীঃ অব্দে রাজা হন।

জয়সিংহ সিদ্ধরাজ—চালুক্যবংশীয় নৃপতি। তিনি স্বয়ং বিদ্যানুরাগী ও পণ্ডিতগণের উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ জৈন আচার্য্য ও গ্রন্থকার হেমচন্দ্রের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কবি বাগভটও তাঁহার সভাসদ ছিলেন।

জয়সিংহ সূরী— শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় ভুক্ত জৈন নৈয়ায়িক। তিনি খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ১৩৬৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি 'কুমারপাল চরিত' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

জয়সিংহ সোবে— রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যের জয়পুর নগরের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ জয়সিংহ, ভারতীয় নৃপতিকুলের আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। তিনি ১৬৯৯ খ্রীঃ অব্দে জয়পুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৪৪ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া ১৭৪৩ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরসিংহ রাজা হইয়াছিলেন। তিনি গণিতে, বিশেষতঃ জ্যোতিষ শাস্ত্রে এবং রাজনীতিতে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রের সম্যক আলোচনার জন্য, ইম্যানুয়েল নামক একজন পাদরির সহিত, তৎকালীন জ্যোতির্ব্বিদ্যার ইউরোপীয় কেন্দ্রস্থল লিসবন নগরে, পর্টুগালের রাজার নিকট একজন লোক প্রেরণ করেন। কয়েকটী যন্ত্রের সহিত একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতকে পর্টুগালের রাজা এদেশে পাঠাইয়া দেন। ক্রমে নানাবিধ জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সংগৃহীত হইল। এই নিমিত্ত স্বয়ং জয়সিংহ জ্যোতিষিক বেধোপযোগী গোলাদি যন্ত্রে নব নব কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই আদেশে সিদ্ধান্ত সম্রাট গ্রন্থের মতানুযায়ী স্বপ্রতিষ্ঠিত জয়পুর, ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লী), উজ্জয়িনী, মথুরা ও কাশীতে মানমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সকল মানমন্দির নির্ম্মাণে কত অর্থ ব্যয় হইয়াছিল, তাহা কাশীর ও দিল্লীর মানমন্দিরের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে কিছু বুঝিতে পারা যায়। জয়সিংহের পঞ্জিকা সংস্কার ও তাঁহার মানমন্দির অপূর্ব্ব দর্শনীয় বস্তু হইয়া রহিয়াছে কিন্তু দেশের কোথাও তাঁহার গণনা প্রচলিত হয় নাই। জয়সিংহ আকাশকে ৪৮ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রায় সহস্র তারার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এই বিষয়ে তিনি মুসলিম জ্যোতির্ব্বিদ উলুগবেগের অনুসরণ করিয়াছিলেন এই তারাপত্র দুষ্প্রাপ্য। ১৬৫০ শকে

(১৭২৮ খ্রীঃ) তিনি ‘যন্ত্রসিংহ কারিকা’ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে, ‘জিয়াজ মোহাম্মদ শাহী’ নামে জ্যোতিষ শাস্ত্রের একখানি অঙ্ক পুস্তক সঙ্কলন করিয়া, তদানীন্তন দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

যখন রাজ্যে সুখ ও শান্তি বিরাজ করে, তখন এক বিশাল রাজ্যের অধিপতির পক্ষে নিশ্চিন্ত মনে শাস্ত্রালোচনা করা সম্ভবপর হয়। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় মহারাজ জয়সিংহের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। অসংখ্য বিপ্লব ও ষড়যন্ত্রের মধ্যে পতিত হইয়াও তাঁহাকে এই সকল শাস্ত্রনুশীলনে লিপ্ত থাকিতে দেখা গিয়াছে। কি গভীর জ্ঞানানুরাগ, ! কি গভীর উদ্যম ও অধ্যবসায় !

দেশের তখন ভয়ানক দুরবস্থা। একদিকে দ্রুতগতিতে মুঘল রাজবংশের পতন অন্যদিকে মহারাষ্ট্র শক্তির উত্থান। ইহার ফলে নানা প্রকার সংঘর্ষের উদ্ভব হইয়াছিল।

দিল্লীর সম্রাটের কুটিল মন্ত্রী সৈয়দ ভ্রাতৃ যুগলের হস্ত হইতে সম্রাট ফিরক শিয়ারকে রক্ষা করিতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাটেরই কাপুরুষতাবশতঃ তাঁহার সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হইয়া যায়। ফিরক শিয়ার যখন জয়সিংহের কোন পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না, তখন তিনি বিরক্ত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। ইহার ফল ইতিহাস পাঠক অবগত আছেন।

দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহ অতি কৌশলে সৈয়দ ভ্রাতৃ যুগলকে বিনাশ করিয়া নিষ্কণ্টক হইলেন। জয়সিংহ এই সময়ে আগ্রা ও মালব প্রদেশদ্বয়ে সম্রাটের প্রতিনিধির পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি উচ্চপদে আরূঢ় হইয়াও স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ চিন্তা হইতে দূরে ছিলেন না। তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় ‘জিজিয়া’ কর রহিত হয়. জাঠদিগের উন্নতির তিনি প্রতিবন্ধক হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র নেতা বাজীরাওকে মালবের সুবেদার পদে স্থাপন করিয়া, তাঁহাদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়াছিলেন।

মহারাজ বিষণসিংহের দুই পুত্র জয়সিংহ ও বিজয়সিংহ। তাঁহারা দুই মাতার গর্ভজাত। বিজয়সিংহের জননী জয়সিংহের অভিষেককালে পুত্রের প্রাণ নাশের ভয়ে পিত্রালয় কীচিবারা নগরে গমন করেন। বিজয়সিংহ বয়প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার জননী দিল্লীর সম্রাটের মন্ত্রী কমরুদ্দিনকে অর্থদ্বারা হস্তগত করিয়া, স্বীয় পুত্রের জন্য অম্বর রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিতে প্রয়াসী হন। কিন্তু তাঁহার কৌশল পূর্ব্বেই অবগত হইয়া জয়সিংহ সর্দ্দারগণের এক সভা আহ্বান করিলেন।

সর্দ্দারদের বুদ্ধি কৌশলে বিজয়সিংহ বন্দী হইলেন। এই প্রকারে বিনা রক্তপাতে গৃহবিবাদ প্রশমিত হইল।

মহারাজ জয়সিংহের বুদ্ধি কৌশলে দেওটী রাজ্য ও তাহার রাজধানী রাজোর নগর তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

জয়সিংহের চরিত্রের একটী দোষে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটি হইয়াছিল। তিনি অতিশয় মদ্যপায়ী ছিলেন। তাঁহার সমকালে অভয়সিংহ যোধপুরের রাজা ছিলেন। বিকানীরের রাজা তাঁহারই স্বজাতীয় ছিলেন। কোন কারণে অভয়সিংহ বিরক্ত হইয়া বিকানীর আক্রমণ করেন। বিকানীর পতি এই সময়ে অম্বরপতি জয়সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। জয়সিংহ এই বিবাদ হইতে বিরত হইতে যোধপুরপতিকে একখানা চিঠি লিখেন। তাহার মর্ম্ম এই—'আমরা উভয়ে এক বৃহৎ পরিবারের অন্তর্গত, অতএব আপনি বিকানীরের দোষ মার্জ্জনা করিয়া তথা হইতে আপনার কামান উঠাইয়া লইবেন। নতুবা জানিবেন আমার নাম জয়সিংহ।' পত্রের শেষ অংশটী পাঠে অভয়সিংহ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া লিখিলেন—'আপনার নাম জয়সিংহ আমার নাম অভয়সিংহ।'

এই ঘটনার পরেই উভয় রাজ্যে ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিয়া যায়। বহু লোক ক্ষয়ের পর উভয়ের সুমতির উদয় হয়। যুদ্ধ বিরতি হয়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে জয়সিংহের মৃত্যুর পরে ঈশ্বর সিংহ রাজা হন। তিনি অতি অকর্ম্মণ্য ছিলেন। তৎপরে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মধুসিংহ স্বীয় মাতুল যোধপুরপতি জগৎসিংহের সাহায্যে স্বীয় ভ্রাতার পরিত্যক্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎপরে মধুসিংহের পুত্র পৃথ্বীসিংহ রাজা হন। তিনি ১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা প্রতাপসিংহ রাজা হন। তিনি পচিশ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া ১৮০৩ সালে পরলোক গমন করেন। প্রতাপসিংহের পরে জগৎসিংহ রাজা পঞ্চদশ বর্ষ রাজত্ব করিয়া ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দের ২১শে ডিসেম্বর পরলোক গমন করেন। তাঁহার এক বিধবা পত্নী পরবর্ত্তী ১৮১৯ সালের ২৫শে এপ্রিল জয়সিংহ নামে একটী পুত্র প্রসব করেন। তিনি ১৮৩৫ সালে পরলোক গত হইলে তাঁহার পুত্র সোয়াই রাম সিংহ রাজা হইয়া ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র মধুসিংহ (জন্ম—১৮৬১) ১৮৮০ সালে রাজা হইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় বদান্য ও জ্ঞানবান্ রাজা ছিলেন।

জয়সেন—(১) একজন বাঙ্গালী কুলপঞ্জিকাকার। 'বৈদ্যকুল চন্দ্রিকা' নামে

তিনি একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে বাংলার ইতিহাসের অনেক উপকরণ পাওয়া যায়।

জয়সেন—(২) তিনি মগধের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম বুদ্ধসেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা বঙ্গের শেষ নরপতি লক্ষ্মণসেনের বংশধর ছিলেন। জয়সেন ১২০২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

জয়স্তম্ভ—তিনি উড়িষ্যার শুল্কি-বংশীয় নরপতি রণস্তম্ভের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুলস্তম্ভের মৃত্যুর পরে তিনি রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার পরে আর এই বংশের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কাঞ্চনস্তম্ভ দেখ।

জয়স্থিতি মল্ল—নেপালের মল্লবংশীয় রাজা। তিনি খ্রীঃ ১৩৮০—১৩৯৪ অব্দ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে নেপালে লইয়া যান এবং তাঁহাদের দ্বারা অনেক ধর্ম্মশাস্ত্র সম্পাদন করান। উক্ত ব্রাহ্মণেরা সকলেই মিথিলার লোক ছিলেন এবং তখন হইতেই মিথিলার সহিত নেপালের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটে। জয়স্থিতি মল্ল বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং বিশেষভাবে নাট্য শাস্ত্রে তাঁহার অনুরাগ ছিল। তাঁহারই উৎসাহে অনেকগুলি নাটক রচিত হইয়াছিল। ঐ সকল নাটক নানা উৎসবাদিতে অভিনীত হইত।

জয়াদিত্য—মধ্যযুগের বৈয়াকরনিক তিনি খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'কাশিকা বৃত্তি'।

জয়া দেবী—তিনি স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজা অনন্ত মাণিক্যের মহিষী এবং তাঁহার সেনাপতি গোপীপ্রসাদের কন্যা ছিলেন। গোপীপ্রসাদ স্বীয় জামাতা অনন্ত মাণিক্যকে হত্যা করিয়া, উদয় মাণিক্য নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। বীর্য্যবতী রাণী জয়া-দেবী স্বীয় পতির সহিত সহমৃতা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলে, স্বীয় পিতা গোপী-প্রসাদ তাহার প্রতিবন্ধক হন। তিনি পিতার প্রতি বিরক্ত হইয়া, তাঁহাকে অপদস্থ করিবার নিমিত্ত বলিয়া ছিলেন —"তুমি রাজাকে বধ করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিয়াছ, রাণীকে গ্রহণ করা আর বাকী রাখ কেন।" এই বলিয়া তেজস্বিনী জয়া দেবী পিতার বাম পার্শ্বে সিংহাসনে উপবিষ্টা হইতে উদ্যতা হইয়াছিলেন। পিতা গোপীপ্রসাদ উপায়ান্তর না দেখিয়া, লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক সিংহাসন হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি দুহিতার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য চন্দ্রপুর নামক স্থানে রাজপাট স্থানান্তরিত করেন। পরে মহারাণী জয়া দেবীকে একটি জায়গীর দিয়া, তাঁহাকে চণ্ডীগড়ের রাণী বলিয়া ঘোষণা করেন। মহারাজ অনন্ত মাণিক্য ১৫৮৫ খ্রীঃ অব্দে নিহত হন।

জয়া দেবী—(২) তিনি উপ্পদেব নামক কাশ্মীরের একজন শৌণ্ডিকের পরম রূপবতী কন্যা ছিলেন। কাশ্মীরপতি ললিতাপীড় (৭৮৩-৭৯৫ খ্রীঃ) তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া প্রথমে তাঁহাকে স্বীয় বেশ্যা শ্রেণীতে, পরে অন্তঃপুরে স্থান দান করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভজাত পুত্র চিপ্পট জয়াপীড় ৮০০—৮১৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীরের রাজা ছিলেন। জয়া দেবী জয়েশ্বর নামে এক শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

জয়া দেবী—(৩) কাশ্মীরপতি বজ্রাদিতের (৭৩৮-৭৪৪ খ্রীঃ) পুত্রবধূ ও ত্রিভুবনাপীড়ের পত্নী। ত্রিভুবনাপীড় রাজা হইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার পত্নী জয়া দেবীর গর্ভজাত পুত্র অজিতাপীড় (৮১৪-৮৫০ খ্রীঃ) রাজা হইয়াছিলেন।

জয়ানন্দ—(১) তিনি উড়িষ্যার নন্দবংশীয় রাজা। তাঁহার পিতার নাম অজ্ঞাত। তাঁহার পুত্র পরানন্দ, পৌত্র শিবানন্দ এবং প্রপৌত্র দেবানন্দ (অন্য নাম বিলাসতুঙ্গ)। এই বংশের মাত্র এই চারিজন রাজারই নাম পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। দেবানন্দের প্রদত্ত দুইখানা ভূমিদান পত্র পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম দান পত্র ৯৭৮ খ্রীঃ অব্দের, দ্বিতীয় খানিতে কোন তারিখ দেওয়া হয় নাই। প্রথম দান পত্রের এক স্থানে দেবানন্দের পরিবর্ত্তে ধ্রুবানন্দ নাম পাওয়া যায় এবং দ্বিতীয় দান পত্রে তাঁহাকে শৈব ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। জয়পুর নামক স্থানে তাঁহাদের রাজধানী ছিল।

জয়ানন্দ—(২) একজন জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তাঁহার পিতার নাম মেধাকর। তিনি 'জন্মপদ্ধতি' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করেন।

জয়ানন্দ—(৩) একজন জ্যোতিষী। তিনি ১৪৪৭ শকে (১৫২৫ খ্রীঃ) 'মুহূর্ত্তদীপ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

জয়ানন্দ—(৪) বাঙ্গালী কবি। তাঁহার পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র। জন্মস্থান বর্দ্ধমানের অন্তর্গত আমাইপুর। তাঁহার মাতার নাম রোদিনী ছিল। তিনি বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব ছিলেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এই বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৫১৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। জয়ানন্দের অনেকগুলি অগ্রজের অতি শৈশবেই মৃত্যু হওয়ায় মাতাপিতা তাঁহার নাম রাখেন গুইঞা। নীলাচল হইতে নদীয়ায় প্রত্যাবর্ত্তনের পথে শ্রীচৈতন্যদেব সুবুদ্ধি মিশ্রের ভবনে বাস করেন এবং বালকের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া জয়ানন্দ রাখেন। তিনি অভিরাম গোস্বামীর মন্ত্র শিষ্য ছিলেন। বীরভদ্র গোস্বামী ও গদাধর পণ্ডিতের আদেশে তিনি শ্রীচৈতন্যের জীবন চরিত বিষয়ে 'চৈতন্য মঙ্গল' নামক বহু ঐতি-

হাসিক তথ্যপূর্ণ এক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে তিনি অনেক আত্মীয়-স্বজনদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই পরম ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত ছিলেন। ১৫৫৮ হইতে ১৫৭০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে জয়ানন্দ চৈতন্য মঙ্গল রচনা করেন এবং তিনি দেশে দেশে উহা গান করিয়া বেড়াইতেন। গাহিবার সুবিধার জন্য তিনি গ্রন্থখানিকে নয় খণ্ডে বিভক্ত করেন। উহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী বহু পদকর্ত্তা ও গ্রন্থকারগণের উল্লেখ আছে। চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থেই প্রধানতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাব কাহিনী স্পষ্টতঃ ও বিস্তৃত উল্লেখ আছে। তদ্ভিন্ন 'ধ্রুব চরিত্র' ও 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নামে তাঁহার রচিত আরও দুইখানা গ্রন্থ আছে।

জয়াপীড়—তিনি কাশ্মীরের বিখ্যাত সম্রাট ললিতাদিত্যের পৌত্র। সম্রাট বজ্রাদিত্যের ঔরসে মহারাণী অমৃত প্রভার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি পিতা ও পিতামহের ন্যায় দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া স্বদেশ হইতে বহু দূরে উপস্থিত হইলে, তাঁহার শ্যালক জজ্জ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করিলেন। এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া, তিনি অনুগামী রাজাদিগকে স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিতে বলিলেন। স্বয়ং কেবল কতিপয় সৈন্যসহ প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে প্রায় এক লক্ষ অশ্ব দক্ষিণাসহ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া, তিনি সৈন্যদিগকে স্বদেশে গমন করিতে আদেশ দিলেন। তৎপরে তিনি গোপনে গৌড়ের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে তিনি কমলা নাম্নী এক রূপবতী নর্ত্তকীর আলয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তিনি জানিতে পারিলেন যে, এক সিংহ রাত্রিকালে অসংখ্য মনুষ্য গো মহিষাদি বধ করিয়া নগরে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে। তিনি এক রাত্রিতে সিংহের আগমন পথে অবস্থান করিয়া তাহাকে বধ করিলেন। পরদিন প্রাতে নগরের লোকেরা সিংহের ছিন্ন মস্তক দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইল। রাজা স্বয়ং ইহা দেখিতে আসিয়া সিংহের মুখে প্রাপ্ত একটা স্বর্ণবলয়ে জয়াপীড়ের নাম দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। অনুসন্ধানে কমলা নর্ত্তকীর গৃহে তাঁহার অবস্থানের বিষয় অবগত হইয়া, অতি সমাদরে তথা হইতে তাঁহাকে নিজ আলয়ে আনয়নপূর্ব্বক স্বীয় কন্যা কল্যাণী দেবীর সহিত তাঁহার পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করিলেন। জয়াপীড় স্ববিক্রমে অন্যান্য গৌড়পতিদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় শ্বশুর জয়ন্তকে পঞ্চ গৌড়াধিপের পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

জয়াপীড়ের কাশ্মীর ত্যাগের পর, মন্ত্রী দেবশর্ম্মা নেতৃবিহীন সৈন্যদিগকে

সংগ্রহপূর্ব্বক বঙ্গদেশে জয়াপীড়ের সহিত মিলিত হইলেন। জয়াপীড় স্বীয় সৈন্য ও বিপুল গৌড় বাহিনীর সহায়তায় প্রথমেই কান্যকুব্জপতিকে পরাস্ত করিয়া স্ববশে আনয়ন করিলেন। তৎপরে কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় শ্যালক জজ্জের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ক্রমাগত কিছুকাল যুদ্ধের পর জজ্জ শ্রীদেব নামক এক চণ্ডাল হস্তে নিহত হইলেন এবং জয়াপীড় পুন সিংহাসন লাভ করিলেন। জয়লব্ধ স্থানে তাঁহার মহিষী কল্যাণ দেবী স্বীয় নামে তথায় কল্যাণপুর নামে এক বৃহৎ গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেন। অপরা মহিষী কমলাও (নর্ত্তকী কমলা) কমলাপুর নামে এক গ্রাম স্থাপন করিলেন। জয়াপীড় মহিষী কল্যাণ দেবীর সরল মধুর ব্যবহারে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, স্বয়ং তাঁহার প্রধান প্রতিহার পদ গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

জয়াপীড় অতিশয় বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। তিনি নানা দেশ হইতে পণ্ডিত আহ্বান করিয়া স্বীয় রাজসভার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। স্বীয় মন্ত্রী শুক্রদত্তের পাকশালার অধ্যক্ষ থক্কিয়কে পণ্ডিত বলিয়া উচ্চ সম্মানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ সভার প্রধান পণ্ডিত উদ্ভট ভট্ট উচ্চ বেতন পাইতেন। 'কুট্টনী মত' নামক গ্রন্থের রচয়িতা সুকবি দামোদর তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মনোরথ, শঙ্খদত্ত, চটক, সন্ধিমৎ, প্রভৃতি রাজ সভার কবি ছিলেন। বামন প্রভৃতি আচার্য্যেরা তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। তিনি নানা দেশ হইতে পণ্ডিত আনাইয়া বিচ্ছিন্ন মহাভাষ্যকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। রাজা স্বয়ং তৎকালের শব্দ শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ক্ষীর মহোদয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া শব্দ শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি লঙ্কেশ্বরের নিকট দূত পাঠাইয়া তথা হইতে শিল্পী আনয়নপূর্ব্বক জয়পুর নামে নগর ও দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মথুরাপতি প্রমোদ জয়াপীড়ের প্রাতিহারী ছিলেন।

জয়াপীড় এই প্রকারে কিছুকাল রাজ্যশাসন করিয়া পুনর্ব্বার দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। প্রথমে পূর্ব্বদেশীয় রাজা ভীমসেনের রাজধানীতে ছদ্মবেশে প্রবেশ করেন। কিন্তু তাঁহার এক পলায়িত শ্যালক সিদ্ধ তথায় বাস করিতেন। তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া রাজা ভীমসেনকে সংবাদ প্রদান করেন। ভীমসেন তাঁহাকে বন্দী করেন। কিন্তু তিনি পীড়িত বলিয়া মুক্তি পাইলেন। ইহার পরেই তিনি নেপাল বিজয়ে বহির্গত হইলেন। নেপালী সৈন্যেরা পলায়নের ভান করিয়া ক্রমাগত পশ্চাত সরিয়া যাইতে লাগিলেন। জয়াপীড় তাঁহাদের

অনুসরণ করিতে করিতে এক নদীতটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই নদী স্বল্পজল মনে করিয়া তিনি সসৈন্যে যেমন পার হইতে লাগিলেন, তখনি এক প্লাবন আসিয়া তাঁহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। তিনি অতি কষ্টে অপর পারে উত্তীর্ণ হইবা-মাত্র নেপালরাজ অরমূড়িকর্ত্তৃক বন্দী হইলেন। নদী তীরস্থ একটী প্রাসাদে বিশ্বস্ত প্রহরীদ্বারা তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখা হইল। তাঁহার মন্ত্রী দেবশর্ম্মা প্রচুর ধন ও কাশ্মীর রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া জয়াপীড়ের মুক্তি প্রার্থনা করিয়া নেপালেশ্বরের নিকট দূত প্রেরণ করি-লেন। নেপাল রাজ সম্মত হওয়ায় দেবশর্ম্মা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গুপ্ত ধনের সংবাদ জানিবার জন্য জয়া-পীড়ের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। জয়াপীড় দেবশর্ম্মাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। দেবশর্ম্মা তাঁহাকে সন্তরণদ্বারা নদী পার হইতে পরামর্শ দিলেন। রাজা বিনা ভেলায় নদী পার হওয়া অসম্ভব বলায়, তিনি রাজাকে কিছু সময়ের জন্য বাহিরে যাইতে বলিলেন। রাজা বাহিরে গেলে, মন্ত্রী স্বীয় গাত্র রক্তে এই চিঠিখানা লিখিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলেন। 'আমি এইমাত্র উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছি, আমার মৃতদেহকে ভেলার কাজে লাগাইয়া আপনি নদী উত্তীর্ণ হউন। সৈন্য প্রস্তুত। তাহাদের সাহায্যে নেপাল জয় করুন।' কিছুক্ষণ পরে রাজা গৃহে আসিয়া মৃত দেহ ও চিঠি পাইয়া স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, মন্ত্রীর মৃত দেহের সাহায্যে নদী উত্তীর্ণ হই-লেন। বলা বাহুল্য তিনি নেপাল জয় করিয়া স্বদেশে আগমন করিলেন। কিন্তু মন্ত্রীর আত্মত্যাগের কথা ভাবিয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন।

জয়াপ্পা সিন্ধিয়া, মহারাজ—সিন্ধিয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা রণজিসিন্ধিয়া, জয়প্পা, যতাবা, দত্তাজী, মাধোজী ও জকাজী নামে পাঁচ পুত্র রাখিয়া পর-লোক গমন করেন। তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়াপ্পা রাজা হন। ১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি ঘাতক হস্তে নিহত হইলে, তাঁহার ভ্রাতা মাধোজী রাজা হইয়াছিলেন। রণজী সিন্ধিয়া দেখ।

জয়েন উদ্দিন—তিনি বাংলার নবাব আলাবর্দ্দী খাঁর ভ্রাতা হাজী আহম্মদের কনিষ্ঠ পুত্র। হাজী আহম্মদের নোয়া-জিক মোহাম্মদ, সৈয়দ আমেদ ও জয়েন উদ্দিন নামে তিন পুত্র ছিল। আলাবর্দ্দী খাঁ স্বীয় তিন কন্যাকে এই তিন ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত বিবাহ দেন। তন্মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ কন্যা আমিনা বেগমকে জয়েন উদ্দিন বিবাহ করেন। তাঁহাদেরই পুত্র বঙ্গের শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা। আলীবর্দ্দী খাঁ বঙ্গের নবাব হইয়াই জয়েন উদ্দিনকে শৌকত-

জঙ্গ উপাধি ও বিহারের নবাবী পদ প্রদান করেন। সেই সময়ে সমশের খাঁ, তাঁহার ভাগিনেয় মুরাদশের খাঁ, সরদার খাঁ ও হায়াত খাঁ নবাব আলী-বর্দ্দী খাঁর বিরাগভাজন হইয়া পদচ্যুত হন। তাঁহার কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া জয়েন উদ্দিনের সহিত দেখা করিতে গিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার পিতা হাজী আহম্মদকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। আলী-বর্দ্দী খাঁ এই সংবাদ শ্রুতমাত্র বিহারে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধে সমশের খাঁ, সরদার খাঁ প্রভৃতিকে পরাজিত ও বধ করিয়া স্বীয় কন্যা আমেনা বেগম ও অন্যান্য পুরমহিলাদের উদ্ধার করেন।

জয়েনউদ্দিন মীর—আসামের আহম-বংশীয় রাজা প্রতাপ সিংহের রাজত্ব-কালে (১৬০৪—১৬৪৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত) ব্রহ্মপুত্র নদীর নিম্ন অংশে আসাম প্রদেশ মুসলমানেরা অধিকার করিয়াছিল। ঐ সময়ে আবদুল সলাম নামক এক ব্যক্তি হাজ নামক স্থানে ফৌজদার ছিলেন। তিনি আহম নরপতি প্রতাপ সিংহের আক্রমণে ভীত হইয়া, বঙ্গের নবাব ইসলাম খাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইসলাম খাঁ মীর জয়েনউদ্দিনকে দেড় হাজার অশ্বারোহী ও চারি হাজার পদাতি তাঁহার সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। জয়েনউদ্দিন খাঁ প্রথমে কৃতকার্য্য হইলেও অবশেষে আহমদের হস্তে পরাজিত হন।

জয়েন উদ্দিন মোহাম্মদ হাফি, শেখ—একজন বিখ্যাত কবি তিনি দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুনের সময়ে (১৬৩০-৫৬ খ্রীঃ) বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি নগ্নপদে বিচরণ করিতেন বলিয়া হাফি নামে অভিহিত হইতেন।

জয়েন খাঁ—তিনি মেদিনীপুরের অন্তর্গত হিজলীর নবাব তাজ খাঁ মস্‌নদ-ই-আলার জামাতা। ১৬৫১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার শ্বশুর তাজ খাঁ পরলোক গমন করেন। তাজ খাঁর পুত্র বাহাদুর খাঁ ঐ সময়ে ঢাকায় ছিলেন। তাঁহার অনুপস্থির সুযোগ গ্রহণ করিয়া তিনি হিজলীর সিংহাসন অধিকার করেন এবং ১৬৬০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। এই সময় বাহাদুর খাঁ হিজলিতে আগমন পূর্ব্বক জৈন খাঁকে বিতাড়িত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। পরে বাদশাহী সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া বাহাদুর খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং যুদ্ধক্ষেত্রেই শয়ন করেন। (তাজ খাঁ মস্‌নদ-ই-আলা ও বাহাদুর খাঁ দেখ)।

জয়েন খাঁ—তিনি হিরাটের খাজা মুকসুদের পুত্র এবং সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের সম্পর্কিত ছিলেন। তিনি দিল্লীর সম্রাটের অধীনে পাঁচ হাজারী সেনাপতি ছিলেন। অতিরিক্ত মদ্যপানে ১৬০২ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

জয়েন খাঁ কোকা—তিনি খাজা মুকসুদ হারিবীর পুত্র ও সম্রাট আকবরের ধাত্রী ভাই ছিলেন। তাঁহার মাতা পিচাহ জান সম্রাট আকবরের বাল্যকালের ধাত্রী ছিলেন। সম্রাট আকবর জয়েন খাঁকে আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি পরাজিত হন। এই যুদ্ধে রাজা বীরবল, মোল্লাশেরী, আরাবক্সা প্রভৃতি নিহত হন। ১৬০০ খ্রীঃ অব্দে তিনি আগ্রা নগরে পরলোক গমন করেন।

জয়েন্দ্র—তিনি কাশ্মীরের অধিপতি বিজয়ের পুত্র ছিলেন। তিনি মন্দ লোকের পরামর্শে তাঁহার বিচক্ষণ মন্ত্রী সন্ধিমতিকে শূলে অর্পন করেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি পরলোক গমন করিলে রাজ্যে অতিশয় অরাজকতা উপস্থিত হয়। কথিত আছে, শূলে নিহত সন্ধিমতির দেহ তাঁহার গুরু ঈশান দেব স্বগৃহে আনয়নপূর্ব্বক, পুনর্জীবিত করেন। জয়েন্দ্রের মৃত্যুর পরে সন্ধিমতি রাজ্যের লোককর্ত্তৃক কাশ্মীরের রাজপদ প্রাপ্ত হন। রাজা জয়েন্দ্র খ্রীঃ পূর্ব্ব ৬৯—৩২ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

জর্জ টমাস—আয়র্লণ্ড দেশ তাঁহার জন্মস্থান। তিনি অনুমান ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জাহাজের নাবিক হইয়া তিনি প্রথমে মান্দ্রাজ প্রদেশে ১৭৮১ খ্রীঃ অব্দে আগমন করেন। এই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মাধোরাও সিন্ধিয়ার সৈনিকদলে ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দে প্রবেশ করেন। সেই সময়ে সর্দ্ধানার বেগম সমরুর খুব উন্নতির সময়। টমাস সিন্ধিয়ার সৈন্যদল পরিত্যাগ করিয়া বেগমের অধীনে কর্ম্ম-গ্রহণ করেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই তিনি একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বেগমের কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। তিনি হরিয়ানা নামক স্থানে গমনপূর্ব্বক একটী নূতন রাজ্যের পত্তন করেন। হানসী নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন এবং তথায় একটী দুর্গ স্থাপন করেন। তিনি রোটক নগরের ২০ মাইল দক্ষিণে স্বীয় নামে জর্জগড় নামে একটী দুর্গ স্থাপন করেন। সাধারণ লোকেরা তাহাকে জাহাজগড় বলিত। কয়েক বৎসর পরে মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করে। তিনি তাঁহার অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া, এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু যুদ্ধের পরে, তাঁহার সেনাপতি হপকিনের মৃত্যু হইলে, তিনি হানসী নগরে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। এখানেও মহারাট্টারা আক্রমণ করিলে, তিনি বশ্যতা স্বীকার করিয়া ইংরেজ সৈন্যদলে যোগ দিতে অনুমতি পাইলেন। পরে ১৮০২ খ্রীঃ অব্দে রাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া, স্বদেশে গমন করিবার সময়ে পথে বহরমপুর নগরে উক্ত সনের ২২শে

আগষ্ট তারিখে পরলোক গমন করেন। তাঁহার বিধবা পত্নী বার্ষিক ৯০ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সামান্য অবস্থা হইতে অদম্য সাহস বলে তিনি একটী রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

জর্জ, সম্রাট পঞ্চম—তিনি ইংলণ্ডের রাজা ভারতের সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দের ৩রা জুন তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এলবার্ট ভিক্টার একই ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। ধর্ম্মযাজক ভেলটন উভয় ভ্রাতার শিক্ষক ছিলেন। দ্বাদশ বর্ষাবয়ক্রম কালে জর্জ ব্রিটেনিয়া নামক জাহাজে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিতে প্রেরিত হইলেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে ব্যাসাটি নামক জাহাজে স্থানান্তরিত হন। এই সময়ে তিনি খুব মনোযোগের সহিত কাজকর্ম্ম শিক্ষা করিতেন। জাহাজের সামান্য সামান্য কাজও মনোযোগের সহিত তিনি করিতে চেষ্টা করিতেন। রাজপুত্র বলিয়া তাঁহার কিছু মাত্র অহঙ্কার ছিল না। পরে তিনি গ্রীন উইচের রয়েল নেবেল কলেজে প্রবেশ করেন। এই স্থানে নৌবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া, তিনি প্রসংশাপত্র প্রাপ্ত হন। পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়সের সময় তিনি থ্রাস নামক জাহাজের অধ্যক্ষ হন। এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হয়। ১৮৯৩ খ্রীঃ তিনি ডাচেস অব টেকের কন্যা মেরীকে বিবাহ করেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজকুমার এডোয়ার্ড জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১০ খ্রীঃ অব্দের ৬ই মে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে তিনি রাজ্য লাভ করেন। ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়ে ১৯১১ খ্রীঃ অব্দের ১২ই ডিসেম্বর ভারতে তাঁহার অভিষেক হয়। তিনি এই সময়ে দ্বিখণ্ডিত বঙ্গের পুনর্মিলন করিয়াদেন। তাঁহার রাজত্বের প্রধান ঘটনা ইউরোপের মহাসমর। ১৯৩৬ সালের ২০শে জানুয়ারী তিনি পরলোক গমন করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অষ্টম জর্জ্জ নাম গ্রহণপূর্ব্বক সম্রাট হইয়াছেন।

জলের খাঁ—তিনি ১৬২০—১৬২৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যার মুঘল সুবেদার ছিলেন। হিজলীর জমিদার বাহাদুর খাঁকে পরাস্ত করিয়া তিনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে মির্জা আহাম্মদ বেগ খাঁ উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

জলৌক—তিনি কাশ্মীরের অধিপতি অশোকের পুত্র। তাঁহার পিতার সময় হইতেই ম্লেচ্ছেরা এদেশ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। তিনি তাহাদিগকে পরাস্ত করেন। যে স্থানে ম্লেচ্ছদিগকে পরাজয় করেন, সেই স্থান উজ্বাট ডিম্ব নামে বিখ্যাত হইয়াছে। কথিত আছে তিনি সমস্ত পৃথিবী জয়

করেন। তিনি শৈব ছিলেন এবং প্রথম জীবনে বৌদ্ধদের প্রতি কিছু অত্যাচারও করিয়াছিলেন। পরে সেই কার্য্যের জন্য তাঁহার অনুশোচনা উপস্থিত হয় এবং অনেক বৌদ্ধ মন্দির ও বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তিনি দীর্ঘকাল রাজ্যশাসন করিয়া তাঁহার মহিষী ঈশান দেবীর সহিত পরলোক গমন করেন। তৎপরে দামোদর নামে এক ব্যক্তি কাশ্মীরের রাজা হইয়াছিলেন।

জলৌকা—তিনি কাশ্মীরপতি প্রতাপাদিত্যের পুত্র। তিনি খ্রীঃ পূর্ব্ব ১৪৮—১১৩ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র তুঞ্জিন রাজা হইয়াছিলেন।

জল্লেশ্বর—খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে কামরূপে বর্ম্মনবংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেন। এই বংশের শেষ রাজা জল্লেশ্বর ত্রিস্রোতা নদীর তীরে রত্নপীঠে স্বীয় নামে একটী মহাদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইহাই জল্লেশ্বর মন্দির নামে খ্যাত।

জম্বুস্বামী—এই সাধু পুরুষের জন্মস্থান গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে (অন্তর্ব্বেদী) ছিল। তিনি অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। সম্বলের মধ্যে একখানি লাঙ্গল ও দুইটী বলদ। তদ্দ্বারা কৃষিকার্য্য করিতেন। উৎপন্ন শস্য দ্বারা সাধু সজ্জনের সেবা করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কথা প্রচলিত আছে। একদা এক চোর তাঁহার বলদ দুইটী অপহরণ করে। পরদিন চোর তাঁহার গৃহে অনুরূপ দুইটী বলদ দেখিয়া বিস্মিত হয়। তখন সাধুর চরণে আশ্রয় লইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে ও তাঁহার শিষ্য হয়।

জহিন—তিনি সিন্ধুদেশের অধিপতি দাহিরের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সম্ভবত বৎসরাজের পুত্র। তিনি দেবল নগরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মোহাম্মদ বিন কাশেম কর্ত্তৃক দেবল নগর বিধ্বস্ত হইলে, তিনি পলায়নপূর্ব্বক দাহিরের পুত্র জয়সিয়ার নিকট আগমন করেন। পরে তিনি কাশিমের বিরুদ্ধে আরও অনেকবার যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। দাহির ও জয়সিয়া দেখ।

জহিরউদ্দিন মকদুম—তিনি মিশরের অধিবাসী ও তুরস্ক সম্রাটের প্রজা ছিলেন। তুরস্ক সম্রাট তাঁহাকে মালাবার উপকূলের স্বধর্ম্মাবলম্বী মুসলমান রাজাদিগকে পর্ত্তুগীজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সাহায্য করিবার জন্য প্রেরণ করেন। এই সময়ে মালাবারে অবস্থান কালে, তিনি মালাবার প্রদেশের একখানা ইতিহাস আরবী ভাষায় রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে ১৫৮০ খ্রীঃ অব্দের পর্য্যন্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

জহোরী মোল্লা—তাঁহার প্রকৃত নাম নুরউদ্দিন। পারস্যের অন্তর্গত সরজোয়ার প্রদেশের ভারসিক নগরে তাঁহার

জন্ম হয়। বিজাপুরের নবাব দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহের রাজত্বকালে (১৫৭৯—১৬২৬ খ্রীঃ) তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং তাঁহারই অধীনে জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'সাকিনামা' আহম্মদনগরের বোরহান নিজাম শাহের নামে উৎসর্গ করিয়া প্রচুর পুরস্কার লাভ করেন। ইব্রাহিম আদিলশাহের নামেও তিন খানি গ্রন্থ উৎসর্গ করেন. ১৬১৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

জনুজী ভোঁসলে— নাগপুরের ভোঁসলে রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুজী ভোসলের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭৫৫ খ্রীঃ অব্দে রঘুজীর মৃত্যুর পরে জনুজী রাজ্যাধিপতি হইলেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ মাধাজী, চান্দা ও ছত্রিশগড় জিলার জায়গীরদার হইলেন। জনুজী কোনও সময়ে নিজাম, কোনও সময়ে পেশোয়ার পক্ষ অবলম্বন করিয়া স্বীয় প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতেছিলেন। অবশেষে নিজাম পেশোয়া ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তিনি পেশোয়ার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে জনুজীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাধুজীর পুত্র রঘুজীকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জাকারিয়া খাঁ—অন্য নাম সয়েফ-উদ্দৌলা বাহাদুর জঙ্গ। তাঁহার পিতার নাম—আবদুল সমাদ খাঁ। ১৭০৯ খ্রীঃ অব্দে নাদির শাহের ভারতবর্ষ আক্রমণ-কালে, তিনি লাহোর নগর রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৭৪৫ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ নওয়াজ খাঁ, উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

জাগদেব—তিনি কাশ্মীরের রাজা জস্সকের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পরে ১১৯৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি রাজা হইয়াছিলেন। তিনি একজন ক্ষমতাশালী নরপতি হইলেও, তাঁহার মন্ত্রীরা প্রথমে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। কিন্তু মন্ত্রী গুণাকর রাহুলের বুদ্ধি ও সাহস বলে তিনি আবার রাজ্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পদ্ম নামক একজন দ্বারপতি বিষ প্রয়োগে তাঁহাকে ১২১৩ খ্রীঃ অব্দে হত্যা করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র রাজদেব রাজা হইয়াছিলেন।

জাতবর্ম্মা—(১) বাঙ্গলার বর্ম্মাবংশীয় বজ্রবর্ম্মা চন্দ্রদ্বীপ (হরিকেল) অধিকার করিয়া একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র জাতবর্ম্মা চেদী-বংশীয় কর্ণদেব ও বঙ্গের পালবংশীয় নরপতি তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি কর্ণদেবের কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জাতবর্ম্মা অঙ্গদেশের অধিপতি ও

কামরূপ পতিকে পরাস্ত করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

জাতবর্ম্মা—(২) মগধের বর্ম্মাবংশীয় নৃপতি। তিনি খ্রীঃ দশম শতাব্দীতে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া, বারেন্দ্র ভূমির কৈবর্ত্তরাজ দিব্যকে পরাজিত করিয়া কামরূপে অভিযান করেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও তিনি কামরূপ রাজ্য স্বরাজ্য ভুক্ত করেন নাই বলিয়াই পণ্ডিতগণের অভিমত। ব্রহ্মপাল তখন কামরূপের রাজা ছিলেন।

জাতবর্ম্মা কুলশেখর, প্রথম—তিনি দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্যবংশীয় একজন রাজা। তিনি ১১৯০—১২১৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার পিতার নাম বিক্রম ও পিতামহের নাম কুলশেখর। তাঁহার পরে মারবর্ম্মা সুন্দর পাণ্ড্য (প্রথম) ১২১৬—১২৩৮ এবং মারবর্ম্মা সুন্দর পাণ্ড্য, (দ্বিতীয়) ১২৩৮—১২৫৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহাদের সময়ে পাণ্ড্যবংশীয় রাজাদের পূর্ব্বগৌরব বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

জাতবর্ম্মা বীর পাণ্ড্যে—(১) দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্যবংশীয় নরপতি। তিনি ১২৫৩ খ্রীঃ অব্দে সিংহল জয় করিয়াছিলেন। তিনি চোড়মণ্ডল, কঙ্গু প্রভৃতি দেশও জয় করিয়াছিলেন।

জাতবর্ম্মা বীর পাণ্ড্যে—(২) তিনি মারবর্ম্মা কুলশেখরের জারজ পুত্র জাতবর্ম্মা সুন্দর পাণ্ড্য (তৃতীয়) তাঁহার প্রকৃত পুত্র হইলেও বীর পাণ্ড্যে বয়স্ক ছিলেন এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী বলিয়া পিতার আদরের পাত্র ছিলেন। বীর পাণ্ড্যে ১২৯৬ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন; কিন্তু ১৩১২ সালে তাঁহার ভ্রাতা (তৃতীয়) সুন্দর পাণ্ড্য তাঁহাকে নিহত করেন।

জাতবর্ম্মা সুন্দরপাণ্ড্য প্রথম—তিনি দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্যবংশীয় রাজা। তিনি দ্বিতীয় মারবর্ম্মা সুন্দর পাণ্ড্যের পরে ১২৫১ খ্রীঃ অব্দে রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনিই প্রকৃতপক্ষে সমস্ত চোল সাম্রাজ্যকে করতলগত করিয়াছিলেন। তিনি মালাবার প্রদেশে প্রবেশ করিয়া তথাকার চের নরপতিকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন। চোল নরপতিকে পরাজিত ও করপ্রদ করিয়া, তিনি হয়শাল রাজ্য আক্রমণ করেন। হয়শাল রাজের প্রধান সেনাপতি সিঙ্গন দণ্ডনায়ক প্রভৃতি এই যুদ্ধে সমরে শয়ন করেন। এই যুদ্ধের পরিণামে হয়শাল নরপতি প্রতি বৎসর কর স্বরূপ হস্তী প্রদান করিতে বাধ্য হন। তৎপরে তিনি সালেম জিলার কতক অংশ ও দক্ষিণ আর্কট অধিকার করেন। এই সময়ে সিংহলের নরপতি ভয়ে তাঁহাকে কর প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি তৎপরে চিদাম্বর নগরে গমনপূর্ব্বক তত্রত্য নটরাজ বিগ্রহের

পূজা অর্চনা করিয়াছিলেন। এই স্থানের মন্দিরের চূড়া স্বর্ণ মণ্ডিত করিয়া দিয়া তিনি তুলাপুরুষ ব্রতানুষ্ঠান করেন। এই ব্রতে স্বর্ণ, রজত, রত্নাদির সহিত তুলিত হইয়া সেই সমস্ত ব্রাহ্মণাদিকে দান করিতে হয়। তৎপরে তিনি শ্রীরঙ্গম তীর্থে গমন করেন। তথা হইতে আরও উত্তর দিকে গমনপূর্ব্বক বাণদিগকে অরণ্যে বিতাড়িত করিয়া, গণ্ডগোপাল রাজাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া কাঞ্চী নগরে প্রবেশ করিলেন; তিনি আরও উত্তরদিকে অগ্রসর হইয়া তেলাঙ্গদিগকে কৃষ্ণা নদীর অপর তীরে বিতাড়িত করিলেন; দেবগিরির যাদবদিগকে পরাস্ত করিলেন; এই সময়ে নেলোরে তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তৎপরে তিনি আর অগ্রসর না হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পথে তিনি শ্রীরঙ্গম তীর্থে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, বহু অর্থ তীর্থ সংস্কারে ব্যয় করেন এবং বহু অর্থ দানও করেন। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তাঁহার কীর্ত্তি কাহিনী জন প্রবাদের ন্যায় লোক মুখে মুখে শ্রুত হওয়া যায়। তিনি সম্ভবতঃ ১২৬৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

জাতুকর্ণ—(১) অগ্নিবেশ, ভেড়, জাতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণি এই ছয়জন আত্রেয় পুনর্ব্বসুর প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে এক একখানি আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ক্ষারপাণি ও জাতুকর্ণের সংহিতার সম্বন্ধে বহু গ্রন্থে উল্লেখ থাকিলেও তাঁহাদের রচিত মূল গ্রন্থ অপ্রাপ্য।

জাতুকর্ণ—(২) একজন উপস্মৃতি শাস্ত্রকার। তাঁহার পুত্র জাতূকর্ণ্যও একজন উপস্মৃতি শাস্ত্রকার।

জাতুকর্ণ্য—একজন জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থকার। অনন্ত-পুত্র রামদৈবজ্ঞ ১৫২২ শকে (১৬০০খ্রীঃ) 'মুহূর্ত্তচিন্তামণি' নামে এক উৎকৃষ্ট জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করেন। গোবিন্দ দৈবজ্ঞের তাহার উপর 'ধারা' নাম্নী টীকা অতি উৎকৃষ্ট।

জানকীনাথ ঘোষাল—দেশহিতব্রতী কর্ম্মী। নদীয়া জিলার চুয়াডাঙ্গা নিবাসী জয়চন্দ্র ঘোষাল তাঁহার পিতা। বাল্যকালে কৃষ্ণনগরে পাঠদশায় তিনি রামতনু লাহিড়ীর প্রভাবে পড়িয়া উপবীত ত্যাগ করেন। তজ্জন্য তাঁহার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ত্যজ্য পুত্র করেন। তিনি অর্থাভাবে পাঠ সমাপন করিবার পূর্ব্বেই অর্থোপার্জ্জনে ব্রতী হইলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যা খ্যাতনাম্নী স্বর্ণকুমারী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর পিতার সহিত তাঁহার সদ্ভাব স্থাপিত হয় এবং তিনি পৈতৃক সম্পত্তি পুনরায় লাভ করেন।

জানকীনাথ জাতীয় মহাসমিতির

প্রথম অবস্থা হইতে ঘনিষ্ঠভাবে উহার সহিত যুক্ত ছিলেন। একাধিক ক্রমে ছাব্বিশ বৎসর কাল প্রতি অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া, তিনি নানা বিষয়ে সাহায্য করিতেন। যে স্থানে অধিবেশন হইত, পূর্ব্ব হইতে তথায় গমন করিয়া, মণ্ডপ নির্ম্মাণ, প্রতিনিধিগণের বাসস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা করা, প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিতেন। দীর্ঘকাল বাঙ্গালা দেশে কংগ্রেসের সমুদয় কার্য্যের ভার প্রধানতঃ তাঁহারই উপরে ন্যস্ত ছিল। বস্তুতঃ খুব কম লোকই তাঁহার ন্যায় কংগ্রেসের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকিয়াও লোক চক্ষুর অন্তরালে কংগ্রেসের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

স্ত্রীশিক্ষায় তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্যিক খ্যাতির পশ্চাতে জানকীনাথের চেষ্টা ও প্রেরণা ছিল। বহুকাল তিনি কলিকাতায় বেথুন কলেজের কার্য্যাধ্যক্ষের (Secretary) কাজ করেন।

তাঁহার একমাত্র পুত্র সার জোৎস্না ঘোষাল সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দীর্ঘকাল বোম্বাই প্রদেশে সরকারী চাকুরী করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

১৩২০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (১৯১৩ খ্রীঃ মে) কলিকাতা নগরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

জানকীনাথ দত্ত—প্রবাসী বাঙ্গালী খ্যাতনামা রাজকর্ম্মচারী ও শিক্ষাব্রতী। ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ইহার পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খি-কমলা গ্রামে। শৈশবেই পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি পড়াশুনা করিবার বিশেষ সুযোগ লাভ করেন নাই; নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া প্রায় এফ্ এ (First Arts) পর্য্যন্ত পড়িবার সুযোগ পান কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় নাই। তৎপূর্ব্বেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার শ্বশুর মহিম চন্দ্র জোয়াদ্দার মহাশয় তখন গোয়ালিয়র রাজ্যে উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারই সাহায্যে জানকী নাথ কিছুকাল আগ্রায় ও পরে লক্ষ্ণৌ নগরীতে পড়াশুনা করিয়া ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং গোয়ালিয়র স্কুলের শিক্ষকতা কাজে নিযুক্ত হন।

ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল তিনি গোয়ালিয়রের শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত ছিলেন এবং অসাধারণ কার্য্য দক্ষতা গুণে গোয়ালিয়রের শিক্ষাবিভাগের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তাঁহারই চেষ্টায় গোয়ালিয়র রাজকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুতঃ উক্ত কলেজটি যে নানাবিষয়ে একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষায়তনে পরিণত হয়, তাহার মূল কারণ জানকী নাথের অক্লান্ত পরিশ্রম ও

অসাধারণ কার্য্য নৈপুণ্য। শিক্ষা বিভাগে তাঁহার অনন্যসাধারণ কৃতীত্বের পরিচয় গোয়ালিয়রের শিক্ষাবিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা (Inspector General of Education) নানাভাবে সরকারী বিবরণীতে স্বীকার করিয়াছেন। কয়েকবার জানকী নাথ অস্থায়ীভাবে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষের পদও অলঙ্কৃত করেন। তিনি গোয়ালিয়র পৌরসভার (Municipality) একজন সদস্য ছিলেন এবং কয়েকবার উহার সভাপতিও হইয়াছিলেন। ১৯১১ খ্রীঃ অব্দে লোক গণনার সময়ে তিনি যেরূপ নৈপুণ্য ও সুশৃঙ্খলতার সহিত কার্য্য সম্পাদন করেন, বিশেষ ভাবে তজ্জন্য গোয়ালিয়ার ও ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রশংসিত হন। ঐ বৎসর গোয়ালিয়রে দুরন্ত মহামারী (Plague) রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। রোগ প্রতিষেধ কল্পে তাঁহার ব্যবস্থানুযায়ী কাজ করাতে ঐ ব্যাধির প্রকোপ অনেক হ্রাস হয়। এই ভাবে নানা বিভাগে সুখ্যাতির সহিত কাজ করিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

জানকীনাথ দাস—একজন বাঙ্গালী কবি। তাঁহার রচিত একখানা মনসার ভাসান পাওয়া গিয়াছে।

জানকীনাথ বসু—১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে জিলা ২৪পরগণার অন্তর্গত হরিনাভি গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি প্রথমে গ্রামের স্কুলে পাঠ আরম্ভ করেন, পরে কলিকাতা হইতে ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কটকে তাঁহার ভ্রাতার কর্ম্মস্থলে অবস্থান করিয়া রভেন্‌সা কলেজ হইতে এফ, এ পাশ করেন। ১৮৮২ সালে বি, এ পাশ করিয়া এলবার্ট কলেজে (Albert College) কিছুদিন অধ্যাপকের কর্ম্ম করেন। তৎপরে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, জয়নগর স্কুলে কিছুদিন প্রধান শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি কটকে যাইয়া ওকালতি আরম্ভ করেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়। তিনি ১৯০৫ সালে কটকের সরকারী উকিলের পদে নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরে তিনি কটক মিউনিসিপালিটীর প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ (Chairman) হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে কাজ করিয়াও বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে এই সময়ে তিনি রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। উড়িষ্যার প্রবাসী বাঙ্গালী ও উড়িষ্যাবাসীর বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৩৪১ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহারই সুযোগ্য পুত্র বঙ্গের সুসন্তান শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসু।

জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য—খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর একজন বাঙ্গালী নৈয়ায়িক পণ্ডিত। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম

'ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী'। তিনি ন্যায় চূড়ামণি নামেও খ্যাত ছিলেন।

জনকজী রাও সিন্ধিয়া—গোয়ালিয়রের দৌলত রাও সিন্ধিয়ার মৃত্যুর পরে তাহার বিধবা মাহিষী বাজীবাই তাঁহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন (১৮২৭ খ্রীঃ। সেই সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র নয় বৎসর ছিল। সুতরাং রাজকার্য্য বাজীবাই নির্ব্বাহ করিতেন। মাত্র পনর বৎসর কয়েক মাস রাজত্ব করিয়া চব্বিশ বৎসর বয়সে ১৮৪৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার পোষ্য পুত্র জয়াজী সিন্ধিয়া তৎপরে গোয়ালিয়রের রাজা হন। রনজী সিন্ধিয়া দেখ।

জানকীরাম রায়, রাজা—তিনি দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর তিনি একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। আলবর্দ্দী খাঁ যখন পাটনার নায়েব তখন তিনি তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরূপে পাটনায় অবস্থান করিতেন। ১৭৪০ খ্রীঃ অব্দে আলাবর্দ্দী খাঁ, সফররাজ খাঁকে পরাস্ত করিয়া বাঙ্গালার নবাব হন। এই সময়ে জানকীরাম রায় প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হন। মহারাট্টাদের বাঙ্গালা দেশ আক্রমণের সময়ে জানকীরাম তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন। স্বীয় প্রভুর এই দুরবস্থার সময়ে স্বীয় অর্থব্যয় করিয়া তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যা কার্য্যেও স্বীয় প্রভুর যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। আলাবর্দ্দী খাঁ ভাস্কর পাণ্ডতকে হত্যা করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়া, মুস্তাফা খাঁ ও জানকীরামকে তাঁহার সন্ধির প্রস্তাবসহ প্রেরণ করেন। ভাস্কর পাণ্ডিত বহু অর্থ দাবী করিলেন। মুস্তাফা খাঁ ও জানকীরাম অর্থ দিতে সম্মত হইলেন কিন্তু কথা হইল যে ভাস্কর পাণ্ডতকে একবার নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধির পাকা বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তদনুসারে ভাস্কর পণ্ডিত নবাব শিবিরে প্রবেশ মাত্র সানুচর নিহত হইলেন। এই সব ঘটনার কিছুকাল পরেই পদচ্যুত সেনাপতি সমসের খাঁ, সদ্দার খাঁর হস্তে জামাতা জয়েনউদ্দিন ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহম্মদ নিহত হইলেন। আলীবর্দ্দী খাঁ সসৈন্যে পাটনায় উপস্থিত হইয়া, বিদ্রোহী সেনাপতিদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়া স্বীয় কন্যা আমেনা বেগম ও অন্যান্য পুরমহিলাদিগকে উদ্ধার করিলেন এবং পাটনার ডিপুটী নায়েবের পদ স্বীয় দৌহিত্র বালক সিরাজউদ্দৌল্লাকে প্রদান করিলেন। তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ কাজ করিবার জন্য জানকারাম রায় নিযুক্ত হইলেন। এই কাজ অতিশয় দায়ীত্বপূর্ণ ছিল। কারণ বহিঃ শত্রুর বঙ্গদেশ আক্রমণের ইহাই একমাত্র পথ ছিল : এই দায়ীত্বপূর্ণ কাজ অতি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন

করিয়া ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র দুর্লভরাম স্বীয় পিতার পদ প্রাপ্ত হইয়া প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন।

জানকু পাথর—১৮২৭ খ্রীঃ অব্দে ময়মনসিংহে প্রজা বিদ্রোহ হয়। তাহার নায়ক ছিল টিপু পাগলা। সে ধৃত হইয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত হয়। তাঁহার পরেই গুমানু সরকার ও উজির সরকার নামক দুই বুদ্ধিমান লোক প্রজা বিদ্রোহের নায়ক হয়। তাহারা যখন ময়মনসিংহ সহরে থাকিয়া জমিদার-দের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা পরিচালনা করিতেছিল, তখন বিদ্রোহীদের নায়ক হইল জানুপাথর ও দোবরাজপাথর। এই দুই ব্যক্তি অসভ্য পার্ব্বত্য জাতীয় ও ভীষণ প্রকৃতির ছিল। বিদ্রোহী-দিগকে দুই দলে বিভক্ত করিয়া দুইজন দুই দলের অধিনায়ক হয়। সেরপুরের পশ্চিমদিকে কাড়বাড়া পাহাড়ের পাদ-দেশে বাটাজুরে জানকু পাথরের ও নালিতা বাড়ীতে দোবরাজ পাথরের প্রধান আস্তানা হইল। তাহারা প্রথমেই সেরপুরের জমিদারী কাছারী ও গৃহ দগ্ধ করিয়া লুণ্ঠন করিল। অবি-লম্বে তাঁহাদের দমনার্থ কিছু সৈন্য প্রেরিত হইল। তাহারা সৈন্য দর্শনে পাহাড়ে পলায়ন করিল কিন্তু সুযোগ পাইলেই লুণ্ঠনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হইত। অবশেষে দুই দল সৈন্য তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। বিদ্রোহী সাধারণ সর্দ্দারদের অনেকে বশ্যতা স্বীকার করিল। কিন্তু প্রধান সর্দ্দারেরা পাহাড়ে পলায়ন করিল। তাহাদের দল বল কমিয়া যাওয়ায় তাহারা আর অত্যাচার করিতে সাহসী হইল না। তাহাদের পরের সংবাদ অজ্ঞাত।

জান জানান মির্জ্জা—মির্জ্জা জানের পুত্র। ১৬৯৯ খ্রীঃ অব্দে আগ্রা নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তাঁহার কবিজন সুলভ নাম—মজদর ছিল। তিনি নির্ভীক স্পষ্টবাদী ছিলেন। আগ্রা নগরেই অধি-কাংশ সময় অবস্থান করিতেন। ১৭৮১ সালের ৩রা জানুয়ারী তিনি আততায়ী কর্ত্তৃক নিহত হন।

জানফিসন খাঁ বাহাদুর—তিনি সর-দানার ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তিনি ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ সাহায্য করিয়া মাসিক এক হাজার টাকা বৃত্তি ও অধস্তন তিন পুরুষ পর্য্যন্ত ভোগ করিবার জন্য একটি জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জানি বেগতুর খাঁ, মির্জ্জা—তিনি সিন্ধুদেশের অন্তর্গত তাত্তার একজন শাসন কর্ত্তা ছিলেন। ১৫৮৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতামহের মৃত্যুর পরে রাজ্য-লাভ করেন। দিল্লীর সম্রাট আকবর শাহ মনে করিয়াছিলেন, জানিবেগ একবার তাঁহার সহিত দেখা করিবেন।

কিন্তু তিনি সাক্ষাৎ না করায়, আকবর শাহ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সেনাপতি বৈরাম খাঁর পুত্র আবদুল রহিম খাঁকে, তাঁহার রাজ্য অধিকার করিতে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে জানিবেগ পরাজিত হইয়া সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করেন। ইতিমধ্যে আবদুল রহিম খাঁর পুত্র মির্জ্জা ইরিচের সহিত জানিবেগের কন্যার পরিণয় কার্য্য সম্পাদিত হইল। সম্রাট জানিবেগকে আমীর শ্রেণীতে উন্নীত করিয়া সম্মানিত করিলেন। ১৫৯৯ সালে দাহারাণ পুরে জানিবেগের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র মির্জ্জা গাজী পিতার পদ ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

জাফর খাঁ—(১) পাঠান সেনাপতি। তিনি সপ্তগ্রাম বিজয়ীরূপেই সমধিক খ্যাত। তিনি কিছুকাল দিনাজপুরের নিকটবর্ত্তী দেবকোটেরও শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১২৯৭ খ্রীঃ অব্দে খোদিত এক শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তাঁহার প্রকৃত নাম বহরাম-ইৎগিন হুমায়ুন। জাফর খাঁ পরবর্ত্তীকালে লব্ধ নাম। তিনি খুব সম্ভব ১২৯৮ খ্রীঃ অব্দে সপ্তগ্রাম বিজয় করেন। সপ্তগ্রামে এখনও তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান আছে। ঐ সমাধি মন্দিরের নির্ম্মাণভঙ্গী ও তাহার অভ্যন্তরস্থ অনেক বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে উক্ত সমাধিটি পূর্ব্বে কোনও হিন্দু মন্দির ছিল।

জাফর খাঁ—(২) তাঁহার উপাধি উমদাদ্-উল্-মুল্ক। তাঁহার পিতার নাম মীর বক্সী সাদেক খাঁ। তিনি উজির ইমিন উদ্দৌলা আসফ খাঁর ভাগিনেয় ও জামাতা। সম্রাট শাহজাহানের সময়ে তিনি পাঁচ হাজারী মনসবদার ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজীবের সময়ে তিনি উজিরের পদ প্রাপ্ত হন। ১৬৭০ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

জাফর খাঁ—(৩) ১৭০৭ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহ তাঁহাকে কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। তিনি অতি অযোগ্য শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৭০৯ সালে, অতিরিক্ত মদ্য পানে কাশ্মীরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

জাফর ভাত্তলী মীর—তিনি নারনোল নামক স্থানের একজন সৈয়দ। তিনি মীরজা বেদিলের সমসাময়িক। সম্রাট আওরঙ্গজীবের পুত্র রাজকুমার আজিম শাহের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। তিনি একজন বিদূষক ও কবি ছিলেন। বিদ্রূপাত্মক কবিতা তিনি অতি নিপুণতার সহিত লিখিতে পারিতেন। দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহের সম্বন্ধে একটী বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখিয়া, সম্রাটের আদেশে নিহত হন।

জাবতা খাঁ—রোহিলা সর্দ্দার নজিব উদ্দৌলা আমীর উল্ ওমরার তিনি পুত্র। ১৭৭০ খ্রীঃ অব্দে পিতার মৃত্যুর পরে তিনি দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের

পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত হন। কিছুকাল পরে সম্রাট জানিতে পারেন যে, জাবতা খাঁ তাঁহার ভগিনী খরুন উন্নিসার সম্মানের হানী করিয়াছেন। এই অপরাধে সম্রাট তাঁহার রাজ্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। কিন্তু জাবতা খাঁ, অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্দৌলার সাহায্যে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। পরে মহারাট্টাদের সাহায্যে স্বরাজ্য প্রাপ্ত হন। ১৭৮৫ খ্রীঃ অব্দে জাবতা খাঁ পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র গোলাম কাদের খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সম্রাট শাহ আলমকে অন্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ময়নদ্দিন খাঁ। সাধারণতঃ তিনি ভানবু খাঁ নামে পরিচিত ছিলেন। ইংরেজ রাজসরকার হইতে মাসিক পাঁচ হাজার টাকায় বৃত্তি পাইতেন। ময়নদ্দিন খাঁর মৃত্যুর পরে তাঁহার মামুদ খাঁ ও জালালউদ্দিন খাঁ নামক দুই পুত্র প্রত্যেকে মাসিক এক হাজার টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেন। জ্যেষ্ঠ মামুদ খাঁ সিপাহী বিদ্রোহে (১৮৫৭ খ্রীঃ) যোগদান করেন। পরে ধৃত হইয়া মিরাট জেলে কারারুদ্ধ হন এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

জাবাল—(১) তন্ত্ররাম নামক চিকিৎসা গ্রন্থ জাবাল প্রণীত।

জাবাল—(২) পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী একজন বৈয়াকরণিক। কিন্তু তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। অষ্টাধ্যায়ীতে অন্যান্য শাব্দিক পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁহার নামের উল্লেখ আছে।

জাবেদ আলী খোন্দকার—একজন বঙ্গীয় মুসলমান কবি। 'মধুমালার কেচ্ছা' নামক পুস্তক তাঁহার রচিত।

জাবেরীলাল অমিয়াশঙ্কর যাজ্ঞিক—গুজরাতের একজন ব্যবসায়ী ও দেশহিতব্রতী। ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দে আহমদাবাদ নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা একজন সরকারী কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন। তৎকালীন ব্যবস্থা অনুযায়ী তিনি ইংরেজি শিক্ষার উচ্চতম পরীক্ষায় কৃতীত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। তৎপরে কিছুকাল অধ্যাপনা কার্য্য করিবার পর, বোম্বাইএর প্রধান সরকারী দপ্তর খানায় কিছুকাল কাজ করেন। কিন্তু চাকুরী অপেক্ষা ব্যবসায় করাই শ্রেয়স্কর মনে হওয়াতে চাকুরী পরিত্যাগ করেন। ঐসময়ে আমেরিকার স্বাধীনতা-সমর উপস্থিত হওয়ায়, বোম্বাই তুলার বাজারে তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং সেই সুযোগে জাবেরী লাল অল্প দিনের মধ্যেই প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন। কিন্তু ঐ যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ন্যায় তিনিও ঘোরতর ক্ষতিগ্রস্ত হন।

প্রধানতঃ ব্যবসায়ী হইলেও জাবেরী লাল দেশের বিবিধ হিতকর আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন। কৃষক-

দের দুঃখ দারিদ্র্য সংক্রান্ত বিষয়গুলিই তিনি প্রধানতঃ আন্দোলন করিতেন। তাঁহারই প্রধান চেষ্টায় কৃষকদিগের অসুবিধা দায়ক অনেক আইন বিধিবদ্ধ হইতে পারে নাই এবং অনেক প্রচলিত বিধি প্রত্যাহৃত হয়। ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি বোম্বাই পৌরসভার (Municipality) সদস্য মনোনীত হন। ঐ পদে তিনি একাধিক ক্রমে পঞ্চদশ বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং এই দীর্ঘকাল নিস্বার্থভাবে দরিদ্র করদাতাগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, তাহাদের দুঃখ ও অসুবিধা দূর করিবার জন্য পরিশ্রম করেন। ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি বোম্বাই এর প্রধান নাগরিকের (High Sheriff) পদ লাভ করেন এবং উহার দুই বৎসর পরে তিনি বোম্বাই আইন সভার (Legislative Council) সদস্য মনোনীত হন। ঐ পদেও তিনি সর্ব্বপ্রকারে নিজের কর্ম্মক্ষমতা ও যোগ্যতা প্রদর্শনপূর্ব্বক সকলের ধন্যবাদ ভাজন হন। আইন সভার বিতর্কের সময়ে তাঁহার সুযুক্তি ও তথ্যপূর্ণ বক্তৃতাগুলি সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিত।

জাবেরীলাল বিদ্যোৎসাহী এবং সাহিত্য রসিকও ছিলেন। তিনি ও তাঁহার আরও দুই বন্ধু মিলিত হইয়া, একখানি ইংরেজি গুজরাটি অভিধান প্রণয়ন করেন। কালিদাসের শকুন্তলার এবং মনুসংহিতার গুজরাটি অনুবাদ তাঁহার দুইটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম ভাগের প্রসিদ্ধ গুজরাটি শ্রেষ্ঠী ত্রিবেদী অর্জ্জনজী নাথজীর অপ্রকাশিত তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধটী তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই সকল ভিন্ন আরও অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ তিনি বিভিন্ন পত্রিকাদিতে প্রকাশ করেন। বোম্বাই এর একাধিক সাধারণ সভা প্রভৃতিতে প্রদত্ত তাঁহার বিভিন্ন বিষয়ক বক্তৃতা গুলিও বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সময়োচিত হইত। ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দ হইতে কিছুকাল তিনি একখানি দ্বি-ভাষিক (ইংরেজী ও গুজরাতি) পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত পত্রিকা খানি তৎকালে ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের মুখপত্র স্বরূপ গণ্য হইত।

জামসেটজী জীজীভাই—১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে বোম্বাইয়ে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি পার্সি জাতীয় ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার পিতৃমাতৃ বিয়োগ ঘটে। তাঁহার শ্বশুর তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। তিনি বাল্যকালে গুজরাতি ও কিছু ইংরেজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে একটি বাণিজ্য জাহাজে চাকরী গ্রহণ করিয়া তিনি চীনদেশে গমন করেন। তৎপরে বোম্বাইয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ৩৫০০০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া ব্যবসায় করিতে

আরম্ভ করেন। ১৮২০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে তিনি তাঁহার প্রায় দুই কোটী টাকা পরিমিত সম্পত্তির অধিকাংশ অর্জ্জন করেন। তিনি সচ্চরিত্র, উদার স্বভাব ও বিখ্যাত দাতা ছিলেন। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচশ লক্ষ টাকা দান করেন। দেশবাসী ব্যতীত বাহিরের অনেক লোককেও তিনি জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দান করিতেন। ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'সার' (Knight) এবং ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে 'ব্যারনেট' (Baronet) উপাধি প্রদান করেন। ৭৬ বৎসর বয়সে ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

জামসেটজী নওসরওয়াঞ্জি টাটা—দেশবিখ্যাত পারসী ব্যবসায়ী ও দানবীর। ১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তের বৎসর বয়সে শিক্ষালাভার্থ বোম্বাই নগরে আগমন করেন এবং ষোল বৎসর বয়সে বোম্বাই এর প্রসিদ্ধ এলফিনষ্টোন কলেজে (Elphinstone College) শিক্ষালাভার্থ প্রবেশ করেন। চারি বৎসর পরে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে, কোনও সূত্রে তিনি চীনদেশে গমন করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অনেক ভাগ্য বিপর্য্যয় ও সংগ্রামের পর ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে অপেক্ষাকৃত শৃঙ্খলতার সহিত ব্যবসায় পরিচালনা করিতে সমর্থ হন। ক্রমে ব্যবসায় বিস্তৃতির সহিত জাপান ও চীনদেশের নানা স্থানে উহার শাখা স্থাপিত হয়। পরে ইয়োরোপের প্যারী নগরীতে এবং আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক নগরীতেও উহার শাখা স্থাপিত হইয়াছিল।

চীনদেশ হইতে ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দেই তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। উহার দুই বৎসর পরে প্রসিদ্ধ দানবীর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদকে অংশী করিয়া একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে গমন করেন; কিন্তু বোম্বাই এর ব্যবসায়ে বিশেষ ক্ষতি হওয়ায় ঐ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। দুই বৎসর পরে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অতঃপর আবিসিনায় যুদ্ধে ঠিকাদারের কাজ করিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করেন। কিছুকাল বোম্বাই নগরীর এক প্রান্তস্থিত ব্যাক বে (Back Bay) নামক জলা-স্থানটির উন্নতির জন্য ঠিকা (Contract) গ্রহণ করেন; তৎপূর্ব্বে আরও অনেকে ঐরূপ ঠিকা গ্রহণ করিয়া প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বোম্বাই সরকার প্রথমে তাঁহাকে কাজ দিতে সম্মত হন নাই। কিন্তু টাটা মহাশয় সমস্ত ক্ষতির দায়ীত্ব স্বয়ং গ্রহণ করিয়া ঐ কাজ আরম্ভ করেন এবং প্রচুর অর্থ লাভ করেন। এইরূপে অর্থ লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যবসায়ও বিস্তৃত করেন। তৈলের কল, কাপড়ের কল প্রভৃতি স্থাপন করিয়া নূতন ভাবে অর্থাগমের পথ প্রস্তুত করেন।

১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে তিনি পুনরায় বিলাত গমন করেন। ল্যাঙ্কাশায়ারে সুতা ও কাপড়ের কলসমূহের অবস্থা ও কার্য্য প্রণালী পরিদর্শনই ঐবার ইংলণ্ড গমনের উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে কুর্ভিলা নামক স্থানে আর একটী মিল স্থাপন করেন। এদেশে সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র বয়নোপযোগী কার্পাস তুলার চাষের তিনি পথপ্রদর্শক ছিলেন। মিশরের সূক্ষ্ম তন্তুময় তুলার চাষের জন্য তিনি মহীশূরে বিস্তৃত ভূখণ্ড আবাদ করেন। তাঁহারই ব্যবস্থা মত চাষ করিয়া সুফল পাওয়া যায়।

ভারতীয় তুলা যাহাতে সস্তায় বিদেশে, প্রধানতঃ জাপানে রপ্তানী হইতে পারে তজ্জন্য তিনি, ইয়োরোপীয় জাহাজ কোম্পানীর অন্যায় প্রতিযোগীতার হাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য, জাপানী কোম্পানীকে জাহাজ চালাইবার জন্য আহ্বান করেন এবং তদুপলক্ষে যে ক্ষতি হইবে তাহা পূরণ করিতে প্রতিশ্রুতি দেন। ফলে প্রবল প্রতিযোগীতা আরম্ভ হইল। টাটা মহাশয়ের প্রভাবে বোম্বাইর সূতা ব্যবসায়ীগণ কম ভাড়াতেও ইংরেজ কোম্পানীর জাহাজে মাল পাঠাইতে সম্মত হইল না। এই বিষয় লইয়া যুগপৎ ইংলণ্ড ও জাপানে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং বৎসরাধিককাল প্রবল প্রতিযোগীতার পর এক মীমাংসা উপস্থিত হইল।

ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে যাহাতে পাশ্চাত্য দেশের মত সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইতে পারে, তদ্বিষয়েও তিনি বিশেষ গবেষণা করেন এবং তাহারই সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ ও গভীর চিন্তা প্রসূত কার্য্য প্রণালী ক্রমে সকল কাপড়ের কলের মালিকই গ্রহণ করেন। মহীশূরে জাপানী ধরণের সূক্ষ্ম রেশমের চাষও তিনি প্রবর্ত্তন করেন।

ভারতের খনিজ সম্পদকে কার্য্যকরী করিবার জন্য তিনি বিশেষ পরিশ্রম করেন এবং সাহস করিয়া অনেক স্থানে খনি ইজারা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। বর্ত্তমানে ছোটনাগপুরের জামসেদপুর নামক স্থানে যে দেশবিখ্যাত লৌহের কারখানা অবস্থিত তাহারও গোড়া পত্তন তিনিই করিয়া যান। তাহার নামেই জামসেদপুর নগর পরিচিত। (উহার পূর্ব্ব নাম ছিল সাকচী)। ভারতের জলশক্তির (Water Power) অপব্যয় নিবারণের জন্যও তিনি চিন্তা করিতেন এবং এবিষয়ে সামান্য কিছু কাজও আরম্ভ করিয়াছিলেন।

বোম্বাই নগরীর প্রসিদ্ধ তাজমহল হোটেল ভারতীয়দের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। উহাও টাটা মহাশয়ের অবদান। বোম্বাইএর সন্নিকটস্থ অনেক অস্বাস্থ্যকর স্থানকে স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত করিয়াও

তিনি জনহিতকর কার্য্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করেন।

মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত বাঙ্গালোর নগরে উচ্চ ধরণের বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য তিনি এক বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং উহার সর্ব্বকালীন ব্যয়াদি নির্ব্বাহার্থ প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা দান করেন। বহু গরীব ছাত্রকেও তিনি শিক্ষালাভের জন্য উদার ভাবে অর্থ সাহায্য করিতেন এবং গরীব পার্শী ছাত্রদের সাহায্যের জন্য একটি ধন-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি কোনও দিন সভা সমিতির সহিত যুক্ত থাকিয়া দেশের কাজ করিবার জন্য ব্যস্ততা প্রদর্শন করেন নাই, কিন্তু বহু প্রবীণ রাজনীতিক নেতা তাঁহার পরামর্শ ও উপদেশ মত কাজ করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। অর্থনীতিতে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল; শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির দ্বারা ভারতের ধনাগমের নূতনতর পথ উন্মুক্ত না করিতে পারিলে, ভারত জগতের মধ্যে যোগ্য স্থান লাভ করিতে পারিবে না, ইহা তিনি যেন দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেন এবং সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্ব্ব প্রকারে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার কার্য্য প্রণালীর মধ্যে কোনওরূপ ভাব প্রবণতা ছিল না। বরঞ্চ কৃতকর্ম্মতা (Practicality) এবং সাহসিকতা (Adventure) তাঁহার সমস্ত প্রচেষ্টাকে সফল করিয়া তুলিয়াছিল।

তিনি বহু সৎকার্য্যে দান করিতেন কিন্তু কখনও দাতা বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিতেন না। বক্তৃতা দ্বারা লোককে কর্ম্মশীল করিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা কাজ করিবার, অর্থ উপার্জ্জন করিবার পথ প্রদর্শন করাই তিনি শ্রেষ্ঠ উপায় মনে করিতেন এবং সমগ্র জীবন এই উপায়ে বহু লোকের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। অলস কর্ম্ম বিমুখ ব্যক্তিদের প্রতি তাঁহার প্রবল ঘৃণা ছিল। 'কর্ম্মই ধর্ম্ম' ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র

ব্যবসায় উপলক্ষে একাধিকবার পাশ্চাত্য জগতের বহুস্থানে গমন করিতে হইয়াছিল, কিন্তু নিজ জীবনে তিনি কখনও বিলাসিতার প্রশ্রয় দেন নাই। অতি সাধারণ নাগরিকের ন্যায় চালচলন ও বেশভূষা তাঁহার ছিল. ভারতীয় আচার ব্যবহার, আদব কায়দা তিনি বরাবরই পালন করিয়া আসিয়াছেন। ভারতের আধুনিক অবস্থার উপযোগী গুণাবলীর একত্র সমাবেশ তাঁহার জীবনে যত অধিক দৃষ্ট হয়, এরূপ আর খুব কম ব্যক্তির চরিত্রে দেখা যায়। স্বশক্তিতে বিশ্বাস, ভারতবাসীর শক্তিতে বিশ্বাস, স্বদেশের ভবিষ্যৎ উন্নতিতে বিশ্বাস এবং শিক্ষাই যে সর্ব্বপ্রকার উন্নতির একমাত্র উপায় এই বিশ্বাস—এই চারিটি বিষয়ই

তাঁহার সমুদয় কার্য্যাবলীর একমাত্র নিয়ামক ছিল।

১৩১১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৯০৪ খ্রীঃ ১৯শে মে) জার্ম্মনির অন্তর্গত এক স্বাস্থ্য নিবাসে এই কর্ম্মবীরের জীবনান্ত হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার দুই পুত্র বর্ত্তমান ছিলেন।

জামালউদ্দিন হোশেন আঞ্জ—তাঁহার পিতার নাম ফকরউদ্দিন কাশ্মীরী। তিনি সিরাজ নগরের সৈয়দ বংশ সম্ভূত। ১৫৮৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। সম্রাট আকবর তাঁহাকে তিন হাজারী মনসবদারী পদ প্রদান করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে তিনি চারি হাজারী মনসবদারী ও আজাদউদ্দৌলা উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি প্রসিদ্ধ 'ফরাঙ্গ জাহাঙ্গীরী' নামক ফারসী অভিধান সঙ্কলন করিয়া ১৬০৫ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামে উৎসর্গ করেন।

জামাল খাঁ—শ্রীহট্টের অন্তর্গত ইটার স্বাধীন ব্রাহ্মণ রাজা সুবিদনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র সূর্য্যনারায়ণ মুসলমান হওয়ার পর তাঁহার নাম জামাল খাঁ হইয়াছিল। সূর্য্যনারায়ণ দেখ।

জামাল খাঁ পন্নি—'পাদশাহ নামা'র মতে তাঁহার নাম জামাল খাঁ পোনারী। স্বাধীন ত্রিপুরা অধিপতি উদয় মাণিক্যের সময়ে চট্টগ্রাম মুঘলদিগের হস্তগত হইলে, সেই অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি রাজা বলদেবের সহিত কামরূপে একবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

জামির—সৈয়দ হিদায়ত আলী খাঁর কবিজন সুলভ নাম। তিনি বঙ্গের নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর (১৭৪০—১৭৫৬ খ্রীঃ) আত্মীয় ছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল নাসিরউদ্দৌলা বক্‌সি উল মুল্‌ক আসাদ জঙ্গ বাহাদুর। তিনি কিছুকাল পাটনার সুবেদার ছিলেন। সম্রাট শাহ আলমের রাজত্বের প্রারম্ভেই তিনি পরলোক গমন করেন।

জামিরী, মৌলানা—শেখ নিজামের কবিজন সুলভ নাম। তিনি বেলগ্রামের অধিবাসী ও শেখ সুলেমানের ভাগিনেয় ছিলেন। সম্রাট হুমায়ুন তাঁহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। তিনি একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। ১৫৯৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

জাম্পু থাপ্পা—একজন নেপাল রাজের বিশিষ্ট সেনাপতি। ১৮১৪—১৮১৫ খ্রীঃ অব্দের নেপাল যুদ্ধে তিনি বিশেষ কৃতীত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

জালালউদ্দিন খাঁ—বিহার প্রদেশের দড়িয়া লোহানীর পুত্র পার খাঁ বিহার প্রদেশ অধিকার করিয়া সুলতান মামুদ উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় স্বাধীন রাজা হইলেন। এই সুলতান মামুদের পুত্র জালালউদ্দিন খাঁ। শূরবংশীয় ফরিদ এই মামুদ খাঁরই অধীনে

কর্ম্ম করিতেন এবং একদা একটী বৃহদাকার ব্যাঘ্র শিকার করিয়া তাঁহার নিকট শের খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। শের খাঁ, সুলতান মামুদের পুত্র জালালউদ্দিন খাঁর শিক্ষকও ছিলেন। সুলতান মামুদের মৃত্যুর পরে অপ্রাপ্ত বয়স্ক জালাল সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার মাতা সুলতানা দুদু তাঁহার নামে রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। অল্পদিন মধ্যে তিনিও গতাসু হইলেন। শের খাঁ এই সুযোগে জালালউদ্দিনকে তাড়াইয়া বিহার অধিকার করিলেন। জালালউদ্দিন পলায়ন পূর্ব্বক বাঙ্গালার নবাব মামুদ শাহের (২য়—১৫৩৩—৩৯ খ্রীঃ) আশ্রয় গ্রহণ করিলেন শের খাঁ বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিয়া মামুদ শাহ (২য়) ও তাঁহার আশ্রিত জালালউদ্দিন খাঁ উভয়কে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিলেন।

জালালউদ্দিন খাঁ শুর—তিনি দিল্লীর সম্রাট শেরশাহ শুরের পুত্র। ১৫৪৫ খ্রীঃ অব্দে শেরশাহের মৃত্যুর পরে তিনি রাজা হন। তিনি অতি অকর্ম্মণ্য নরপতি ছিলেন। তিনি সেলিম শাহ বা ইসলাম শাহ নামে খ্যাত ছিলেন। নয় বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি পরলোক গমন করিলে, তাঁহার অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র ফিরোজ শাহ রাজা হইয়াছিলেন।

জালালউদ্দিন খিলিজী—তিনি ভারতের খিলিজী বংশীয় নরপতিদের মধ্যে প্রথম সম্রাট। তাঁহাদের আদি পুরুষ কালিজ খাঁ, চেঙ্গিস খাঁর ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মালেক দিল্লির সম্রাট গিয়াসউদ্দিনের রাজত্ব কালে ভারতবর্ষে আগমন-পূর্ব্বক উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি সম্রাট কৈকুবাদের সময়ে সামনার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কৈকুবাদের দুষ্ট মন্ত্রী নিজাম উদ্দিন অন্যান্য অমাত্যবর্গ কর্ত্তৃক নিহত হইলে, জালাল উদ্দিন খিলিজা সম্প্রদায়ক্রমে মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন। তিনি অকর্ম্মণ্য পীড়িত সম্রাট কৈকুবাদকে সংহার করিয়া সিংহাসন লাভ করেন। (১২৯০ খ্রীঃ)।

এ পর্য্যন্ত তুর্কিবংশীয়েরা দিল্লিতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখন একটি নূতন বংশ দিল্লির সিংহাসন অধিকার করায় তুর্কিরা খুব অসন্তুষ্ট হইলেন। এই জন্য জালাল উদ্দিন দিল্লীতে রাজধানী স্থাপন না করিয়া কিলুঘরি নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন।

তাহার রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে সম্রাট গিয়াসউদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র মালিক খাজু দিল্লির সিংহাসন লাভের প্রয়াসী হন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হন। সম্রাট জালাল উদ্দিনের সম্মুখে উপস্থিত করিলে, তিনি বিদ্রোহীদের সকলকেই ক্ষমা করিলেন। খিলিজী সর্দ্দারগণ সম্রাটের এতটা সদ্ব্যবহার একবারেই ভাল মনে করিলেন না। সম্রাট বলিতেন

'ক্ষমা প্রদর্শনই শত্রুকে বশীভূত করিবার প্রকৃষ্ট উপায়'। কিন্তু অতিরিক্ত ক্ষমা প্রদর্শনে রাজদণ্ডভীতি দূর হইয়া যায়। কতিপয় প্রধান প্রধান ওমরাহ সম্রাট জালাল উদ্দিনকে হত্যা করিয়া তাজ-উদ্দিন কুচি নামক একজন প্রধান সেনা-পতিকে রাজপদ প্রদান করিতে অভি-লাষী হইলেন। তাঁহারা তাজউদ্দিন কুচির আত্মীয় ছিলেন। একদিন তাজ-উদ্দিনের গৃহে সঙ্কল্প সিদ্ধির মন্ত্রণা করি-বার জন্য তাঁহারা মিলিত হইয়া সুরা-পানে মত্ত হইয়া সমস্ত গোপন মন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া দেন। এই সভায় সম্রাটের হিতাকাঙ্খী এক ব্যক্তি উপ-স্থিত ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এই বিষয় সম্রাটকে জ্ঞাপন করেন; সম্রাট অনতিবিলম্বে তাঁহাদিগকে ধৃত করি-বার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তাঁহারা ধৃত হইয়া সম্রাটের সমীপে নীত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে অতিশয় ভৎর্সনা করেন। তন্মধ্যে মালিক নশরৎ নামক এক ব্যক্তি বলি-লেন—'মদ্যপের বাক্য বায়ুর ন্যায় অসার; জাঁহাপানার অভাবে এইরূপ সদাশয় মহদন্তঃকরণের নরপতি কোথায় পাইব?' সম্রাট তাঁহার কথা শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। তৎপরে সকলকে সতর্ক করিয়া ও অপরাধ মার্জনা করিয়া বিদায় দিলেন।

একবার এক হাজার ঠগ ধৃত হইয়া বিচারার্থ তাঁহার নিকট আনিত হয়। তিনি তাঁহাদিগকে কোন প্রকার শাস্তি না দিয়া নৌকাযোগে বাঙ্গালা দেশে পাঠাইয়া দেন।

তাঁহার জীবনে একটি মাত্র লোককে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। সিদিমোল্লা নামক একজন মুসলমান দরবেশের আচরণ অতিশয় অদ্ভুত রকমের ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি সুলতানের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। এই সকল কারণে হস্তীর পদতলে নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাকে নিষ্পিত করেন।

আলাউদ্দিন, সুলতান জালাল-উদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা ছিলেন। তাঁহাকে তিনি কাড়া প্রদেশের শাসন কর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। ক্রমান্বয়ে কয়েকটি যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া আলা-উদ্দিন সিংহাসন লাভের প্রয়াসী হন কিন্তু তখন তাঁহার প্রচুর অর্থবল না থাকায়, অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। প্রথমেই তিনি দেবগিরির (বর্ত্তমান দৌলতাবাদ) রাজা রামচন্দ্রকে আক্র-মণ করেন এবং পরাজিত করিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করেন। এই অভিযানের সংবাদ শুনিয়া সম্রাট জালালউদ্দিন অতিশয় সন্তুষ্ট হন।

আলাউদ্দিন স্বীয় জায়গীর কাড়া প্রদেশে আগমন করিয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠতাত জালালউদ্দিনকে কাড়ায় পদার্পন

করিতে সাদরে আমন্ত্রণ করিলেন। জালালউদ্দিন যেমন অগ্রসর হইয়া জামাতাকে আলিঙ্গন করিলেন, জামাতা ও তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া ক্ষমা চাহিলেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার ইঙ্গিতে জালালউদ্দিন ছিন্নশির হইলেন। জালালউদ্দিনের মৃত্যু সময়ে জেষ্ঠ রাজ কুমার আরকিলি মুলতানে ছিলেন। রাজ মহিষী পতিহত্যার বিবরণ শুনা মাত্র তাড়াতাড়ী কনিষ্ঠ পুত্র রুকনউদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। কিন্তু আলাউদ্দিন রাজকুমারদিগকে অচিরে বধ করিয়া নিষ্কণ্টক হইলেন।

জালালউদ্দিন মসুদ জানি— সম্রাট নাশিরউদ্দিনের রাজ্য লাভের পূর্ব্বেই বাঙ্গালা দেশ একরকম স্বাধীন হইয়াছিল। লক্ষণাবতীর শাসনকর্ত্তা ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন বা মুগিসউদ্দিন উজবেগ (১২৪৬—৫৭ খ্রীঃ) আসাম দেশ জয় করিতে গিয়া তথায় নিহত হন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া দিল্লীর সম্রাট নাশির উদ্দিন (১২৪৬—১২৬৫ খ্রীঃ) জালালউদ্দিন মসুদ জানিকে ১২৫৮ সালে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান। তিনি মাত্র এক বৎসর রাজত্ব করিয়া পদচ্যুত হন। তৎপরে তাজউদ্দিন আর্সালান খাঁ বাঙ্গালার নবাব হন।

জালালউদ্দিন মুলতানী কাজী— সম্রাট আকবর শাহের সভায় তিনি একজন বিদ্বান্ মৌলবী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার জন্ম মুলতানে ছিল। সম্রাট আকবর শাহ যে নূতন ধর্ম্ম মত প্রচার করেন, তিনি তাঁহার অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁহার ঘোষণা পত্রে সাক্ষরও করেন।

জালালউদ্দিন মোহাম্মদ শাহ— তিনি ভাতুরিয়ার ব্রাহ্মণ-বংশীয় রাজা গণেশের পুত্র। কিন্তু হামিল্‌টন সাহেবের মতে তিনি দিনাজপুরের কায়স্থ বংশীয় রাজা গণেশের পুত্র। বঙ্গের স্বাধীন মুসলমান নরপতি সাহাবউদ্দিন বায়জিদ শাহের মৃত্যুর পরে (১৪০৯—১৪১৪) তিনি বাঙ্গালার নবাব হইয়াছিলেন এবং ১৪১৪—১৪৩১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার পূর্ব্ব নাম ছিল যদু, মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জালালউদ্দিন (ধর্ম্ম রক্ষক) এই নাম গ্রহণ করেন। কথিত আছে নুর কুতবউল আলম নামক একজন প্রসিদ্ধ দরবেশের নিকট তিনি দীক্ষিত হন। তিনি পাণ্ডুয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক গৌর নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি অতিশয় ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন। ষোড়শ বর্ষ রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র আহম্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৪৩১—৪২ খ্রীঃ)।

জালালউদ্দিন, শেখ—এই দরবেশের জন্মস্থান পারস্যের অন্তর্গত তবরেজ

নগর। তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। রাজা লক্ষ্মণ সেন তাঁহার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বাইশ হাজার বিঘা ভূমি নিষ্কর মালদহ জিলায় প্রদান করেন। এই নিষ্কর পীরপাল ভূমি এখনও মালদহ জিলায় বর্ত্তমান আছে। এই সাধুরই বিবরণ লইয়া 'শেখ শুভোদয়া' গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

জালাল বোখারী সৈয়দ—তিনি সৈয়দ আহম্মদ কবিরের বংশধর ও সৈয়দ মোহাম্মদ বোখারার পুত্র। ১৫৯৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি দিল্লীর সম্রাট শাহজাহানের অতি প্রিয় পাত্র ছিলেন। শাহজাহান তাঁহাকে ছয় হাজারী মনসবদারী ও রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান বিচারপতির পদ প্রদান করেন। তিনি একজন কবিও ছিলেন। ১৬৪৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার অন্যতম পুত্র সৈয়দ মুসা তাঁহার উপাধি ও পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

জালিম সিংহ— তিনি কোটার সামন্ত নরপতি হিমৎসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র। এই ঝালা সর্দ্দার হিমৎ সিংহ কোটার ফৌজদারও ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে জালিম সিংহ ফৌজদার বা সেনাপতি হইয়াছিলেন। তিনি ১৭৪০ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কোটার অধিপতি দুর্জ্জনশাল অপুত্রক ছিলেন। তিনি অন্তার সামন্ত নরপতি অজিত সিংহকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। অজিতের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চত্তরশাল কোটার অধিপতি হইলেন এবং জালিম সিংহ তাঁহার সেনাপতি ও মন্ত্রী হইলেন। এই সুবিখ্যাত রাজপুত সেনাপতি ভারতের মেকিয়াবেল, তাঁহার জীবনী লইয়াই কোটা রাজ্যের ইতিহাস উজ্জ্বল হইয়াছে।

এই সময়ে মধুসিংহ অম্বরের (জয়পুরের) সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন। তিনি কোটার উপর আধিপত্য করিতে প্রয়াসী হন। মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরবকালে কোটা ও বুন্দির অধিপতিগণ অম্বরের অধিপতির অধীনে যুদ্ধক্ষেত্রে রাজাজ্ঞা বহন করিতেন। মধুসিংহ আজ সেই কর্ত্তৃত্ব চত্তরশালের উপর স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইলেন। বিপুল সৈন্য বাহিনী লইয়া তিনি কোটা রাজ্য আক্রমণ করিলেন। প্রথমে কয়েকটী দুর্গ অধিকার করিয়া তিনি খুব উল্লসিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরিণামে জালিম সিংহের বীরত্বের নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন। এই যুদ্ধ জয়ের অল্পকাল পরেই অপুত্রক চত্তরশাল পরলোক গমন করিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা গোমান সিংহ কোটার রাজা হইলেন (১৭৬৬ খ্রীঃ)। তিনি বিচক্ষণ নরপতি হইলেও জালিম সিংহের বীরত্বে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার ভূমিবৃত্তি কাড়িয়া লইলেন

জালিম সিংহের বীরত্বের কাহিনী তখন রাজপুতানার সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিনি অনন্যোপায় হইয়া উদয়পুরের রাণা অরি সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই স্থানে তিনি রাণার অনুরোধে দৈলবারা সর্দ্দারের প্রভুত্ব খর্ব্ব করেন। এই সময়ে মহারাট্টাদের সহিত রাণার তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। রাণা ভীষণরূপে পরাজিত হন। জালিম সিংহ বন্দী হইয়া ত্র্যম্বকজী নামক এক মহারাট্টা সেনাপতির অধীন হন। ত্রম্বাকজী তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। যুদ্ধের পরে জালিম সিংহ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জালিম সিংহ প্রথমেই রাও গোমান সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন কিন্তু তিনি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। জালিম ইহাতে নিরোদ্যম না হইয়া সুসময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে মহারাট্টারা ক্রমে ক্রমে দেশ জয় করিয়া কোটার নিকটবর্ত্তী হইলেন। গোমান সিংহ তখন জালিম সিংহকে স্মরণ করিলেন। জালিম মহারাট্টাদেরে চারিলক্ষ টাকা দিয়া গোমান সিংহের সহিত সন্ধি স্থাপন করাইয়া দিলেন।

গোমান সিংহ ১৭৭১ খ্রীঃ অব্দে দশম বর্ষীয় পুত্র উমেদ সিংহকে জালিম সিংহের হস্তে সমর্পণ করিয়া পরলোকবাসী হইলেন। জালিম সিংহ কৈলবারা জয় করিয়া নবীন রাজার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। সকলের মনে আশার সঞ্চার হইল। এই সময়ে দেওয়ানী কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বৃদ্ধ অখিরাম কতকগুলি কূট মন্ত্রণা বিশারদ লোককর্ত্তৃক নিহত হইলে, রাজ্যের ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় বিধ কার্য্যই তাঁহার হস্তে পতিত হইল।

সর্ব্বত্র দেখা যায় ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি লোক শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। জালিম সিংহের জীবনেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁহার ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই একটী ষড়যন্ত্রী দল, তাঁহার বিরুদ্ধে গঠিত হইল। এই দলে মহারাজ গোমান সিংহের ভ্রাতা স্বরূপ সিংহ, ব্যাঙ্করোট সর্দ্দার, রাজকুমারের ধাই ভাই যশকর্ণ প্রভৃতি ছিলেন। অচিরে এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল, স্বরূপ সিংহ স্বীয় বন্ধু যশকর্ণ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। যশকর্ণ এই অপরাধে নির্ব্বাসিত হইলেন। ব্যাঙ্করোট সর্দ্দার ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীরা রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন।

দ্বিতীয় ষড়যন্ত্রের অধিনায়ক ছিলেন আথুনের দেবীসিংহ। মুষা নামক দস্যুপতি দ্বারা জালিম সিংহ তাঁহাকে পরাস্ত ও নির্ব্বাসিত করেন। তৃতীয় ষড়যন্ত্র দলের নায়ক ছিলেন মোশাই নগরের বাহাদুর সিংহ প্রভৃতি। তাঁহারাও পরাস্ত হইয়া বিদেশে বিতাড়িত হন।

কথিত আছে তাঁহার বিরুদ্ধে আঠারটী ষড়যন্ত্র অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধি কৌশলে তিনি সকলই ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

জালিম সিংহ রাজনীতি শাস্ত্রেও বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে কর্ণেল মনসন বিচক্ষণ শক্তিশালী একদল সৈন্য লইয়া হোলকারকে আক্রমণ করেন কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে কোটার রাজ প্রতিনিধি জালিম সিংহ মনসনকে যথেষ্ট সাহায্য করেন. ইহার ফলে যশোবন্ত রাও হোলকার তাঁহার প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া কোটা আক্রমণ করেন তিন লক্ষ টাকা দিয়া জালিম সিংহ তাঁহার সহিত সন্ধি করেন। পিণ্ডারী সর্দ্দার আমীর খাঁকে ও করিম খাঁকে বিপদের সময়ে অর্থ সাহায্য করিয়া, তিনি বশীভূত করিয়াছিলেন। বিচক্ষণ রাজনীতিবিৎ জালিম সিংহ অন্য রাজ্য হইতে বিতাড়িত সর্দ্দারদিগকে অতি সমাদরের সহিত গ্রহণ করিতেন এবং অনেক সময়ে তাঁহাদের পূর্ব্ব স্বামীর সহিত মিলন করাইয়া দিতেন। কোটার রাজা বৃদ্ধ বয়োজ্যেষ্ঠ মন্ত্রী জালিম সিংহকে যথেষ্ট মান্য করিতেন। এদিকে মন্ত্রী জালিম সিংহও রাজাকে অতিক্রম করিয়া কখনও কোন আদেশ প্রচার করিতেন না। রাজা উমেদ সিংহ মন্ত্রীর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে একটী বিশেষ আয়ের জায়গীর দিতে চাহিলেন। প্রথমে জালিম সিংহ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াও রাজার অনুরোধে তাহা গ্রহণ না করিয়া পারেন নাই।

ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট পিণ্ডারী দমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া রাজপুতানার রাজন্যবর্গের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। সর্ব্বপ্রথমেই কোটার অধিপতি উমেদ সিংহ সম্মতি জানাইয়া ইংরেজ পক্ষ অবলম্বন করেন।

১৮১৯ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে কোটারাজ উমেদ সিংহ কিশোর সিংহ, বিষণ সিংহ ও পৃথ্বী সিংহ নামক তিন পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পরে কিশোর সিংহ রাজা হইলেন। জালিম সিংহের মধুসিংহ ও গরধন নামে দুই পুত্র ছিল। তাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। এজন্য রাজ্যে কিছুদিন গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু মন্ত্রী জালিমের বুদ্ধি কৌশলে গরধন দিল্লীতে নির্ব্বাসিত হইলেন। ইহার কিছুকাল পরে রাজা কিশোর সিংহ ও মন্ত্রী পুত্র মধু সিংহের মধ্যে বিরোধ জন্মিয়া ছিল। জালিম সিংহের অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলে শত্রুতা বন্ধুতায় পরিণত হইয়াছিল।

রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি বিধান করিয়া ৮০ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ কাবুলী—তাঁহার পূর্ব্ব নাম লালা বেগ। তাঁহার পিতা মিরজা হাকিমের ভৃত্য ছিলেন। মিরজা হাকিমের মৃত্যুর পরে সম্রাট আকবর শাহের রাজত্বকালে তিনি রাজ সংসারে প্রবেশ করেন। আকবর শাহ তাঁহাকে রাজকুমার জাহাঙ্গীরকে প্রদান করেন। লালা বেগ খুব বলিষ্ঠ ছিলেন। তিনি মুসলমান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও শাসন কার্য্যে দৃঢ় চিত্ত ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক পূর্ব্ব বিহারের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন এবং জাহাঙ্গীর খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সময়ে তিনি গোরক্ষপুরের রাজা শঙ্কররামকে নিষ্ঠুর রূপে হত্যা করেন। তাঁহার নিষ্ঠুর আচরণে বিহারবাসীরা অতিশয় জ্বালাতন হইয়াছিল। ১৬০৭ খ্রীঃ অব্দে কুতবউদ্দিনের মৃত্যুর পরে তিনি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু অচিরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তৎপরে ইসলাম খাঁ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইলেন।

জাহাঙ্গীর শাহ—ভারতের মুঘল রাজবংশের চতুর্থ সম্রাট। ১৫৬৯ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে সম্রাট আকবরের কয়েকটি পুত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া অকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায়, সম্রাট আকবর বিশেষ দুঃখিত ছিলেন। তিনি মনোদুঃখ লাঘব করিবার জন্য আজমীরের প্রসিদ্ধ মুসলিম সাধক শেখ সেলিম চিস্তির সমীপে গমনাগমন করিতেন। শৈশবে জাহাঙ্গীরের নাম ছিল মুহম্মদ সুলতান সেলিম। কিন্তু সম্রাট আকবর তাঁহাকে 'শেখ বাবা' বলিয়াই সম্বোধন করিতেন। পুত্রের শিক্ষা দীক্ষার প্রতি সম্রাট আকবরের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। রাজকুমার সেলিম, প্রধানতঃ যাঁহাদের নিকট নানা বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মৌলানা মীর কালন হারবী; শেখ আহমদ; কুতবউদ্দিন মুহম্মদ খাঁ আতগা এবং আবদর রহিম খাঁ প্রধান। তাঁহাদের শিক্ষা নৈপুণ্যে কুমার সেলিম পদমর্য্যাদোচিত নানা বিষয়ে পারদর্শী হন। ফারসী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার জন্মে। তদ্ভিন্ন তুর্ক ও হিন্দি ভাষাও তিনি আয়ত্ব করেন। তাঁহার হস্তাক্ষরও অতিশয় সুন্দর ছিল। বৈজ্ঞানিক নানা বিষয়েও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। চিত্রাঙ্কনও তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। খ্যাতনামা চিত্রকরদের অঙ্কিত চিত্রাবলী দেখিয়া তাহাদের দোষগুণ তিনি সহজেই বিচার করিতে পারিতেন। তাঁহার দেহ সবল ও আকৃতি প্রিয়দর্শন ছিল। পুরুষোচিত নানারূপ ব্যায়ামেও তাঁহার অধিকার ছিল। তিনি একজন দক্ষ শিকারীও ছিলেন। পিতা সম্রাট আকবর তাঁহাকে অতি অল্প বয়স হইতেই প্রসিদ্ধ সেনা-

পণ্ডিতদের সহিত বিভিন্ন অভিযানে প্রেরণ করিয়া রাজনীতি যুদ্ধ কৌশল প্রভৃতিও শিক্ষা দিয়াছিলেন।

যাহাতে তাঁহার মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া বিবাদ না ঘটে তজ্জন্য সম্রাট আকবর, কুমার সেলিমের বাল্যকালেই তাঁহাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া তদুপযুক্ত সম্মানাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি কুমারকে যথাসম্ভব নিজের সঙ্গে রাখিয়া রাজনীতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দে আকবরের আদেশে কুমার সেলিম মেবারের রাণার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। কিন্তু তিনি ঐ সময়ে দুষ্টবুদ্ধি লোকের পরামর্শে, পিতার নির্দ্দেশমত কাজে মনোযোগ না দিয়া, স্বাধীনভাবে চলিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। উহার কিছুকাল পরেই তিনি অর্থ ও জনবল সংগ্রহ করিয়া আগ্রা অধিকার করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। সম্রাট আকবর তখন দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। আগ্রা রক্ষার ভার তখন সেনাপতি কিলিচ খাঁর উপরে ছিল। তাঁহার কৌশলে সেলিম বিশেষ প্রচেষ্টা না করিয়াই এলাহাবাদ অভিমুখে প্রস্থান করেন। তথায় তিনি নিজেকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া সেই মত চলিতে লাগিলেন। দাক্ষিণাত্যে আকবর সেই সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া পত্র প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। ১৬০১ খ্রীঃ অব্দের মধ্যভাগে সম্রাট আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কুমার সেলিমও বহু সৈন্য সামন্তসহ আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যদিও তিনি প্রচার করিলেন যে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়াই তাঁহার ঐ অভিযানের উদ্দেশ্য, সম্রাট আকবর তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং সেলিম প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া এলাহাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তথায় তিনি পুনরায় স্বাধীন রাজার ন্যায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। সম্রাট আকবর অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু ও উপদেশক আবুল ফজলকে দাক্ষিণাত্য হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এই সংবাদ কুমার সেলিমের নিকট পৌঁছিলে তিনিও উদ্বিগ্ন হইলেন এবং চক্রান্ত করিয়া বুন্দেল নরপতি বীর সিংহেরদ্বারা আবুল ফজলকে হত্যা করাইলেন। এই নৃশংস ঘটনায় সম্রাট শোকে অভিভূত ও ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইলেও, পুরঙ্গনাদের মধ্যবর্ত্তীতায় কুমার সেলিম, কোনওরূপ নিগ্রহ ভোগ না করিয়াই নিস্তার লাভ করিলেন। কিছুকাল আগ্রায় থাকিবার পর সম্রাট পুনরায় তাঁহাকে (১৬০৩ খ্রীঃ) মেবারের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে বলিলেন। নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত

তিনি যাত্রা করিয়া ফতেপুর সিক্রী পর্য্যন্ত গমন করিলেন এবং নানা অজুহাতে তথায় বিলম্ব করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সম্রাটও বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এলাহাবাদে গমন করিতে অনুমতি দিলেন। ঐ বৎসরেই শেষভাগে সেলিম পুনরায় এলাহাবাদে উপস্থিত হইলেন এবং পূর্ব্বেরই ন্যায় ভোগ বিলাসে মত্ত হইলেন। এই সময়ে কতকগুলি লোক রাজকুমার খসরুর (সেলিমেরই জ্যেষ্ঠ পুত্র) পক্ষ অবলম্বন করিয়া, তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। সম্রাট আকবর তাহা বুঝিতে পারিয়া পুত্র সেলিমকে সৎপথে আনিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইলেন। এবং স্বয়ংই এলাহাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে তাঁহার এক নিকট আত্মীয়ের গুরুতর পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। উহার কিছুকাল পরে কুমার সেলিম স্বয়ংই রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে সম্রাট আকবরও তাঁহাকে যথাসাধ্য কুসংসর্গ হইতে দূরে রাখিয়া তাঁহার কু-অভ্যাসগুলি দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এবারও অন্তঃপুরচারিণীদের মধ্যবর্ত্তীতায় তিনি আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারিলেন না। তাহার কিছুকাল পরেই সম্রাট আকবর গুরুতর পীড়িত হইয়া পড়েন এবং প্রায় দশ মাস রোগ ভোগ করিয়া ১৬০৫ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে পরলোক গমন করেন।

সম্রাট যখন মৃত্যু শয্যায় তখনই তাঁহার উত্তরাধিকারী কে হইবেন, তাহা লইয়া গোলোযোগ উপস্থিত হইল। মানসিংহ, খাঁ আজম, আজিজ খাঁ প্রমুখ অমাত্যগণ কুমার সেলিমের পুত্র খসরুর পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকেই সিংহাসনে স্থাপন করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু বার্হার প্রসিদ্ধ সৈয়দবংশীয় কয়েকজন প্রধান অমাত্যের বিরুদ্ধতায় মানসিংহ প্রমুখের চেষ্টা বিফল হয়। এই ষড়যন্ত্রের সময়ে সেলিম পিতার রোগশয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইতে সাহস পান নাই। চারিদিকের গোলমাল থামিয়া গেলে, তিনি সম্রাটের মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে মাত্র তথায় উপস্থিত হন। সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর, ছয়ত্রিশ বৎসর বয়সে জাহাঙ্গীর সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তদুপলক্ষে যথারীতি আনন্দোৎসব, অমাত্যদিগের পদোন্নতি, বন্দীর মুক্তি প্রদান ও অন্যান্য নানাবিধ রাজোচিত কাজ সম্পন্ন হয়। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি 'নুরুদ্দিন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর পাদশা গাজী' উপাধি গ্রহণ করিলেন।

এই ঘটনার এক বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরু দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ বন্ধুগণের পরামর্শে বিদ্রোহী হন। আগ্রা হইতে পলায়ন করিয়া তিনি

উত্তর পশ্চিমদিকে প্রস্থান করেন। সংবাদ পাইয়াই সম্রাট তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন এবং তাহাদের কিছু পরে নিজেও গমন করেন। পথমধ্যে লোকবল বৃদ্ধি ও লুণ্ঠনাদিদ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে করিতে খসরু লাহোরে উপস্থিত হইলেন। লাহোর অধিকার করিবার চেষ্টা বিফল হইলে তিনি পশ্চাদ্ধাবিত রাজসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু ভৈরোয়াল রণক্ষেত্রের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কাবুল অভিমুখে পলায়ন করেন। এবং চন্দ্রভাগা নদী অতিক্রম করিবার সময়ে ধৃত হইয়া লাহোরে সম্রাট সমীপে নীত হন। জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিবার আদেশ প্রদান করেন।

এক বৎসরের কিছু অধিক পরে সম্রাট কাবুলে গমন করেন। তাহার পূর্ব্বেই পারস্যরাজ শাহ আব্বাস মুঘল অধিকৃত কান্দাহার নগর আক্রমণ করেন। কিন্তু উহা অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়া সান্ধ স্থাপন করেন। কান্দাহার ও কাবুলে শান্তি স্থাপিত হইলে ১৬০৭ খ্রীঃ অব্দের মধ্যভাগে জাহাঙ্গীর কাবুলে উপস্থিত হন। কয়েক মাস তথায় অবস্থান করিয়া পুনরায় ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। ঐ সময়ে তিনি সংবাদ পান যে কুমার খসরু, দীর্ঘকাল বন্দী অবস্থায় থাকার পর কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা পাইয়াই পুনরায় বিদ্রোহী হইয়াছেন। এই বিদ্রোহ অবশ্য অতি অল্প চেষ্টায় দমিত হইল। কিন্তু খসরুর এই প্রকার বারংবার বিদ্রোহী হওয়ায় সম্রাট চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে বধ করিবার পরামর্শ দিলেন। পরিশেষে স্থির হইল যে তাঁহাকে অন্ধ করা হইবে। সেই মত ব্যবস্থা হইল। কিন্তু পরে চিকিৎসার ফলে খসরু একটি চক্ষুতে দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে কুতব নামে এক ব্যক্তি, নিজেকে খসরু বলিয়া পরিচয় দিয়া বিহারে বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করেন। আফজল খাঁ অতি সহজেই তাঁহাকে দমন করিয়া নিহত করেন।

১৬১১ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে সম্রাট জাহাঙ্গীর শের আফগান নামক এক পাঠানের বিধবা পত্নী মিহির উন্নিসাকে বিবাহ করেন। রাজ মহিষী হইবার পর তাঁহার নাম হয় নূরজাহান। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ও নানা বিষয়ে গুণশালিনী ছিলেন। ক্রমে ক্রমে সম্রাটের বিশেষ প্রিয়পাত্রী হইয়া তিনি অনেক রাজ ক্ষমতা নিজে গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ও ভ্রাতারা রাজকার্য্যে উচ্চ পদে নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেন (এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ নূরজাহান নামে দ্রষ্টব্য)। ঐ

সময়ে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর কে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবেন তাহা লইয়া বিশেষ গোলোযোগ উপস্থিত হয়। কুমার খসরু ও কুমার খুরম এই দুইজনের পক্ষ লইয়া দুইটি প্রবল দল সৃষ্ট হয় এবং তৎফলে বিশেষ অশান্তির উদ্ভব হয়। সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান প্রধানতঃ খুরমের পক্ষপাতিনী ছিলেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমভাগে কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি স্থানীয় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। বিকানীরে রায় রায়সিংহ, দলপৎসিংহ, বীরসিংহ বুন্দেলার ভ্রাতা রামচন্দ্র বুন্দেলা, বিহারের জনৈক জমিদার সংগ্রাম, কনৌজ ও কালপিতে কয়েকজন স্থানীয় জমিদার, গুজরাটে মুজফর নামক একজন ওমরা, কাটি ওয়াড়ের জয়পত্য নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা, এইরূপ আরও অনেক ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে বিদ্রোহী হন। এই সকল বিদ্রোহ অল্প আয়াসেই দমিত হয়। ১৬১৩ খ্রীঃ অব্দে পশ্চিম কূলবর্ত্তী পর্ত্তুগীজ বণিকেরা উৎপাত আরম্ভ করাতে, তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজ বণিকদিগের সাহায্যে তাহাদিগকে দমন করিতে হয়। বাঙ্গালা দেশে ইস্‌লাম খাঁ নামক প্রসিদ্ধ সেনাপতি শেষ পাঠান নরপতি ওসমানকে পরাস্ত ও নিহত করেন এবং আরাকানী মগদিগকেও দমন করিবার চেষ্টা করেন। সে চেষ্টা অবশ্য বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই। ঐ সময়ের মধ্যেই উত্তর পশ্চিম সীমান্তে এবং মুঘল শাসনাধীনে কাবুলেও বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ঐ বিদ্রোহের নায়কের নাম আহদাদ। ঐ বিদ্রোহ কয়েক বৎসর চলিয়াছিল। তদ্ভিন্ন উহারই নিকটবর্ত্তী বাঙ্গাশ নামক স্থানে বিদ্রোহ হয়। আহদাদ পরাজিত ও বিতাড়িত হইলেও বাঙ্গাশের বিদ্রোহ সহজে দমিত হয় নাই। বরঞ্চ ঐ স্থানে মুঘল প্রভুতা অনেকটা খর্ব্ব হয়।

সম্রাট আকবরের রাজত্বের শেষভাগে জাহাঙ্গীর (তখন রাজকুমার সলিম) রাজাদেশে মেবার আক্রমণ করেন। কিন্তু সেই অভিযানের বিশেষ ফল হয় নাই। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি আবার মেবারের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। রাণা প্রতাপসিংহের পুত্র রাণা অমরসিংহ সেই সময়ে মেবারের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, মুঘল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়া রাজ্যকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করেন। কিন্তু প্রধান প্রধান অমাত্যগণের বিরুদ্ধতায় তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। যুদ্ধ উপস্থিত হইল। দীর্ঘকাল ধরিয়া সংগ্রাম চলিতে থাকে। আসফ খাঁ জাফর বেগ, রাজা জগন্নাথ, মহাবৎ খাঁ, আবদুল্লা খাঁ, রাজা বাসু প্রভৃতি হিন্দু ও মুসলমান সেনাধ্যক্ষগণ ঐ যুদ্ধে ব্যাপৃত

হন। সম্রাট স্বয়ংও কিছুকাল আজমীরে যাইয়া অবস্থান পূর্ব্বক যুদ্ধ পরিচালনার সাহায্য করেন। রাজপুতেরা যথাশক্তি সংগ্রাম করিয়াও অর্থবল ও জনবলের অপ্রাচুর্য্য হেতু পরিশেষে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন. সন্ধি স্থাপিত হইলে মুঘল রাজবাহিনীসহ কুমার খসরু ও কুমার খুরম প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই আজমীরে অবস্থান করিবার সময়েই ইংরেজ দূত সার টমাস রো, (Sir Thomas Roe) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ হইতে বাণিজ্য বিষয়ক সন্ধি করিবার জন্য জাহাঙ্গীর সমীপে উপস্থিত হন (টমাস রো দেখ)।

দাক্ষিণাত্যে আহমদনগর, বিজাপুর প্রভৃতি পাঠান রাজ্যগুলির সহিত দিল্লীর মুঘল বাদশাহদের অনেকদিন হইতেই বিরোধ চলিতেছিল. জাহাঙ্গীরের পূর্ব্বে সম্রাট আকবরও দাক্ষিণাত্যে অভিযান করিয়াছিলেন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া জাহাঙ্গীরও দাক্ষিণাত্যে মুঘল প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে মনস্থ করেন। প্রথম কয়েক বৎসর অন্যান্য নানা বিষয়ে বিব্রত থাকায়, ঐ বিষয়ে অধিক মনোযোগ দিতে পারেন নাই। ১৬০৮ খ্রীঃ অব্দেই প্রকৃতপক্ষে, বিস্তৃত ভাবে দাক্ষিণাত্যে অভিযান আরম্ভ হয়। প্রথমে খাঁন খানা ঐ অভিযানের নেতৃত্ব লাভ করেন। পরে ক্রমে বহু প্রধান প্রধান সেনাপতি ও ওমরওরা দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ পরিচালনা করিবার ভার প্রাপ্ত হন। রাজকুমার খসরু ও খুরম বহুকাল অন্যান্য সেনাপতিদের সহিত একত্র হইয়া ঐ যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরও কিছুকাল আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া মাণ্ডুতে বাস করেন। অনেক বৎসর ধরিয়া এই সংগ্রাম চলিয়াছিল। প্রথম প্রথম মুঘল সেনাপতিদের পরস্পর ঈর্ষার ফলে মুঘলরাজ সৈন্য বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। পরে, রাজকুমারদের উপস্থিতি নিবন্ধন এবং সম্রাট জাহাঙ্গীর মণ্ডুতে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করায়, যুদ্ধের গতি অন্যদিকে ধাবিত হইল। দীর্ঘকাল বহু ব্যয়সাধ্য লোকক্ষয়কর যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া ক্ষুদ্র বিজাপুররাজ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। ১৬১৭ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে বুর্হানপুর মুঘল অধিকৃত হইলে, সন্ধি স্থাপিত হয় এবং বিজাপুররাজ মুঘল প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লয়েন। আহমদনগর প্রমুখ কয়েকটি দুর্গ এবং নিকটবর্ত্তী অনেক স্থান মুঘলদিগের করায়ত্ব হইল। এই যুদ্ধে, অন্যান্য সেনাপতিদের ন্যায় কুমার খুরমও অনেক কৃতীত্ব প্রদর্শন করেন এবং তাহার পুরস্কার স্বরূপ সম্রাটের নিকট হইতে শাহজাহান উপাধি প্রাপ্তি হন।

দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ বিগ্রহ শেষ হইলে সম্রাট জাহাঙ্গীর কিছুকাল গুজরাটে

যাইয়া বাস করেন। তিনি প্রধানতঃ কাম্বে ও আহমদাবাদ নগরেই অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু নূতন ধরণের সংক্রামক ব্যাধিতে নগরের স্বাস্থ্যহানী হওয়ায় ১৬১৮ খ্রীঃ অব্দের শেষভাগে তিনি আহমদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পথিমধ্যে অক্টোবর মাসে দোহাদ নামক স্থানে তাঁহার তৃতীয় পৌত্র আওরঙ্গজীব জন্ম-গ্রহণ করেন।

ঐ সময়ে উত্তর ভারতের অনেক স্থানে মহামারী (প্লেগ) রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। খুব সম্ভব ১৬১৬ খ্রীঃ অব্দে প্রথমভাগে পঞ্জাবে উহার প্রাদুর্ভাব হয় এবং দ্রুত গতিতে উত্তর ভারতের নানা স্থানে বিস্তৃতি লাভ করে। সম্রাট জাহাঙ্গীর গুজরাট হইতে আগ্রাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বেই ১৬১৮ খ্রীঃ অব্দের শেষভাগে পুনরায় ঐ মারাত্মক ব্যাধির আক্রমণে শত শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। পঞ্জাব ও কাশ্মীরেই উহার আক্রমণ অধিকতর হইয়াছিল। আগ্রাতে রোগের বিস্তার হওয়ায় জাহাঙ্গীর কিছু-কাল ফতেপুর শিক্রিতেই অবস্থান করেন এবং প্রায় ছয় বৎসর পরে ১৬১৯ খ্রীঃ অব্দের মধ্য ভাগে রাজ-ধানীতে উপস্থিত হন।

রাজত্বের প্রথম ভাগে কয়েক বৎ-সরের মধ্যে (১৬১২ হইতে ১৬২০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত) অনধিকৃতপূর্ব্ব কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদে মুঘল প্রভুতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে হিমালয়ের প্রান্তবর্ত্তী খোখারা নামক ক্ষুদ্র রাজ্যটি উল্লেখ যোগ্য। পর্ব্বত ও অরণ্য পরিবেষ্টিত এই রাজ্যটির নদীগর্ভে হীরক পাওয়া যাইত। সেইজন্য পূর্ব্বেও কয়েকবার উহা অধিকার করার চেষ্টা করা হইয়া-ছিল। ১৬১৫ খ্রীঃ অব্দে সেনাপতি ইব্রাহিম খাঁ উহা অধিকার করেন। এই সময়েই পুরীর প্রসিদ্ধ জগন্নাথ মন্দির ধ্বংস উপলক্ষে খুর্দ্দা রাজ্যে অভিযান হয়। পুরুষোত্তম দাস তখন খুর্দ্দার রাজা ছিলেন। কেশোদাস মারু নামক একজন রাজপুত সেনানী, তীর্থ যাত্রীর ছদ্মবেশে গোপনে পুরীতে উপ-স্থিত হইয়া মন্দির অধিকার করেন এবং উহার চতুর্দ্দিক সুরক্ষিত করেন। পুরুষোত্তম দাস মন্দির উদ্ধারের প্রয়াস করিলে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। কেশোদাস প্রায় পরাস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আরও মুঘল সৈন্য কেশোদাসের সাহায্যের জন্য আসিতেছে শুনিয়া পুরু-ষোত্তম দাস সন্ধি স্থাপন করেন। (কেশোদাস মারু, রাজা ও পুরুষোত্তম দাস দ্রষ্টব্য)। গুজরাট ও কাঠিওয়া-ড়ের দুইটি ক্ষুদ্র রাজ্য অল্প আয়াসেই অধিকৃত হয়। কিন্তু কাশ্মীরের দক্ষিণ সীমার নিকটবর্ত্তী কিস্তোয়ার নামক ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য রাজ্যটি অধিকার করিতে

বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। একাধিক মুঘল সেনাপতির চেষ্টা বিফল হইবার পর, দিলওয়ার খাঁ, বহু সৈন্য লইয়া অভিযান করেন এবং অনেক চেষ্টার পর রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বন্দী করেন। রাজা জাহাঙ্গীরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু পরবর্ত্তী মুঘল সেনাপতিদের অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া কিস্তোয়ারের অধিবাসীরা বিদ্রোহী হয়। প্রথমবারে অল্প চেষ্টায় ঐ বিদ্রোহ শান্ত করা হয়। পরে আবার বিদ্রোহ হয়। ঐ বারে (১৬২২ খ্রীঃ) কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা ইরাদাৎ খাঁ শান্তি স্থাপন করেন। কিস্তোয়ারের নিকটবর্ত্তী কাঙ্গড়া রাজ্যটিও বহুকাল মুঘলদিগের অনধিকৃত ছিল। সম্রাট আকবর উহা অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে রাজা বিক্রমাজিৎ উহা অধিকার করেন।

এই সময়ে সম্রাটের স্বাস্থ্য দ্রুতগতিতে মন্দের দিকে যাইতেছিল। সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান ইহাতে চিন্তিতা হইয়া পড়েন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহজাহানই যে সম্রাট হইবেন তাহা একরূপ স্থির হইয়া গিয়াছিল। নূরজাহান ইহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই তিনি, জাহাঙ্গীরের অপর পুত্র শাহরিয়ারের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকেই সিংহাসনে স্থাপন করিবার বিশেষ আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইহাতে মুঘল দরবারে এক রাজনীতিক জটিলতা উপস্থিত হইল। কিন্তু ১৬২২ খ্রীঃ অব্দে নূরজাহানের পিতা ইতি-মাদ দৌল্লার মৃত্যু হওয়ায়, সাম্রাজ্ঞীর মনোরথ পূর্ণ হইবার পথে বিশেষ বাধা উপস্থিত হইল, শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই।

১৬১৭ খ্রীঃ অব্দে রাজকুমার খুরমের নেতৃত্বে মুঘলবাহিনী দাক্ষিণাত্যে মুঘল প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেও, মালিক অম্বর সম্পূর্ণভাবে বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। তিনবৎসরের মধ্যেই তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা-পতিদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া পুনরায় স্বাধীন ভাবে চলিতে লাগিলেন জাহাঙ্গীর পুনরায় তাঁহাকে দমন করিবার জন্য শাহজাহানকে (রাজকুমার খুরম) প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু খুরম একেলা যাইতে আপত্তি করিলেন তিনি তাঁহার অগ্রজ রাজকুমার খসরুকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ঐ প্রস্তাবে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের উহাতে বিশেষ আগ্রহ ছিল। যাহা হউক পরিশেষে সম্রাটকেই সম্মত হইতে হইল এবং শাহজাহান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ দমনে গমন করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও বিদ্রোহ

দমন করিতে খুব বেশী কষ্ট করিতে হয় নাই। প্রায় দুইবৎসরের মধ্যেই সর্ব্বত্রই শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। এই সময়েই আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে শাহজাহান বুর্হানপুরে আততায়ীর দ্বারা অগ্রজ খসরুর বধ সাধন করান এবং শূলবেদনা জাত পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া পিতাকে সংবাদ প্রেরণ করেন। জাহাঙ্গীর বিষয়টি অনেকটা অনুমান করিতে পারিলেও বাহ্যত কোনও রূপ ভাবান্তর প্রদর্শন করেন নাই।

দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ শান্ত হইবার পরে আবার কান্দাহারে বিপ্লব উপস্থিত হইল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমভাগে পারসিকেরা কান্দাহার অধিকার করিতে নিষ্ফল প্রয়াস পায়। কিন্তু পরাজিত হইলেও তাহারা একেবারে আশা পরিত্যাগ করে নাই; প্রথমতঃ কয়েক বৎসর পারস্যরাজ শাহ আব্বাস, একাধিক রাজদূতকে বহুমূল্য উপঢৌকনাদি সহ জাহাঙ্গীরের রাজ সভায় প্রেরণ করিতে থাকেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর শাহআব্বাসের এই বাহ্যিক বন্ধুতার ছলনায় কান্দাহারকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ভাবিয়া উহা রক্ষার জন্য বিশেষ আয়োজন কিছু করেন নাই। তখন সুযোগ বুঝিয়া ১৬২২ খ্রীঃ অব্দে শাহ আব্বাস পুনরায় কান্দাহার আক্রমণ করিলেন। এবার অল্প আয়োজনে কিছু হইবে না বুঝিতে পারিয়া, সম্রাট স্বয়ং সমস্ত উদ্যোগের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। শাহজাহান তখন দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ দমন করিয়া আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। সম্রাট তাহাকে সত্বর কাবুল অভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন; শাহজাহান নূরজাহানের চক্রান্তের বিষয় অবগত ছিলেন এবং কাবুলে গমন করিয়া দীর্ঘকাল তথায় ব্যাপৃত থাকিলে পরিণামে যে তিনি সিংহাসনও হারাইতে পারেন তাহা অনুভব করিয়া নানা অজুহাতে যাইতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐরূপ ব্যবহার বিদ্রোহেরই নামান্তর; এই কথাই নূরজাহান সম্রাটকে বুঝাইতে লাগিলেন। ফলে সম্রাটও তীব্রভাবে তিরস্কার করিয়া তাঁহাকে সত্বর কাবুল অভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। শাহজাহান প্রথমে সম্রাটকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিয়া পরিশেষে বিদ্রোহী হইলেন। নূরজাহানই প্রকৃতপক্ষে এই রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। তিনি শাহজাহানকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। শাহজাহান গত্যন্তর না দেখিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করিলেন এবং প্রথমে গোলকুণ্ডা রাজ্যে প্রবেশ করিয়া কিছুকালের জন্য নিরাপদ হইলেন। গোলকুণ্ডা রাজ্যের ভিতর দিয়া অতঃপর তিনি উড়িষ্যায় গমন করেন এবং ক্রমে বাঙ্গালা দেশে

উপনীত হন। বাঙ্গালার মুঘল শাসনকর্ত্তা ইব্রাহিম খাঁ, তাহাকে বাধা দিতে যাইয়া যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। শাহজাহান বাঙ্গালা দেশে নিজ ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্রমে বিহার অধিকার করিলেন। অতঃপর তিনি যখন অযোধ্যা অভিমুখে যাত্রা করিবেন মনস্থ করিতেছিলেন, তখন এলাহাবাদের নিকট সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রেরিত সৈন্য তাঁহার গতিরোধ করিল। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া শাহজাহান পুনরায়, উড়িষ্যা ও তেলিঙ্গানার ভিতর দিয়া দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। মালিক অম্বর তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন এবং শাহজাহান আর একবার প্রভুত্ব স্থাপন করিবার শেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা বিফল হওয়ায় তিনি সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। নুরজাহানের পরামর্শে জাহাঙ্গীর তাঁহাকে ক্ষমা করেন এবং তাঁহাকে বালাঘাট পরগণার শাসনভার প্রদান করেন। রাজাদেশে শাহজাহান তাঁহার দুই পুত্র দারা ও আওরঙ্গজীবকে সম্রাটের নিকট প্রতিভূস্বরূপ রাখিয়া পত্নী ও অন্যান্য পুত্রগণসহ নাসিকে গমন করিলেন। প্রায় তিন বৎসর পরে এই গৃহ বিবাদ শান্ত হয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট যুদ্ধে অনেক প্রসিদ্ধ মুঘল সেনাপতি হত হন।

মুঘল সেনাপতি মহবৎ খাঁ সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের বিশেষ অপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার রাজনৈতিক কৌশলে মহাবৎ খাঁ রাজধানী হইতে বহু দূরবর্ত্তী স্থান সমূহেই অবস্থান করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু বিদ্রোহী শাজাহানকে দমন করিবার জন্য নুরজাহান বাধ্য হইয়া মহাবৎ খাঁরই সাহায্য প্রার্থিনী হন এবং মহাবৎ খাঁও ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় রাজসৈন্যের অধিনায়ক হইয়া কুমার পারভেজের সহিত শাহজাহানের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেন। বিদ্রোহ শান্ত হইলে, নুরজাহান মহাবৎ খাঁর ক্ষমতা পুর্ণলাভের সম্ভাবনায় শঙ্কিত হইয়া, তাঁহাকে বাঙ্গালাদেশের শাসনকর্ত্তারূপে প্রেরণ করেন। বুদ্ধিমান মহাবৎ নুরজাহানের রাজনৈতিক কৌশল বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার ধারণা হইল যে, বৃদ্ধ ভগ্ন স্বাস্থ্য সম্রাটকে নুরজাহানের প্রভাব ও ক্ষমতা হইতে মুক্ত না করিতে পারিলে যে, তাঁহার নিজেরও কোনও উন্নতির সম্ভাবনা নাই। তিনি তখন কৌশলে ও বলপ্রয়োগ উভয়েরই সাহায্যে নিজ ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর যখন কাশ্মীরে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিয়া, কাবুল যাইবার পথে ঝেলাম নদীর তীরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন মহাবৎ খাঁ বাঙ্গালা দেশ হইতে কয়েক সহস্র বিশ্বস্ত রাজপুত অনুচর লইয়া তথায়

উপস্থিত হইলেন এবং বিশেষ কৌশলে এবং কিয়ৎপরিমাণে বল প্রয়োগেও সম্রাটকে নিজের তত্ত্বাবধানে, একরূপ বন্দীভাবেই, আনয়ন করিলেন। সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানও তখন সম্রাটের সহিত ছিলেন কিন্তু তিনি ছদ্মবেশে পলায়নপূর্ব্বক নদীর অপর তীরে উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে স্বীয় ভ্রাতা আসফ খাঁর সাহায্যে সম্রাটকে মহাবৎ খাঁর কবল হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হওয়ায়, তিনি পরিশেষে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন মহাবৎ খাঁ সদল বলে সম্রাটকে লইয়া পূর্ব্ব ব্যবস্থা মত কাবুলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কিছুকাল কাবুলে অবস্থান করিবা পর সম্রাট সদলবলে যখন লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন নূরজাহানের চতুরতাপূর্ণ এক কৌশলে, মহাবৎ খাঁ প্রাণ রক্ষার জন্য পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন এবং সম্রাটও পূর্ব্বের ন্যায় স্বাধীনভাবে অর্থাৎ সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের পরামর্শাদি মত কাজ করিবার সুযোগ পাইলেন।

উত্তর ভারতে যখন পূর্ব্বোক্ত ঘটনাবলী সংঘটিত হইতেছিল, তখন দাক্ষিণাত্যেও পুনরায় উপদ্রব আরম্ভ হয়। মালিক অম্বর, পুনরায় ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর অন্যান্য সেনাপতিরা বিশৃঙ্খলভাবে মুঘল প্রাধান্যের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়। কিন্তু বিশেষ গুরুতর কোনও পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই। এই সময়ে শাহজাহানও আর একবার ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করেন। তিনি নাসিক ত্যাগ করিয়া উত্তর ভারতের তাত্তা পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া পুনরায় নাসিকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বস্তুতঃ এই সময়ে রাজ্যের সর্ব্বত্রই একটা বিশেষ বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছিল। একাধিক রাজকুমার ও সেনাপতিদের ক্ষমতা লাভের চেষ্টায় সর্ব্বত্রই একটা বিপদ আশঙ্কা ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল।

সম্রাটকে মহাবৎ খাঁর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া নূরজাহান কিছুকাল লাহোরেই অবস্থান করেন। কিন্তু তথায় স্বাস্থ্যহানী হওয়ায় তাঁহারা ধীরে ধীরে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে চিঙ্গিসহৎলি নামক স্থানে, অবস্থা আরও মন্দ হয় এবং ঐ স্থানেই ১৬২৭ খ্রীঃ অব্দের ২৮শে অক্টোবর, আটান্ন বৎসর বয়সে, বাইশ বৎসর রাজত্ব করিয়া, সম্রাট জাহাঙ্গীর পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃতদেহ রাজসমারোহে লাহোরে নীত হইয়া দিলখোসা উদ্যানে সমাহিত হয়।

সম্রাটের মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কে হইবেন, তাহা লইয়া কিছু গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল

পরিশেষে শাহজাহানই সিংহাসনে উপবেশন করেন (নূরজাহান ও শাহজাহান দ্রষ্টব্য)।

সম্রাট জাহাঙ্গীর পিতার নিকট হইতে যে বিস্তীর্ণ রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার অধিক বিস্তৃতি সাধন করিতে পারেন নাই। তাঁহার রাজত্বকাল খুব শান্তিপূর্ণ ছিল না। নিজ পুত্র খসরু ও পৌত্র খুরম, একাধিক বার বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। নূরজাহানের ক্ষমতা লাভের প্রয়াসে অনেক সেনাপতিও সাময়িকভাবে বিদ্রোহী হন। দাক্ষিণাত্যে পাঠান রাজ্যগুলির সহিত সংগ্রাম দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া চলিয়াছিল এবং কাবুলেও পারস্যপতির সহিত একাধিক বার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়।

রাজনৈতিক কারণে একান্ত বাধ্য না হইলে, সম্রাট জাহাঙ্গীর অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের উপর প্রধানতঃ অত্যাচার করেন নাই। তিনি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন বলিয়া, ঐতিহাসিকগণ মনে করেন না। আকবরের ন্যায় তাঁহারও ধর্ম্মমত বিষয়ে অনেকটা উদারতা ছিল।

শাসন সংক্রান্ত বিশেষ গুরুতর পরিবর্ত্তন তাঁহার রাজত্বে হয় নাই। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বিষয়ে সুব্যবস্থা প্রচলিত হয়। অধীনস্থ ক্ষুদ্র সামন্ত রাজাদের সহিত যথাসম্ভব সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি স্বয়ং খুব দৃঢ়চিত্ত পুরুষ ছিলেন না। অনেক বিষয়েই বরঞ্চ অব্যবস্থিত চিত্তের পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজত্বের প্রায় পনের বৎসর তিনি সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের প্রভাবাধীন ছিলেন। বস্তুতঃ ঐ কয় বৎসর জাহাঙ্গীরের পরিবর্ত্তে নূরজাহানই মুঘল সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রী ছিলেন। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে তাঁহার রাজত্বে মুঘল সাম্রাজ্য নানা বিষয়ে উৎকর্ষতা লাভ করে। দেশেরও অধিকাংশ স্থানে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল।

সম্রাট জাহাঙ্গীর একখানি আত্মজীবনী রচনা করেন। রাজত্বের প্রথম দ্বাদশ বৎসরের বিবরণ তাঁহার নিজের রচনা। পরে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলে তিনি মোতামদ্ খাঁ নামক এক ব্যক্তির উপর উহা রচনার ভার দেন। গ্রন্থখানি বহু মূল্যবান্ তথ্যে পূর্ণ। উক্ত পুস্তকখানি প্রধানতঃ "তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরি" নামে পরিচিত। আরও অনেক নামেও কেহ কেহ পুস্তকখানির নামকরণ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থখানি ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে প্রথম সৈয়দ আহমদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। পরে একাধিক ইংরেজ বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়। তদ্ভিন্ন "পন্দ-নামা-ই-জাহাঙ্গীরি" নামেও একখানি গ্রন্থ সম্রাট স্বয়ং রচনা করেন। উহাতে তাঁহার দৈনন্দিন জীবন যাত্রার অনেক মনোরম বিবরণ পাওয়া যায়। এইগুলি

ভিন্ন বহু ফারসী, হিন্দি ঐতিহাসিকের রচিত গ্রন্থ হইতে তাঁহার রাজত্বের অনেক বিবরণ জানা যায়।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বহু ইয়োরোপীয় বণিক, ভ্রমণকারী ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিবরণ হইতেও অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়। ঐ সকল ব্যক্তিদের মধ্যে নিম্ন লিখিতগুলি প্রধান—উইলিয়াম হকিন্স (William Howkins), সার হেনরী মিড্‌লটন (Sir Henry Middleton), জোসেফ সালবাঙ্ক (Joseph Salbancke), উইলিয়াম ফিঞ্চ (Wiliam Finch), নিকোলাস উইদিংটন (Nicholas Withington), জন জর্দ্দা (John Jourdin), রিচার্ড ষ্টিল (Richard Steel), জন ক্রাউদার (John Crowther), সার টমাস রো (Sir Thomas Roe), এড্‌ওয়ার্ড টেরী (Rev. Edward Terry) এবং জন ডি-লেট (John De Laet),

জাহানআরা বেগম—(১) মুঘল সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠাকন্যা। তিনি অতি পবিত্র স্বভাবা ধর্ম্মপরায়ণা মহীয়সী মহিলা ছিলেন। আজীবন চির কুমারী থাকিয়া তিনি ত্যাগের ও সেবাপরায়ণার এক মহৎ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে আজমীরে তাঁহার জন্ম হয়। সম্রাট শাহজাহানের যত্নে তিনি নানা বিষয়ে উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি পিতার বিশেষ স্নেহ ভাজন হন এবং নানা রাজকার্য্যে সম্রাটকে পরামর্শ দিয়া নিজ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও উন্নত মনের পরিচয় প্রদান করিতেন। মমতাজ মহলের মৃত্যুর পর, জাহানআরা সর্ব্ববিষয়ে ছায়ার ন্যায় পিতার সহচরী থাকিয়া যে একনিষ্ঠ পিতৃসেবার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, জগতের ইতিহাসে তাহা বাস্তবিকই দুর্লভ। সম্রাট শাহজাহানও কন্যার বিবিধ গুণরাশির পরিচয় পাইয়া রাজ-অন্তঃপুরে তাঁহাকে বিশিষ্ট মর্য্যাদা ও ক্ষমতা প্রদান করেন। ১৬৩২ খ্রীঃ অব্দে জাহানআরা সম্রাটের রক্ষার ভার প্রাপ্ত হন।

১৬৪৪ খ্রীঃ অব্দে জাহানআরা অতর্কিতে গুরুতর ভাবে অগ্নিদগ্ধ হন। প্রায় নয় মাস কাল একাধিক অভিজ্ঞ চিকিৎসকের চেষ্টায় তিনি আরোগ্য লাভ করেন। সম্রাট শাহজাহান কন্যার আরোগ্য লাভে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া আনন্দ উৎসব সম্পন্ন করেন।

জ্যেষ্ঠা ভগিনীরূপে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের প্রতি অতি স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের পীড়াদির সময়ে সেবাশুশ্রূষা দ্বারা সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। যদিও তাঁহার মনোগত ইচ্ছা ছিল যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারাশেকোই পিতৃ সিংহাসনে উপবেশন করে, কিন্তু আওরঙ্গজীব সিংহাসন

অধিকার করিলেও তিনি কখনও তাঁহার প্রতি বিরূপ ভাব প্রদর্শন করেন নাই। রাজকার্য্য উপলক্ষে যখন আওরঙ্গজীব তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন, তখন জাহান-আরা, তাঁহার অসন্তোষের ভয়ে কখনও নিজের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিতে ভীতা হইতেন না। পিতাকে আগ্রা দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিলেও, আওরঙ্গজীব জ্যেষ্ঠা ভগিনীর, পিতৃদত্ত মর্য্যাদা ও ক্ষমতা হ্রাস করেন নাই।

সম্রাটের শেষজীবনে জাহান-আরা সেবিকা ও সহচরী রূপে সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সকাশে উপস্থিত থাকিয়া, পিতার শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার কষ্ট লাঘবের জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্নবতী থাকিতেন। বস্তুতঃ তাঁহারই অক্লান্ত সেবা ও যত্নের প্রভাবেই সম্রাটের শেষ জীবনের কষ্ট অনেকটা লাঘব হইয়াছিল।

১৬৮১ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লী নগরীতে এই মহীয়সী মহিলার মৃত্যু হয়। রাজান্তঃপুরের বিলাস বৈভবের মধ্যে বাস করিয়াও, তিনি অতি সাধারণ জীবনে অনুরক্তা ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি, দিল্লীর উপকণ্ঠে, প্রসিদ্ধ মুসলিম সাধু শেখ নিজামুদ্দিন আওলিয়ার বিশাল সমাধি প্রাঙ্গনেই নিজ সমাধির স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া যান এবং তাঁহারই Gel Copgs রচিত একটি ফারসী কবিতা খোদিত আছে। তাহাতে তিনি, নিজ সমাধিকে বহুমূল্য আবরণে আবৃত না করিয়া, কেবল সুকোমল তৃণের দ্বারাই আচ্ছাদিত করিতে অনুরোধ জানাইয়া গিয়াছেন।

জাহানারা বেগম—(২) তিনি খান্দেশের অধিপতি লোদি খাঁর কন্যা। লোদি খাঁ একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। জাহাঙ্গীর শাহের পুত্র, শাহজাহান এক সময়ে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন। সেই সময়ে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়। এই সংবাদ শুনিয়া শাহজাহান সসৈন্যে শীঘ্র দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অভিলাষী হইয়া, খান্দেশের মধ্য দিয়া যাওয়া সমীচিন বলিয়া অবধারণ করিলেন। কিন্তু খান্দেদেশের মধ্য দিয়া যাইতে হইলে লোদি খাঁর অনুমতি আবশ্যক। তদর্থে স্বীয় পুত্র মুরাদকে তিনি খান্দেশে লোদি খাঁর নিকট অনুমতি লাভার্থ প্রেরণ করেন। লোদি খাঁ অনুমতি দিলেন না। ইতিপূর্ব্বে একবার মুরাদ লোদি খাঁর কন্যা জাহানারাকে বন্য হস্তীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেজন্য মুরাদ মনে করিয়াছিলেন, সেই উপকারের প্রতিদান স্বরূপ তিনি অনুমতি পাইবেন। তৎপরিবর্ত্তে তিনি অপমানিত হইলেন। শাহজাহান অন্য পথে দিল্লীতে আগমন করিলেন। তিনি দিল্লীর রাজপদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, লোদি খাঁকে

আমন্ত্রণ করিয়া দিল্লীতে আনয়ন করিবার জন্য রাজকুমার মুরাদকে খান্দেশে প্রেরণ করিলেন। লোদি খাঁ আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া, সপরিবারে দিল্লীতে আগমন করিলেন। মুরাদ রাজকুমারী জাহানারার রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব লোদি খাঁর নিকট উপস্থিত করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন।

লোদি খাঁ দিল্লিতে উপস্থিত হইলে সম্রাট শাহজাহান তাঁহাকে যথাযোগ্য সমাদর ত করিলেনই না, বরং অশিষ্ট ব্যবহারের অজুহাতে তাঁহাকে বন্দী করিলেন। তাঁহার অবস্থান স্থান সৈন্য পরিবেষ্টিত হইল। এই স্থানে লোদী খাঁর বহু পত্নী শত্রুহস্তে পতিত হইবার ভয়ে আত্মহত্যা করেন। লোদী খাঁ, আজমৎ খাঁ ও হস্মিন খাঁ নামক পুত্রদ্বয় ও কন্যা জাহানারার সহিত আবদ্ধস্থান হইতে বহির্গত হইলেন। সকলেই প্রস্থান করিতে সমর্থ হইলেন কিন্তু রাজকুমারী জাহানারা, মুরাদ হস্তে বন্দিনী হইলেন। পরে মুক্তি লাভ করিয়া পিতার সহিত মিলিত হইলেন। এই স্থানেও বন্দিনী রাজকুমারীকে মুরাদ বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত করাইতে পারেন নাই। মুঘলদের সহিত যুদ্ধে আজমৎ নিহত হইলেন। লোদি খাঁ, হিম্মন ও জাহানারা নদী সন্তরণে উত্তীর্ণ হইলেন।

এই যুদ্ধে লোদি খাঁ, হিম্মন ও জাহানারা সকলেই সমর সজ্জায় শয়ন করিয়াছিলেন।

জাহান ইবন সৈবান—মুলতান নগরে পূর্ব্বে একটী সূর্য্য মন্দির ছিল। মোহাম্মদ বিন কাশিম মুলতান নগর অধিকার করিয়াও তাহা ধ্বংস করেন নাই। বরং হিন্দু অধিবাসীদের হস্তেই মন্দির সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে জাহান ইবন সৈবান নামক একজন দুরাচার সেনাপতি সূর্য্য মন্দির ও তন্মধ্যস্থ মূর্ত্তি সম্পূর্ণ নষ্ট করেন।

জাহান খাঁ—শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা লোদী খাঁ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাঁহার অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র জাহান খাঁ তদীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হন। সুবিদরাম, বসুদাস, রাজেন্দ্র ও রুদ্রদাস প্রভৃতি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীরা রাজ্যশাসন করিতেন। জাহান খাঁ নিজ নামে জাহানপুর নামে একটী গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি খুব দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে কেশওয়ার খাঁ শাসনকর্ত্তা (কাননগু) হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে দিল্লীতে আকবর শাহ রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি কাননগুর ক্ষমতা অতিশয় হ্রাস করিয়া দেন। তদবধি শাসনকর্ত্তারা আমিল নামে অভিহিত হইতেন। কিন্তু সাধারণের নিকট তাঁহারা নবাব বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা ঢাকার নবাবদিগের অধীন ছিলেন।

জাহান বক্ত—তৃতীয় পেশোয়া বালাজী বাজীরাও, সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত স্বীয় অধিকারে আনয়ন ও আহাম্মদ শাহ আবদালীকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়ন করিবার জন্য, সেনাপতি সদাশিব রাও ভাওকে বিংশ সহস্র অশ্বারোহী ও এক লক্ষ পদাতিক সৈন্যসহ উত্তর ভারতে প্রেরণ করেন (১৭৫৯ খ্রীঃ)। তিনি দিল্লীতে পঁহুছিয়া দ্বিতীয় শাহ আলমকে পদচ্যুত করিয়া রাজবংশীয় জাহান বক্ত নামক এক ব্যক্তিকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করেন। ১৭৬১ খ্রীঃ অব্দে পাণিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দের পরাজয় হইলে, জাহান বক্তের রাজত্ব শেষ হয়। এই নরপতির কোন ক্ষমতা ছিল না। তিনি প্রকৃতপক্ষে মহারাট্রাদের হস্তে ক্রিয়াপুত্তল ছিলেন।

জাহান বানু বেগম—তিনি রাজকুমার মুরাদের দুহিতা ও সম্রাট আকবরের পৌত্রী। সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র রাজকুমার পারবেজের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহাদের কন্যা নাদিরা বেগমের সহিত সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শেকোর বিবাহ হয়।

জাহান শাহ, আমীর—তিনি বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী তৈমুরলঙ্গের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। তৈমুরলঙ্গের আদেশে তিনি যমুনার তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ শ্মশান ভূমিতে পরিণত করিয়াছিলেন।

জাহান্দর শাহ—তিনি দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহের পুত্র। ১৭১২ খ্রীঃ অব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পরেই রাজ্যে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই সময়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজকুমার আজিম ওস্মান ও তৃতীয় রাজকুমার ময়জউদ্দিনের মধ্যে সিংহাসন লাভার্থ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। দাক্ষিণাত্যের সেনাপতি জুলফিকর খাঁর সাহায্যে ময়জউদ্দিন, আজিম ওস্মানকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়া, দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক জাহান্দর শাহ উপাধি গ্রহণ করিলেন। এই নরপতি অতিশয় বিলাসী, কর্ম্মবিমুখ ও আত্মপরায়ণ ছিলেন। তদুপরি তিনি একজন নীচ প্রকৃতির লাল কুয়ার নামক কুলটার অতিশয় অনুগত ছিলেন। তিনি প্রিয়তমা উপপত্নীর মনস্তুষ্টির জন্য তাহার ভ্রাতাকে এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তার পদ প্রদান করিলেন। লাল কুয়ারের বার্ষিক দুই কোটী টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল। এতদ্ব্যতীত তাহার অলঙ্কারাদির জন্য স্বতন্ত্র ব্যয় বরাদ্দ ছিল। তিনি মাত্র ১১মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজকুমার আজিম ওস্মানের পুত্র ফরক শিয়ার তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ১৭১৩ সালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

জাহ্নবী দেবী, মহারাণী—তিনি ত্রিপুরার অধিপতি মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের মহিষী। ১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দের

১১ই জুলাই মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য পরলোক গমন করিলে, তাঁহার মহিষী জাহ্নবী দেবী প্রায় তিন বৎসর রাজ্য শাসন করেন। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিমণির পুত্র রাজধরকে তিনি উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। তদনুসারে রাজধর মাণিক্যকেই ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। জাহ্নবী দেবী কুমিল্লা নগরীতে একটী দীর্ঘিকা খনন করান। তাহা এখনও রাণীর দীঘি নামে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

জাহ্নবী দেবী—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী। তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজে তিনি নেত্রীস্থানীয়া ছিলেন। তাঁহারই ব্যবস্থা মত খেতুরীর মহোৎসব সম্পন্ন হইত। তিনি বৃন্দাবন হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন।

জাহ্নবী দেবী রায় চৌধুরাণী—তিনি সন্তোষের (ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল) ছয় আনীর জমিদার গোলকনাথ রায়ের সহধর্ম্মিণী। তাঁহার ১৩ বৎসর বয়সে তাঁহার স্বামী গোলকনাথ পরলোক গমন করেন। তিনি বাঙ্গালা লেখা পড়া ভাল জানিতেন। বাঙ্গালার যে সমুদয় মহিলা জমিদার স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলে জমিদারী শাসন করিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। তিনি স্বীয় ক্ষমতা বলে বহু সৎ কার্য্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াও জমিদারীর আয় বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বৈকুণ্টনাথ রায় চৌধুরীকে দত্তক গ্রহণ করেন। ১৮৭০ সালে স্বীয় নামে সন্তোষ জাহ্নবী স্কুল, স্বামীর নামে গোলকনাথ দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু সৎকার্য্যে প্রচুর অর্থদান করিয়া গিয়াছেন। বৈকুণ্টনাথ জাহ্নবী দেবীর জীবিত কালেই অকালে অপুত্রক পরলোক গত হন। তাঁহার পুত্র বধূ রাণী দিনমণি চৌধুরাণী পরে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীকে দত্তক গ্রহণ করেন। মহিয়সী জাহ্নবী চৌধুরাণী ১৩০৬ বাংলার ১৩ই ফাল্গুন পরলোক গমন করিয়াছেন। ইন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী দেখ।

জিজাবাঈ—ছত্রপতি শিবাজীর মাতা ও বিজাপুরের অন্যতম সেনাপতি শাহজীর প্রথমা পত্নী। এই তেজস্বিনী মহিলা, স্বামী দ্বিতীয়া পত্নী গ্রহণ করায় তাঁহার সংস্রব পরিত্যাগপূর্ব্বক পুণা সহরে বাস করিতেন। তাঁহার শম্ভুজী ও শিবাজী নামে দুই পুত্র জন্মে। শম্ভুজী পিতার নিকটেই থাকিতেন। জিজাবাই অতি ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন। শিবাজী ও শাহজী দেখ।

জিজি বেগম—সম্রাট আকবরের ধাত্রী মাতা। তিনি তাঁহারই স্তন্য পান করিতেন। জিজি বেগমের পুত্র

মিরজা আজিজ কোকাকে আকবর শাহ, খাঁ আজিম উপাধি প্রদানপূর্ব্বক আমীর শ্রেণীতে উন্নীত করেন। ১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দে জিজি বেগমের মৃত্যু হয়। সম্রাট স্বয়ং তাঁহার মৃত দেহ স্কন্ধে বহন করেন এবং শ্মশ্রু ও গুম্ফ ছেদন করেন।

জিৎ—প্রমারবংশীয় জিৎ আবুপর্ব্বতের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ, কণোজরাজ জয়চাঁদ ও চিতোরপতি সমরসিংহের সমসাময়িক ছিলেন। পৃথ্বীরাজের সহিত মিলিত হইয়া মোহাম্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

জিতাঙ্কুশ—তিনি উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নরপতি দ্বিতীয় গুণার্ণবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পনর বৎসর রাজত্ব করিবার পর তিনি পরলোক গমন করিলে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কলিগঙ্গাঙ্কুশ বার বৎসর রাজত্ব করেন। কামার্ণব (প্রথম) দেখ।

জিতামিত্র মল্লদেব—নেপালের মল্লবংশীয় রাজা। তিনি খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিতেন। তিনিও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার রচিত কয়েকখানি নাটক পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস অবলম্বনে রচিত "গোপীচন্দ্র নাটক" সমধিক বিখ্যাত। উহার ভাষা বাঙ্গালা ভাষারই প্রাচীন রূপ।

জিতারি—(১) আসামের নরক-বংশীয় শেষ রাজা সুবাহুর মৃত্যুর পর দ্রাবিড়বংশীয় জিতারি নামক এক ব্যক্তি কামরূপের আধিপত্য লাভ করেন। এই বংশের একজন প্রধান রাজা শশাঙ্ক বা অরিমত্ত। অরিমত্ত দেখ।

জিতারি—(২) চিতোরের নরপতি। প্রসিদ্ধ জৈন পণ্ডিত হরিভদ্র সূরী তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন। তিনি খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতার অন্তর্বর্ত্তী তালতলার পরলোকগত বিখ্যাত ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র এবং রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পিতৃভবনে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যথারীতি পড়াশুনার পর ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে আইন পড়িবার জন্য ইংলণ্ডে যান এবং প্রত্যাগমন করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে তিনি কিছুকাল রিপণ কলেজের আইন বিভাগে অধ্যাপনাও করেন। তিনি আজীবন রিপণ কলেজ পরিচালক সমিতির সভ্য ছিলেন এবং সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর উহার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার শরীর চর্চ্চার প্রতি উৎসাহ ছিল। বিলাতে পাঠ্যাবস্থায় ব্যায়ামবীর হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ১৯০৬

খ্রীঃ অব্দে তিনি প্রেসিডেন্সী রাইফেল ব্যাটেলিয়নে (Presidency Rifle Battalion) স্বেচ্ছাসেবক সৈন্য-দলে সাধারণ সৈন্য (Private) রূপে ভর্ত্তি হন এবং ঐ বৎসরই কর্পোরেলের (Corporal) পদে উন্নীত হন। পরে স্বায় কৃতিত্বে তিনি সার্জ্জেণ্টের (Sergent) পদ লাভ করেন। ১৯১২ সালে তিনি দিল্লী দরবারে মেডেল প্রাপ্ত হন। জিতেন্দ্রনাথের নাম বাঙ্গালী ভুলিতে পারিবে না। ব্যায়ামবীর হিসাবে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে যাঁহারা শরীর চর্চ্চায় অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছিলেন, কাপ্তেন জিতেন্দ্রনাথ তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন। লাঠি ও ছোরা খেলা, মুষ্টি যুদ্ধ প্রভৃতি সমস্ত ক্রীড়াকৌশলে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি কলিকাতার বিভিন্ন ক্লাবে ও আখড়ায় যাইয়া যুবকদিগকে শরীর-চর্চ্চায় অনুপ্রেরণা দিতেন। বস্তুতঃ পক্ষে তিনি কোন কসরতের সংবাদ পাইলেই সেখানে উপস্থিত হইতেন এবং যুবকদেরে উৎসাহ ও উপদেশ দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিতেন। কলিকাতার প্রায় সমস্ত ব্যায়াম চর্চ্চার সমিতির সহিতই তাঁহার নাম জড়িত। তিনি শুধু স্বীয় নামটি দিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। শরীর চর্চ্চার প্রসারের জন্য তিনি বিভিন্ন সমিতি, রিপণ কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেড় লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন।

তিনি আদর্শ ব্যায়ামবীর ছিলেন এবং তাঁহার মনোবৃত্তিসমূহও ছিল ঠিক বীরজনোচিত। আজীবন ব্যায়ামব্রতীর মৃত্যুতে শরীর-চর্চ্চা প্রিয় বাঙ্গালী যুব সমাজ একজন অকৃত্রিম বন্ধু ও উপ-দেষ্টাকে হারাইয়াছে।

তিনি ১৩৪২ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে (অক্টোবর ১৯৩৫ খ্রীঃ) পরলোক গমন করেন।

জিন—একজন বৌদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি 'প্রমাণ বার্ত্তিকালঙ্কার টীকা, নামক প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই গ্রন্থ বিক্রমশীলার পণ্ডিত দীপঙ্কর রক্ষিত কর্তৃক ১০৪৫ খ্রীঃ অব্দে তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন কঙ্কনের জিনভদ্র এবং এই জিন একই ব্যক্তি। তিনি খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

জিনকীর্ত্তি—তিনি একজন জৈন গল্প লেখক। খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি শ্রেষ্ঠীকথানক ও পালগোপাল কথানক নামে দুইখানা উপাখ্যানমূলক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

জিন গুপ্ত—(১) বৌদ্ধ আচার্য্য। তিনি খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতে যান্ এবং তথায় কয়েক-খানি বৌদ্ধ গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করেন। ধর্ম্মগুপ্তীয় সম্প্রদায়ের 'অভি-

নিষ্ক্রমণ-সূত্র' নামক গ্রন্থ তাহাদের অন্যতম।

জিন গুপ্ত—(২) গান্ধারবাসী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। তিনি পুরুষপুরের (পেশোয়ার) অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের নাম ছিল কুম্ভ। তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম বজ্রসার। পিতা-মাতার অনুমতি লইয়াই তিনি অতি বাল্যকালে ভিক্ষু হন। জিনভদ্র ও জিনযশ নামক আচার্য্যদ্বয়ের সমীপে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যৌবনের প্রারম্ভেই খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে চীনদেশে গমন করেন। পূর্ব্বোক্ত আচার্য্যদ্বয় ভিন্ন যশোগুপ্ত নামক আর একজন ভিক্ষুও তাঁহাদের সহগামী ছিলেন। তাঁহারা প্রথমে চেউ (Cheu) বংশীয় সম্রাট মিং (Ming) এর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্র সমূহ চীন ভাষায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু অল্প-কাল পরেই অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা সম্রাট উ'র (Wu) আদেশে নির্ব্বাসিত হন। জিনগুপ্ত ও সহকর্ম্মীগণ চীনরাজের অধিকারের বাহিরে তুর্ক জাতীয় বৌদ্ধ নৃপতি ট-পো কগানের (T'o-Po Kagan) রাজ্যে উপস্থিত হন এবং তথায় সমাদরে গৃহীত হন।

কিছুকাল পরে নানারূপ রাজ-নৈতিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইলে চীন-রাজ্যে পুনরায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার হইতে আরম্ভ করে এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র সকল চীন ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য পণ্ডিত নিযুক্ত হন। এই সময়ে আচার্য্য নরেন্দ্র যশ, (তিনিও জিন গুপ্তের ন্যায় নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন), ও আরও কতিপয় পণ্ডিতের উপর বৌদ্ধ শাস্ত্র অনুবাদ করিবার ভার অর্পণ করা হয় (৫৮০—৬০০ খ্রীঃ)। সু-ই (Sui) বংশীয় ইয়াং-শিয়েন (Yang Chien) তখন সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু নরেন্দ্র যশের অনুবাদ লইয়া মতভেদ হওয়ায় মীমাং-সার জন্য বিজ্ঞতর পণ্ডিতের সন্ধান করা হয় এবং জিনগুপ্তের খ্যাতির কথা শুনিয়া তাঁহাকে পুনরায় আহ্বান করা হয়।

রাজাহ্বানে জিনগুপ্ত পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, অনুবাদ সংশোধনের ভার গ্রহণ করেন। ধর্ম্মগুপ্ত নামক আর একজন ভারতীয় পণ্ডিত ও একাধিক চীনা পণ্ডিত এবিষয়ে তাঁহার সহকারী ছিলেন। তাঁহারা প্রায় চল্লিশখানি নিবন্ধ অনুবাদ ও সংশোধন করেন।

শেষ জীবনে জিনগুপ্ত কিছুকাল টেঙ্-বংশীয় সম্রাটের রাজগুরু ছিলেন। প্রায় আশী বৎসর বয়সে (৬০০ খ্রীঃ) চীনদেশেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

জিনৎ-উন্-নিসা বেগম—(১) তিনি বাঙ্গালার সুবাদার মুরশিদ কুলি খাঁর কন্যা। নবাব মুরশিদ কুলি খাঁ, সুজা-উদ্দিন নামক এক তুর্ক যুবকের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। সুজাউদ্দিনের চরিত্র দোষ ছিল বলিয়া জিনৎ-উন্নিসা বেগম অধিকাংশ সময় পিতৃ সন্নিধানে অবস্থান করিতেন। তাঁহার গর্ভে মিরজা আসাদ উল্লা খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই পরে সরফরাজ খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন।

জিনৎ-উন্-নিসা বেগম—(২) মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজীবের অন্যতমা কন্যা। ১৭১০ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি অতিশয় বিদুষী ছিলেন। তাঁহার রচিত একখানা কাব্য রহিয়াছে। তাঁহার লোহিতবর্ণ সমাধি দিল্লীর দরিয়াগঞ্জ নামক স্থানে যমুনার তটে এখনও বর্ত্তমান আছে।

জিন দত্ত সূরী—(১) জৈন কোষকার হেমচন্দ্রের সমসাময়িক (খ্রীঃ ১২ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ) একজন জৈন গ্রন্থকার। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। অধিকাংশই জৈনধর্ম্মের উপদেশমূলক অথবা জৈন পূর্ব্বাচার্য্যগণের জীবনী।

জিনদত্ত সূরী—(২) খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর খ্যাতনামা জৈন নৈয়ায়িক। তিনি স্বরচিত 'বিবেক বিলাস' গ্রন্থে 'ষড়দর্শন বিচার' এই নামে প্রধান প্রধান দর্শন গুলির আলোচনা করেন। তাঁহার মতে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন, ষড়-দর্শনেরই অন্তর্ভূত। তাঁহার বর্ণনায় নৈয়ায়িকরা শৈব ছিলেন বলিয়া বুঝা যায়।

জিনপদ্ম—একজন জৈন গ্রন্থকার। তিনি 'ষড়্ভাষা-বিভূষিত-শান্তিনাথ-স্তবন' এই নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থের স্তোত্রগুলি সংস্কৃত ও মহারাষ্ট্রী, মাগধী, সৌরসেনী, পৈশাচী ও অপভ্রংশ এই ছয়টি প্রাকৃত ভাষায় রচিত। অনেক জৈন গ্রন্থকার এইরূপ বিভিন্ন ভাষায় রচিত শ্লোক সংবলিত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ একই শ্লোকের প্রথম দুই পদ এক ভাষায় এবং অপর দুই পদ আর এক ভাষায় রচনা করেন। জিনপদ্ম খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

জিনপ্রভ শূরী—জৈন আচার্য্য ও গ্রন্থ-কার। তিনি খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম-ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার "রাজ প্রসাদ", নামক গ্রন্থে জৈন তীর্থস্থান, তাহাদের উৎপত্তির কারণ, তত্তৎস্থানের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিবরণ প্রভৃতি বহু মূল্যবান্ তথ্য পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন "চতুর্ব্বিংশতি জিন স্তোত্র", মান-তুঙ্গ রচিত "ভয়হর স্তোত্রের টীকা" প্রভৃতি গ্রন্থও তিনি রচনা করেন।

জিনভদ্র গণি ক্ষমাশ্রমণ—এক-জন জৈন দার্শনিক পণ্ডিত। ৪৮৪

খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ৫২৮—৫৮৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন। তিনি 'আবশ্যক নিরুক্তি, নামক গ্রন্থের 'বিশেষাবশ্যক ভাষ্য' নামক এক টীকা রচনা করিয়াছেন। সাধারণতঃ তিনি 'ক্ষমাশ্রমণ' নামেই বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

জিন মিত্র—(১) খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীর একজন বৌদ্ধ নৈয়ায়িক। সর্ব্বজ্ঞ দেব, দানশীল প্রভৃতি আরও কয়েকজন বৌদ্ধ স্থবির সমভিব্যাহারে তিনি তিব্বতে গমন করেন এবং তথায় অনেক সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্র তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। 'ন্যায়বিন্দু পিণ্ডার্থ' নামে তিনি ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। মূল গ্রন্থখানি এখন পাওয়া যায় না। তিব্বতীয় ভাষায় উহার একখানি অনুবাদ আছে।

জিনমিত্র—(২) প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে আগমন করেন। সেই সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শীলভদ্র, ধর্ম্মপাল, জিনমিত্র, স্থিরমতি, জ্ঞানচন্দ্র প্রভৃতি অধ্যাপক ছিলেন। জিনমিত্র বোধিসত্ত্ব, সর্ব্বাস্তিবাদীয় সম্প্রদায়ের বিনয় পিটক সম্বন্ধে একখানি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম 'মূল সর্ব্বাস্তিবাদনিকায় বিনয়সংগ্রহ পারিব্রাজক আইত-সিঙ্গ ইহার চীন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

জিনযশ—মগধবাসী বৌদ্ধ ভিক্ষু ও আচার্য্য। তিনি খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে চীনদেশে গমন করেন এবং চেউ (Cheu) বংশীয় সম্রাট উ'র (Wu) রাজত্বকালে (খ্রীঃ ৫৬১—৫৭৮) কয়েকখানি বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করেন। ঐ সকল গ্রন্থের অধিকাংশই অধুনা বিলুপ্ত জিনগুপ্ত দেখ।

জিনলাভ সূরী—একজন প্রসিদ্ধ জৈন দার্শনিক পণ্ডিত। 'তর্কফক্কিকা' গ্রন্থ প্রণেতা প্রসিদ্ধ ক্ষমাকল্যাণ সূরী তাঁহার ছাত্র ছিলেন। ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

জিনসেন—(১) জৈন দিগম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্য্য ও গ্রন্থকার। তিনি খ্রীঃ নবম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন এবং রাজা অমোঘবর্ষের (২য়) বিশেষ সুহৃদ ছিলেন। তাঁহার গুরুর নাম বীরসেন। জিনসেনের আদি পুরাণে 'বৃহৎ কথা'র নামোল্লেখ আছে। জিনসেনের অপর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'পার্শ্বাভ্যুদয়'। এই গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে দুই একটি পদ রচনা করিয়া সমগ্র মেঘদূত গ্রন্থখানিকে একীভূত করা হইয়াছে।

জিনসেন—(২) জৈন গ্রন্থকার ও আচার্য্য। তিনি ৬৬ সর্গে জৈন হরিবংশ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে যদুবংশ

ও কুরুবংশের ইতিহাস বর্ণনচ্ছলে জৈন ধর্ম্মের প্রাধান্য কীর্ত্তন করা হইয়াছে।

জিনেন্দ্র বোধি—বৌদ্ধ স্থবির ও নৈয়ায়িক। তিনি খুব সম্ভব খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন। "বিশালমলবতী নাম প্রমাণ সমুচ্চয়-টীকা" নামে একখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া, পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। মূল গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য উহার তিব্বতীয় অনুবাদ মাত্র পাওয়া যায়। তিনিই পাণিনী ব্যাকরণের ন্যাস রচয়িতা জিতেন্দ্র বোধি, বলিয়াও পণ্ডিতগণ অনুমানকরেন।

জিনেশ্বর সূরী—খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অভয়দেব সূরী বর্ত্তমান ছিলেন। তৎপরেই এই প্রসিদ্ধ জৈন দার্শনিক পণ্ডিতের আবির্ভব হয়। তাঁহার গুরু ভাই ধনেশ্বর সূরী ছিলেন।

জিয়াউদ্দিন কাজী—তিনি দিল্লীর খিলজী বংশীয় শেষ নরপতি কুতউদ্দিন খিলজীর শিক্ষক ও মন্ত্রী ছিলেন। সম্রাট কুতব উদ্দিনের হীন জাতীয় সেনাপতি হাসন (পরে মালিক খসরু) ষড়যন্ত্র করিয়া কুতব উদ্দিনকে হত্যা করিয়াছিলেন। এই ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারিয়া ধার্ম্মিক জিয়াউদ্দিন কাজী সম্রাটকে সতর্ক করিয়াছিলেন। কিন্তু নির্ব্বোধ কুতব উদ্দিন ইহাতেও সতর্ক না হওয়ায় হাসনের হস্তে নিহত হন।

জিয়াউদ্দিন খাঁ—বাঙ্গালার সুবাদার নবাব মুরশিদ কুলি খাঁর সময়ে (১৭০৪—২৫ খ্রীঃ) তিনি হুগলীর স্বাধীন ফৌজদার ছিলেন। মুরশিদ কুলি খাঁ পাতশাহের অনুমতি ক্রমে হুগলীর ফৌজদারকে আপন কর্ত্তৃত্বাধীনে আনয়ন পূর্ব্বক জিয়া খাঁকে পদচ্যুত করেন এবং তৎস্থানে আলীবেগ নামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। জিয়া খাঁ দিল্লী যাত্রার অভিপ্রায়ে হুগলী পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু আলীবেগ পথরোধ করিলেন। জিয়া খাঁ তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু অচিরেই পরলোক গমন করিলেন।

জিয়াউদ্দিন বর্ণি—তিনি একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পণ্ডিত। তাঁহার জন্ম স্থান বুলন্দ সহর। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—'তোয়ারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'। এই গ্রন্থে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের সময় হইতে সুলতান ফিরোজ শাহ তোগলকের রাজত্ব কালের ষষ্ঠ বর্ষ পর্য্যন্ত (১২৬৫ খ্রীঃ—১৩৫৬ খ্রীঃ) তিনি বিবরণ দিয়াছেন। সেই সময়ে তাঁহার বয়স ৭২ বৎসর ছিল। তাঁহার পিতৃব্য আলা-উল-মুলক, আলাউদ্দিন খিলজির রাজত্বকালে দিল্লী সহরের কোতোয়াল ছিলেন। তাঁহার পিতা মুবাইয়াদ-উল-মুলক সেই সময়ে বুলন্দ সহরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

—একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত। মূলতানের নিকটবর্ত্তী ভিল্লমল্ল গ্রামে তাঁহার বাসস্থান ছিল। তাঁহার পুত্র বিখ্যাত ব্রহ্মগুপ্ত (জন্ম ৫৯৮ খ্রীঃ) ৫৫০ শকে (৬২৮ খ্রীঃ) স্বীয় ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করেন।

জিষ্ণুগুপ্ত—তিনি নেপালের একজন প্রাচীন রাজা। তাঁহার নামীয় যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহার একদিকে পক্ষযুক্ত সিংহমূর্ত্তি ও 'শ্রীজিষ্ণু গুপ্তস্য' লিখিত আছে। দ্বিতীয় দিকে একটী চিহ্ন মাত্র। তাঁহার একটী শিলালিপিও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

জিহুনিয়—একজন শক জাতীয় সামন্ত নরপতি। তাঁহার পিতার নাম মণিগুল। তাঁহার রজত ও তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। রজত মুদ্রার একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তি ও অপরদিকে নগর দেবতাকর্ত্তৃক রাজার অভিষেকের চিত্র আছে। প্রথম প্রকার তাম্রমুদ্রার একদিকে বৃষ অপর দিকে সিংহ, দ্বিতীয় প্রকার তাম্র মুদ্রার একদিকে হস্তী ও অপরদিকে বৃষমূর্ত্তি। এই নরপতি পারদ ও কুষাণ বংশীয়দের সামন্ত নরপতি ছিলেন।

জীবক—তিনি মহাত্মা বুদ্ধদেবের চিকিৎসক ছিলেন। তক্ষশীলা নগরের চিকিৎসকদের পরিচর্য্যা করিয়া তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করেন। বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে, জীবক কুমার ভৃত্য (পালি কোমার ভচ্চ) বুদ্ধদেবের জীবিতকালে একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। তিনি তক্ষশিলাতে আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য আত্রেয়ের নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মগধরাজ বিম্বিসারের অন্যতম পুত্র অভয় তাঁহার পালক পিতা ছিলেন। জীবক বৌদ্ধসংঘ ও মগধরাজ বিম্বিসার, অজাতশত্রু প্রভৃতির চিকিৎসা করিতেন। তিনি শিশু চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল কুমার ভৃত্য। মতান্তরে বিম্বিসার তনয় রাজকুমার অভয়কর্ত্তৃক পালিত হন বলিয়া তাঁহার নাম হয় 'কুমার ভৃত্য'।

জীব গোস্বামী—তিনি কর্ণাটের অধিপতি বিপ্ররাজের বংশোদ্ভব সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর বল্লভ গোস্বামীর পুত্র ছিলেন। তিনি 'হরিনামামৃত ব্যাকরণ,' 'সূত্রমালিকা,' 'কৃষ্ণার্চ্চন দীপিকা,' 'গোপাল বিরুদ্ধাবলী,' 'মাধব মহোৎসব,' 'সঙ্কল্প কল্পবৃক্ষ,' ও ভাবার্থ সূচক 'চম্পু' প্রভৃতি বহু সংস্কৃত পুস্তক রচনা করেন। জীব গোস্বামীর পূর্ব্ব পুরুষ বিপ্ররাজ কর্ণাট দেশের রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধের রূপেশ্বর ও হরিহর নামে দুই পুত্র জন্মে। রূপেশ্বর স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া পৌরস্ত দেশের অন্তর্গত শেখরে আসিয়া বাস

করেন। এই রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ নৈহাটিতে বাস করিতেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র—পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ। মুকুন্দের পুত্র কুমার-দেব বাকলা চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত ফতেয়া-বাদ নামক স্থানে বাস করিতেন। কুমার দেবের পুত্র—রূপ, সনাতন ও বল্লভ। এই বল্লভের পুত্র জীবগোস্বামী। তিনি ২০ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনে আসিয়া ৬৫ বৎসর এখানে অতিবাহিত করেন। তিনি অতিশয় সুন্দর ছিলেন বলিয়া, বাল্যকালে তাঁহার নাম অনুপম ছিল। নিত্যানন্দের আদেশে তিনি বৃন্দাবন-বাসী হন। তৎপূর্ব্বে তিনি কাশীতে তপন মিশ্রের আবাসে উপস্থিত হইয়া, মধুসূদন বাচস্পতির নিকট বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া, জ্যেষ্ঠতাত রূপগোস্বামীর গ্রন্থ রচনায় সহায়তা করিতে থাকেন। তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তৎ-কালে বৃন্দাবনে সমাগত সকল পণ্ডিতকেই তিনি বিচারে পরাস্ত করিয়া ছিলেন। একবার শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত বল্লভ ভট্ট গোস্বামী সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। রূপগোস্বামী তখন ভক্তি রসামৃতসিন্ধু দেখিতে দেন। বল্লভ ভট্ট তাহার মঙ্গলাচরণে ভ্রম প্রদর্শন করেন। জীব গোস্বামী বল্লভ ভট্টকে বিচারে পরাস্ত করিয়া ইহা যে ভুল নহে, তাহা প্রদর্শন করেন। ইহাতে বিনয়ের অবতার রূপগোস্বামী অতি-মাত্র দুঃখিত হইয়া, তাঁহাকে মৃদু তিরস্কার করিয়া, তাঁহাকে তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে আদেশ দেন। জীব গোস্বামী, এই আদেশ পাইয়া অতিমাত্র দুঃখিত হৃদয়ে এক নির্জন বনে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে এক-দিন সনাতন গোস্বামী তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। জীব গোস্বামী জ্যেষ্ঠতাতের পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। তাঁহার কৃচ্ছ্র সাধন দর্শনে সনাতন বড়ই দুঃখিত হইলেন। এই অবস্থা রূপগোস্বামীকে জানাইলে দয়ার্দ্রহৃদয় রূপগোস্বামী তাঁহাকে স্বীয় সমীপে আসিতে অনুমতি দিলেন। জ্যেষ্ঠতাতের সস্নেহ ব্যবহারে জীব গোস্বামী সুস্থ দেহ হইলেন। রূপ গোস্বামী গোবিন্দজীর, সনাতন গোস্বামী মদনমোহন জীর ও জীব গোস্বামী রাধাদামোদর জীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া, তৎতৎ বিগ্রহের পূজায় নিযুক্ত ছিলেন।

বৃন্দাবনে যে ছয়জন গোস্বামী বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন তন্মধ্যে জীব গোস্বামী অন্যতম।

শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ॥

রূপ ও সনাতন গোস্বামীর তিরো-ভাবের পর জীব গোস্বামীই বৃন্দাবনের বৈষ্ণব সমাজের পরিচালক হইয়া-ছিলেন। দুঃখী কৃষ্ণদাস, নরোত্তম

ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতি তাঁহার নিকট বৈষ্ণব শাস্ত্র ও ভক্তি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। পরম ভাগবত জীব গোস্বামী বৃন্দাবনেই ১৬১৮ খ্রীঃ অব্দে দেহ রক্ষা করেন।

জীবদাস—তিনি সৌরাষ্ট্রের শক জাতীয় নরপতি দামজদশ্রীর অন্যতম পুত্র। তাঁহার মুদ্রায় ১০০ হইতে ১২০শ শকাব্দের (১৭৮—১৯৮ খ্রীঃ) উল্লেখ আছে। জীবদাসের পরে তাঁহার পিতৃব্য রুদ্রসিংহ রাজা হইয়াছিলেন।

জীবন চক্রবর্ত্তী—তাঁহার পিতার নাম নারায়ণ চক্রবর্ত্তী। তিনি 'কৃষ্ণ মঙ্গল' নামে একখানা কাব্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের উপাখ্যান ভাগ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে গৃহীত। এতদ্ব্যতীত 'দান খণ্ড' ও 'নৌকা খণ্ড' নামেও তাঁহার দুইখানা গ্রন্থ আছে।

জীবনদ—একজন তীর্থোপাসক সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী। তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা বিন্দু চিহ্ন ধারণ করিতেন। তাঁহাদের মতে তীর্থ সেবাই সমুদয় সুখের মূল। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বীয় মতে আনয়ন করিয়াছিলেন।

জীবনধারণ পরমেশ্বর—গুপ্তবংশীয় রাজাধিরাজ আদিত্য সেন (৭ম খ্রীঃ শতাব্দা) যখন রাজ্য বিস্তারে প্রয়াসী হইয়া পূর্ব্ব ভারত জয় করিতেছিলেন, সেই সময়ে বঙ্গের নরপতি জীবনধারণ-পরমেশ্বর, তাঁহাকে রাজ্য বিস্তারে বার বার বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় বঙ্গের এই সুসন্তানের বিষয় আর কিছুই জানা যায় না।

জীবন নাথ—এই জ্যোতিষী পণ্ডিতের রচিত 'বস্তুরত্নাবলী' গ্রন্থ অতিশয় প্রসিদ্ধ।

জীবন নাথ শর্ম্মা—তিনি ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে একখানা বীজগণিত রচনা করেন। তিনি 'ভাবপ্রকাশ' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থেরও রচয়িতা।

জীবন মৈত্র কবি—তাঁহার জন্মস্থান বগুড়া জেলার অন্তর্গত লাহিড়ী পাড়া গ্রাম। তাঁহার পিতামহের নাম বংশীবদন মৈত্র, পিতার নাম অনন্তরাম মৈত্র ও মাতার নাম স্বর্ণমালা দেবী, সহধর্ম্মিনীর নাম ব্রজেশ্বরী। ১১৫১ বাঙ্গালা সালে (১৭৪৪ খ্রীঃ) তিনি বিষহরি পদ্মপুরাণ বা মনসার ভাসান নামে এক খানা গ্রন্থ রচনা করেন।

জীবনাথ শর্ম্মা—(১) একজন জ্যোতিষ পণ্ডিত। ১৭৭০ শকে (১৮৪৮ খ্রীঃ) তিনি একখানা বীজগণিত রচনা করেন। 'ভাব প্রকাশ' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থও তাঁহার রচিত।

জীবনাথ শর্ম্মা—(২) 'বাস্তুরত্নাবলী' গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

জীবশর্ম্মা—তিনি একজন জ্যোতিষ

শাস্ত্রের জাতক গ্রন্থের প্রণেতা। বরাহ তাঁহার বৃহজ্জাতকে অন্যান্য জাতককারের সহিত জীবশর্ম্মারও নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

জীবাগর্জ্জর— একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত। তাঁহার পিতার নাম নরহরি। তিনি 'প্রশ্নসার' নামক জাতক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

জীবিত গুপ্ত (প্রথম)—মালবের গুপ্ত বংশীয় নরপতি হর্ষগুপ্তের পুত্র। তাঁহার পুত্র কুমারগুপ্ত। মালবের গুপ্তবংশের সহিত কনৌজের মৌখরীবংশীয়দের চির শত্রুতা ছিল। জীবিত গুপ্তের সহিত কনৌজের ঈশ্বরবর্ম্মার ঘোরতর যুদ্ধ হয়।

জীবিত গুপ্ত (দ্বিতীয়)—খ্রীঃ ৬০৬ অব্দে হর্ষবর্দ্ধন কর্ত্তৃক মালবের দেব গুপ্ত হত হন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মালবের গুপ্তবংশের অবসান হয়। কিন্তু দেবগুপ্তের অপর ভ্রাতা মাধবগুপ্ত মগধে যাইয়া রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। জীবিত গুপ্ত (দ্বিতীয়) এই মাধবগুপ্তেরই বংশধর ও বিষ্ণুগুপ্তের পুত্র ছিলেন। মাধবগুপ্ত দেখ

জীমূত বাহন—বঙ্গের স্বাধীন হিন্দু নরপতি সেন রাজদের সময়ে তিনি 'দায়ভাগ' নামে একখানা উৎকৃষ্ট ব্যবহার শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করেন ইহার ব্যবস্থা বাঙ্গলার বিশেষত্ব।

জীরা—আসামের কোচবংশের প্রতিষ্ঠাতা হরির মণ্ডল, হাজু নামক এক ব্যক্তির হীরা ও জীরা নামক দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। এই জীরা শিবসিংহ (অন্য নাম শিশু) নামে এক পুত্র প্রসব করেন। শিবসিংহ দেখ।

জুনাইদ খাঁ, শেখ—তিনি সম্রাট আওরঙ্গজীবকর্ত্তৃক ধর্ম্ম পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়া উড়িষ্যায় গমন করেন। যাহাতে হজরত মোহাম্মদের প্রবর্ত্তিত বিধি নিষেধ মানিয়া লোকে চলে, রোজা পালন ও নামাজ পড়ায় আভিনিবিষ্ট হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখা, 'কোরাণ' ও মুসলমান ধর্ম্মের নিন্দাকারীকে শাস্তি দেওয়া প্রভৃতি তাঁহার করণীয় ছিল। সেই জন্য তাঁহার দুইজন সহকারী ছিলেন। অন্যতম সহকারী রহমতউল্লা স্বীয় দুষ্কার্য্য ও আইন অমান্যের জন্য পদচ্যুত হইলে সৈয়দ মোহাম্মদ থায়ুম কাজী ও প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইলেন। খান দৌরাণ যখন উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন, সেই সময়ে কেন্দ্র পাড়ার মন্দির ধ্বংস করিয়া তথায় একটি মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্রাটের অন্যতম সচীব আসাদ খাঁ সুবাদারকে লিখিলেন যে, 'সম্রাটের আদেশ, মেদিনীপুরের অন্তর্গত তিল কুটীর নব নির্ম্মিত মন্দির ও দেশের কাফেরদের অন্যান্য মন্দির সব ধ্বংস করিতে হইবে। সম্রাটের আদেশ প্রাপ্তি মাত্র তোমাকে পূর্ব্বোক্ত মন্দির

ধ্বংস করিতে হইবে। গত দশ বার বৎসরের মধ্যে ইষ্টক নির্ম্মিত অথবা মৃত্তিকা নির্ম্মিত যত মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে সমুদয় ধ্বংস করিতে হইবে। বলাবাহুল্য পুরাতন মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার রহিত করিতে হইবে।' খুর্দ্দার রাজা দিব্যসিংহ পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের রক্ষক ছিলেন। দিব্যসিংহ মন্দির প্রবেশ পথের রাক্ষস মূর্ত্তিটী ভগ্ন করিতে ও মন্দিরের কাষ্ঠ নির্ম্মিত মূর্ত্তি আওরঙ্গজীবের নিকট পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। (১৭ই মে ১৬৯৭ খ্রীঃ)।

জুনাইদ বারলাদ—তিনি মুঘল সম্রাট বাবরের অধীনে জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৫৩০ খ্রীঃ অব্দে বাবরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই স্থানে স্থানে আফগাণ সর্দ্দারেরা বিদ্রোহী হয়। লোদী বংশীয় শেষ নরপতি ইব্রাহিম খাঁর ভ্রাতা মামুদ লোদী, একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, জৌনপুরের মুঘল শাসন কর্ত্তা জুনাইদ বারলাদকে পরাস্ত করিয়া তৎপ্রদেশ অধিকার করেন।

জুনা শাহ—দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ তুঘলকের ভাই। তিনিই বিখ্যাত জৌনপুর নগর স্থাপন করেন এবং উহা তাঁহারই নামে পরিচিত হয়।

জুনেদি—দিল্লীর সম্রাট আল্‌তামাসের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রুকনউদ্দিন রাজা হইয়াছিলেন। এই সময়ে প্রধান মন্ত্রী জুনেদি ও অন্যান্য অনেক সর্দ্দার বিদ্রোহী হন। রুকন উদ্দিন বিদ্রোহ দমন করিতে লাহোর অভিমুখে গমন করিলে, অন্যান্য সর্দ্দারেরা তাঁহার ভগিনী রেজিয়াকে রাজপদ প্রদান করেন। জুনেদি দিল্লির সিংহাসন লাভের চেষ্টায় সুলতানা রেজিয়ার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হন

জুনেদি খাঁ—তিনি দিল্লীর পাঠান সুলতান রুকুন উদ্দিনের (১২৩৫ খ্রীঃ) প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তিনি বিদ্রোহী হন। রুকুন উদ্দিনের মৃত্যুর পরে সুলতানা রিজিয়া ১২৩৬—১২৩৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সেই সময়েও তিনি রিজিয়ার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন কিন্তু পরাস্ত হইয়াছিলেন।

জুমর নন্দী—বাঙ্গালী বৈয়াকরণিক। 'সংক্ষিপ্ত সার" নামক ব্যাকরণের তিনি একখানা টীকা রচনা করেন। ঐ গ্রন্থের নাম রসবতী। জুমর নন্দী খুব সম্ভব মুর্শিদাবাদ জিলার অধিবাসী এবং খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

জুলফিকার আলি—একজন ফারসী গ্রন্থকার। তাঁহার কবিজন সুলভ নাম "মস্ত"। তিনি অনেক ফারসী ও উর্দ্দু কবিদের জীবন চরিত রচনা করেন। ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দে ঐ গ্রন্থ সমাপ্ত হয়।

জুলফিকর খাঁ, আমীরউলউমরা—তিনি নসরতজঙ্গ নামেও অভিহিত

হইতেন। তাঁহার পূর্ব্ব উপাধি ইয়াকদ খাঁ ছিল। তাঁহার পিতার নাম আসাদ খাঁ। এমনিউদ্-দৌলা আসক খাঁর কন্যা মেহেরউন্নিসা বেগম তাঁহার মাতা ছিলেন। ১৬৫৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। জুলফিকর খাঁ সম্রাট আওরঙ্গজীবের সময়ে নানা উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পরে সম্রাট বাহাদুর শাহের সময়ে (১৭০৭—১২ খ্রীঃ) তিনি দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী প্রাপ্ত হন। তাঁহারই মন্ত্রণা কৌশলে বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জাহান্দর শাহ, অপর ভ্রাতাদিগকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন। বলা বাহুল্য কার্য্যের সফলতার পুরস্কার স্বরূপ জুলফিকর খাঁ প্রধান মন্ত্রী হইলেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই ফরোকশিয়ার, জাহান্দর শাহকে পরাজিত ও নিহত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন। সেই সময়ে জুলফিকর খাঁও অতি নিষ্ঠুররূপে নিহত হন।

জুস্ক—কাশ্মীরে তুরস্কবংশীয় হুষ্ক, জুস্ক ও কনিষ্ক নামে তিনজন রাজা বুদ্ধের মৃত্যুর দেড়শত বৎসর পরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন এবং বহু বৌদ্ধ মন্দির ও চৈত্যাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

—তিনি রাষ্ট্রকূট বংশীয় নরপতি। তাঁহার পুত্র কক্কধাজ ও পৌত্র পরবল

জেতকর্ণ ভদ্র—তিনি ও তাঁহার সহকারী পণ্ডিত সূর্য্যরাজ শ্রীভদ্র, নেপালে অবস্থানপূর্ব্বক 'বুদ্ধস্য স্তোত্র' নামক গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন।

জেতারি বা আচার্য্য জেতারি—তিনি খ্রীঃ দশম শতাব্দীতে বরেন্দ্র ভূমিতে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন মগধের পালবংশীয় নরপতি মহীপালের সামন্ত নরপতি সনাতনের সভাপণ্ডিত জেতারির পিতা গর্ভপাদ ছিলেন। আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তিনি বৌদ্ধ দেবতা মুঞ্জশ্রীর উপাসক হন। মগধপতি মহীপাল তাঁহাকে পণ্ডিত উপাধি প্রদান পূর্ব্বক বিক্রমশিলার অধ্যক্ষ পদে বরণ করেন। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকখানা উৎকৃষ্ট দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। (ক) 'হেতুতত্ত্ব উপদেশ' এই গ্রন্থে তিনি মধ্যপদের যথার্থ প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ইহার মূল সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায় না। কিন্তু পণ্ডিত কুমারকলস কৃত ইহার তিব্বতীয় অনুবাদ রহিয়াছে। (খ) 'ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনিশ্চয়' গ্রন্থের মূল সংস্কৃত এখন পাওয়া যায় না কিন্তু তিব্বতীয় অনুবাদ আছে। (গ) 'বালাবতারতর্ক' বালকদিগের তর্কশাস্ত্র। ইহারও সংস্কৃত মূল পাওয়া যায় না। আচার্য্য নাগরক্ষিত কৃত উহার তিব্বতীয় অনুবাদ পাওয়া যায়।

জেব-উন্-নিসা, বেগম—মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজীবের জ্যেষ্ঠা কন্যা ১৬৩৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার মাতার নাম দিলরস বানু বেগম। তিনি চির-কুমারী ছিলেন এবং অতি ধার্ম্মিকা, পরোপকারিণী বলিয়াও তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। পিতার যত্নে তিনি সুশিক্ষা লাভ করেন এবং পরবর্ত্তী জীবনে কবিতা রচনায় পারদর্শীতার পরিচয় প্রদান করেন। আজীবন ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ, ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা প্রভৃতিতে রত থাকিয়া তিনি পবিত্র নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপন করেন। প্রায় ছিষট্টি বৎসর বয়সে দিল্লীতে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং দিল্লীরই প্রান্তবর্ত্তী এক বিস্তৃত উদ্যানে তাঁহার দেহ সমাহিত করা হয়।

জেশর মাছি শোলাঙ্কী—(জয়-সিংহ ?) মুসলমানেরা মুলতান অধি-কার করিয়াও শাসন কার্য্যের সৌকা-র্য্যার্থ হিন্দু কর্ম্মচারীই নিযুক্ত করিতেন। এই শোলাঙ্কী বংশীয় জেশর মাছি মানিকতারা নামক স্থানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

জৈতজী—খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ রাজ-পুতানা পর্য্যটনকালে জৈতজী নামে দাদু পন্থী এক ভক্তের সাক্ষাৎ পান। তাঁহার সহিত গোবিন্দ সিংহের ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক আলাপ হয়। জৈতজী গোবিন্দ সিংহকে বুঝাইতে চেষ্টা পান যে, অক্রোধের দ্বারা ক্রোধ দমন এবং সাধুতার দ্বারা অসাধুতার দমন করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। গুরু গোবিন্দ অবশ্য তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই।

জৈত্রপাল—(১) যাদব বংশীয় বিল্লম-দেবের পুত্র। বরঙ্গলের কাকতীয়েরা জৈত্রপাল কর্ত্তৃক অত্যাচারিত হইয়া-ছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পুত্র সিঙ্গনের সময় হইতেই দেবগিরির যাদববংশের বিশেষ উন্নতি হয়।

জৈত্রপাল—(২) জনৈক স্বাধীন নর-পতি। তিনি প্রসিদ্ধ ভাস্করাচার্য্যের পুত্র লক্ষ্মীধরকে স্বীয় সভাপণ্ডিত পদে বরণ করিয়াছিলেন। তিনি খ্রীঃ দ্বাদশ শতা-ব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

জৈন খাঁ—মেদিনীপুরের অন্তর্গত হিজলীর নবাব তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলার তিনি জামাতা ছিলেন। ১৬৫১ খ্রীঃ অব্দে তাজ খাঁর পরলোক গমনের পর তিনিই হিজলীর নবাব হন। এই সময়ে তাজ খাঁর পুত্র বাহাদুর খাঁ ঢাকায় ছিলেন। ১৬৬০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত জৈন খাঁ নবাব ছিলেন। তৎপরে বাহাদুর খাঁ ঢাকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জৈন খাঁকে বিতা-ড়িত করিয়া হিজলী রাজ্য অধিকার করেন। জৈন খাঁ বাদশাহী সৈন্যের সাহায্যে বাহাদুর খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন কিন্তু সমরক্ষেত্রেই তিনি চিরকালের

জন্য শয়ন করেন। তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা দেখ।

জৈন মহাবীর—একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত 'গণিতসার সংগ্রহ' নামক গ্রন্থ তাঁহারই রচিত (৭৭৫ শক, ৮৫৩ খ্রীঃ)।

জৈমিনী—বেদব্যাসের শিষ্য জৈমিনী কর্ম্মমীমাংসা বা পূর্ব্বমীমাংসার রচয়িতা। ভারত-সংহিতা নামক একখানা গ্রন্থও তাঁহার রচিত। এই গ্রন্থের মাত্র অশ্বমেধ পর্ব্ব পাওয়া যায়, অন্য অংশ লুপ্ত। জৈমিনী প্রণীত সঙ্কর্ষণ কাণ্ড বৈষ্ণবদিগের এক খানা অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহা ভক্তি মীমাংসা গ্রন্থ। এই সকল গ্রন্থ প্রণেতা একই ব্যক্তি, না ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি তাহা বলা সহজ নহে। জৈমিনী হস্তীপেষণে নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

জোনরাজ— কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিনীর লেখক কহ্লন মৃত্যুমুখে পতিত হইলে (সম্ভবত ১১২৮ খ্রীঃ) জোনরাজ পরবর্ত্তী ১৪২০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইতিহাস রচনা করেন। তৎপরে তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীবর ১৪২০—১৪৮৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীরের ইতিহাস সঙ্কলন করেন। তৎপরে প্রাজ্যভট্ট শুখ ১৪৮৬—১৫৮৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত কাশ্মীরের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছিলেন।

জোন্‌স, সার উইলিয়ম (Sir William Jones)—ভারত প্রবাসী খ্যাতনামা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও বিচারপতি। ১৭৪৬ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডে তাঁহার জন্ম হয়। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ হ্যারো (Harrow) বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ১৭৭৩ খ্রীঃ অব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। তৎপূর্ব্বেই ফারসী ভাষায় লিখিত নাদির শাহের একখানি জীবন চরিত ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। তদ্ভিন্ন আরও নানাভাবে তিনি প্রাচ্যসাহিত্য প্রধানতঃ আরবী ও ফারসী সাহিত্যের চর্চ্চা করেন। ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে তিনি ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ রয়েল সোসাইটির (Royal Society) সদস্য (F. R. S.) মনোনীত হন। ১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কয়েক বৎসর নানা ভাবে বিভিন্ন প্রকারের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টের (Supreme Court) অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হইয়া ভারতে আগমন করেন। ঐ বৎসর তিনি সম্মানসূচক "সার" (Knight) উপাধি প্রাপ্ত হন।

সার উইলিয়ম জোন্‌স অন্যকারণে অধিকতর খ্যাতি লাভ করেন। এদেশবাসী ইংরেজদিগের মধ্যে তিনিই প্রথম সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। এইজন্য তাঁহাকে যে অশেষ কষ্ট স্বীকার ও

অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল তাহা বাস্তবিকই অতুলনীয়। তৎকালীন সামাজিক প্রথার জন্য কোনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই তাঁহাকে সংস্কৃত শিখাইতে সম্মত হন নাই। সার উইলিয়মের বিশেষ বন্ধু নদীয়ার মহারাজা শিবচন্দ্র অনেক চেষ্টা করিয়াও, উচ্চ বেতনের প্রলোভন দেখাইয়াও তাঁহার জন্য কোনও অধ্যাপক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। সার উইলিয়ম স্বয়ং নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কাহাকেও সম্মত করাইতে পারেন নাই। অনেক চেষ্টার পর সালখিয়া নিবাসী রামলোচন কবিভূষণ নামে একজন বৈদ্য জাতীয় সুশিক্ষিত পণ্ডিত মাসিক পাঁচশত টাকা বেতনে এবং আরও অনেকগুলি কঠিন সর্ত্তে তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিতে সম্মত হইলেন। সর্ত্তগুলি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য বিবেচনায় সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল—অধ্যাপনার জন্য একটি একতলা গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে এবং উহার মেঝ শ্বেত প্রস্তরাবৃত করিতে হইবে। ঐ গৃহের ভূতল ও দেওয়াল যতদূর সম্ভব প্রত্যহ গঙ্গাজলে ধৌত করিতে হইবে। অধ্যাপক মহাশয় প্রাতঃকালে আগমন পূর্ব্বক, পার্শ্ববর্ত্তী অপর গৃহে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, কাষ্ঠাসনে উপবেশন পূর্ব্বক অধ্যাপনা করিবেন। কোনও প্রকার নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্য অথবা সার উইলিয়মের আহার ব্যপদেশে ব্যবহৃত দ্রব্য ঐ অধ্যাপনা গৃহে আনীত হইবে না। এই সকল সর্ত্ত ভিন্ন অধ্যাপক মহাশয় যাতায়াতের ব্যয়ও লাভ করিতেন। সার উইলিয়াম তখন খিদিরপুরে বাস করিতেন।

অসাধারণ অধ্যবসায় বলে সার উইলিয়াম শীঘ্রই সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পরে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ রচনা করেন এবং কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। তাহাদের মধ্যে মনুসংহিতা, শকুন্তলা গীতগোবিন্দ প্রভৃতি প্রধান। তদ্ভিন্ন সরকারী নির্দ্দেশে তিনি হিন্দু ও মুসলমান আইনের এক সার সঙ্কলন করেন। বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিতরূপে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

সার উইলিয়ামের আর এক কীর্ত্তি কলিকাতার প্রসিদ্ধ "এসিয়াটিক সোসাইটি" (The Asiatic Society of Bengal) স্থাপন। এই সমিতির স্থাপয়িতারূপে তিনি চিরদিন ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়া থাকিবেন।

অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং ১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা নগরেই তাঁহার দেহান্ত হয়।

জোরিয়া—চিতোরের মহারাণা খোমানের আহ্বানে যে সকল স্বদেশ প্রেমিক

মহাবীর স্বদেশ শত্রু মুসলমানদিগকে তাড়াইবার জন্য খোমানের পতাকা-তলে সম্মিলিত হইয়াছিলেন, জিত-গড়ের অধিপতি জোরিয়া তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। খোমান দেখ।

জ্ঞানগর্ভ—বৌদ্ধস্থবির ও দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি নাগার্জ্জুন রচিত "মূল-মাধ্যমিক বৃত্তি অকুতোভয়" নামক গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।

জ্ঞানচন্দ্র—খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর এক জৈন নৈয়ায়িক। তাঁহার গুরুর নাম রাজশেখর সূরী। গুরুর আদেশে তিনি "রত্নাকরাবতারিকা টীপ্পন" নামে এক-খানি গ্রন্থ রচনা করেন। উহাতে বৌদ্ধ দার্শনিক দিঙ্‌নাগ প্রমুখের মত আলোচিত হইয়াছে।

জ্ঞান দাস—তিনি একজন পদকর্ত্তা। তাঁহার রচিত ১৯৪টী পদ পাওয়া গিয়াছে। তিনি ১৫৩০ খ্রীঃ অব্দে কাটোয়ার দশ মাইল পশ্চিমে কাঁদরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত গ্রামে জ্ঞান দাসের একটি মঠ এখনও বর্ত্তমান আছে। তথায় প্রতি বৎসর পৌষ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে তিন দিন ব্যাপী একটি মেলা বসিয়া থাকে।

জ্ঞান দেব—মহারাষ্ট্র ভাষার আদি কবি জ্ঞানদেব, দেবগিরির যাদববংশীয় শেষ স্বাধীন নরপতি রামদেবের সময়ে (১২৭১—১৩০৯ খ্রীঃ) বর্ত্তমান ছিলেন

জ্ঞানপূর্ণ— খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর একজন দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি বরদারাজ কৃত "তার্কিক রক্ষা" নামক গ্রন্থের "লঘুদীপিকা" নামে একখানি টীকা রচনা করেন। জ্ঞানপূর্ণ (নামান্তর জ্ঞানদেব) বিষ্ণুস্বামীর শিষ্য ছিলেন।

জ্ঞান বজ্র—যে সমুদয় ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতে গমনপূর্ব্বক সংস্কৃতে লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্র তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন তিনি তাঁহা-দের অন্যতম।

জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালী অধ্যাপক ও শিক্ষাব্রতী। তিনি সাধা-রণের মধ্যে জে, আর, ব্যানার্জি নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রেভাঃ প্রসন্নকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়। তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। হুগলী জিলার অন্তর্গত সোনার-টিকরিতে জ্ঞানরঞ্জনের জন্ম হয় (অনুঃ খ্রীঃ ১৮৭৯ অব্দ)। ঐ সময়ে তাঁহার পিতা তত্রস্থ খ্রীষ্টিয় প্রচারাশ্রমের ভারপ্রাপ্ত ধর্ম্মযাজক ছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই জ্ঞানরঞ্জন মেধাবী ও কৃতী ছাত্ররূপে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। মাত্র তের বৎসর বয়সে তিনি শ্রীরামপুর কলেজিয়েট স্কুল হইতে (১৮৮২ খ্রীঃ) প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে যথা সময়ে ডাফ্ কলেজ হইতে এফ্-এ ও বি-এ পরী-ক্ষায় উত্তীর্ণ হন।. : শেষোক্ত পরীক্ষায় তিনি ইংরেজ ও দর্শনশাস্ত্রে প্রথম

বিভাগে সম্মানের সহিত (Honours) উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি দর্শনশাস্ত্রে এম্-এ উপাধি লাভ করেন। এইবারেও তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করিয়া, মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে, তিনি (অধুনা লুপ্ত) ডাফ্ কলেজে ইংরেজি ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। দুই বৎসর পরে তিনি মেট্রপলিটান ইনষ্টিটিউসনের (Metropolitan Institution ; বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) যোগদান করেন এবং একাদিক্রমে বিয়াল্লিশ বৎসর কাল তিনি ঐ কলেজে অধ্যাপনা করেন। কর্ম্ম জীবনের শেষভাগে নয় বৎসর সহকারী-অধ্যক্ষ (Vice-Principal) এবং অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়ের মৃত্যুর পর, কয়েক বৎসর অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৩৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি বিদ্যাসাগর কলেজের কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দুই বৎসর রিপণ কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন।

কর্ম্ম জীবনের বহু বৎসর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ছিলেন এবং অনেক বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট এম্-এ বিভাগে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ অনেক কাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল এবং দুই বৎসর ফ্যাকাল্টি অব আর্ট্স এর (Faculty of Arts) সভাপতিও (Dean) হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালী খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের তিনি অন্যতম বিশিষ্ট নেতা ছিলেন এবং স্বীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কার্য্যাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করিতেন। স্বয়ং স্বধর্ম্মনিষ্ঠ খ্রীষ্টান হইলেও, তিনি অন্যান্য ধর্ম্ম মতের প্রতিও শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র শুধু খ্রীষ্ট-সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। মদ্যপান নিবারণ, লোক শিক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ জনহিতকর কাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। রাজনীতিতে তিনি উদার মতাবলম্বী (Moderate) ছিলেন। লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া, তিনি কাজ করিতেই বিশেষ ইচ্ছা করিতেন। সেই জন্যই সংবাদ পত্রের ঢক্কানিনাদে তাঁহার কীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইবার সুযোগ পায় নাই

জ্ঞানরঞ্জন সুবক্তা ছিলেন। ইংরেজি ভাষাতে তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা শ্রোতাকে মুগ্ধ করিত। তাঁহার পাণ্ডিত্যও বিভিন্নমুখী ছিল। তিনি একাধারে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও অর্থনীতিতে কৃতী ছিলেন এবং অধ্যাপনাকালে দেশবিদেশের বিশেষজ্ঞদের রচনাবলীর সহিত পরিচয় দিয়া তিনি পঠিতব্য বিষয়গুলি ছাত্রদের বিশেষ মনোজ্ঞ করিয়া তুলিতে পারিতেন। গত

অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে যে কয়জন অধ্যাপক ও শিক্ষাব্রতী মনীষা ও পাণ্ডিত্যের দ্বারা বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, জ্ঞানরঞ্জন তাঁহাদের অন্যতম। নিরহঙ্কার, অমায়িক, মিষ্টভাষী জ্ঞানরঞ্জন সকল পরিচিত লোকেরই প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

১৯৩৮ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে (ভাদ্র, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে) কলিকাতা নগরীতে প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

জ্ঞান রাজ—গোদাবরী ও বিদর্ভা (বর্ত্তমান বর্দা) নদীর সংযোগ স্থলের এক ক্রোশ উত্তরে পার্থপুর নামে একটী গ্রাম ছিল ; তথায় ভরদ্বাজবংশীয় জ্ঞানরাজ এক বিখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম নাগনাথ। জ্ঞান রাজ ১৫০৩ খ্রীঃ অব্দে (১৪২৫ শকে সিদ্ধান্ত সুন্দর নামক জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত রচনা করেন। তাঁহার পুত্র সূর্য্য দাস বা সূর্য্য সূরী ১৫৩৮ খ্রীঃ অব্দে (১৪৬০ শকে) ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতীর উপর 'গণিতামৃত কূপীকা' নাম্নী এক উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন। (সূর্য্য দাস ও নাগনাথ দেখ)। জ্ঞান রাজের শিষ্য ঢুণ্ডিরাজও একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ছিলেন। জ্ঞান রাজের পুত্র চিন্তামণি জ্ঞানরাজ কৃত সিদ্ধান্তরাজ গ্রন্থের এক উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন।

জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী, কাব্যানন্দ, এম, এ ; পি, আর, এস ; এম, আর, এ, এস—তিনি চন্দন নগরের অধিবাসী। তাঁহার পিতার নাম বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী। তিনি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট কৃতী ছাত্র। প্রথমে তিনি অধ্যাপক, পরে মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান, শেষে কণ্ট্রোলার জেনারেলের কাজ করেন। মহীশূর রাজ্যে ও ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের নিকট তিনি বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তন্মধ্যে আহ্নিকম্, উচ্ছাস, লক্ষ্মীরাণী (নাটক) লোকালোক (কাব্য), মধ্যলীলা (নাটক) পিপাজী (নাটক), Solutions of Differential Equations ; Agricultural Insurance ; Theory of Thunderstorm ; The Language Problem of India প্রভৃতি চিন্তাপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ প্রধান। ১৩৩১ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

জ্ঞানশ্রী ভদ্র—বৌদ্ধ নৈয়ায়িক। কাশ্মীরের এক ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম হয়। বয়োপ্রাপ্ত হইয়া তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং উক্ত ধর্ম্ম প্রচারার্থ তিব্বতে গমন করেন। তথায় বাস করিবার সময়ে তিনি অনেক বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিতে সহায়তা করেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রণীত "প্রমাণ বিনিশ্চয়ের" তিনি একখানি টীকা রচনা করেন। মূল গ্রন্থ-

খানি দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু তিব্বতীয় ভাষায় তাহার একখানি অনুবাদ আছে।

জ্ঞানশ্রী মিত্র—প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ শিক্ষা-কেন্দ্র বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম দ্বাররক্ষক অর্থাৎ এক বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। প্রথমে তিনি শ্রাবক মতানুসারী ছিলেন। পরে মহাযান মত অবলম্বন করেন। তিনি "কার্য্যকারণ ভাবসিদ্ধি" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। মূল গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য। তিব্বতীয় ভাষায় উহার একখানি অনুবাদ আছে।

জ্ঞানহরি দাস—বাঙ্গালী বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। তাঁহার রচিত ২টী পদ আছে।

জ্ঞানানন্দ স্বামী—হরিদ্বারের ওঁঙ্কার মঠের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার জন্মস্থান ত্রিপুরা জিলার কমলাসাগর রেল ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী মজলিশপুর গ্রাম। পিতার নাম পদ্মলোচন রায়। তাহার গৃহস্থাশ্রমের নাম নিবারণচন্দ্র রায়। বারবর্ষ বয়ক্রমকালেই তিনি গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া ভারতের বহু তীর্থ পদব্রজে ভ্রমণ করেন। দেশবন্ধুর আহ্বানে তিনি একবার তারকেশ্বর সত্যাগ্রহেরও পরিচালনা করেন। তিনি স্বীয় গ্রামেও একটী ওঁঙ্কার মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৩৪৫ সালের ৬ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার চন্দন নগরে তিনি স্বীয় শিষ্য সরোজকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে দেহরক্ষা করেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ মল্লিক—কলিকাতার বিখ্যাত ধনী ও সম্ভ্রান্ত নাগরিক। তিনি রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের পৌত্র ও কুমার সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের পুত্র। ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। জ্ঞনেন্দ্রনাথ জ্ঞানানুরাগী, ললিতকলাপ্রিয়, উদার সদালাপী পুরুষ ছিলেন। স্বয়ং চিত্রকলা নিপুণ ছিলেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় কলিকাতাস্থ মর্ম্মর প্রাসাদে (Marble Palace) দেশবিখ্যাত অমূল্য চিত্ররাজীর সমাবেশ সম্ভব হয়। ১৯২৭ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে (১৩৩৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ) তাঁহার মৃত্যু হয়।

জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর—কলিকাতার অন্তর্গত জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ ঠাকুর-পদবাধারী জমীদারবংশীয় প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র। খ্যাতনামা খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মাচার্য্য ও মনস্বী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট তিনি শিক্ষা লাভ করেন এবং তাঁহারই প্রভাবে খ্রীষ্টধর্ম্মে অনুরাগী হইয়া ঐ ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক, কৃষ্ণমোহনের কন্যা কমলমণিকে বিবাহ করেন। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করাতে প্রসন্নকুমার তাঁহাকে বিষয়সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করেন। প্রসন্নকুমারের মৃত্যুর পর, তাঁহার চরম পত্রের (Will) ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জ্ঞানেন্দ্রমোহন কলিকাতা হাইকোর্টে এবং ইংলণ্ডের প্রিভি কাউনসিলে (Privy Council) মকর্দ্দমা

করেন। তৎফলে স্থির হয় প্রসন্নকুমারের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্র মোহন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সম্পত্তির অধিকারী থাকিবেন, তাহার পর সমু- সম্পত্তি জ্ঞানেন্দ্র মোহন অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারী পাইবেন। যতীন্দ্র মোহনের জীবিত কালেই, জ্ঞানেন্দ্র মোহন সম্পত্তির ভাবীস্বত্ব, ইংলণ্ডের এক সিণ্ডিকেটের (Syndicate) নিকট বিক্রয় করেন এবং যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার দত্তক পুত্র প্রদ্যোত কুমার ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লন।

জ্ঞানেন্দ্র মোহন বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম ব্যারিষ্টার (Barricster) হন। কিন্তু তিনি প্রধানতঃ বিলাতেই অবস্থান করাতে আইন ব্যবসায় করিতে সমর্থ হন নাই। ইংলণ্ডেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়, মৃত্যুকালে দুই কন্যা ও এক দত্তক পুত্র বর্ত্তমান ছিল।

জ্ঞানেন্দ্র লাল রায়—তিনি কৃষ্ণ নগরের প্রসিদ্ধ দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয়ের অন্যতম পুত্র। তিনি এম, এ; বি, এল পাশ করিয়া উকিল হয়েন। পরে কৃষ্ণনগরের মহারাজ ক্ষৌণিশ চন্দ্রের দেওয়ান হইয়াছিলেন। তিনি পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্র লালের ন্যায় সাহিত্য সেবী ছিলেন। 'পতাকা' ও 'নবপ্রভা' নামক দুইখানা পত্রিকা তিনি কিছুদিন সম্পাদন করিয়া- ছিলেন। মধ্যে কিছু দিন তিনি 'বঙ্গবাসী' পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন।

জ্ঞানেশ্বর নাথ—খ্রীঃত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে নিবৃত্তি নাথের শিষ্য জ্ঞানেশ্বর মারাঠী ভাষায় 'জ্ঞানেশ্বরী' নামে গীতার এক ভাষ্য দশহাজার কবিতায় রচনা করেন। এই গ্রন্থ এখনও মহারাষ্ট্র দেশে অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত পঠিত হইয়া থাকে।

জ্ঞানোত্তম—(১) মধ্যযুগের শাঙ্কর পন্থী বৈদান্তিক পণ্ডিত। তিনি কাঞ্চিপুরের সর্ব্বজ্ঞপীঠ নামক মঠে প্রথমে শিক্ষার্থী ও পরে তথায়ই আচার্য্য ছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী আচার্য্যদের মধ্যে তিনি চতুর্থ ছিলেন।

জ্ঞানোত্তম (২)—ব্রহ্মস্তুতি; বিষ্ণুপুরাণ টীকা; ষড়দর্শন-সংগ্রহ বৃত্তি; অধিকরণ সঙ্গতি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা একজন জ্ঞানোত্তম আচার্য্যের নাম পাওয়া যায়। তাঁহার শিষ্যের নাম সুখপ্রকাশ।

জ্ঞানোত্তম মিশ্র—মাদ্রাজ প্রদেশের একজন বৈদান্তিক পণ্ডিত। তিনি নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধির উপর একখানি টীকা রচনা করেন। তাঁহার অন্যতম শিষ্য চিৎসুখও একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। তিনি খ্রীঃ দশম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়, রাজা—হুগলী জিলার অন্তর্গত উত্তর পাড়ার জমিদার রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহা- শয়ের পৌত্র ও হরিহর মুখোপাধ্যায়;

মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। ১২৫৫ বঙ্গাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আয় যেমন প্রচুর ছিল, সদ্ব্যয়ও তদনুরূপ ছিল। সঙ্গীত, কাব্য ও সাহিত্য-চর্চ্চার জন্য বহু ব্যক্তি তাঁহার নিকট বার্ষিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। এই বদান্য ভূমাধিকারী মহাশয়ের নিকট প্রার্থী হইয়া কেহ কখনও বিমুখ হয় নাই। দেশের সদনুষ্ঠানে তিনি প্রকাশ্যে দ্বিলক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার গোপন দানও যথেষ্ট ছিল। অর্থ উপার্জ্জন করা কঠিন, ততোধিক কঠিন অর্থের সদ্ব্যয় করা। এই সংযমী চরিত্রবান ধনী সন্তান যেমন উচ্চকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনই নানাবিধ সৎকার্য্য দ্বারা তাঁহার উচ্চ হৃদয়েরও পরিচয় দিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার এই সমস্ত সদ্‌গুণের জন্য ১৯১৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। এই সৎকর্ম্মনিষ্ঠ বদান্য রাজা ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ১৮ই মাঘ পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত সনৎ কুমার মুখোপাধ্যায় বাহাদুরও বহু পিতৃ গুণের অধিকারী হইয়াছেন।

জ্যোতিভূষণ সেন এম, এ,—তিনি একজন প্রকৃত অকপট ও উৎসাহী স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন। তিনি এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মহাত্মা গোখলের প্রতিষ্ঠিত পুনার "ভারত ভৃত্য সমিতি"তে (The Servant of India Society) যোগদান করেন। এক বৎসর শিক্ষাধীন সভ্য থাকিবার পর, সমিতি তাঁহাকে স্থায়ী সভ্য করিতে অভিলাষী হন। কিন্তু তিনি আরও দীর্ঘকাল বিবেচনা করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। চারি বৎসর পরে যখন আবার তাঁহাকে সভ্য করিবার প্রস্তাব উত্থাপন হয়, তখন তিনি বলিলেন যে, 'সমিতির সভ্যদিগকে যে সমুদয় প্রতিজ্ঞা করিতে হয়, তাহা তাঁহার পক্ষে ভয়োৎপাদক, সুতরাং তিনি সমিতির সভ্য না হইয়াও সেবক থাকিতে চাহেন।' বলা বাহুল্য সমিতি তাঁহার প্রার্থনা অতি শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেন। তাঁহার অতি লাভ জনক চাকুরী অনেক জুটিয়াছিল। কিন্তু অকৃত্রিম দেশ সেবক অম্লানবদনে তাহা উপেক্ষা করিয়া দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে ভারত সেবক পত্রিকায় (The Servant of India) লিখা হইয়াছিল যে, 'তাহা অপেক্ষা প্রেমিক স্বদেশ সেবক জন্মে নাই'। বড়ই দুঃখের বিষয় ১৩৩৪ সালে তাঁহার অকাল মৃত্যুতে ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশ তাঁহাদের একজন সুসন্তানকে হারাইয়াছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—খ্যাতনামা বাঙ্গালী সাহিত্যিক। তিনি কলিকাতা জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ ঠাকুর-বংশীয় প্রিন্স্‌ দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র এবং

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চম পুত্র। ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে (১২৫৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ) তাঁহার জন্ম হয়। পিতৃভবনের গুরুদেবের নিকটেই তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয় এবং পরে কিছুকাল অগ্রজ হেমেন্দ্রনাথের নিকট ইংরেজি পাঠ শিক্ষা আরম্ভ করেন। বয়োপ্রাপ্ত হইয়া, প্রথমে সেণ্ট পল্স (St. Paul's) তার-পরে মণ্টাগু একাডেমী (Montague Academy), হিন্দুস্কুল এবং শেষে কেশবচন্দ্রের Calcutta College এ অধ্যয়ন করেন। এই শেষোক্ত বিদ্যালয় হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসর প্রেসিডেন্সী (Presidency) কলেজে পড়েন। কিন্তু পরবর্ত্তী পরীক্ষা আর দেওয়া হয় নাই। দক্ষিণ ডিহির শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা কাদম্বিনী দেবীর সহিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। ১২৯১ বঙ্গাব্দে কাদম্বিনী দেবী পরলোক গমন করেন। তাহার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর বিবাহ করেন নাই। তাঁহার কোনও সন্তান ছিল না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, অভিনয় প্রভৃতি ললিত কলায় বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন এবং পরবর্ত্তী জীবনে তিনি প্রধানতঃ সাহিত্য চর্চ্চা করিলেও সঙ্গীত চর্চ্চায়ও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। কৈশোরেই নিজেদের আত্মীয়বর্গের দ্বারা অভিনয় করিবার জন্য তিনি 'অদ্ভুত নাট্য' নামে একখানি নাটক রচনা করেন। পরে বিভিন্ন সময়ে আবশ্যক বোধ করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ, পুরুবিক্রম, সরোজিনী, মানভঙ্গ, পুনর্বসন্ত, হিতে বিপরীত, অশ্রুমতী, বসন্তলীলা, অলীকবাবু প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন রচনা করেন। তাঁহার পুরুবিক্রম ও সরোজিনী নাটক সেই সময়ে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত অভিনীত হইত এবং সকল শ্রেণীর লোকের কাছে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। নাট্যাচার্য্য গিরিশ চন্দ্র তখনও নাট্যকাররূপে খ্যাতি লাভ করেন নাই। পুরুবিক্রম নাটকখানি গুজরাটি ভাষায় অনুবাদিত হয়। পুরু-বিক্রম নাটকেই, তাঁহার অগ্রজ সত্যেন্দ্র নাথের প্রসিদ্ধ স্বদেশ প্রেমোদ্দীপক সঙ্গীত 'গাও ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়' সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার সরোজিনী নাটক সেই সময়ে নাট্য জগতে নবযুগ আনয়ন করে।

সঙ্গীতরসজ্ঞ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই সঙ্গীত রচনা করিতে থাকেন। সেই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের পরিচালনাধীনে আদি ব্রাহ্মসমাজে কয়েকজন খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি সঙ্গীত করিতেন। তাঁহার পিতৃভবনেও অনেক সঙ্গীতবিশারদকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল। এই সকল বিশেষজ্ঞ-দিগের সংস্পর্শে আসিয়া জ্যোতিরিন্দ্র-

নাথও স্বীয় স্বভাবসুলভ প্রতিভাবলে অল্পকাল মধ্যেই সঙ্গীত আলাপন ও রচনায় ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করেন এবং ঐ সকল গায়কদের অনেক হিন্দি সঙ্গীতের অনুকরণে বাঙ্গালাতে অনেক পারমার্থিক সঙ্গীত রচনা করেন। এই সকল বিষয়ে তাঁহার অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁহার বিশেষ সহায় ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের সহিত বোম্বাই প্রবাস-কালে, তিনি উৎকৃষ্টরূপে সেতার বাজান এবং অনেক মারাঠী সঙ্গীতও শিক্ষা করেন। হারমোনিয়াম এবং পিয়ানো বাজানতেও তিনি বিশেষ সুদক্ষ ছিলেন।

নিজ আত্মীয় গোষ্ঠীদের লইয়া প্রথম কিছুকাল অভিনয়াদি করিয়া তাঁহারা অভিনয়োপযোগী বাঙ্গালা ভাল নাটকের অভাব বিশেষ অনুভব করেন। তখন ভাল বাঙ্গালা নাটকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয় এবং তৎফলে খ্যাতনামা নাটক লেখক রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়, নবনাটক রচনা করেন। নাট্যকারকে জ্যোতিরিন্দ্র নাথের পিতৃ ভবনে আহুত এক সভায় বিশেষরূপে অভ্যর্থনা করিয়া, পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দেওয়া হয় এবং নাটক খানিও উপযুক্ত আড়ম্বরে অভিনীত হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যৌবনকালে তাঁহাদের বাস ভবনে একটি সারস্বত সম্মিলন হইত। প্রধান ও খ্যাতনামা সাহিত্য সেবীগণের মধ্যে যাহাতে পরস্পর আলাপ পরিচয় হয় ও তাঁহাদের মধ্যে যাহাতে সদ্ভাব বর্দ্ধিত হয়, ইহাই সেই সম্মিলনের উদ্দেশ্য ছিল। ঐ সম্মিলনীর নাম ছিল বিদ্বজ্জন-সমাগম। বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায়, প্রমুখ সাহিত্য রথীগণ ঐ 'সমাগমে' উপস্থিত থাকিতেন।

১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরা কয়েকজন মিলিয়া 'সঞ্জীবনী সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করেন। মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু তাহার সভাপতি ছিলেন। জাতীয় হিতকর ও উন্নতিকর নানাবিধ কার্য্য অনুষ্ঠান ঐ সভার উদ্দেশ্য ছিল। সভ্যেরা সকলে মন্ত্রগুপ্তি পালন করিতেন। সভার কার্য্য পরিচালনার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে সাঙ্কেতিক ভাষা উদ্ভাবন করেন, তাহাতে 'সঞ্জীবনী সভা'র নাম হইত 'হামচুপামু হাফ'। ঐ সভার নির্দ্ধারণ অনুসারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এক অদ্ভুত সার্ব্বজনীন পোষাক উদ্ভাবন করেন এবং নিজে সেই পোষাক পরিয়া জনসমাজে বিচরণ করিয়া, মানসিক বলের পরিচয় প্রদান করেন। বলাবাহুল্য ঐ সার্ব্বজনীন পোষাক জনসমাজে আদৃত হয় নাই।

যৌবনের প্রারম্ভ হইতে স্বদেশ-প্রিয়তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট ছিল। তিনি যে পুরু-বিক্রম ও সরোজিনী নাটকদ্বয় রচনা

করেন, তাহার মূলে ছিল দেশের প্রতি লোকের মনে অনুরাগ ও স্বদেশ প্রীতি উদ্বোধিত করিবার ইচ্ছা। নবগোপাল মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিগণ যখন প্রথম হিন্দু মেলার অনুষ্ঠান করেন, তখন জ্যোতিরিন্দ্র নাথ প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ বিশেষ উৎসাহের সহিত তাহাতে যোগ দেন এবং মেলাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটি জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা পাঠ করা হয়। ঐ হিন্দু মেলাই প্রকৃত পক্ষে জাতীয় শিল্প প্রদর্শনীর পথ প্রদর্শক। পূর্ব্বোক্ত সঞ্জীবনী সভার নির্দ্ধারণ অনুসারে সভ্যেরা একটি দিয়াসালাইএর কল ও বস্ত্র বয়নের জন্য তাঁত স্থাপন করেন। দ্রব্য প্রস্তুতের ব্যয় বাহুল্য প্রভৃতি নানাকারণে ঐ সকল প্রচেষ্টা বন্ধ হইয়া যায়। পরবর্ত্তী জীবনে জ্যোতিরিন্দ্র স্বয়ং কলিকাতা হইতে খুলনা পর্য্যন্ত বাষ্পীয়পোত (Steamer) চালাইবার ব্যবস্থা করেন। এক্ষেত্রেও তিনি বাঙ্গালীর পথ প্রদর্শক ছিলেন। এই বিষয়ে একটি ইংরেজ কোম্পানীর সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার প্রতিযোগীতা চলে। দেশবাসীর সর্ব্বপ্রকার সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিলেও, দৈব প্রতিকূল হওয়ায় এবং আরও নানা-কারণে ঐ ব্যবসায় তিনি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তৎপূর্ব্বে পাটের ব্যবসায় ও নীলের চাষ করিয়া তিনি যে অর্থ লাভ করিয়াছিলেন, জাহাজ চালান ব্যবসায়ে তাহার সমুদয়ই নষ্ট হইয়া যায়।

জোড়াসাঁকোর পিতৃ ভবনে তৎ-কালসুলভ অবরোধ প্রথা বিশেষভাবে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের সহিত বোম্বাই বাসকালে তত্রত্য নারীদিগের মধ্যে অবরোধ প্রথার অভাব দর্শন করিয়া, বাঙ্গালা সমাজেও স্ত্রী স্বাধীনতা প্রচলন করিতে অভিলাষী হন এবং এবিষয়ে তিনি প্রথমেই যথেষ্ট মানসিক বলের পরিচয় প্রদান করেন। কাশীপুরে এক উদ্যান বাটীকায় অবস্থানকালে তিনি পত্নীকে অশ্বারোহণ শিক্ষা প্রদান করেন। পরে জোড়াসাঁকোর পৈতৃক ভবনে বাসকালে তাঁহারা উভয়ে অশ্বারোহণে কলিকাতার ময়দানে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। এজন্য জনসাধারণের বিদ্রূপ বা রহস্যকে তাঁহারা গ্রাহ্যই করিতেন না।

১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ উদ্যোগী হইয়া 'কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন' নামে একটি সভা স্থাপন করেন। ঐ সভা স্থাপনের তিনটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—(১ম) বঙ্গ ভাষার অভাব মোচন। (২য়) বঙ্গীয় গ্রন্থ সমালোচনা এবং (৩য়) বঙ্গ সাহিত্য অনুরাগীদিগের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্দ্য স্থাপন। রাজেন্দ্র লাল মিত্র উহার প্রথম সভাপতি ছিলেন। কিছুকাল সভার

কাজ বেশ ভালরূপেই চলিয়াছিল।

সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার অনুরাগের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বাঙ্গালা গানের স্বরলিপি যাহাতে সহজ বোধ্য ভাবে প্রকাশিত করা যাইতে পারে, সে বিষয়েও তিনি চিন্তা করিয়া প্রথমে 'ভারতী' পত্রিকাতে সংখ্যা মাত্রিক স্বরলিপি প্রকাশ করিতে থাকেন। শেষে আরও সহজ ও সরল ভাবে আকার মাত্রিক স্বরলিপি প্রকাশ করেন। এই শেষোক্ত প্রণালীর স্বরলিপি সাধনা পত্রিকাতে প্রকাশিত হইত এবং উহাই সর্ব্বসাধারণের মধ্যে গৃহীত ও প্রচলিত।

অগ্রজের সহিত বোম্বাই প্রদেশে থাকিবার সময়ে সঙ্গীতাদি চর্চ্চার সভা প্রভৃতি দেখিয়া, কলিকাতাতেও ঐরূপ একটি সভা স্থাপনের জন্য উৎসুক হন এবং কলিকাতার ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অর্থানুকূল্যে ও সাহায্যে 'ভারত সঙ্গীত সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বাটীতে উহার বৈঠক হইত, পরে অন্তর্বিরোধে উহা দুই দলে বিভক্ত হয়। এক পক্ষ কলিকাতার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ঐ নামে আর একটি 'সমাজ' স্থাপন করেন। সঙ্গীত সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকিবার সময়ে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথম প্রসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা ডোয়ার্কিন অ্যাণ্ড সন্স' (Dwarkin and Sons) এর অর্থানুকূল্যে 'বীণাবাদিনী' নামে একখানি পত্রিকা সম্পাদন করেন। পরে ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে 'সঙ্গীত প্রকাশিকা' নামে আর একখানি পত্রিকা সম্পাদন করেন। প্রথমোক্ত পত্রিকাখানি দুই বৎসর এবং শেষোক্ত পত্রিকাখানি দশ বৎসর চলিয়াছিল।

পূর্ব্বে যে নাটকাদির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেগুলি ভিন্ন জ্যোতিরিন্দ্র নাথ নিম্ন লিখিত বারখানি সংস্কৃত নাটক বাঙ্গালা ভাষাতে অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেন—অভিজ্ঞান শকুন্তলা, উত্তর চরিত, মুদ্রা রাক্ষস, রত্নাবলী, মালতী-মাধব, প্রবোধ চন্দ্রোদয়, বেণীসংহার, মহাবীর চরিত, মালবিকাগ্নি মিত্র, বিক্রমোর্ব্বশী, চণ্ডকৌশিক, নাগানন্দ, বিদ্ধশালভঞ্জিকা, ধনঞ্জয়বিজয়, কর্পূর-মঞ্জরী ও মৃচ্ছকটিক। এই সমস্তই ১৩০৬ হইতে ১৩১১ বঙ্গাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উৎকৃষ্টরূপে ফরাসী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ফরাসী ভাষা হইতে বাঙ্গালাতে অনুবাদ করেন। তদ্ভিন্ন বহু ছোট ছোট গল্প অনুবাদ করিয়া সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশিত হইলে, তিনি উহারও একজন

উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন এবং তাঁহার ফরাসী ভাষা হইতে অনূদিত গল্পাদি প্রধানতঃ ভারতীতেই প্রকাশিত হইয়াছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রধানতঃ ললিতকলা বিলাসী হইলেও মৃগয়াতেও দক্ষ ছিলেন। পৈতৃক সম্পত্তি পরিদর্শনের সময়ে প্রায়ই বন্ধুবর্গকে লইয়া শিকার করিতে যাইতেন। কিছুকাল তিনি 'মুখসামুদ্রিক' (Physiognomy) এবং শিরসামুদ্রিক (Phrenology) বিদ্যারও অনুশীলন করেন।

এই বিবিধগুণ সমন্বিত মনীষী শেষ জীবনে রাঁচিতে গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিতেন এবং সেইখানেই ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে (মার্চ্চ ১৯২৫ খ্রীঃ) তাঁহার মৃত্যু হয়।

জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর—ইঁহার উপাধি ছিল কবিশেখরাচার্য্য। ইনি বিদ্যাপতির আনুমানিক ১০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত "বিদ্যাপতির পদাবলীর" ভূমিকায় এবং এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী "কীর্ত্তিলতা"র মুখবন্ধে ইঁহাকে বিদ্যাপতির খুল্লপিতামহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জ্যোতিরীশ্বরের পিতা ধীরেশ্বর ঠাকুর ও পিতামহ রামেশ্বর ঠাকুর ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে ইনি মিথিলার রাজা নরসিংহ দেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন। নরসিংহ দেবের সময় মিথিলা দর্পণের মতে ১১৪৯ শকাব্দ বা ১২২৭ খ্রীঃ অব্দ। জ্যোতিরীশ্বর তাঁহার "ধূর্ত্তসমাগম' নামক সংস্কৃত প্রহসনে কর্ণাট বংশীয় রাজা নান্যদেবের পৌত্র নরসিংহদেবের উল্লেখ করিয়াছেন।

জ্যোতিরীশ্বরের সময় সম্বন্ধে মতদ্বৈধ রহিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ববুআজী মিশ্র জ্যোতিষাচার্য্য অনুমান করেন যে, জ্যোতিরীশ্বর নরসিংহ দেবের সময়ে অর্থাৎ ১২২৭ খ্রীঃ অব্দে জীবিত ছিলেন, কারণ তিনি তাঁহার 'ধূর্ত্তসমাগম, নামক প্রহসনে নরসিংহ দেবের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ৺মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেন যে, জ্যোতিরীশ্বর উক্ত বংশীয় (কর্ণাট বংশীয়) শেষ নৃপতি হরসিংহদেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন। অধ্যাপক বেণ্ডেল (Bendall) সাহেবের মতে হরসিংহ দেবের সময় ১৩২৪ খ্রীঃ অব্দ; জ্যোতিরীশ্বর রচিত বর্ণ-রত্নাকর নামক মৈথিল গ্রন্থে কতক "ফার্সী" শব্দ আছে, তাহা দৃষ্টে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে, মুসলমান আক্রমণের অন্ততঃ ১০০ বৎসর পরে এই গ্রন্থ রচিত হয় এবং সেই সময় উক্ত গ্রন্থে প্রদত্ত সকল ফার্সী শব্দও সাহিত্যে স্থান পায়।

জ্যোতিরীশ্বর সংস্কৃত সাহিত্যে অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি "ধূর্ত্তসমাগম" নামক একখানি সংস্কৃত প্রহসন ও "পঞ্চসায়ক" (মদনের পাঁচবাণ) এবং "রঙ্গশেখর" নামক কামশাস্ত্রের দুই-খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই কয় খানি গ্রন্থ ব্যতীত তিনি মৈথিল ভাষায় 'বর্ণ রত্নাকর' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দের "Journal of the Asiatic Society of Bengal" এর ৪১৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী জ্যোতিরীশ্বরের "রঙ্গ-শেখর" গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। "ধূর্ত্তসমাগম" প্রথম ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে Christian Lassen কর্ত্তৃক মূল ও তাহার লেটিন অনুবাদ সহ মুদ্রিত হয়। তাঁহার "পঞ্চসায়ক" গ্রন্থ পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত। জ্যোতিরীশ্বর সঙ্গীত শাস্ত্রেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। M. Winternitz তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে জ্যোতিরীশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন।

জ্যোতিরীশ্বর রচিত বর্ণরত্নাকর মৈথিল ভাষায় রচিত সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ। এ পুস্তকের এক খণ্ড Asiatic Society of Bengal এর পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। এপুস্তক তালপত্রে ১৫০৭ খ্রীঃ অব্দে অনুলিখিত হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী "Journal of the Asiatic Society of Bengal" এ সংস্কৃত পুস্তক সংগ্রহের বর্ণনা প্রদান করেন, তাহাতে বর্ণরত্নাকরের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এ পুস্তক প্রাচীন মৈথিল অক্ষরে লিখিত। প্রাচীন বাঙ্গালা ও মৈথিল অক্ষরের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। এত প্রাচীন বাঙ্গালা অথবা অপর মৈথিল গদ্য গ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষায় বলিতে গেলে—"No Bengali or Maithili MS. of that age has yet been discovered. This book seems to have guided the genius of Vidyapati." এ পুস্তকে বোধ হয় ৮ অধ্যায় ছিল। প্রথম ৭ অধ্যায় পাওয়া গিয়াছে; ইহা ভিন্ন আরও কয়েকখানি পৃষ্ঠা আছে। ইহার প্রত্যেক অধ্যায়কে সমুদ্রের (রত্নাকরের) কল্লোলের সঙ্গে তুলনা করিয়া "কল্লোল" নামে অভিহিত করা হইয়াছে, এবং প্রত্যেক কল্লোলের নিম্নে সেই কল্লোলে বর্ণিত বিষয়, পুস্তকের নাম ও গ্রন্থকারের নাম দেওয়া আছে, ১৮ পুরাণ, ৬৯ বায়ু, ১২ আদিত্য, ৬৩ বুদ্ধাস্ত্র, ১৮ পৌরাণিক সতী-নারী প্রভৃতি বর্ণিত আছে। বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের যে স্থান, মৈথিল সাহিত্যে বর্ণরত্নাকরের সেই স্থান। কাহারও কাহারও মতে বিদ্যাপতি ও জ্যোতিরীশ্বর সমসাময়িক ছিলেন।

জ্যোতিষচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ; বি, এল; রায় বাহাদুর—তাঁহার জন্মস্থান যশোহর জিলার অন্তর্গত হরিশঙ্করপুর। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মস্থান বিহার প্রদেশের পূর্ণিয়া জিলায় ছিল। তিনি ঘোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই সংগ্রামে তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য শত-গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি সংযমী, নিষ্ঠাবান্ ও ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইংরেজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ণিয়ার তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবী ছিলেন। সুবক্তা বলিয়া তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। বিহার প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজে তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। সেজন্য বিহারের বাঙ্গালী সমাজ তাঁহাকেই বিহারের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুচিন্তিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতায় সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তিনি নানাবিধ দায়ীত্বপূর্ণ বিষয় কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন। ভারতবর্ষ প্রভৃতি মাসিক পত্রে তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। বিহারে কার্য্যানুরোধে তাঁহাকে অবস্থান করিতে হইলেও, তিনি জন্মভূমির কথা ভুলিয়া যান নাই। তিনি স্বগ্রামে পিতার নামে একটী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ও মাতার নামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া, ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জনসাধারণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। এই স্বদেশ ও স্বজাতিবৎসল পরোপ-কারী মহাত্মা অকালে ১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসে পরলোক গমন করিয়া-ছেন।

ঝ

ঝিন্দন কুমারী, মহারাণী—পাঞ্জাব কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের অন্য-তমা পত্নী ও মহারাজ দলীপ সিংহের জননী। ১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দে মহারাজ রণজিৎ সিংহ পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সুগঠিত সুনিয়ন্ত্রিত রাজ্য অন্তর্বিপ্লবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। প্রথমে খড়্গা সিং, তৎপরে নেওনেহাল সিংহ ও তাহার পরে সের সিংহ পাঞ্জাবের রাজা হইয়াছিলেন। ১৮৪৩ সালে সের সিংহের নিধনের পরে দলীপ সিংহ রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা মহারাণী ঝিন্দন নাবালক রাজার পক্ষে রাজ্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। হীরা সিংহ প্রধান মন্ত্রী হইলেন। লাল সিংহ মহারাণীর প্রিয়পাত্র ছিলেন। হীরা সিংহ ইহার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া নিহত হইলেন এবং মহারাণীর ভ্রাতা জবাহির সিংহ প্রধান মন্ত্রী হইলেন।

লাল সিংহ ও জবাহির সিংহ সমুদয় রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তেমন যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। খালসা সৈন্যকে সুশাসনে রাখিতে জবাহির সিংহ অসমর্থ হইলেন এবং পরে তাহাদের হস্তে নিহত হইলেন। তখন তেজ সিংহ প্রধান সেনাপতি ও লাল সিংহ উজির হইলেন। অল্পকাল পরেই ১৮৪৫ সালে শিখে ইংরেজে যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। লর্ড হার্ডিং এই সময়ে ভারতের গবর্ণার জেনারেল ছিলেন। মুদকি, ফিরোজশা, আলীওয়াল, সোব্রাও প্রভৃতি স্থানে ভীষণ যুদ্ধ হইল। অবশেষে ইংরেজেরা সোব্রাও যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া সন্ধি করিলেন। ইহার ফলে ইংরেজেরা দলীপ সিংহ বয়প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, পাঞ্জাব শাসনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। মহারাণী বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া রাজকার্য্য হইতে অপসৃত হইলেন। লাল সিংহ মাসিক দুই সহস্র টাকা বৃত্তি পাইয়া বারাণসীতে নির্ব্বাসিত হইলেন। বলা বাহুল্য মহারাণী রাজকার্য্য হইতে অপসারিত হইয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি গোপনে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন মনে করিয়া, গবর্ণার জেনারেল তাঁহাকে, পুত্র দলীপ সিংহের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, সেখাপুরের দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং বৃত্তির পরিমাণ মাসিক চারি সহস্র টাকা করিয়াদিলেন। ইতিমধ্যে একটী ক্ষুদ্র বিদ্রোহ হওয়ায়, বড়লাট মহারাণীকে বারাণসীতে নির্ব্বাসিত করিয়া, তাঁহার বৃত্তির পরিমাণ মাসিক এক সহস্র টাকা করিয়া দিলেন। এই সমস্ত কারণে শিখ সর্দ্দারেরা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৯ সালে সমস্ত পাঞ্জাব ইংরেজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। দলীপ সিংহ বৃত্তি পাইয়া ফতেপুরে প্রেরিত হইলেন। মহারাণী বারাণসী হইতে চুনার দুর্গে স্থানান্তরিত হইলেন। এই স্থান হইতে তিনি কৌশলে পলায়নপূর্ব্বক নেপালে উপস্থিত হন। নেপালের প্রধান সেনাপতি জঙ্গ বাহাদুর তাঁহাকে ইংরেজ রেসিডেণ্ট হস্তে সমর্পণ করেন। ১৮৫৪ সালে দলীপ সিংহ ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৮৬১ সালে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে মহারাণী নেপাল হইতে আসিয়া পুত্রের সহিত মিলিত হন এবং পুত্রের সহিতই পুনঃ ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৮৬৩ সালের আগষ্ট মাসে ইংলণ্ডেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন। ১৮৬৪ সালে তাঁহার পুত্র দলীপ সিংহ তাঁহার মৃতদেহ সহ ভারতবর্ষে প্রত্যাগত হইয়া নর্ম্মদা তীরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন। মহারাণী ঝিন্দন নানা সদ্‌গুণে ভূষিতা অতি তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন।

ট

টঙ্কদাস—বঙ্গের পালবংশীয় নরপতি ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহজিয়া মত খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে। সহজিয়া মতের প্রকৃত নাম মহাসুখ-বাদ। টঙ্কদাস হেবজ্র তন্ত্রের দুইখানি টীকা ও কয়েকখানি তন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

টড, জেম স (Col. James Todd)—উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী ও ঐতিহাসিক। ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে তাঁহার জন্ম হয়। মাত্র সতের বৎসর বয়সে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর (East India Company) অধীনে কাজ লইয়া ভারতে আগমন করেন এবং সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত হন। ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি ভারতের নানাস্থানে উচ্চ দায়ীত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত থাকিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ১৮১২—১৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত গোয়ালিয়রের রেসিডেণ্ট (Resident) ছিলেন। রাজপুতানায় অবস্থানকালে তিনি একখানি বিস্তৃত ইতিহাস সঙ্কলন করেন। বহুদিন পর্য্যন্ত বইখানি বিশেষ মূল্যবান বলিয়া আদৃত ছিল। বস্তুতঃ ঐ গ্রন্থের (Annals and Antiquities of Rajasthan) রচয়িতারূপেই তিনি সমধিক পরিচিত। ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি বহুকাল রয়েল এশিয়াটিক্ সোসাইটির (Royal Asiatic Society) গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

টনি, চার্লস (Charles Tawney)—শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রেভাঃ, রিচার্ড টনি (Rev. Richard Tawney) একজন ধর্ম্ম যাজক ছিলেন। চার্লস টনি কৃতীত্বের সহিত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপন করিয়া কিছুকাল তত্রত্য ট্রিনিটি কলেজে (Trinity College) চাকুরী করেন। পরে ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি ভারতে আসিয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে মিঃ সাটক্লিফের পর তিনি ঐ কলেজেই অধ্যক্ষ হন। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ঐ পদে আসীন ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে সময়ে সময়ে (সর্ব্ব মোট প্রায় আট বৎসর) তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার (Registrar) হইয়াছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক, ইণ্ডিয়া আপিসের (India Office) গ্রন্থাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন এবং ১৯০৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ঐ পদে নিযুক্ত থাকেন।

১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দ হইতে অবসর গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের

একজন সদস্য ছিলেন। এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা বিভাগের কাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি ফ্যাকাল্‌টি অব আর্টস্‌ এর (Faculty of Arts) সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং চারি বৎসর ঐ পদ অলঙ্কৃত করেন।

গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে তিনি ঐ ভাষায় বিশেষ কৃতীত্ব অর্জ্জন করেন। ইংরেজি সাহিত্যেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল এবং সেক্সপীয়ারের নাটক তিনি অতিশয় দক্ষতার সহিত অধ্যাপনা করিতেন। ভারতবর্ষে আগমন করিয়া, তিনি বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া, কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ ইংরেজি ভাষাতে অনুবাদ করেন। তন্মধ্যে কথাসরিৎসাগর, কথাকোষ, উত্তর-রাম চরিত, মালবিকাগ্নিমিত্র ও প্রবন্ধ চিন্তামণি প্রধান। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার অনুরাগ ছিল। ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাঙ্গালা উপন্যাস 'স্বর্ণলতা'র যে ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়, তিনি উহার ভূমিকা লিখিয়া দেন।

তিনি ছাত্রদের একজন পরম মঙ্গলাকাঙ্খী বন্ধু ও সহায় ছিলেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারে ছাত্রগণ সর্ব্বদাই মুগ্ধ থাকিত। বাঙ্গালী ছাত্রেরা যাহাতে ভালরূপ ইংরেজি শিখিতে পারে, তজ্জন্য তিনি বিশেষ যত্ন লইতেন। তাঁহার গুণমুগ্ধ ছাত্র ও সহকর্ম্মীদের যত্নে, তাঁহার একটি আবক্ষ মর্ম্মর মূর্ত্তি (Bust) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন ভবনে (Senate Hall) রক্ষিত হইয়াছে। ১৯২২ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডে তাঁহার মৃত্যু হয়।

টমসন, জর্জ (George Thomson) — ইংলণ্ডের অন্তর্গত লিবারপুল নগরে ১৮০৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। দুই বৎসর বয়সের সময়ে তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে লইয়া লণ্ডন নগরে গমন করেন। তাঁহাদের অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়া, তিনি স্কুলের শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহের ফলে তিনি গৃহেই বিশেষ পাঠে অনুরাগী হন। যৌবনে পদার্পণ করিয়াই, তিনি দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৩০ সালে তিনি বিবাহ করেন। ১৮৩৪ সালে দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার জন্য আমেরিকায় গমন করেন। ১৮৩৬ সালে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ে ভারতহিতৈষী অ্যাডাম (Mr. Adam) সাহেবের সহিত পরিচিত হন। ১৮৩৯ সালের জুলাই মাসে এই অ্যাডাম সাহেবেরই বিশেষ যত্নে ইংলণ্ডে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী (British India Society) স্থাপিত

হয়। জর্জ টম্‌সন তাঁহার অন্যতম বক্তা হন। ভারতবর্ষের সুখ দুঃখ ইংলণ্ডের লোকের গোচর করাই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। প্রিন্‌স্ দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলণ্ডে গমন করিলে, মিঃ টমসন তাঁহার সহিত পরিচিত হন। দ্বারকানাথ তাঁহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া, দেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। তাঁহাকে পাইয়া নব্য উন্নতিকামী ডিরোজিওর ছাত্রবৃন্দ পরম উৎসাহিত হন। তাঁহার বক্তৃতায় নব্যদল অগ্নিময় হইয়া যাইত। এই সময়ে কলিকাতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী স্থাপিত হয়। ইহাকে বর্ত্তমান ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের পূর্ব্বপুরুষ বলা যাইতে পারে। এদেশের যুবকবৃন্দের সহিত সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক ব্যাপারেই তিনি উৎসাহের সহিত যোগ দিতেন। ১৮৫৬ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর তিনি এদেশ ত্যাগ করেন।

টমসন, সার অগষ্টাস রিভার্স (Sir Augustus Rivers Thomson)—খ্যাতনামা উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজ কর্ম্মচারী। তাঁহার পিতা পাউনি (Powney) টমসনও ভারতবর্ষে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার পিতামহ জর্জ নিসবেট টমসন (George Nisbet) ১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংস এর খাস-মুন্সী (Private Secretary) ছিলেন। ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দে সার অগষ্টাসের জন্ম হয়। স্বদেশে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ভারতে আগমন করেন। কার্য্যব্যপদেশে তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর ভারতবর্ষে ছিলেন। এই সুদীর্ঘকাল তিনি বিচার ও শাসন বিভাগে বহু গুরুতর দায়ীত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেন। কিছুকাল তিনি (১৮৭৫—৭৮ খ্রীঃ) ইংরেজাধিকৃত ব্রহ্মদেশের শাসনকর্ত্তা (Chief Commissioner) ছিলেন এবং ১৮৮২—৮৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার ছোটলাট (Lieutenant Governor) ছিলেন। সুদক্ষ, নির্ভিক, দৃঢ়চরিত্র, সুশাসক বলিয়া তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল।

সার অগষ্টাসের শাসনকালে বাঙ্গালাদেশে শাসন বিভাগের কোনও কোনও পদে প্রতিযোগিতা দ্বারা কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হয় এবং শাসন বিভাগে নানারূপ পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধন করা হয়। ঐ সময়ে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে মহিলা ছাত্রী গ্রহণের প্রথা এবং বাঙ্গালাদেশে সাতটি জিলায় জুরি-প্রথার প্রবর্ত্তন হয়। খিদিরপুরে জাহাজ জীর্ণসংস্কার জন্য ডক্ (Dock) নির্ম্মাণের চেষ্টাও তাঁহার শাসনাকালেই আরম্ভ হয়। নৈহাটীতে গঙ্গার উপর সেতু নির্ম্মাণ, লোক্যাল (Local) ও জিলা বোর্ডের সৃষ্টি, কলিকাতায় প্রথম আন্ত-

র্জাতিক প্রদর্শনীর (International Exhibition) ব্যবস্থা প্রভৃতি অনেক জনহিতকর কার্য্য তাঁহার শাসনকালেই অনুষ্ঠিত হয় তিনি সরকারী অর্থ ব্যয়ে বুদ্ধগয়ার মন্দির, সাসারামে শের শাহের সমাধি এবং রোটাস গড়, পুরী, পাণ্ডুয়া প্রভৃতি অনেক স্থানে পুরাকীর্ত্তির সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য একটি মন্ত্রণা সমিতি (Commission) নিযুক্ত হয় এবং ঐ সমিতির নির্দ্দেশ অনুযায়ী অনেক ব্যবস্থা করা হয়। সার অগষ্টাস যখন বড়লাটের মন্ত্রণা পরিষদের (Executive Council) সদস্য ছিলেন, তখনই প্রসিদ্ধ ইলবার্টবিলের আন্দোলন উপস্থিত হয়।

চাকুরী হইতে অবসর করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে জিব্রাল্টারে তাঁহার মৃত্যু হয়।

টমাস, এডওয়ার্ড (Edward Thomas)—উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও পুরাতত্ত্ববিদ্। ১৮১৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৩২ খ্রীঃ অব্দে রাজকার্য্যে (I. C. S.) নিযুক্ত হইয়া ভারতে আগমন করেন। প্রায় পঁচিশ বৎসর নানাস্থানে উচ্চ দায়ীত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত থাকিয়া ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমাবধি ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রণালীর রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে বিরত থাকিতেন না। ভারতবর্ষ, পারস্য প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া, তিনি বহু মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা ও গ্রন্থ প্রণয়ন করেন প্রাচ্য দেশ সমূহের প্রাচীন মুদ্রাতত্ত্ব (Numismatics) সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইত। জেম্‌স্ প্রিন্‌সেপ প্রমুখ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচ্য ঐতিহাসিকগণের কোনও কোনও গ্রন্থ তিনি সম্পাদন করেন। প্রায় পচিশ বৎসর তিনি ইংলণ্ডের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির (Royal Asiatic Society) ধনাধ্যক্ষ ছিলেন এবং ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বিদ্বজ্জন পরিষদ রয়েল সোসাইটিরও সদস্য (F. R. S) হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন ফরাসী ও রুসিয়া দেশের পণ্ডিত সভারও সদস্য পদ লাভ করেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

টমাস, জন (John Thomas)—ইংরেজ অধিকারের প্রথমযুগের একজন খ্রীঃ ধর্ম্মযাজক। ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতাও একজন ধর্ম্মযাজক ছিলেন। বয়প্রাপ্ত হইয়া তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক জাহাজে কাজ লইয়া ১৭৮৩ খ্রীঃ

অব্দে ভারতে আগমন করেন। পুনরায় তিন বৎসর পরে কলিকাতায় আসিয়া এদেশেই ধর্ম্ম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে জাহাজের কাজ ছাড়িয়া দেন।

টমাস বাল্যাবধি বিশেষ ধর্ম্মভীরু ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম প্রবণতা মাত্রায় কিঞ্চিৎ অধিক ছিল এবং তৎফলে তিনি সময়ে সময়ে প্রায় বিকৃত মস্তিষ্কের ন্যায় কাজ করিতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সরল বুদ্ধি অত্যধিক ধর্ম্ম প্রবণ ছিলেন। প্রথমে তিনি কিছুকাল মালদহে অবস্থান করিয়া তত্রত্য ইংরেজ কোম্পানীর রেশম কুঠীতে কাজ করেন। ঐ স্থানেই তিনি ভালরূপ বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করেন। ১৭৯২ খ্রীঃ অব্দে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং অল্পকাল পরেই প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মযাজক উইলিয়াম কেরীর সহিত ভারতে আগমন করেন। অতঃপর তাঁহারা দুইজনে বাঙ্গালা দেশে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন (উইলিয়াম কেরী দ্রষ্টব্য)। কিন্তু টমাসের সরল প্রকৃতি এবং উৎকট ধর্ম্ম প্রবণতার সুযোগ লইয়া, অনেক দুষ্ট বুদ্ধি লোক তাঁহাকে নানারূপে বহুবার বঞ্চনা করে। কিন্তু টমাসের সরল বিশ্বাসের কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। তাঁহার সরল প্রকৃতির সুযোগ লইয়া অনেকে তাঁহার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য লাভ করিত এবং তিনি ঐ ভাবে, পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া নানা জনকে অর্থ সাহায্য করিতে যাইয়া, ঋণগ্রস্ত ও উত্তমর্ণ কর্তৃক উৎপীড়িত হন। কৃষ্ণপাল নামক এক ব্যক্তি যখন (কেরী ও কৃষ্ণপাল দেখ) খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হন, তখন আনন্দের আতিশয্যে টমাসের মস্তিষ্ক বিকৃতি হয় পরে চিকিৎসার ফলে রোগমুক্ত হইয়া, কিছুকাল নীলকরের কাজ করেন। পূর্ব্বোক্ত কারণে নানারূপ অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়িয়া অশেষ দুর্গতি ভোগ করেন। ১৮০১ খ্রীঃ অব্দে দিনাজপুর নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

টমাস, সেণ্ট (Saint Thomas)—তিনি খুব সম্ভব ভারতে আগত প্রথম ইউরোপীয় খ্রীষ্টান পাদ্রী। তিনি কোন্ সময়ে প্রথম এদেশে আসেন তাহা এখনও বিবেচনাধীন রহিয়াছে। দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলে উপস্থিত হইয়া যথাসাধ্য খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। পরে চোরমণ্ডল অঞ্চলেই তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তার লাভ করে। তাঁহার চেষ্টার দাক্ষিণাত্যের বহু স্থানে খ্রীষ্টধর্ম্ম সুপ্রচারিত হয়। তিনি এই দেশেই দেহ ত্যাগ করেন। পর্টুগিজরাজ তৃতীয় জনের আদেশে তাঁহার সমাধি বহু অনুসন্ধানের পর মালিয়াপুর নামক স্থানে আবিষ্কৃত হয় এবং তথায় প্রাপ্ত কঙ্কালগুলি পর্ত্তুগিজ অধিকৃত গোয়া নগরীতে নীত হইয়া, টমাসের স্মৃতি মন্দিরে রক্ষিত হয়।

টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ—আসামের অন্তর্গত মণিপুরের প্রসিদ্ধ সেনাপতি। তাঁহার পিতা চন্দ্রকীর্ত্তি মণিপুরের অন্যতম অধিপতি ছিলেন। ১২৬৫ বঙ্গাব্দের শেষভাগে টিকেন্দ্রজিতের জন্ম হয়। তিনি বাল্যকাল হইতেই নানারূপ পুরুষোচিত ক্রীড়া ও ব্যায়ামাদিতে সুদক্ষ ছিলেন। চন্দ্রকীর্ত্তির মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শূরচন্দ্র সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের মধ্যে কুলচন্দ্র যুবরাজ এবং টিকেন্দ্র জিৎ প্রধান সেনাপতি হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের অপর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভৈরবজিৎ, টিকেন্দ্রজিতের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন এবং শূরচন্দ্রকেও টিকেন্দ্রজিতের বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন করিয়া তোলেন। তৎফলে ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সামান্য একটু বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং দশচক্রে পড়িয়া মহারাজ শূরচন্দ্র সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন।

তৎকালে মিঃ গ্রীমউড্ (Mr. Greemwood) মণিপুর রাজধানীতে ইংরেজ দূত (Resident) ছিলেন। তিনি অনেক বিষয়ে ভৈরবজিতের সহিত একমত ছিলেন। শূরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া ইংরেজ সরকারের সহিত অনেক আলোচনা করেন, কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল হয় নাই (শূরচন্দ্র দেখ)। শূরচন্দ্রের সিংহাসন ত্যাগ করাতে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুলচন্দ্র রাজা হইলেন এবং টিকেন্দ্রজিৎ যুবরাজ হইলেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার কুলচন্দ্রকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেও, টিকেন্দ্রজিৎকে বিদ্রোহের নায়ক বলিয়া, শাস্তি দিতে মনস্থ করিলেন। তদনুসারে তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য, একদল ইংরেজ সৈন্য মণিপুরে প্রেরিত হইল। আসামের কমিশনার মিঃ কুইণ্টনও সেই সৈন্যদলের সহিত গমন করেন। কিন্তু টিকেন্দ্রজিতকে বন্দী করিবার পরিবর্ত্তে, মিঃ কুইণ্টন, পূর্ব্বোক্ত মিঃ গ্রীমউড ও আরও তিনজন ইংরেজ সেনানী আক্রান্ত ও বন্দী হইয়া নিহত হন। বৃদ্ধ মন্ত্রী থঙ্গাল জেনারেলের আদেশে ঐ পাঁচজন ইংরেজ কর্ম্মচারীর দেহচ্যুত মস্তক একস্থানে প্রোথিত করা হয়। অবশিষ্টেরা পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করেন।

এই নিদারুণ পরাজয় ও অমানুষিক বর্ব্বরতার প্রতিশোধ লইবার জন্য, অল্পকাল পরেই বৃহত্তর সেনাবাহিনী মণিপুরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। ইংরেজ সৈন্য মণিপুর অধিকার করেন। বিশেষ ভারপ্রাপ্ত আদালতের বিচারে টিকেন্দ্র জিৎ ও থঙ্গাল জেনারেলের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তাঁহারা উভয়ে ঐ দণ্ডের বিরুদ্ধে কলিকাতা হাইকোর্টে

আপীল (Appeal) করেন। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ব্যবহারজীবী মনোমোহন ঘোষ টিকেন্দ্রজিতের পক্ষ অবলম্বন করিয়া আপীল দায়ের করেন। কিন্তু হাইকোর্ট প্রাণদণ্ডই বাহাল রাখেন। তৎপরে সপারিষদ, বড়লাট ঘোষণাপত্র প্রচার দ্বারা ঐ প্রাণদণ্ডের আদেশ অনুমোদন করিলে, ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দের ১৩ই আগষ্ট রাজধানীর একটি প্রধান উন্মুক্ত স্থানে থঙ্গাল জেনারেল ও টিকেন্দ্র জিতের একত্রে ফাঁসী হয়।

টিপু শাহ—আর্কটের একজন বিখ্যাত দরবেশ। মহীশূরের অধিপতি হায়দর-আলী শাহ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহারই নাম হইতে তাঁহার পুত্র টিপুসুলতান নাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার সমাধিক্ষেত্র এখনও শত শত মুসলমানের তীর্থক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। কানাড়ী ভাষায় টিপু অব্দের অর্থ সিংহ।

টিপুসুলতান—মহীশূরের প্রসিদ্ধ মুসলমান নৃপতি হায়দর আলির পুত্র। ১৭৪০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। হায়দর আলি নিজে বিশেষ শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য রাজ্যশাসন বিষয়ে নিজের অসুবিধা অনুভব করিয়া পুত্রের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। টিপু বাল্যকাল হইতেই পুরুষোচিত সকলপ্রকার ব্যায়াম ক্রীড়াদিতে দক্ষ ছিলেন। পিতার জীবিতকালেই টিপুসাহেব একাধিক বার পিতার সহকারী রূপে অথবা একেলাই বিভিন্ন স্থানের যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করিয়া কৃতীত্ব প্রদর্শন করেন। ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে, হায়দর আলির মৃত্যুর পর, তিনি মহীশূর রাজ্যের অধীশ্বর হন।

হায়দর আলি অতিশয় ইংরেজ বিদ্বেষী ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে তখন ইংরেজ ও ফরাসীতে ঘোরতর প্রতিযোগীতা চলিতেছিল। হায়দর আলি এবং তৎপরে টিপু সুলতানও ফরাসীদিগের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া, ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছিলেন। এই সংগ্রামে মারাঠারা এবং হায়দ্রাবাদের নিজাম ইংরেজদের সাহায্যকারী ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া টিপু সুলতান, পিতারই ন্যায় পূর্ব্বোক্ত ত্রিশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে থাকেন। ফরাসীরা এ বিষয়ে কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছিল। ১৭৮৬ হইতে ১৭৯১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ছয় বৎসরে তিনি বিশেষ রাজনীতি ও বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক একেলাই এই তিন শক্তির বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেন। সেই সংস্রবে তিনি একাধিক বার নিজ রাজ্যের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি আক্রমণ, বিধ্বস্ত ও অনেক সময়ে কোনও কোনওটি নিজরাজ্য ভুক্ত করেন। এই সূত্রে প্রধানতঃ মালাবার প্রদেশ হইতে অসংখ্য খ্রীষ্টান ও হিন্দুকে

বলপূর্ব্বক মুসলমান করা হয় এবং বহু খ্রীষ্টান ও হিন্দু ধর্ম্মমন্দির বিনষ্ট করা হয়। এই সকল কারণেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্যগুলি ইংরেজদিগের শরণাপন্ন হয় এবং ইংরাজেরাও টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার এই সুযোগ আদৌ পরিত্যাগ করেন নাই। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে একাধিক ইংরেজ সেনানী মারাঠাদিগের ও নিজামের সাহায্যে টিপুসুলতানকে দমন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হন। সাময়িক ভাবে মধ্যে মধ্যে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইলেও টিপু সুলতান প্রায় অধিকাংশ সন্ধিরই মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই। ১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে টিপু সুলতান বেদনোরের প্রসিদ্ধ দুর্গ অধিকার করেন এবং পর-বর্ত্তী বৎসর মারাঠাদের রাজ্য আক্রমণ করেন। মারাঠারা ভীত হইয়া, টিপু কর্ত্তৃক তৎকাল পর্য্যন্ত অধিকৃত সমগ্র ভূখণ্ডে তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিয়া লয়েন।

ইহার পূর্ব্বেই ইয়োরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হওয়ায় ভারতবর্ষেও উভয় জাতির মধ্যে বিরোধের শান্তি হয়। ইহাতে টিপু সুলতান ক্রুদ্ধ হন এবং ঐরূপ সন্ধি করাতে ফরাসীদের সহিত তাঁহার মৈত্রী বন্ধন ক্ষুণ্ণ হইয়াছে মনে করিয়া, এতৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য সেই বৎসরই ফরাসীরাজ ষোড়শ লুই (Louis XVI) এর নিকট দূত প্রেরণ করেন। প্রথমবারে যাঁহারা প্রেরিত হন তাঁহারা নানা কারণে কনষ্ট্যাণ্টিনোপল (Constantinople) পর্য্যন্ত যাইয়া ফিরিয়া আসেন। তাহাতেও নিরুৎসাহ না হইয়া ১৭৮৭ খ্রীঃ অব্দে পুনরায় আর একদল প্রেরিত হন। তাঁহারা প্রায় এক বৎসর পরে ফরাসী দেশে উপস্থিত হইয়া সম্রাট লুই কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হন। কিন্তু এই দৌত্যের ফল বিশেষ কিছুই হয় নাই। ফরাসীদিগের নিকট হইতে কোনও রূপ সাহায্য পাইবার আশায় ব্যর্থকাম হইয়া, টিপু সুলতান নিজ শক্তিতেই ইংরেজ দলনে প্রবৃত্ত হইলেন। কয়েক বৎসর যুদ্ধাদি চলি-বার পর, টিপু সুলতানকে দমন করা একান্তই আবশ্যক বিবেচনায় ১৭৯১ খ্রীঃ অব্দের প্রথমভাগে গবর্ণর জেনারেল (Governor General) লর্ড কর্ণওয়ালিস (Lord Cornwallis) স্বয়ং মাদ্রাজ প্রদেশে গমন করিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এ বিষয়ে মারাঠারা ও নিজাম ইংরেজদের সহায় হইলেন এবং বিভিন্ন দিক হইতে মহীশূর রাজ্য আক্রান্ত হইল। কিছুকাল যুদ্ধ চলিবার পর টিপু সুলতান, ত্রিশক্তির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু তিনি অন্য দুই পক্ষকে

বাদ দিয়া পৃথক ভাবে সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন না। আবার কিছুকাল যুদ্ধ চলিবার পর টিপু সুলতান পুনরায় সন্ধির প্রস্তাব করিলেন (১৮৯১ খ্রীঃ মধ্যভাগে)। এবারেও লর্ড কর্ণওয়ালিস সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। সুতরাং যুদ্ধ পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল এবং ইংরেজ, মারাঠা ও নিজামের মিলিত শক্তি বিভিন্ন দিক হইতে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া মহীশূর পতিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অনেকগুলি সুরক্ষিত দুর্গ এবং বিস্তীর্ণ ভূভাগ তাঁহাদের করতলগত হওয়ায় মহীশূর-পতি ক্রমশঃই হীনবল হইয়া পড়িতে লাগিলেন এবং সত্বর যুদ্ধ সমাপ্ত না হইলে তাঁহাকে হয়ত সমগ্র রাজ্যই হারাইতে হইবে, এই আশঙ্কায় ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সুলতান, চামার্স (Chalmers) ও ন্যাশ (Nash) নামক দুইজন ইংরেজ সেনানীকে (Lieutenants) বন্দীদশা হইতে মুক্তি দিয়া তাঁহার সপক্ষে সন্ধির প্রস্তাব লইয়া পুনরায় লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট প্রেরণ করিলেন। অনেক আলোচনার পর ২৩শে ফেব্রুয়ারী সন্ধির সর্ত্ত স্থির হইল। তদনুসারে টিপু সুলতান তাঁহার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ পরিত্যাগ করিতে; এক বৎসরের মধ্যে তিন কোটী টাকা ক্ষতি পূরণ স্বরূপ দিতে, সমস্ত শত্রু পক্ষীয় বন্দীকে মুক্তি দিতে এবং সন্ধির সর্ত্ত সমূহ পালনের জামিন স্বরূপ তাঁহার দুই পুত্রকে ইংরেজের তত্ত্বাবধানে রাখিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অতঃপর সন্ধির অন্যতম সর্ত্তানুসারে টিপু সুলতানের দুই পুত্র যথাযোগ্য আড়ম্বরের সহিত ইংরেজ শিবিরে নীত হইলেন। ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা এই ভাবে ব্যর্থ হওয়ায় টিপু সুলতানের ক্রোধ আরও প্রাপ্ত হইল। তখন হইতে তিনি গোপনে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। ভারতে নিজাম, পেশোয়া, রোহিলখণ্ডে নবাবের ভ্রাতুষ্পুত্র, ভারতের বাহিরে আফগানিস্থানের আমীর, নেপালের মহারাজা প্রভৃতির সহিত গোপনে পত্র বিনিময় চলিতে লাগিল। এমন কি ফরাসীদের সাহায্য লাভের জন্যও দূত প্রেরিত হইল। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ অবশ্য এই সকল সংবাদ লাভে বঞ্চিত ছিলেন না। তাঁহারাও এ বিষয়ে যথা বিহিত ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে বিলম্ব করা একান্তই অবিবেচনার কাজ হইবে বুঝিয়া, তদানীন্তন প্রধান শাসনকর্ত্তা লর্ড মর্ণিংটন (Lord Mornington) ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে একটি বৃহৎ সেনাবাহিনী সুলতানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ইংরেজ পক্ষ প্রথমে যুদ্ধ না করিয়া চলে কিনা দেখিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত

যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। এইবারও নিজাম ও মারাঠারা ইংরেজ পক্ষে যোগ দেন। কয়েক মাস যুদ্ধ চলিবার পর ৪ঠা মে টিপু সুলতান স্বয়ং দুর্গ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে ইংরেজ সৈন্য হস্তে দুর্গ মধ্যেই নিহত হন। তৎপর-দিন পদোচিত আড়ম্বরের সহিত তাঁহার দেহ, তাঁহার পিতারই সমাধির পার্শ্বে সমাহিত করা হয়।

টিপুসুলতানের দুর্গ অধিকৃত হইলে দেখা যায় যে, তাহার মধ্যে এক বিস্তৃত গ্রন্থাগার রহিয়াছে। তাহাতে বহু মূল্য-বান পুস্তক ছিল। আরবী, ফারসী ও হিন্দুস্থানী ভাষায় প্রায় দুই সহস্র পুঁথি তথায় সংগৃহীত ছিল। ইতিহাস জীবন চরিত, ধর্ম্মতত্ব, নীতিশাস্ত্র, কাব্য, উপা-খ্যান, গণিত জ্যোতিষ, দর্শন প্রভৃতি বহু বিষয়ের পুস্তকে গ্রন্থাগার পূর্ণ ছিল। বড়লাটের আদেশে ঐ গ্রন্থাগারের সমস্ত পুঁথি কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে স্থানান্তরিত হয়।

টিপুসুলতান বিদ্যানুরাগী নরপতি ছিলেন। তাঁহার উৎসাহ ও যত্নে অনেক উৎকৃষ্ট পুস্তক রচিত অথবা ভাষান্তরিত হয়। ফারসী, উর্দ্দু ও কানাড়া ভাষায় তিনি উৎকৃষ্টরূপে কথোপকথন করিতে পারিতেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ তাঁহার চরিত্র বর্ণনায় তাঁহার প্রতি সুবিচার করেন নাই। সর্ব্বত্রই তাঁহাকে পরধর্ম্মদ্বেষী বলিয়া চিত্রিত করা হই-য়াছে। কিন্তু মহীশূরের শৃঙ্গেরী মঠে প্রাপ্ত মঠাধ্যক্ষ শঙ্করাচার্য্যকে লিখিত টিপুর পত্রাবলী হইতে অবগত হওয়া যায় যে, মারাঠা সৈন্য কর্ত্তৃক মঠ লুণ্ঠিত ও অপবিত্র হইলে, তিনি মঠের সংস্কার ও নূতন বিগ্রহ স্থাপনের জন্য রাজকোষ হইতে অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন।

টেকচাঁদ ঠাকুর—প্যারীচাঁদ মিত্র দেখ।

টেম্পল, সার রিচার্ড (Sir Richard Temple)—তাঁহার জন্ম ১৮২৬ খ্রীঃ অব্দে। স্বদেশে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া ১৮৪৭খ্রীঃ অব্দে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া (I. C. S. রূপে) ভারতে আগমন করেন। তখন হইতে প্রথম সাতাইশ বৎসর, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানে উচ্চ দায়ীত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত থাকিয়া, প্রশংসা অর্জ্জন করেন। এই সময়ের মধ্যে একবার ভারত সর-কারের পররাষ্ট্র সচিব, আর একবার রাজস্ব সচিবের কাজ করেন। ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক (Lord Northbrook) কর্ত্তৃক, বাঙ্গালা দেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানে সাহায্য দানের যে ব্যবস্থা হয়, তিনি তাহার সমুদয় তত্ত্বা-বধানের ভার প্রাপ্ত হন। ঐ কাজে তিনি যে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেন, তাহাতেই তাঁহার প্রশংসা চারিদিকে বিস্তৃত হয়। ঐ দুর্ভিক্ষের সময়েই, বিহারের জনবহুল

স্থান সমূহ হইতে নব-অধিকৃত ব্রহ্ম দেশের জনবিরল স্থানে বসতি স্থাপন করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু সে চেষ্টা সম্যক ফলবতী হয় নাই। তৎপর তিন বৎসর তিনি বাঙ্গালা দেশের ছোটলাট (Lieutenant Governor) হন। এই সময়ে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য কর্তৃপক্ষ খুব ব্যাপকভাবে বন্দোবস্ত করেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি দুর্ভিক্ষ নিবারণ প্রচেষ্টা বিষয়ে পরামর্শ দানের জন্য বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে প্রেরিত হন এবং ঐ বৎসরেরই মধ্যভাগে বোম্বাইএর শাসনকর্তা (Governor) হন। ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কর্ম্মকুশলতার জন্য, বিশেষতঃ দুর্ভিক্ষ নিবারণ কল্পে সুব্যবস্থা করার জন্য একাধিক উচ্চ সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত হন। C. S. I. (১৮৬৬ খ্রীঃ); K. C. S. I. (১৮৬৭); G. C. S. I. (১৮৭৮), ব্যরনেট (Baronet; ১৮৭৬ খ্রীঃ)। তিনি মাত্র তিন বৎসর বাঙ্গালার শাসনকর্তা ছিলেন। তখন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা একত্রে বাঙ্গালা প্রদেশ বলিয়া অভিহিত হইত। তাঁহার শাসনকালে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সম্পন্ন হয়। ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে প্রথম হাবড়ার ভাসমান সেতু সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্য নূতন ব্যবস্থা হয়। শিল্প শিক্ষার (Technical Education) হুগলী, ঢাকা, পাটনা ও কটকে বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়া লিগের (India League) তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বিজ্ঞান-সভাকেও এই জন্য অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল ভিন্ন, লর্ড নর্থব্রুক কর্তৃক চিত্রশালা স্থাপন এবং আলিপুরের পশুশালা (Zoological Garden), শিবপুরের উদ্যান (Botanical Garden) প্রভৃতির উন্নতি সাধন, এইরূপ বহু জনহিতকর কার্য্য তাঁহারই সময়ে সাধিত হয়।

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও তিনি নানাভাবে দেশের রাজনৈতিক ও অন্যান্য আন্দোলনের সহিত যোগ রক্ষা করিতেন। ১৯০২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ভারতবর্ষের নানা বিষয় উপলক্ষ করিয়া কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে Men and Events of My Time in India (১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত) এবং The Story of My Life (১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

টেম্পল, সার রিচার্ড কর্ণাক (Sir Richard Carnac Temple)—তিনি বাঙ্গালার ছোটলাট (১৮৭৪—১৮৭৭

খ্রীঃ অব্দে) সার রিচার্ড টেম্প্‌লের পুত্র। ১৯০২ খ্রীঃ অব্দে, পিতার মৃত্যুর পর, তিনি পিতার পদবীর (Baronet) ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে সৈনিক বিভাগে কাজ লইয়া ভারতে আগমন করেন। ১৮৭৮—৭৯ খ্রীঃ অব্দের আফগান যুদ্ধে এবং ১৮৮৭—৮৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম দেশের নানাস্থানে বিদ্রোহ দমনে, তিনি নিযুক্ত ছিলেন। পরে দশ বৎসর (১৮৯৪—১৯০৪ খ্রীঃ অব্দ) আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সৈনিক বিভাগে কাজ করিলেও, তিনি ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। ঐ সকল বিষয় আলোচনা করিবার জন্য তিনি ইণ্ডিয়ান আন্টিকোয়ারী (The Indian Antiquary) নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং সুদীর্ঘকাল উহা বিশেষ যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরও বহু বৎসর উহা প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ঐ শ্রেণীর পত্রিকা সমূহের মধ্যে বিশেষ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

টোডরমল—সম্রাট আকবরের নবরত্নের অন্যতম এবং প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্ মন্ত্রী। তাঁহার পিতার নাম ভগবতীদাস। ১৫১৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যেই পিতৃহীন হওয়ায় তাঁহার মাতা তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া লালনপালন করেন। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি রাজ দরবারে লিপিকরের কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। কিছুকাল পরে সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করেন। ১৫৬৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি খানজামানের বিরুদ্ধে সম্রাটের অধীনে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। ১৫৭৪ খ্রীঃ অব্দে গুজরাটের রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়া তিনি গুজরাটে গমন করেন। পর বৎসর বাঙ্গালা দেশে পাঠান নরপতি দাউদ খাঁকে দমন করিবার জন্য যে রাজ সেনাবাহিনী প্রেরিত হয়, তিনি তাহার সঙ্গে গমন করেন। মুনিম খাঁ এই সময়ে তাঁহার সহযোগী ছিলেন। দাউদ খাঁর সহিত নানা স্থানে যে সকল খণ্ড যুদ্ধ হয়, তিনি তাহাদের প্রত্যেকটিতেই উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন এবং দাউদ খাঁকে নানা স্থানে পরাস্ত করেন (দাউদ খাঁ দ্রষ্টব্য)। দাউদ খাঁকে দমন করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে তিনি বাঙ্গালা দেশেও রাজস্ব সম্বন্ধে অনেক নূতন ও উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন। তাহাতে তাঁহার যশ চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়। অতঃপর রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তথায়ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে সুব্যবস্থা করিবার ভার প্রাপ্ত হন।

১৫৭৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি (সম্রাট

আকবরের রাজত্বের দ্বাবিংশ বৎসরে) পুনরায় রাজস্ব সংক্রান্ত কাজে গুজরাতে গমন করেন। ঐ সময়ে অন্যতম সেনাপতি মীর আলি গুলাব বিদ্রোহী হওয়ায়, টোডরমল তাঁহাকে পরাস্ত করেন। ঐ বৎসর তিনি উজীরের পদ লাভ করেন। কয়েক বৎসর পরে বাঙ্গালা ও বিহারে পুনরায় বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি ঐ বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য প্রেরিত হয়। মুঙ্গেরের নিকট এক যুদ্ধে মাসুম-ই-কাবুলী এবং মিরজা সরফুদ্দিনকে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধ উপলক্ষে তাঁহাকে দীর্ঘকাল বিহারে অবস্থান করিতে হয়। বিদ্রোহ শান্ত হইলে, তিনি দিল্লীতে প্রস্থান করেন। পূর্ব্বোক্ত মাসুম-ই-কাবুলী, মিরজা সরফুদ্দিন হোসেন, হুমায়ুন ফারমিলি, তার খাঁ দিওয়ানা প্রভৃতি এই বিদ্রোহের প্রধান নায়ক ছিলেন। ১৫৮৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি মানসিংহের সহিত যুসুফজাইদিগকে দমন করিবার জন্য গমন করেন। ১৫৯০ খ্রীঃ অব্দে তিনি কিছুকাল লাহোরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। আকবরের রাজত্বের সপ্তবিংশ বৎসরে (১৫৮২ খ্রীঃ) তিনি দেওয়ান এবং তৎপূর্ব্বে গুজরাতের বিদ্রোহ দমন করিয়া তিনি রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। সম্রাটের রাজত্বের চৌত্রিশ বৎসরে (১৫৮৯ খ্রীঃ অব্দ) স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। রাজস্ব ও অর্থনীতি সম্বন্ধে সুব্যবস্থার জন্য চারি প্রকারের মোহর ও তিন প্রকারের তঙ্কা প্রচলনের ব্যবস্থা করেন। পূর্ব্বে রাজস্ব সংক্রান্ত হিসাবপত্র হিন্দিতে রক্ষিত হইত। তিনি ফারসী ভাষায় হিসাব রাখার প্রবর্ত্তন করেন।

টোডরমল সংস্কৃত ভাষায় টোডড়ানন্দ নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উহা একধারে ধর্ম্মশাস্ত্র ও জ্যোতিষ গ্রন্থ।

অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি হরিদ্বারে বাস করিতে থাকেন। ১৫৮৯ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ট্যাবারনিয়ার (Tavernier)—একজন ফরাসী দেশীয় ভ্রমণকারী। তিনি দিল্লীর সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে (১৬২৭—১৬৫৮ খ্রীঃ) ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, শাহজাহান অপত্য নির্ব্বিশেষে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে চোর, দস্যু ও রাজকর্ম্মচারীদের অত্যাচারের ভয় ছিল না। প্রজারা সর্ব্বপ্রকারে সুখী ছিল। বস্তুতঃ তাঁহার বিবরণ পাঠে সম্রাট শাহজাহানের উপর স্বাভাবিক শ্রদ্ধা না জন্মিয়া পারে না।

ঠ

ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী—বাঙ্গালী কবি ও পালা গান রচয়িতা। আনুমানিক ১২০৯ বঙ্গাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি মুহুরীগিরি কাজে নিযুক্ত হন। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত রচনায় তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রমে তিনি আণ্টুনি, ভোলা ময়রা প্রভৃতি তৎকালীন প্রসিদ্ধ কবিওয়ালাদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁহাদের উৎসাহে বিভিন্ন যাত্রার বা কবির দলের জন্য সঙ্গীত রচনা করিতে থাকেন। প্রায় ষাট বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ঠাকুরদাস দত্ত—প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার ও সঙ্গীত রচয়িতা। তাঁহার পিতা রামমোহন দত্ত কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে (Fort William College) চাকুরী করিয়া বিত্তবান হন। তাঁহার বাস ভবনে বারমাসে তের পার্ব্বণ সম্পন্ন হইত। ঠাকুরদাস খ্রীঃ উনবিংশ শতাব্দীর (বঙ্গের ত্রয়োদশ শতাব্দীর) প্রথম দশকে জন্মগ্রহণ করেন। গৃহ শিক্ষকের নিকট তিনি ইংরেজি ও বাঙ্গালা ভাষায় সুশিক্ষা লাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল। যৌবনের প্রথম ভাগেই ঠাকুরদাস পিতৃহীন হন। কিছুকাল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে তিনি চাকুরী করেন। কিন্তু ভাল না লাগায় কাজ ছাড়িয়া দেন।

সঙ্গীত রচনা ভিন্ন যাত্রার পালা রচনা ও অভিনয় করিতেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি তৎকালীন বহু যাত্রা দলের অধিকারীকে পালা রচনা করিয়া দিতেন। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সখের যাত্রার জন্যও তিনি পালা রচনা করিতেন। এই বিষয়ে তাঁহার খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সকল বিভিন্ন লোকের জন্য তিনি প্রায় ষোলটি পালা রচনা করেন। প্রায় সমুদয় পালাই পৌরাণিক বিষয়ে।

ঠাকুরদাসের নিজের একটি সখের পাঁচালীর দল ছিল। পরে ঐ দলটি ব্যবসায়িক দলে পরিণত হয় এবং বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করে। ঐ দলের জন্য তিনি পৌরাণিক বিষয়ে অনেক পালা রচনা করেন। তাঁহার কবিত্ব শক্তিতে তৎকালীন সুধীজন বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁহার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। নবদ্বীপ, তারকেশ্বর, সাতক্ষীরা প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতে তাঁহার নিমন্ত্রণ আসিত।

পাঁচালী ও যাত্রার দলের পালা ভিন্ন তিনি বিরহ ও প্রেম বিষয়েও অনেক গান রচনা করেন। এইগুলি সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত হইবার যোগ্য। ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়—বাঙ্গালী লেখক ও গ্রন্থ রচয়িতা। খুলনা জিলার সাতক্ষীরা মহকুমায় তাঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল। তাঁহার পিতার নাম নবকুমার মুখোপাধ্যায়। ঠাকুরদাস বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু নিজে নিজে অধ্যয়ন করিয়া তিনি যথেষ্ট জ্ঞানার্জ্জন করেন। অধ্যয়নস্পৃহা তাঁহার শেষ জীবন পর্য্যন্ত ছিল।

বৈষয়িক জীবনে তিনি কিছুকাল শিক্ষকতা এবং কয়েক বৎসর কয়েকটি জমিদারী সেরেস্তাতেও কাজ করেন। তদ্ভিন্ন বঙ্গবাসী, বঙ্গনিবাসী প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগেও কাজ করিয়াছিলেন। নবজীবন, সাধারণী, সাহিত্য, সাধনা, নব্যভারত, প্রদীপ প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি মালঞ্চ, সাহিত্যমঙ্গল, সাতনরী, বিজনবালা, উদ্ভটকাব্য, শারদীয় সাহিত্য প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

শেষ জীবনে তিনি যখন যশোহর জিলায় এক জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করিতেছিলেন, তখন গুরুতর পীড়িত হইয়া, চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন এবং এইখানেই ১৩১০ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে (১৯০৩ খ্রীঃ নবেম্বর) মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা বর্ত্তমান ছিল।

ড

ডন ফ্রানসিস ডি মিনিসেস (Don Francis De Meneses)—তিনি সিংহল দ্বীপের পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বাঙ্গালার অন্তর্গত সন্দ্বীপের পর্ত্তুগিজ শাসনকর্ত্তা গঞ্জালে, আরাকান অধিকার করিবার জন্য, ১৬১৫ খ্রীঃ অব্দে গোয়ার পর্ত্তুগিজ রাজপ্রতিনিধি ডন হিরোম ডি এজবেডোর (Don Heerome De Azvedo) নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। তদনুসারে রাজপ্রতিনিধি ডন ফ্রানসিসকে কয়েকখানা যুদ্ধ জাহাজ ও সৈন্যসহ গঞ্জালের নিকট প্রেরণ করেন। গঞ্জালে স্বীয় ও রাজকীয় সৈন্য ও রণতরীর সাহায্যে আরাকান আক্রমণ করেন। আরাকানরাজ ওলন্দাজ সৈন্যের সাহায্যে গঞ্জালেকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। সেনাপতি ডন ফ্রানসিস এই যুদ্ধে নিহত হন। গঞ্জালের দুর্দ্দশা এখান হইতেই আরম্ভ হয়। গঞ্জালে দেখ।

ডল্লন—তিনি শুশ্রুত সংহিতার একজন প্রসিদ্ধ প্রাচীন টীকাকার। সেই টীকায় নাম 'নিবন্ধা সংগ্রহ।'

ডাওসন, জন (John Dowson)—ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ্। ১৮২০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ভারতে রাজকার্য্যের জন্য প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে ইংরেজ যুবকদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য, হেলিবুরিতে (Haileybury) যে শিক্ষায়তন ছিল, তিনি কিছুকাল তথায় শিক্ষকতা করেন। তৎপরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় সংসৃষ্ট কলেজে ও সামরিক বিদ্যালয়ে হিন্দুস্থানীর অধ্যাপক হন। ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। হিন্দু ধর্ম্ম এবং পৌরাণিক বিবরণ সংবলিত একখানি গ্রন্থ (A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion) তিনি সংকলন করেন। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালাদেশের ছোটলাট (Lieutenant Governor) সার এড্ওয়ার্ড ক্লাইব বেলির (Sir Edward Clive Bayley) সহযোগীতায় সার হেনরী মিয়ার্স ইলিয়ট (Sir Henry Miers Elliot) সঙ্কলিত ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ (History of India as told by its own Historians) সম্পাদন করিয়া প্রকাশিত করেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে উহা সমাপ্ত হয়। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ জ্ঞানকোষ এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকাতে তাঁহার ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের নানা বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ডাকপুরুষ—আমাদের দেশে ডাকের বচন বলিয়া যে সকল ছড়া (কবিতা) প্রচলিত আছে, তাহাদের প্রণেতা এই ডাকপুরুষ আসামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান কামরূপ জিলার বড়পেটা মহকুমার অন্তর্গত লেহিভেগরা গ্রামে ছিল। সম্ভবতঃ তিনি খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

ডাকুনহা, জে, গিয়ারসন J. Gerson Dacunha.—১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে পর্ত্তুগিজ অধিকৃত গোয়ানগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি গোয়া, বোম্বাই ও ইউরোপে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। চিকিৎসা বিদ্যায় জ্ঞান লাভ করিয়া, তিনি বোম্বাই নগরে প্রত্যাগত হন। তিনি একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাইনগরীস্থিত শাখা পরিষদের (The Bombay Branch of the Royal Asiatic Society) সহকারী সভাপতি ছিলেন। উক্ত সমিতিতে তিনি ইতিহাস, স্থপতিবিদ্যা, প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যবান্ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। চাউল

ও বেসিন বন্দর (বোম্বের অন্তর্গত) এবং বোম্বাই নগরীর উৎপত্তির ইতিহাস ১৯০০ খ্রীঃ অব্দে তিনি লিখিয়াছিলেন। তিনি মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ, পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সংগৃহীত ১৫ হাজার ভারতীয় বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা ছিল। বোধ হয় তিনি একজন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুদ্রা সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি ১৯০০ খ্রীঃ অব্দের ৩রা জুলাই পরলোক গমন করেন।

ডাঙ্গর ফা—নামান্তর হরি রায়। তিনি ত্রিপুরাধিপতি মোহনের (খিচুং ফা) পুত্র। তিনি রাজ্যের নানাস্থানে পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি অষ্টাদশ পুত্রের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ রত্ন-ফাকে গৌড়ের নবাব তোগ্রল খাঁর নিকট প্রেরণ করেন এবং অবশিষ্ট সপ্তদশ পুত্রের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন। রত্নফা ১২৭৯ খ্রীঃ অব্দে, নবাবের সাহায্যে পিতাকে বিতাড়িত করিয়া, সিংহাসন লাভ করেন। ডাঙ্গর ফা পলায়নপূর্ব্বক থাংচি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এই স্থানেই পরলোক গমন করেন। রত্নফা দেখ।

ডানকান, জোনাথান (Jonathan Duncan)—ভারতপ্রবাসী উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চাকুরী লইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানে দায়ীত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত থাকিয়া, তিনি কৃতীত্বের পরিচয় প্রদান করেন। ১৭৯৫ হইতে ১৮১১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি বোম্বাইএর শাসন-কর্ত্তা (Governor) ছিলেন। এত দীর্ঘকাল আর কেহই ঐ পদে নিযুক্ত থাকেন নাই। শাসন ব্যাপারে তিনি অনেক দুর্নীতি দমন করিয়া, প্রশংসা লাভ করেন। বাঙ্গালা দেশে সাগরে সন্তান নিক্ষেপের ন্যায়, কাঠিওয়াড়েতেও এক প্রকারের শিশু কন্যা হত্যা প্রচলন ছিল। তিনি উহার দমন করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। টিপু-সুলতান ও মারাঠাদিগের সহিত যুদ্ধে এবং গুজরাটের সাময়িক বিদ্রোহ দমনেও তিনি কৃতীত্ব প্রদর্শন করেন। ১৮১১ খ্রীঃ অব্দে বোম্বাই নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। কৃতজ্ঞ বোম্বাইবাসীগণ কর্ত্তৃক তাঁহার সমাধির উপর এক লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে।

ডাফ, আলেক্জাণ্ডার, (Rev. Dr. Alexander Duff)—ভারত প্রবাসী সুপ্রসিদ্ধ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজক। ১৮০৫ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে ইংলণ্ডে তাঁহার জন্ম হয়; স্কটলণ্ডের সেণ্ট এণ্ড্রুজ (St. Andrews) বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। বাল্যকাল হইতেই তিনি ধর্ম্মভীরু ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। খ্রীষ্টের মহান উপদেশসমূহ দেশবিদেশে প্রচার করিবার জন্য, তাঁহার বিশেষ

ইচ্ছা হইত। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার সময় হইলে স্কটলণ্ডের ধর্ম্মপরিষদ (General Assembly of the Church of Scotland) কর্ত্তৃক তিনি ভারতবর্ষে খ্রীষ্টের ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য মনোনীত হন এবং ১৮২৯খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে তিনি সস্ত্রীক ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া প্রায় এক বৎসর পরে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। পথে দুইবার তাঁহাদের জাহাজ ভগ্ন হয়। প্রথমবার আফ্রিকার উপকূলে আর দ্বিতীয়বার সাগর মোহানায়। ইহার ফলে রেভাঃ ডাফ যে সকল মূল্যবান্ গ্রন্থাদি সঙ্গে করিয়া আনিতেছিলেন, সে সমুদয়ই নষ্ট হইয়া যায়। ভাগীরথীর মোহানায় জাহাজ ভগ্ন হইলে, কর্দ্দমাক্ত শরীরে দেশীয় ডিঙ্গি নৌকায় চড়িয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন।

ডাফের পূর্ব্বে, কেরী, মার্সমান, প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রচারকগণ ভারতে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতে আগমন করেন। কলিকাতায় ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম প্রচার করিতে দিতে অনুমতি না দেওয়ায়, তাঁহারা দিনেমার অধিকৃত শ্রীরামপুরে যাইয়া প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন। ডাঃ ডাফ্ এদেশে আসিবার পূর্ব্বে, ইংলণ্ড হইতে তাঁহাকে এইরূপ আভাষ দেওয়া হইয়াছিল যে, তিনি যেন কলিকাতার বাহিরে যাইয়া প্রচার কার্য্য করেন। কিন্তু কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া, ডাফ অন্যান্য প্রচারকদিগের সহিত আলোচনা এবং বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয়াদি পরিদর্শন করিয়া, প্রচার-পন্থা সম্বন্ধে ভিন্নমত স্থির করিলেন। তাঁহার মত হইল যে কলিকাতা নগরেই উৎকৃষ্ট শিক্ষায়তন স্থাপন ও পরিচালনা করিবেন এবং ঐ সকল শিক্ষায়তনের মধ্য দিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া কয়েকজন হিতৈষী বন্ধুর সহায়তায় তিনি ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দের ১৩ই জুলাই একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান ও নানাভাবে সাহায্য করেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবসে রামমোহন, উপস্থিত থাকিয়া ডাফ ও নবাগত ছাত্রগণকে উৎসাহ প্রদান করেন। ডাফ স্বয়ং ঐ বিদ্যালয়ে নিজ উদ্ভাবিত প্রণালীতে ইংরাজি শিক্ষা দিতেন। পূর্ব্বেই তিনি নিজে ভালরূপ বাঙ্গালা ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সেইজন্য বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দিতে, তাঁহার বিশেষ অসুবিধা হইত না।

বিদ্যালয় পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাধারণের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিবার ব্যবস্থা করেন। এই বক্তৃতা শুনিবার জন্য প্রথম প্রথম বিশেষ লোক হইত না। জাতিচ্যুত হইবার ভয়ে অনেকেই ইচ্ছা থাকিলেও

আসিত না। যাহারা সাহস করিয়া আসিত, তাহারাও সমাজে নিন্দিত ও সময়ে সময়ে নিগৃহীত হইত। কিন্তু ইংরাজি শিক্ষার জন্য লোকের আগ্রহ ক্রমশঃ বাড়িতেছিল বলিয়া, তাঁহার বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা বাড়িয়া চলিতে থাকে।

এইভাবে দুই বৎসর চলিবার পর, ১৮৩২ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে মহেশচন্দ্র ঘোষ নামক এক ব্যক্তি প্রথম তাঁহার নিকট খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাহার পর খ্যাতনামা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৎপরে কয়েক মাসের মধ্যে গোপীনাথ নন্দী ও আনন্দচাঁদ মজুমদার নামে আরও দুই জন ডাফের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

বলা বাহুল্য এই ঘটনায় তদানীন্তন হিন্দু সমাজে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রভাব হইতে ছাত্রগণকে রক্ষা করিবার জন্য অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি আন্দোলনে যোগদান করেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ডাফের বিদ্যালয় পূর্ব্বেরই ন্যায় জনপ্রিয় হইতে থাকে।

ডাফ নিজের কর্ম্মক্ষেত্র শুধু কলিকাতাতেই নিবদ্ধ রাখেন নাই। হুগলী, বাঁশবেড়িয়া, কালনা, ঘোষপাড়া প্রভৃতি স্থানে প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করিয়া, একাধারে শিক্ষাদান ও খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের সহিত সহানুভূতি না থাকিলেও ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের সাহায্য হইবে বলিয়া অনেক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ডাফকে নানাস্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে সাহায্য করেন। কলিকাতার সন্নিকটস্থ টাকীর চৌধুরীবংশীয় জমীদারগণ এবিষয়ে বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। তাঁহাদের উৎসাহে টাকীতে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উহা পরে কাশীপুরে স্থানান্তরিত হয়।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবংশীয় দারদের এক কর্ম্মচারীর পুত্র উমেশচন্দ্র সরকার সস্ত্রীক ডাফের নিকট খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। দীক্ষার পূর্ব্বে উমেশচন্দ্র ও তাহার পত্নীকে উদ্ধার করিবার বিশেষ চেষ্টা হয় এবং তাহা লইয়া মকর্দ্দমাও হয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে চেষ্টা সফল হয় নাই। এই ঘটনায় বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিত সমাজে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং তৎফলে সকল শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া "হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়" নামে একটি শিক্ষায়তন স্থাপন করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাহার প্রথম কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। বিদ্যালয়টি কয়েক বৎসর পরে উঠিয়া যায়।

১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ডাফ ভারতে অবস্থান করেন। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার

ভিন্ন ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারও তাঁহার কার্য্য তালিকার মধ্যে ছিল। তদ্ভিন্ন তদানীন্তন শিক্ষামূলক সর্ব্বপ্রকার কাজের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত থাকিতেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি বেথুন সোসাইটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে, তাঁহাকে প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ (Vice Chancellor) করার প্রস্তাব হয়। কিন্তু বার্দ্ধক্য জনিত অসুস্থতার জন্য তিনি ঐ পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই।

এদেশের কর্ম্মজীবনের মধ্যে দুই-বার তিনি, প্রধানতঃ বিশ্রাম লাভ ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য স্বদেশে গমন করেন। প্রথমবার ফিরিয়া আসিবার সময়ে তিনি মিশর ও জেরুজেলাম পরিভ্রমণ করিয়া আসেন।

নিজ মত প্রচারের সাহায্যের জন্য, তিনি ১৮৩২ সালে Calcutta Christian Register নামে একখানি পত্রিকা পরিচালনের আয়োজন করেন। পরে অব্জার্ভার (The Observer) নামেও একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দের মে মাস হইতে "ক্যালকাটা কোয়ার্টার্লি" (The Calcutta Quarterly) নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিতে থাকেন। তিনি দীর্ঘকাল "ক্যালকাটা রিভিউ" (The Calcutta Review) পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন।

তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার ও অন্যান্য জন-হিতকার কার্য্যের জন্য তিনি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিতেন। উন্নত চরিত্র ও উচ্চ আদর্শের জন্য সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। এদেশের কর্ম্মজীবন শেষ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক, তিনি নিজ দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা সেই স্থান হইতেও এদেশে খ্রীষ্টের বাণী প্রচারের সুব্যবস্থা করিতেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, স্বদেশে, বিবিধ সম্মানের অধিকারী হইয়া, এই কর্ম্মবীরের দেহান্ত হয়।

ডাফরিন, লর্ড (First Marquess of Dufferin and Ava)—১৮২৬ খ্রীঃ অব্দের ২১শে জুন, তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা প্রাইস, ডাফরিনের প্রথম বেরণ ছিলেন। তাঁহার মাতা হেলেন সেলিনা প্রসিদ্ধ বাগ্মী রিচার্ড ব্রিনসলী সেরিডানের (Richard Brinsly Sheridan) পৌত্রী ও টমাস সেরিডানের (Thomas Sheridan) পুত্রী ছিলেন। তাঁহার মাতাও বিদুষী ছিলেন। লর্ড ডাফরিন অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্গত ইটন (Eton) ও ক্রাইষ্ট চার্চ্চ (Christ Church) কলেজে অধ্যয়ন করেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া, তিনি ১৮৪৯—৬০

খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত নানা কাজে লিপ্ত ছিলেন। ১৮৬০ সালে তিনি সিরিয়া দেশে খ্রীষ্টান নরনারীর হত্যার অনুসন্ধান করিতে সদস্য নিযুক্ত হন। ১৮৬৪—৬৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি ভারত সচিবের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তৎপরে তিনি ১৮৮৩ সাল পর্য্যন্ত আরও নানা কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। ১৮৮৪ সালে লর্ড রিপনের পরে, তিনি ভারতের রাজপ্রতিনিধি হইয়া আগমন করেন। লর্ড রিপনের সময়ে ইলবার্ট বিলের জন্য ইংরেজ ও দেশীয় লোকদের মধ্যে ভয়ানক সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সঞ্জাত হয়। তিনি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুল পরিমাণে সদ্ভাব স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাঁহার রাজত্বের প্রথম কার্য্য রাউলপিণ্ডির দরবার। রুশিয়ার সম্রাট মধ্য এসিয়ার রাজ্য বিস্তার করিতে করিতে আফগানিস্থানের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। মার্বনগর রুশিয়ার করতলগত হইলে, ইংরেজেরা শঙ্কিত হইয়া আফগানিস্থান ও রুশরাজ্যের সীমা নির্দ্ধারণে ব্যস্ত হইলেন। ১৮৮৫ সালের বসন্তকালে তিনি আফগানিস্থানের আমীর আবদর রহমানকে রাউলপিণ্ডির দরবারে অভ্যর্থনা করিয়া, রুশিয়ার সহিত যুদ্ধ বাঁধিলে, অর্থ ও অস্ত্রদ্বারা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। অনেক চেষ্টার পর রুশিয়া ও আফগানিস্থানের সীমা নির্দ্ধারণ সম্পন্ন হইল এবং রুশরাজ হিরাটনগর আমীরের অধিকারে রাখিতে সম্মত হইলেন।

ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে ব্রহ্মরাজ থিব ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা দুর্গ সংস্কারাদি কার্য্য করাইতে ছিলেন। এতদ্ব্যতীত কাষ্ঠ ব্যবসায়ী বোম্বে বর্ম্মা ট্রেডিং কোম্পানীর অভিযোগের প্রতিও রাজা থিব সমুচিত মনোযোগ প্রদান করিতেন না। এই সমুদয় নানা কারণে লর্ড ডাফরিন বিরক্ত হইয়া ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে সেনাপতি প্রেণ্ডারগাষ্টকে (Gen. Prendergast) ব্রহ্মদেশ অধিকার করিতে প্রেরণ করেন। তিনি রাজধানী মান্দালয় নগর হঠাৎ আক্রমণ করিয়া, রাজা থিবকে বন্দী করিয়া আনেন এবং রাজা থিব ভারতের রত্নগিরি নগরে নির্ব্বাসিত হন। ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে উত্তর ব্রহ্মদেশও ইংরেজ সাম্রাজ্য ভুক্ত হইল। ইতিপূর্ব্বে ১৮২৬ ও ১৮৫২ সালের যুদ্ধের পরে আসাম ও নিম্ন ব্রহ্মের কোন কোন স্থান ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। এখন সমস্ত ব্রহ্মদেশই ইংরেজ রাজ্যান্তর্গত হইল।

সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে গোয়ালীয়ার দুর্গ ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে ছিল। ১৮৮৬ সালে লর্ড ডাফ্রিন মহারাজা সিন্ধিয়াকে ইহা প্রত্যর্পণ করেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশ বৎসর রাজত্বকাল পূর্ণ হওয়ায় ১৮৮৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী ভারতবর্ষে জয়ন্তী উৎসব Jubilee) অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। তদুপলক্ষে বহু রাজবন্দীকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

লর্ড ডাফ্‌রিনের অন্যতম কীর্তি প্রজাসত্ব আইন। মধ্য বঙ্গ, অযোধ্যা ও পাঞ্জাবের প্রজাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি তিনটী প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন করেন। এই আইন হওয়ায় প্রজারা কিছুকাল ভূমি অধিকার করিলে এবং সেই ভূমি হইতে তাহারা, নিয়মিত খাজানা আদায় করিলে, উৎখাত হইতে পারে না।

তাঁহার সময়ের আর একটী বিশেষ ঘটনা জাতীয় মহাসমিতির (Indian National Congress) প্রতিষ্ঠা। ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসের বড়দিনের ছুটিতে বোম্বাই নগরে এই জাতীয় মহাসমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। বঙ্গের সুসন্তান ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় (Mr. W. C. Bonerjee Bar-at-law) ইহার সভাপতি ছিলেন। ইহাই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

তাঁহার সহৃদয়া পত্নী হ্যারিয়েট ভারতীয় মহিলা কুলের সুচিকিৎসার জন্য স্বীয় নামে (Countess of Duffrins Fund) একটা ধনভাণ্ডার স্থাপন করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করেন। তদ্দ্বারা ভারতের নানাস্থানে মহিলাদের চিকিৎসার জন্য তাঁহার নামে বহু চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে।

সীমান্ত প্রদেশে দুর্গ নির্ম্মাণ, ব্রহ্ম যুদ্ধ, সৈন্য বৃদ্ধি প্রভৃতি কার্য্যের জন্য অনবরত তাঁহাকে অর্থ ব্যয় করিতে হওয়ায়, তিনি আয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লবণ ও কেরাসিন তৈলের উপর কর স্থাপন করেন এবং আয়কর প্রবর্ত্তন করেন।

তিনি ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দের ১০ই ডিসেম্বর লর্ড ল্যান্‌সডাউনের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তৎপরে তিনি ১৮৮৮—৯১ সাল পর্য্যন্ত রোম নগরে, ১৮৯১—৯৬ সাল পর্য্যন্ত পেরি নগরে রাজদূতের কার্য্য করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে ব্যবসায়ে বহু অর্থ নষ্ট হওয়ায় তিনি অর্থ সঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন তিনি বিদ্বান্, জ্ঞানপিপাসু পুরুষ ছিলেন। নানা সদনুষ্ঠানের সহিত তিনি সংযুক্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম Letters From High Latitudes. তাঁহার সহধর্ম্মিণী Our Viceregal Life in India নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ১৯০২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী লর্ড ডাফ্‌রিন পরলোক গমন করেন।

ডালহৌসী, লর্ড (The Marquis of Dalhousie)—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীনে ভারতবর্ষে যে কয় জন

বড়লাট শাসনকর্ত্তা রূপে আগমন করেন, লর্ড ডালহৌসী তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান ছিলেন। তাঁহার শাসন-কালে ভারতবর্ষে নানা বিষয়ে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় এবং বহু নূতন ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। ঐ সকলের মধ্যে অনেক বিষয় পরবর্ত্তীকালের ইতিহাসের উপ-করণ সৃষ্টি করে।

১৮১২ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে ইংলণ্ডে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা, আর্ল অব ডালহৌসী (Ninth Earl of Dalhousie) সৈনিক বিভাগে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরূপে কাজ করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। লর্ড ডালহৌসী শিক্ষা সমাপন করিয়া স্বদেশেই শাসন কার্য্যের একাধিক দায়িত্বপূর্ণ পদে অধি-ষ্ঠিত ছিলেন। ভারতের প্রধান শাসন-কর্ত্তার (Governor General) পদ লাভ করিয়া, তিনি ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে এদেশে পদার্পণ করেন। এবং কিঞ্চিদধিক আট বৎসর ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। তিনি আসিবার পূর্ব্বেই ভারতে ইংরেজ রাজত্ব বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে এবং ইংরেজ প্রভুত্বও দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তখনও অনেক স্থানে দেশীয় রাজ্য ছিল। তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর অসদ্ভা-বের অভাব ছিল না। ডালহৌসী মনে করিলেন যে, এদেশে যদি ইংরেজ রাজত্ব স্থায়ী করিতে হয়, তবে দেশীয় রাজ্যগুলির বিলোপ সাধন করিতে হইবে। এই নীতি তিনি পূর্ব্বাবধিই অবলম্বন করিয়া কাজ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে অনেক দেশীয় রাজ্য ইংরেজ অধিকারভুক্ত হয়। ডালহৌসীর শাসনকালের পূর্ব্বেই এদেশে ইংরেজ শাসন কর্ত্তৃপক্ষ দেশীয় রাজ্যগুলি সম্বন্ধে এই স্থির করিয়াছিলেন যে, কোনও রাজার মৃত্যুর পর, তাঁহার ঔরসজাত পুত্র বর্ত্তমান না থাকিলে, সেই রাজ্য ইংরেজ অধিকার ভুক্ত হইবে। এই নীতি অবলম্বন করার ফলে, ডালহৌসীর শাসনকালে প্রথমে বোম্বাই প্রদেশের সাতারা নামক ক্ষুদ্র মারাঠা রাজ্যটি ইংরেজ অধিকার ভুক্ত হয়। সাতারার তদানীন্তন রাজা অপুত্রক বিধায় দত্তক গ্রহণ করেন। কিন্তু ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ (Board of Directors) ঐ কার্য্য অনুমোদন করেন নাই। তাহার অল্প-কাল পরেই সম্বলপুর রাজ্য ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সম্বলপুরের অপুত্রক রাজা দত্তক গ্রহণ না করাতে, বিশেষ কোনও গোলমাল হয় নাই। ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে মারাঠা রাজ্য ঝান্সীর রাজা অপুত্রক পরলোক গমন করিলে, ইংরেজ সর-কার তাঁহার বিধবা পত্নী লক্ষ্মীবাইকে বৃত্তি দিয়া ঝান্সী অধিকার করিলেন। (লক্ষ্মীবাই দ্রষ্টব্য)। ক্রমে ক্রমে বুন্দেল-খণ্ডের জৈতপুর, পাঞ্জাবের বাঘাত নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য, বাঙ্গালা দেশের

দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তের উদয়পুর, খান্দেশ প্রদেশের একটি ক্ষুদ্র রাজ্যও ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হইল। ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে নাগপুরের বৃহৎ মারাঠা রাজ্যের অধিপতিও অপুত্রক পরলোক গমন করিলে, পূর্ব্বউল্লিখিত নীতির বলে নাগপুর রাজ্যও খাসমহলে পরিণত হইল। রাজবংশীয় অনেককে, বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা হইল। তাহার দুই বৎসর পরে মাদ্রাজ প্রদেশে কর্ণাটের নবাব অপুত্রক পরলোক গমন করিলে, কর্তৃপক্ষ তাঁহার স্থানে আর কাহাকেও নবাব বলিয়া স্বীকার করিলেন না। মৃত নবাবের খুল্লতাতকে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হইল মাত্র। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে পেশোয়া বাজীরাও মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দ হইতে ইংরেজ সরকার তাঁহাকে বার্ষিক প্রায় ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিতেন। তিনি নানাসাহেব নামে এক দত্তক পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিলে, ঐ বৃত্তি বন্ধ হইয়া যায়। (নানাসাহেব দ্রষ্টব্য)। ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে অযোধ্যাও ইংরেজ অধিকৃত হয়। কুশাসন ও অত্যাচার ইহাই অযোধ্যার তদানীন্তন নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল। (ওয়াজিদ আলি শাহ দেখ)। ডালহৌসীর শাসনকালের মধ্যে ইহাই শেষ রাজ্য বৃদ্ধি। এই সকল রাজ্য বৃদ্ধির ফল যে বিশেষ সন্তোষজনক হয় নাই, পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা লর্ড ক্যানিংএর অধিকারকালে সংঘটিত প্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহ তাহার প্রমাণ। ডালহৌসী এদেশে আসিবার পূর্ব্বেই প্রথম শিখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পাঞ্জাবের কিয়দংশ ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হয়। তৎফলে শিখদের মধ্যে অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পায় এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বড়লাট লর্ড হার্ডিং (Lord Hardinge) এর ব্যবস্থা ফলে যে সকল শিখ সর্দ্দারের শক্তি ও প্রভুত্ব হ্রাস পাইয়াছিল, তাঁহারা ক্রমশই ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচার করিতে লাগিলেন। অনেকে প্রকাশ্যভাবেই ইংরেজ রাজ্য আক্রমণ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। ডালহৌসী শাসনভার গ্রহণ করিবার অল্প পরে, মুলতানের শাসনকর্ত্তা মূলরাজ বিদ্রোহী হইয়া দুইজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীর প্রাণবধ করিলেন। প্রথম শিখযুদ্ধের পর মূলরাজকে ইংরেজরাই মুলতানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁহার কার্য্যাবলীর জন্য ইংরেজ সরকারের নিকট অনেকাংশে দায়ী ছিলেন। কিন্তু ইংরেজদের অভিভাবকত্ব তাঁহার মনঃপূত না হওয়ায়, তিনি বিদ্রোহী হন। উক্ত ইংরেজ কর্ম্মচারীদ্বয়ের নিধনই দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ। (ঝিন্দন কুমারী ও দলিপ সিংহ দ্রষ্টব্য)। ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে গুজরাটের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে শিখ শক্তি বিধ্বস্ত হয় এবং

পঞ্জাবের অবশিষ্ট অংশ ইংরেজ রাজ্য ভুক্ত হয়।

ভারতের ভৌগলিক সীমার বাহিরে ব্রহ্মদেশেও অশান্তির উদ্‌ভব হয়। প্রথম ব্রহ্ম যুদ্ধের (১৮২৬ খ্রীঃ) পর, সন্ধির সর্ত্তানুসারে বহু ভারতীয় ও ইংরেজ বণিক ব্যবসায় উপলক্ষে পেগু প্রদেশের নানাস্থানে, প্রধানতঃ বেসিন, রেঙ্গুন প্রভৃতি বন্দরে যাইয়া ব্যবসায় কেন্দ্র স্থাপন করেন। ঐ সকল বণিকদিগের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতে আরম্ভ হওয়ায়, তাঁহারা বড়লাট সমীপে আবেদন করিয়া প্রতীকার প্রার্থী হন; শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায়, যুদ্ধ ঘোষিত হয় এবং অল্পকাল মধ্যেই সমগ্র পেগু প্রদেশ অধিকৃত হয়। উহাই যথেষ্ট বোধ হওয়ায় লর্ড ডালহৌসী ঘোষণাদ্বারা যুদ্ধ ক্ষান্ত করেন (১৮৫২ খ্রীঃ ডিসেম্বর)। ব্রহ্ম যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে, সিকিম রাজের সহিতও সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল এবং তৎফলে সামান্য স্থান অধিকৃত হয়।

এই সকল রাজ্য বিস্তার ভিন্ন লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে নানা বিষয়ে উন্নতি সাধিত হয়। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয়গুলি 'নিম্নে উল্লিখিত হইল (১) বাষ্পীয় যানের (Railway) প্রবর্ত্তন। বোম্বাই হইতে প্রথম উহার কাজ আরম্ভ হয়। ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে বোম্বাই হইতে থানা পর্য্যন্ত রেলপথ উন্মুক্ত হয়। এই রেল পথ বিস্তার প্রথমে সরকারী ব্যয়ে এবং সরকারী ব্যবস্থাতেই হইয়াছিল। কিন্তু ডালহৌসীর পরামর্শে ইংলণ্ডের শাসনকর্ত্তৃপক্ষ, বণিকসঙ্ঘ অথবা যৌথগোষ্ঠীকে রেলপথ বিস্তার করিতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। তাহার ফলে ইংলণ্ডে সমিতিভুক্ত হইয়া ইংরেজ বণিকসঙ্ঘ ভারতে রেলপথ বিস্তারে উদ্যোগী হন। (২) তড়িৎ-বার্ত্তা (Telegraph) প্রচলন। প্রধানতঃ সরকারী কাজের জন্য প্রবর্ত্তিত হইলেও, অল্পকালের মধ্যে সর্ব্বসাধারণকে উহার সুবিধা ভোগ করিবার সুযোগ দেওয়া হইল। (৩) অল্প ব্যয়ে পত্রাদি প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা প্রচলন। পূর্ব্বে দূরত্ব অনুযায়ী পত্রের মাশুলের হ্রাস বৃদ্ধি হইত। উহার পরিবর্ত্তে দূরত্ব নিরপেক্ষ মাশুলের প্রচলন হইল। তদানুষঙ্গিক আরও অনেক নূতন ব্যবস্থাও প্রচলিত হইল। এই সকল ভিন্ন, বিচার ও শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য বহু নূতন ব্যবস্থা প্রচলনও পুরাতন ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা হয়। এই সকলের ফলে রাজ্যের আয় বৃদ্ধি ও অনেক স্থলে ব্যয় হ্রাস হয়। জনসাধারণের জীবন যাত্রা সহজ ও নিরাপদ হয়। অর্থাগমের নূতন পথ উন্মুক্ত হয় এবং ব্যবসাবাণিজ্যেরও প্রসার হয়। লর্ড ডালহৌসী কিঞ্চিদধিক আট বৎসর এদেশের শাসনকর্ত্তা

ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ভারতে ইংরেজ রাজ্য যেরূপ বিস্তৃতি লাভ করে এবং নানা বিষয়ে যে সব উন্নতিকর ও জনহিতকর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়, ভারতের কোনও একজন শাসনকর্ত্তার আমলে তাহা হয় নাই। এই সময়ে বাঙ্গালা-দেশের জন্য প্রথম ছোটলাটের পদ (Lieutenant Governorship) সৃষ্ট হয়। তৎপূর্ব্বে বড়লাটই সাক্ষাৎ ভাবে বাঙ্গালা প্রদেশ শাসন করিতেন। তখন খাস বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর একত্রে বাঙ্গালা প্রদেশ নামে অভিহিত হইত। এই ব্যবস্থা ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। তাঁহাকে যদি দীর্ঘকালের জন্য স্থানান্তরে যাইতে হইত, তবে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ একজন ডেপুটি গবর্ণর নিযুক্ত হইতেন। সার ফ্রেডারিক হ্যালিডে (Sir Frederick James Halliday), বাঙ্গালার প্রথম পাঁচ বৎসরের জন্য ছোট লাট হন। (১৮৫৪ ১লা মে হইতে ১৮৫৯ ১লা মে পর্য্যন্ত।) তাঁহার শাসনকালে সরকারী কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত ভবনাদি, সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য পথ, সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণ, রক্ষা ও তাহাদের উন্নতি সাধনের জন্য পূর্ত্তবিভাগ (Public Works Department) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঐ সকল বিভাগের কার্য্যের উপযোগী কর্ম্মচারী প্রাপ্ত হইবার সুবিধার জন্য, পূর্ত্ত বিদ্যালয় (Engineering Schools) সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করে। শিক্ষা বিভাগেও তিনি অনেক নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তন করেন এবং শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যাপকভাবে অর্থ ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হয়। তাঁহারই সময়ে সার চার্লস উড (Sir Charles Wood) এর বিশেষ যত্নে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি প্রেসিডেন্সী কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আরও কুড়ি বৎসরের জন্য সনন্দ লাভ করেন। ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়। এইভাবে লোকহিতকর নানা বিভাগে প্রভূত অর্থ ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইলেও ডালহৌসীর শাসনকালে ইংরেজ সরকারের আর্থিক অনটন ঘটে নাই। সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিবার জন্যই এইরূপ সম্ভব হইয়াছিল। রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সৈনিক বিভাগেও অনেক পরিবর্ত্তন ও সংস্কার সাধন করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশেরই নানাস্থানে অধিকাংশ সৈন্য রাখা হইত। এক্ষণে নবাধিকৃত প্রদেশগুলির নানাস্থানে সেনানিবাস প্রতিষ্ঠিত করিতে হইল। ব্রহ্ম যুদ্ধের পর, পূর্ব্ব ও নূতন অধিকৃত স্থান সমূহ পরিদর্শন করিবার জন্য, তিনি দুইবার ব্রহ্মদেশে গমন করেন। প্রথমবারে কেবল আরাকান এবং পরবর্ত্তীবারে

অন্যান্য স্থানে গমন করেন এবং কয়েক মাস অবস্থান করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করেন। অন্যান্য স্থানেও তিনি আবশ্যক মত পরিদর্শনে গমন করেন।

১৮১৩ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজদিগের সহিত হায়দ্রাবাদের নিজামের এক সন্ধি হইয়াছিল এবং তৎফলে নিজামের সম্পূর্ণ ব্যয়ে ইংরেজ সরকার কয়েকটি সৈন্য বাহিনী রক্ষা করিবার অধিকার লাভ করেন। কিন্তু ঐ ব্যয় বাবদ দেয় অর্থ বাকী পড়িতে থাকে এবং প্রাপ্য অর্থ লাভ করিবার অনেক প্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে আবার এক নূতন বন্দোবস্ত হইল। তৎফলে, পূর্ব্ব দেয় অর্থ এবং পরবর্ত্তীকালে সৈন্য রক্ষার সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহার্থ, নিজাম কতকগুলি সর্ত্তে, কয়েকটি জিলা ইংরেজদের হস্তে প্রদান করিলেন। ঐ জিলাগুলি লইয়া বেরার প্রদেশ গঠিত হইল। এখনও পর্য্যন্ত ঐ প্রদেশটি সাক্ষাৎভাবে ইংরেজাধীনে আছে।

নূতন অধিকৃত অনেক স্থানের শাসন ব্যবস্থা সাধারণ ব্যবস্থা হইতে পৃথক করা হয়। ঐ সকল স্থানকে সাধারণতঃ বিধি বহির্ভূত স্থান (Non-Regulated Province) বলা হইত। ঐ ভাবে শাসিত প্রদেশের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রদেশগুলিতে আরও উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হয় এবং ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Council) গুলিরও বিস্তৃতি সাধন ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়।

শাসনকার্য্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে হওয়ায় ডালহৌসীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। তদুপরি ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে তাঁহার পীড়িতা পত্নী স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য স্বদেশাভিমুখে গমনকালে পথিমধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায়, তিনি আরও কাতর হইয়া পড়েন। পূর্ব্ব স্বাস্থ্য আর ফিরিয়া পান নাই। তৎসত্ত্বেও আরও তিন বৎসর অসীম মানসিকবলের সহিত সমুদয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া, ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি স্বদেশ যাত্রা করেন। ইংলণ্ডে যাইয়াও তিনি স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন নাই। কয়েক বৎসর ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া জীবিত ছিলেন মাত্র। ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দের শেষভাগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ডাহির—তিনি সিন্ধু দেশের রাজা ছিলেন। ইরাকের শাসনকর্ত্তা হেজাজ ভারতবর্ষ জয় করিতে অভিলাষী হইয়া প্রথমে ওবেদউল্যা নামক এক সেনাপতিকে সিন্ধু দেশ জয় করিতে প্রেরণ করেন। ডাহিরের সহিত যুদ্ধে ওবেদউল্যা প্রাণত্যাগ করেন। তদীয় সৈন্যদল পলায়ন করেন। তৎপরে হেজাজ বুদেল নামক আর একজন সেনাপতিকে ডাহিরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।

তিনিও অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া ডাহিরের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। অতঃপর হেজাজ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মোহাম্মদ বিন কাশিমকে বহু সৈন্যসহ সিন্ধু দেশ বিজয়ার্থ প্রেরণ করেন। ৭১২ খ্রীঃ অব্দে মোহাম্মদ সিন্ধু দেশের রাজধানী আলোর নগর আক্রমণ করেন। ডাহির সেই যুদ্ধে সমর শয্যায় শয়ন করেন। কিন্তু ডাহিরের মহিষী, স্বামীর মৃত্যুর পরেও স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরাজয়ের সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে, পুরাঙ্গনাগণসহ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

ডি বয়নি বেনট (De Boigne Benoit, Count—সার্দ্দিনিয়া রাজ্যে ১৭৫১ খ্রীঃ অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তদশ বর্ষ বয়ক্রমকালে তিনি ফরাসী দেশে সৈন্য বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর সাধারণ সৈন্যরূপে কাজ করিয়া উন্নতির আশা খুবই কম মনে করিয়া, উক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক রুসিয়ার সৈন্যদলে প্রবেশ করেন। সেই সময়ে রুসিয়া ও গ্রীসের সহিত, তুরস্কের যুদ্ধ চলিতেছিল। টেনেডো দ্বীপ আক্রমণ করিতে যাইয়া তিনি তুরস্ক সেনাপতির হস্তে বন্দী হন। পরে উভয় রাজ্যে সন্ধি হইলে তিনি মুক্তি লাভ করেন। তৎপরে নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, কেয়েরো নগর স্থিত ব্রিটিশ কনসাল জেনেরেলের নিকট হইতে অনুরোধ পত্র গ্রহণপূর্ব্বক মান্দ্রাজে আগমন করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈনিকদলে প্রবেশ করিয়া কিছুদিন তিনি কাজ করেন। তৎকালীন গবর্ণার মেকার্টি'র (Lord Macartrey) দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া, তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতায় চলিয়া আসেন। গবর্ণার স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে বড়লাট ওয়ারেন হেষ্টিংসের নিকট একখানা অনুরোধ পত্র প্রদান করেন। বড়লাটও তাঁহাকে তদনুরূপ একখানা উৎকৃষ্ট পরিচয় পত্র প্রদান করেন। এই পত্র দেখিয়া গোয়ালিয়রের মাধব রাও সিন্ধিয়া তাঁহাকে সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত করেন। সিন্ধিয়া তাঁহার হস্তে স্বীয় সৈন্যদলের শিক্ষার ভার সমর্পণ করেন। তাঁহার শিক্ষা গুণে সিন্ধিয়ার সৈন্যগণ অপরাজেয় হইয়াছিল। বলা বাহুল্য সিন্ধিয়া তাঁহাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। ১৭৯৪ সালে তিনি সিন্ধিয়া চাকুরী ছাড়িয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু ১৭৯৫ সালে আবার সিন্ধিয়ার অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৭৯৫ সালে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৮৩০ সালে পরলোক গমন করেন। তিনি প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা নানা কাজে দান করিয়াও নগদ এক কোটী টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন।

ডিরোজিও, হেনরী লুই বিবিয়ান (Henry Louis Vivian Derozio) —১৮০৯ খ্রীঃ অব্দের ১০ই এপ্রিল কলিকাতার ইটালী পদ্মপুকুর অঞ্চলে, মৌলালী দরগার সন্নিকটবর্ত্তী এক ভবনে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ফ্রানসিস ডিরোজিও (Francis Derozio) এক সওদাগরী আফিসে কাজ করিতেন। তাঁহার সচ্ছল অবস্থা ছিল। ডিরোজিও স্কটলণ্ড দেশীয় ড্রামণ্ড সাহেবের ধর্ম্মতলাস্থিত স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন। ড্রামণ্ড সাহেব (Mr. Drummond) স্বাধীন চিন্তা ও বিদ্যাবত্তার জন্য সে সময়ে একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। প্রচলিত ধর্ম্মমতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না বলিয়া, অনেক সাহেব তাঁহার স্কুলে ছাত্র পাঠাইতেন না। এই স্কুলে পড়ার ফলে ডিরোজিওর মধ্যেও ড্রামণ্ড সাহেবের স্বাধীন চিন্তার ভাব জাগরিত হইয়াছিল। চৌদ্দ বৎসর বয়সেই পাঠ শেষ করিয়া ডিরোজিও প্রথমে পিতার আফিসে কেরাণীর কর্ম্মগ্রহণ করেন। তৎপরে ভাগলপুরে তাঁহার এক নীলকর মাসীপতির নিকট কিছুকাল অবস্থান করেন। তাঁহার অধ্যয়ন স্পৃহা অতিশয় প্রবল থাকায়, তিনি অনেক ভাল ভাল ইংরেজী গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে ইংরেজি খবরের কাগজেও কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিতেন। এই সময়ে তাঁহার বিখ্যাত কবিতা Fakir of Jhungeera প্রকাশিত হয় এবং চতুর্দ্দিকে ইংরেজ ও বাঙ্গালী মহলে তাঁহার যশ ব্যাপ্ত হয়।

১৮২৮ সালে ডিরোজিও তাঁহার কবিতা পুস্তক ছাপিবার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। তৎকালে হিন্দু কলেজে একজন শিক্ষকের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি উক্ত পদে নিযুক্ত হন। ছাত্রগণ তাঁহার অধ্যাপনা, বাগ্মীতা ও সত্যনিষ্ঠার প্রভাবে বিশেষভাবে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইলেন। রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মহেশ ঘোষ প্রভৃতি ছাত্রেরা তাঁহার আলয়ে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। ডিরোজিও তাঁহাদের সহিত তাঁহার মাতা ও কনিষ্ঠা ভগিনী এমিলিয়ার পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সংশ্রবে আসিয়া হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের মনে মহাবিপ্লব ঘটিতে লাগিল। তিনি স্বীয় ছাত্রগণকে লইয়া একাডেমিক এসোসিয়েসন নামে (Academic Association) এক বিতর্ক সমিতি স্থাপন করিলেন। এই সভায় ডিরোজিও সভাপতির কাজ করিতেন। এই সভার প্রভাব প্রতিপত্তি এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, ইহার অধিবেশনে এক একদিন ডেবিড হেয়ার, বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের প্রাইভেট সেক্রেটরী কর্ণেল বেনসন (Col. Benson)

এডজুটাণ্ট জেনারেল কর্ণেল বিটসন (Col. Beatson), বিশপ কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ মিলস (Dr. Mills) প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিতেন এবং বক্তৃতা শুনিয়া বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

ডিরোজীওর জীবন কাহিনী বাঙ্গালীর নব জীবন সঞ্চারের এক অধ্যায়। সুতরাং এখানে দেশের ও সমাজের তৎকালের অবস্থা অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ইউরোপে ফরাসীদেশে এক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব উপস্থিত হয়। তাহা ইউরোপের সমস্ত চিন্তার ধারাকে বদলাইয়া দেয়। তাহার প্রভাব এদেশেও অনুভূত হয়। যাঁহারা হিন্দু কলেজে শিক্ষা দিতেন, তাঁহারা সেই স্বাধীন চিন্তার ভাব ছাত্রদের মধ্যেও সঞ্চার করিয়া দিতে লাগিলেন। ১৮২৮—৪৫ সাল বাঙ্গালা দেশের এক নবযুগের কাল বলিলেই হয়। এই সময়ের পূর্ব্বেই ইংরেজ শাসন এদেশে দৃঢ়মূল হইয়াছিল। ইংরেজেরা এদেশে বণিকরূপেই প্রথম আগমন করেন। সুতরাং তখনকার তাঁহাদের মনোভাব ছিল, এদেশ হইতে ন্যায় অন্যায় যেরূপেই হউক অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে। কিন্তু রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের এই বণিকসুলভ মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন হয়। ক্রমে ক্রমে এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের উন্নতির দিকেও তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এতকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা দেশের সামাজিক, নৈতিক বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন কাজে হস্তক্ষেপ করেন নাই। এখন ধীরে ধীরে সেইদিকে মনোযোগ দিতে লাগিলেন। রাজপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় লোকদের মধ্যেও নানা পরিবর্ত্তন দেখা দিল। ইংরেজ চরিত্রের কর্ম্মনিষ্ঠা, শৃঙ্খলা ও উদার পরমত সহিষ্ণুতা তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিল।

এই সময়ে রাজা রামমোহন রায় ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দের ২৩শে আগষ্ট (১২৩৫ সালের ৬ই ভাদ্র) ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। তৎপূর্ব্ব হইতেই সংস্কার বিরোধীরা তাঁহাকে নানাভাবে অপদস্থ করিতে প্রয়াস পাইতেন। রাজার এই কার্য্যে তাঁহাদের মধ্যে সেই বিরুদ্ধভাব আরও প্রবলতর হইল।

লর্ড আমহার্ষ্ট ১৮২৩—২৮ সাল পর্য্যন্ত এদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি সতীদাহের দিকে আকৃষ্ট হইলেও, তিনি কার্য্যতঃ কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক (১৮২৮—৩৫) অতি দৃঢ় হস্তে ইহার প্রতীকার করিলেন। ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখের ঘোষণা পত্রদ্বারা এই সতীদাহ প্রথা রহিত করিলেন। ইহার কয়েক

মাস পরেই ১৮২৯ সালের ২৫শে জানুয়ারী (১২৩৬ বঙ্গাব্দের ১১ই মাঘ) রামমোহন রায় তাঁহার নবনির্ম্মিত ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব সম্পন্ন করিলেন। এই উভয় ঘটনা হিন্দু সমাজে ভয়ানক উত্তেজনার সৃষ্টি করিল।

এদিকে ডিরোজিওর শিক্ষা প্রণালী বঙ্গীয় নবাযুবকদের মধ্যেও বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিল। যাহা কিছু প্রাচীন তৎসমুদয়ই হেয় ও ত্যাজ্য এবং যাহা কিছু নব্য বা পাশ্চাত্য তাহাই গ্রহণ যোগ্য, ইহাই তাঁহাদের ধারণা জন্মিল। নব্যদের প্রকাশ্যে মদ খাওয়া, অখাদ্য ভোজন প্রভৃতি অতি সৎসাহসের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। ছেলেরা উপনয়নকালে উপবীত লইতে চাহিত না। অনেকে উপবীত ত্যাগ করিতে চাহিত। অনেকে সন্ধ্যা আহ্নিক পরিত্যাগ করিয়াছিল। কেহ কেহ আরও অগ্রসর হইয়াছিল। রাস্তায় চলিবার সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলে 'আমরা গরু খাইগো, আমরা গরু খাইগো' বলিয়া চীৎকার করিত। এই সকল কারণে সমাজপতিরা অতিমাত্র বিচলিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ হইতে বিতাড়িত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ডিরোজিও ইহা জানিতে পারিয়া নিজেই স্কুলের কাজ পরিত্যাগ করিলেন। তিন বৎসর মাত্র তিনি স্কুলে ছিলেন। ইহার মধ্যেই তাঁহার ছাত্রেরা যে অনুপ্রাণনা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা জীবনে কখনও ভুলিতে পারেন নাই। এই যুবকদলের অধিকাংশই উত্তরকালে দেশবিখ্যাত হইয়াছিলেন।

ডিরোজিও স্কুল পরিত্যাগ করিয়া "ইষ্ট ইণ্ডিয়ান" (The East Indian) নামে একখানা দৈনিক পত্রিকা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই ঐ কাগজ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ডিরোজিও কলিকাতার ফিরিঙ্গী দলের একজন নেতা বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তাঁহাদের সর্ব্ববিধ উন্নতিকর কার্য্যে তিনি নিযুক্ত থাকিতেন। ইহার কিছুদিন পরেই ১৮৩১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর ডিরোজিও হঠাৎ কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া ২৩শে শনিবার পরলোক গমন করিলেন।

ডুপ্লে, জোসেফ ফ্রানসিস (Joseph Francis Dupleix)—ভারত প্রবাসী প্রসিদ্ধ ফরাসী সেনাপতি ও রাজনীতিবিদ। ১৬৯৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ফরাসী দেশেই উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার নিজের বিস্তৃত ব্যবসায়ও ছিল। পিতার ইচ্ছা ছিল যে ডুপ্লেও ব্যবসায়ী হন। কিন্তু প্রথম জীবনে তিনি তজ্জন্য বিশেষ আসক্তি প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁহাকে (১৭২০ খ্রীঃ অব্দ) ভারতের অন্যতম ফরাসী

বাণিজ্যকেন্দ্র পণ্ডিচেরীতে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়। ঐখানে তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিয়া প্রচুর ধনলাভ করেন। কিন্তু স্বদেশস্থ পরিচালক সভা তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতি অনুমোদন না করাতে, প্রথমে (১৭২৬ খ্রীঃ অব্দ) তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। কয়েক বৎসর পর তাঁহার সহিত সব বিষয় মীমাংসা হইয়া গেলে, তিনি চন্দননগরের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া ১৭৩১ খ্রীঃ অব্দে তথায় উপনীত হন। তাঁহার গমনের পূর্ব্বে চন্দননগরের ফরাসী বাণিজ্য অতি হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু ডুপ্লের অসাধারণ কর্ম্মক্ষমতা ও দূরদৃষ্টির ফলে কিঞ্চিদধিক দশ বৎসরের মধ্যে, চন্দননগর ভারতে একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হইয়া উঠে। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার কর্ম্মক্ষমতায় প্রীত হইয়া, তাঁহাকে পণ্ডিচেরীর শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। তৎসঙ্গে ১৭৪০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহারা তাঁহাকে ভারতে অবস্থিত সমস্ত ফরাসী বাণিজ্য কুঠীরও প্রধান তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিলেন। পণ্ডিচেরীতে উপনীত হইয়া, ডুপ্লে দাক্ষিণাত্যে ফরাসী প্রাধান্য দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং ফরাসী বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনে, যত্নবান হইলেন। এই বিষয়ে তিনি যে পন্থা অবলম্বন ও যে সব ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন, তাহা তাঁহার অসাধারণ রাজনীতি জ্ঞান ও দূরদর্শীতার পরিচয় প্রদান করে। দুঃখের বিষয় ফরাসী দেশস্থ পরিচালক সভা, তাঁহার কার্য্যে সব সময়ে উৎসাহ প্রদান করিতেন না। বরঞ্চ, ইয়োরোপে ফরাসী ও ইংরেজের মধ্যে যুদ্ধ আশঙ্কা করিয়া, তাঁহারা যে সব আদেশ প্রেরণ করিতেন, তাহা অনেক সময়ে ডুপ্লের ব্যবস্থার বিপরীত হইত। কিন্তু তিনি আবশ্যক বোধে অনেক আদেশ অমান্য করিয়া, স্থানীয় প্রয়োজনানুরোধে অনেক বিষয়ে নিজমতানুযায়ী কাজ করিতেন।

১৭৪৪ খ্রীঃ অব্দে ইয়োরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তাহার তরঙ্গ ভারতেও আসিয়া পৌঁছে। মাদ্রাজস্থিত ইংরেজ বাণিজ্য কেন্দ্রের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী, ভারতের ফরাসী বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি আক্রমণ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। কিন্তু ফরাসী দেশ হইতে ডুপ্লেকে যথা সম্ভব বিগ্রহ সৃষ্টি না করিতে, উপদেশ দেওয়া হয়। ডুপ্লে অবশ্য সে উপদেশ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন না। কিন্তু ফরাসী দেশ হইতে সাহায্য লাভের সম্ভাবনা অল্পই, তাহা বুঝিতে পারিয়া, দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য রাজ্যাধিপতিদের সহিত মিলিত হইয়া, ফরাসী স্বার্থ রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কর্ণাটের নবাবের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন। কিছুকাল পরে অন্যতম ফরাসী নৌ-সেনাধ্যক্ষ লা বর্ডনে (La Bourdannais) কতিপয়

যুদ্ধজাহাজ লইয়া পণ্ডিচেরীতে উপস্থিত হইলেন। এবং পরে (১৭৪৬ খ্রীঃ অব্দ আগষ্ট) মাদ্রাজের ইংরেজ কুঠী ও দুর্গ অধিকার করিলেন। ডুপ্লে পূর্ব্বে কর্ণাটের নবাবকে এইরূপ আভাষ দিয়াছিলেন যে, ঐ দুর্গটী অধিকৃত হইলে, তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু পাছে আবার নবাব, উহা ইংরেজদিগকেই প্রত্যর্পণ করেন, এই আশঙ্কায় তিনি উহা নবাবকে প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নবাব ফরাসীদের কবল হইতে দুর্গটি অধিকার করিবার জন্য, সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু উহাতে কোনই ফল হয় নাই। বরঞ্চ নবাবের বৃহৎ বাহিনী প্রায় তাহার অর্দ্ধসংখ্যক ফরাসীপক্ষীয় সৈন্যের নিকট পরাজিত হওয়ায়, ইউরোপীয় জাতীদের মধ্যে, দেশীয় রাজাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা ছিল, তাহা সম্পূর্ণ দূর হইয়া গেল। ইহার কয়েক বৎসর পরে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হওয়ায়, সন্ধির সর্ত্তানুসারে মাদ্রাজ ইংরেজদিগকে প্রত্যর্পিত হইল (১৭৪৯)। এই ঘটনার পূর্ব্বে ইংরেজেরা মাদ্রাজ ও পণ্ডিচেরী আক্রমণ করিয়া, বিফল মনোরথ হন।

পূর্ব্বোক্ত সন্ধির ফলে ভারতেও ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয়। তখন উভয় পক্ষেরই অনেক সৈন্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ঐ অতিরিক্ত বাহিনী পোষণ করা অত্যন্ত ব্যয় সাধ্য বোধ হওয়ায়, উভয় পক্ষই অনুভব করিতেছিলেন যে, দেশীয় রাজাদের প্রয়োজন মত তাঁহাদিগকে সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে পারিলে, ঐ সৈন্য পোষণের ব্যয় অনেকটা লাঘব হইতে পারে। সৌভাগ্য ক্রমে সুযোগও ঘটিয়া গেল এবং ফরাসী ও ইংরেজ উভয়েই দাক্ষিণাত্যের বিবদমান দুই পক্ষে যোগ দিয়া, নিজেরা লাভবান হইতে লাগিলেন। এই সময় হইতে, ইউরোপে সন্ধি স্থাপিত হইলেও, ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে বিবাদ ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। [চাঁদ সাহেব (২), আনোয়ারউদ্দিন খাঁ (১৯০ পৃঃ) ও মোহাম্মদআলি কর্ণাটের নবাব, এই নামগুলি দ্রষ্টব্য]। ডুপ্লে এই বিবাদকালে কর্ণাটের নবাব দোস্তআলির জামাতা চাঁদ সাহেব ও দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিজাম-উল্-মুলকের দৌহিত্র মুজাফ্ফর জঙ্গের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দী যথাক্রমে আনোয়ার-উদ্দিন খাঁ ও নাদির জঙ্গএর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। দীর্ঘকাল বিগ্রহাদি চলিবার পর ডুপ্লের কুটনীতি ও রণকৌশলের ফলে, নিজাম-উল্-মুল্ক-এর দৌহিত্র মুজাফ্ফর জঙ্গ দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের পদ অধিকার করিলেন। ইহাতে দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের প্রভাব ও ক্ষমতা

যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। মুজাফ্‌ফর জঙ্গ, কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ ব্যক্তিগত ভাবে, ডুপ্লেকে নানারূপ সম্মান প্রদর্শন ও পুরস্কার প্রদান করিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার শাসনাধীন প্রদেশগুলিতে ফরাসীদের মুদ্রাও প্রচলন করিতে সম্মত হইলেন। বস্তুতঃ ঐ সময়ে দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের ক্ষমতা ও গৌরব উন্নতির সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ডুপ্লে পূর্ব্বাবধিই, ব্যক্তিগত লাভকে আদৌ গণ্য করিতেন না। ভারতে ফরাসী প্রভুত্ব স্থাপন এবং ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। সেই জন্য মুজফ্‌ফর জঙ্গ যখন তাঁহাকে 'কর্ণাটের নবাব' উপাধি দিতে চাহিলেন, তিনি নিজে উহা গ্রহণ না করিয়া, তাঁহার প্রধান সহযোগী চাঁদ সাহেবকে উহা দেওয়াইলেন। মুজফ্‌ফর জঙ্গ অতঃপর নিজ রাজধানী আওরঙ্গাবাদে গমন করিলে, তাঁহারই অনুরোধে ডুপ্লে সেনাপতি বুসিকে (General Bussy) তিনশত ফরাসী ও দেড় হাজার শিক্ষিত দেশীয় সৈন্য সহ আওরঙ্গাবাদে প্রেরণ করিলেন। মুজাফ্‌ফর জঙ্গ, ঐ বাহিনীর সমুদয় ব্যয় ভার বহন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন (মুজাফ্‌ফর জঙ্গ দ্রষ্টব্য)

কিন্তু এইরূপ প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি লাভ হওয়া সত্ত্বেও, অল্পকাল মধ্যেই ফরাসী গৌরব হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইল। কর্ণাটের পূর্ব্ব নবাব আনোয়ারউদ্দিনের অন্যতম পুত্র মোহাম্মদ আলি, ইংরেজ সহায়তায় পিতৃরাজ্য লাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। ফরাসীরা তদানীন্তন নবাব চাঁদ সাহেবের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই বিগ্রহেই প্রথম ফরাসী গৌরব ম্লান হয়। মোহাম্মদ আলি ইংরেজদের সহায়তায়, চাঁদ সাহেব ও ফরাসীদিগকে পরাস্ত করেন। এই সময়েই রবার্ট ক্লাইব (Robert Clive) প্রথমে নিজ রণকৌশল ও রাজনীতি জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন। এই সময় হইতে কয়েক বৎসর ধরিয়া ভাগ্যলক্ষ্মী কখনও ফরাসীদের, কখনও বা ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন পক্ষেরই নিশ্চিত কিছু মীমাংসা হইল না। তারপরে আবার ডুপ্লের অসাধারণ রাজনীতি কৌশলে, কিছুকাল ফরাসীদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইল। এই সময়ের মধ্যে তিনি মারাঠাদের ও মহীশূরের রাজার সঙ্গেও বন্ধুতা স্থাপন করিয়া, ইংরেজদিগের প্রভাব প্রভূত পরিমাণে খর্ব্ব করেন। এই সময়ে প্রধানতঃ মোহাম্মদ আলিকে উপলক্ষ করিয়া ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ চলিতে থাকে (১৭৫২ খ্রীঃ অব্দ)।

এই সময়ে ফরাসী দেশে ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকবর্গ ক্রমে ডুপ্লের কার্য্যপ্রণালীর উপর

বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছিলেন। তাঁহারা ভাবিতেন, যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা বৃথা অর্থ নাশ ও লোকক্ষয় না করিয়া যাহাতে ভারতে ফরাসী বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহারই চেষ্টা করা উচিত। ডুপ্লেও ভারতে ফরাসী প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখিয়া সন্ধি করিতে সম্মত ছিলেন। সেই জন্য প্রথম কিছুকাল, তিনি নিজের সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিবার চেষ্টা করেন। উভয়ের ফলাফল অনেক দিন পর্য্যন্ত অনিশ্চিতই ছিল। কখনও ইংরেজরা, কখনও বা ফরাসীরা খণ্ড যুদ্ধে জয় লাভ করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে তাহা আদৌ ফলপ্রদ হয় নাই। ১৭৫৫ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে, মাদ্রাজ ও পণ্ডিচেরীর মধ্যবর্ত্তী সাদ্রাজ নামক ওলন্দাজ বাণিজ্য কেন্দ্রে উভয় পক্ষ হইতে সন্ধির সর্ত্তাবলী আলোচনা করিবার আয়োজন হয়। কিন্তু তাহাতে কোনই মীমাংসা না হওয়ায়, পুনরায় কিছুকাল, পূর্ব্বের ন্যায় খণ্ড যুদ্ধ চলিতে থাকে। কিন্তু ডুপ্লের শত্রু পক্ষ এই সময়ের মধ্যে, তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে আরম্ভ করে এবং তৎফলে উর্দ্ধতন পরিচালক সমিতি সহসা চন্দন নগরের শাসনকর্ত্তা গডেহুকে ডুপ্লের পদে নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ প্রেরণ করিলেন। তদনুযায়ী ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে গডেহু পণ্ডিচেরীতে আসিয়া শাসন ভার গ্রহণ করিলেন এবং ডুপ্লে তাঁহাকে সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দিয়া অক্টোবর মাসের মধ্যভাগে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তাঁহাকে ঐ ভাবে হঠাৎ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ কেন দেওয়া হইল, তাহা পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ উৎসুক ছিলেন না। বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য ছিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া যে যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছিল, তাহার প্রত্যক্ষ ফল কিছু না পাইয়া, তাঁহারা ক্রমে ডুপ্লের কার্য্য প্রণালীর উপর বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। ডুপ্লের রাজনীতি কৌশল তাঁহারা কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সেই জন্যই তাঁহারা ভাবিতেছিলেন যে, ডুপ্লের বদলে অন্য কাহাকেও পাঠাইয়া, ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনপূর্ব্বক, যাহাতে বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নতি হয়, তাহারাই চেষ্টা করা উচিত।

গডেহু ডুপ্লের স্থান অধিকার করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত হিসাবপত্র বুঝিয়া লইবার জন্য, প্রায় আড়াই মাস তাঁহাকে পণ্ডিচেরীতে থাকিতে বাধ্য করেন। হিসাবপত্র বুঝাইবার সময়ে দেখা যায় যে, ডুপ্লে নিজ তহবিল হইতে অনেক টাকা কোম্পানীর কাজের জন্য

বিভিন্ন প্রণালীতে খরচ করিয়াছেন। কোথাও দাদন দিয়া, কোথাও ঋণ প্রদান করিয়া, কোথাও বা অন্য কোনও ভাবে, নিজ সঞ্চিত বহু অর্থ তিনি ব্যয় করিয়াছিলেন। ঐ অর্থ তাঁহার ফেরত পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু গডেহু, হিসাবের গোলমাল দেখাইয়া, ডুপ্লের নিকট কোম্পানীর ঐ ঋণ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেন। এমন কি ডুপ্লে নিজ তহবিল হইতে, যে সকল টাকা দেশীয় বিভিন্ন লোককে ঋণ স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই অর্থেও ডুপ্লের কোনও দাবী নাই বলিয়া, উহা ফেরত পাইবার সমস্ত পথ তিনি বন্ধ করিলেন। ডুপ্লে যখন ভারত ত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের কণামাত্র তাঁহার অধিকারে ছিল না। স্বদেশে উপস্থিত হইয়া, তিনি দলিলপত্রের সাহায্যে তাঁহার দাবী উপস্থিত করিয়া, প্রাপ্য অর্থ লাভ করিবার জন্য দীর্ঘকাল চেষ্টা করেন। কিন্তু গডেহুর বিরুদ্ধতায় পরিচালক সভা ডুপ্লের কোনও দাবী স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না। হতভাগ্য ডুপ্লে জীবনের সকল শক্তি ও অর্থ স্বদেশ ও স্বজাতীর প্রভাব, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যয় করিয়া, শেষ জীবনে হৃতসর্ব্বস্ব হইলেন। বন্ধু ও উপকৃতজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, তিনি মর্ম্মস্পর্শী বেদনায় অভিভূত হইয়া, ১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসে পরলোক গমন করেন।

ডুপ্লে প্রস্থান করিবার পর হইতেই ভারতে ফরাসী প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি দ্রুতগতিতে হ্রাস পাইতে লাগিল। গডেহুর একমাত্র লক্ষ্য ছিল, কি প্রকারে নির্ব্বিঘ্নে বাণিজ্য করা যায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি অনেক স্থলে হীনতা স্বীকার করিয়াও, ইংরেজ ও অনেক দেশীয় রাজাদের সহিত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই সত্য, কিন্তু নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, ডুপ্লে ভূমি প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই, পরবর্ত্তীকালে ইংরেজ রাজ্য গঠিত হইবার দ্রুত সম্ভাবনা হইয়াছিল। এক অপরিণামদর্শী পরিচালক সভার বুদ্ধিহীনতাতেই যে, অন্ততঃ দক্ষিণ ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই, সে বিষয়ে সকল ঐতিহাসিকই এক মত।

ডুবয়, জিন (Jean Abbe Dubois) —ভারত-প্রবাসী ফরাসী ধর্ম্মযাজক। তিনি খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে আগমন করেন এবং দক্ষিণ ভারতের প্রধান ফরাসী বাণিজ্য কেন্দ্র পণ্ডিচেরীতে অবস্থান করিতে থাকেন। তিনি সর্ব্ব সমেত ত্রিশ বৎসরেরও

অধিক ভারতে অবস্থান করিয়াছিলেন এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বহু বৎসর ধর্ম্ম প্রচার ব্যপদেশে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে দেশীয় লোকদের সংশ্রবে আসিবার সুযোগ পান। দাক্ষিণাত্যের, প্রধানতঃ মাদ্রাজ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ এবং মহীশূর প্রভৃতি স্থানের হিন্দুদের আচার ব্যবহার ধর্ম্মমত প্রভৃতি বিষয়ে তিনি একখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তৎকালীন হিন্দু সমাজের বিস্তৃত এবং অনেকাংশে সঠিক বিবরণ ঐ পুস্তক হইতে পাওয়া যায়। মাদ্রাজের ইংরেজকর্ত্তৃপক্ষ উহার স্বত্ব ক্রয় করিয়া লয়েন। ১৮১৬ খ্রীঃ অব্দে উহা প্রথম ইংলণ্ডে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ডুবয় উহার একটি পরিশোধিত সংস্করণ রচনা করেন। কিন্তু ঐ সংস্কৃত রচনা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দে ডুবয় স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। এদেশে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ তিনি ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ভারতে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার সম্পর্কেও তিনি একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে প্যারী নগরীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ডুমা (Dumas)—পণ্ডিচেরীর ফরাসী শাসনকর্ত্তা। ১৬৯৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ১৭১৩ খ্রীঃ অব্দে ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে চাকুরী গ্রহণ করিয়া, পণ্ডিচেরীতে আগমন করেন। এখানে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়া, তিনি প্রধান মন্ত্রণা সভার সভ্য (Member of the Supreme Council) পদ লাভ করেন। ইহার পরেই আফ্রিকার নিকটবর্ত্তী ভারত মহাসাগরস্থিত ফরাসী দ্বীপ ও বরবোঁ দ্বীপের শাসনকর্ত্তার পদ লাভ করেন। উক্ত পদে তিনি ১৭৩৫ সাল পর্য্যন্ত ছিলেন। তৎপরে তিনি ভারতবর্ষস্থিত ফরাসী উপনিবেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া আগমন করেন। তিনি পরিণামদর্শী, বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ও ফরাসীর গৌরব রক্ষায় নিয়ত যত্নশীল ছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে উগ্রতা ছিল না। তিনি শান্তিকামী ছিলেন। ১৭৩২ সালে কর্ণাটের নবাব সাদতউল্লা খাঁ পরলোক গমন করেন এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দোস্ত আলী, নিজামের অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই, তৎপদ গ্রহণ করেন। দোস্ত আলীর সহিত ডুমার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। এই সুযোগে দোস্ত আলীর সাহায্যে তিনি ফরাসী মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অনুমতি, দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদ শাহের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে এই ক্ষুদ্র উপনিবেশের বার্ষিক আয় দুই লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে ডুমা উচ্চ সম্মান লাভে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। ১৭৩৮ সালে তাঞ্জোরের হিন্দু রাজা

তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ডুমার সাহায্য প্রার্থনা করেন। ডুমা এই সাহায্য প্রদান করিয়া, কারিকল নগর ও তৎসংলগ্ন দশটী গ্রাম প্রাপ্ত হইলেন।

কর্ণাটের নবাব দোস্ত আলীর দুই পুত্রের মধ্যে সফদর আলী ছিলেন। দোস্ত আলীর অনেক কন্যা ছিল। তন্মধ্যে আপন ভ্রাতুষ্পুত্র মূর্ত্তজা আলী এক জামাতা এবং দূর সম্পর্কিত চাঁদ সাহেব অন্য জামাতা ছিলেন। মহারাট্টারা দাক্ষিণাত্যে মুঘল অধিকারের বিরোধী ছিলেন। ১৭৩৯ সালের শেষভাগে রঘুজী ভোসলের সেনাপতি মুরারি ৫০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সহ কর্ণাট আক্রমণ করেন। দোস্ত আলী ও তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র হাসন আলী যুদ্ধ ক্ষেত্রে বহু সেনাপতি সহ প্রাণত্যাগ করেন। সেনাপতি আসাদ আলীকে মহারাট্টারা বন্দী করিলেন। পরে আসাদ আলীকে মুক্তি দিয়াছিলেন। মহারাট্টারা পরে চাঁদ সাহেবকে বন্দী করেন। মহারাট্টারা চলিয়া গেলে, সফদর আলী কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ডুমাকে পণ্ডিচেরীর নিকটবর্ত্তী অনেক স্থান প্রদান করেন। ডুমার সদ্বিবেচনায় সকলেই সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি ১৭৪১ সালে ডুপ্লের হস্তে কার্য্যভার সমর্পন পূর্ব্বক স্বদেশে গমন করেন।

ডুরাণ্ড, সার হেনরী মেরিয়ন (Sir Henry Marian Durand)—তাঁহার পিতা একজন অশ্বারোহী সৈনিক দলের সেনাপতি ছিলেন। ১৮১২ খ্রীঃ অব্দের ৬ই নবেম্বর তাঁহার জন্ম হয়। লিষ্টার এডিকম্ব নগরে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৮২৯ ইঞ্জিনিয়াররূপে ভারতে আগমন করেন। উত্তর পশ্চিম ও আগ্রা অযোধ্যা প্রদেশে পয়ঃ প্রণালী সংস্কার বিভাগের (Irrigation Work) কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে কাবুল অভিযানে তিনি গমন করেন। ১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দে গজনী নগরের কাবুলদ্বার তাঁহারা সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন। কাবুল হইতে প্রত্যাগত হইয়া, কিছুদিন বিশ্রাম সম্ভোগের পর, বড়লাট লর্ড এলেন বরার (১৮৪২—৪৪ খ্রীঃ) খাস মুন্সীর (Private Secretary) কার্য্যে কিয়ৎকাল যাপন করেন। ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত টেনাসরিম প্রদেশের তিনি শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৮৪৮—৪৯ সালের শিখ যুদ্ধেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। ইহার পরে তিনি গোয়ালিয়র ও ভুপালের রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি ক্যালকাটা রিভিউ (Calcutta Review) পত্রিকায় কতকগুলি সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহার পরেই তিনি কিছুদিন (১৮৫৬ খ্রী) প্রেসিডেন্সী বিভাগের পরিদর্শক ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তৎপরে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে

ইন্দোরে অবস্থানকালে, তত্রস্থ বিদ্রোহী সিপাহীরা তাঁহাকে তথা হইতে বিতাড়িত করে। কিন্তু তিনি কয়েকটী স্থানে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া, মালব দেশের পশ্চিমাংশ অধিকার করেন বিদ্রোহ দমনের পর, ভারত সকারের আদেশে সৈন্য সংস্কার কার্য্যের জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৮৫৯—৬১ সাল পর্য্যন্ত তিনি বড়লাটের মন্ত্রী সভার সদস্য এবং ১৮৬৫ পর্য্যন্ত পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন। তিনি ১৮৭০ সালে পাঞ্জাব প্রদেশের ছোটলাটের পদ লাভ করেন। ১৮৭১ সালের ১লা জানুয়ারী হস্তী হইতে পতনে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁগার সমকালবর্ত্তী রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে তিনি একজন চরিত্রবান্, সুদক্ষ, অভিজ্ঞ ও ন্যায়বান কর্ম্মচারী ছিলেন।

ডেমিট্রিয়াস (Demetrius)—তিনি বাহ্লিক দেশের রাজা ছিলেন। হিন্দুকুশ পর্ব্বতের ও বাক্ষু (অক্সাস) নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশকে পূর্ব্বকালে বাহ্লিক (Bactria) বলিত। অনুমানিক ২৫০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে বাহ্লিক দেশীয় গ্রীক নরপতিরা স্বাধীন হইয়া, রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। অশোকের মৃত্যুর পরে গ্রীক রাজারা প্রবল হইয়া মৌর্য্যবংশীয়দের হস্ত হইতে গান্ধার প্রদেশ (বর্ত্তমান আফগানিস্থান) অধিকার করেন। এই সময়ে বহু সংখ্যক গ্রীক ভারতবর্ষে বাস করিতে আরম্ভ করেন। বাহ্লিকপতি ডেমিট্রিয়াস সিন্ধু বিধৌত পাঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। খুব সম্ভব শাকলনগরে (বর্ত্তমান শিয়ালকোট) তাঁহার রাজধানী ছিল।

ডোম্বী—ডোম্বী হেরুক নামে মগধের একজন রাজা ছিলেন। তিনি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেন। তিনি বজ্রযান ও সহজযান সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়াছেন। ডোম্বীগীতিকা নামে তাঁহার সংকীর্ত্তনের এক পদাবলী আছে। সম্ভবতঃ তিনি খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

ড্রেক, রোজার Roger Drake,—লর্ড ক্লাইবের সমকালবর্ত্তী, একজন বিখ্যাত লোক। তিনি ১৭৩৭ খ্রীঃ অব্দে প্রথম বঙ্গদেশে আগমন করেন। ১৭৫২—৫৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মন্ত্রণা সভার সভাপতি ও উক্ত কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি কলিকাতায় দুর্গ সংস্কার দ্বারা বাঙ্গালার নবাব সিরাজউদ্দৌলার ক্রোধ উৎপাদন করেন। নবাব কলিকাতা আক্রমণ করিলে তিনি পলায়ন করেন (১৭৫৬)। ১৭৫৮ খ্রীঃ অব্দে কোম্পানীর ডাইরেক্টারেরা তাঁহাকে পদচ্যুত করেন এবং তৎপদে হলওয়েল সাহেব (J. C. Holwell) নিযুক্ত হয়েন

ঢুণ্ডিরাজ—(১) গোদাবরী ও বিদর্ভ (বর্ত্তমান বর্দা নদী) সাগর সঙ্গমের এক ক্রোশ উত্তরে পার্থপুর নামে একটি গ্রাম ছিল, তথায় নৃসিংহ দৈবজ্ঞ নামে এক জ্যোতিষী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র ঢুণ্ডিরাজ জাতকাভরণ নামক এক-খানা উৎকৃষ্ট জাতক গ্রন্থ ১৪৬০ শকে (১৫৩৮ খ্রীঃ অব্দ) রচনা করেন। তিনি স্বগ্রামবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জ্ঞানরাজের শিষ্য ছিলেন। এই ঢুণ্ডিরাজ পুত্র গণেশ ১৫৫৮ খ্রীঃ অব্দে (১৪৮০ শক) তাজিক ভূষণ পদ্ধতি নামে একখানা গ্রন্থ লিখিয়া-ছেন। জ্ঞানরাজ ও নৃসিংহ দেখ।

ঢুণ্ডিরাজ—(২) তাঁহার ঋণ ভঙ্গাধ্যায় নামে একখানা গ্রন্থ ছিল।

ঢুণ্ডিরাজ—(৩) কুণ্ডকল্পলতা (ক্ষেত্র-ব্যবহার) নামে এই জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতের একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে।

ঢুণ্ডিরাজ—(৪) জাতক কৌস্তভ নামক নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

ঢুণ্ডিরাজ—(৫) খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিনি পঞ্চাঙ্গ ফল গ্রন্থ রচনা করেন।

ঢুণ্ঢ্‌নাথ—'রসেন্দ্র চিন্তামণি' নামক প্রসিদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

ঢেণ্টস—একজন সিদ্ধাচার্য্য। গোরক্ষ-নাথ দেখ।

ঢোলা রায়—মারবারের প্রসিদ্ধ নর-পতি সোরসিংহ খ্রীঃ দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার ভ্রাতা বলপূর্ব্বক রাজ্য অধিকার করেন। সোরসিংহের মহিষী স্বীয় শিশুপুত্র ঢোলা রায়কে লইয়া পলায়ন-পূর্ব্বক খোগঙ্গ নগরের মীনরাজ রালুন সিংহের আশ্রয়ে উপনীত হইলেন। রালুন সিংহ রাজ মহিষীকে ভগিনী সম্বোধনপূর্ব্বক ঢোলা রায়কে স্বীয় ভাগিনেয়ের ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কৃতঘ্ন ঢোলা রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রতিপালক রালুন সিংহকে হত্যা করিয়া, তাঁহার রাজ্য অধিকার করিলেন। ইহার পরেই তিনি দেওশার অপুত্রক রাজার একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিয়া, উক্ত রাজ্য লাভ করেন। রাজ্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহার রাজ্য লিপ্‌সা আরও বর্দ্ধিত হইল। তৎপরে তিনি শিরো নামক মীনদিগের অধিপতি রাও নাত্তোকে পরাস্ত করিয়া, তাঁহার রাজধানী মাচনগর অধিকার করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে, আজমীর রাজের কন্যা মারুনী দেবীকে বিবাহ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কালে, মীনগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সমর ক্ষেত্রেই শয়ন করি-লেন। মারুনী দেবী তৎকালে অন্তর্বত্নী ছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি কঙ্কুল নামে এক পুত্র প্রসব করেন। এই কঙ্কুল ৯৬৭ খ্রীঃ অব্দে ধুন্দর জয় করিয়া, তথায় স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। ইহাই বর্ত্ত-মান জয়পুর।

ত

তকিউদ্দিন আবদুর রহমান—ভারতবর্ষে মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে, আরব দেশীয় মুসলমানেরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়া, দাক্ষিণাত্যের বহু বন্দরে বাসস্থান স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রধানতঃ আরব দেশীয় অশ্বই বেশীর ভাগ বিক্রয় করিতেন। আরব দেশের অন্তর্গত কিস প্রদেশের অধিপতি জামাল উদ্দিনের ভারতে অশ্ব বিক্রয়ের বিস্তৃত ব্যবসায় ছিল। খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই ব্যবসায় পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য তিনি স্বীয় ভ্রাতা তকিউদ্দিন আবদুর রহমানকে প্রেরণ করেন। তিনি তাম্রপর্ণী নদীর মোহানায়স্থিত কায়ল বন্দরে অবস্থান করিয়া বাণিজ্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। এই স্থানে পূর্ব্ব দেশীয় চীনা ব্যবসায়ী ও পশ্চিম দেশীয় পারস্য, খোরাসান, মিশর প্রভৃতি দেশের বণিকেরা সমাগত হইতেন। এই স্থানে তকিউদ্দিন ১৩০৩ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র সিরাজউদ্দিন সেই পদ প্রাপ্ত হন। সিরাজউদ্দিনের পরে তৎপুত্র নিজামউদ্দিন পিতৃ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

তক্তসিংহ—যোধপুরের রাজা মানসিংহ ১৮৪৩ খ্রীঃ অব্দে অপুত্রক পরলোক গমন করিলে, রাজ্যের সর্দ্দারের ও ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট অজিত সিংহের বংশধর, আহম্মদনগরের রাজা তক্তসিংহকে যোধপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে পর, তাঁহার পুত্র যশোবন্ত সিংহ রাজা হইয়াছিলেন।

তণ্ডিপা—একজন প্রসিদ্ধ সিদ্ধাচার্য্য। জ্যোতিরীশ্বর প্রণীত বর্ণরত্না করে তাঁহার উল্লেখ আছে।

তথাগত—একজন জৈন দার্শনিক পণ্ডিত। ধর্ম্মভূষণ নামক দিগম্বর জৈন পণ্ডিত তাঁহার ন্যায়দীপিক নামক দার্শনিক গ্রন্থে তথাগতের উল্লেখ করেন।

তথাগত গুপ্ত—বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের পরে শক্রাদিত্য, বুদ্ধগুপ্ত, তথাগত গুপ্ত, বালাদিত্য ও বজ্র নামক পাঁচজন রাজা, নালন্দায় পাঁচটী সঙ্ঘারাম বা মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

তথাগত রক্ষিত—তিনি একজন সহজাচার্য্য বৌদ্ধাচার্য্য। তিব্বতীয় টেঙ্গুর গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে।

তন্ কোয়াং—একজন চীনদেশীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। তিনি চীন দেশ হইতে জল পথে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ ও বৌদ্ধ তীর্থ দর্শন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি প্রথমে হরিকেল দেশে

(পূর্ব্ববঙ্গে) উপস্থিত হন। তথাকার রাজা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। এই দেশেই তিনি গতায়ু হন।

তম্বঙ্গরাজ—তিনি কাশ্মীরপতি অনন্তরাজের জ্ঞাতি ও বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন। অনন্তরাজের আদেশে, নীলপুরীর সামন্ত নরপতি নাবালক উৎবর্ষ রাজের তিনি অভিভাবক হইয়াছিলেন।

তফজল হোশেন খাঁ—তিনি ফরক্কাবাদের নবাব ছিলেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে, তিনি ৬২ জন ইংরেজ পুরুষ, রমণী ও বালক বালিকাকে হত্যা করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত হন। বিচারে তিনি মক্কায় নির্ব্বাসিত হন।

তমিজউদ্দিন—১২৮৬ বাংলা সনে তিনি 'গোলশানে মোহাব্বত' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

তরবিয়ত খাঁ—সম্রাট আওরঙ্গজীবের সময়ের একজন চারি হাজারী সেনাপতি। তিনি অস্ত্রাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন। আওরঙ্গজীবের মৃত্যুর পরে তিনি আজমশাহের পক্ষাবলম্বন করেন। ১৭০৭ খ্রীঃ অব্দে বাহাদুর শাহের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

তরুণীরমণ—একজন পদকর্ত্তা। সম্ভবতঃ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পদাবলী অতি মধুর। এপর্য্যন্ত তাঁহার রচিত পঞ্চাশাধিক পদ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার রচিত বহু কবিতা অন্যের কবিতার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

তরু দত্ত—খ্যাতনাম্নী বাঙ্গালী বিদুষী ও কবি। ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া যে সকল ভারতবাসী বিশ্বের সুধীজন মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তরু দত্ত তন্মধ্যে একজন প্রধান ছিলেন। কলিকাতার রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্তবংশীয় গোবিন্দচন্দ্র দত্ত তাঁহার পিতা। এই বংশেরই রসময় দত্ত কলিকাতার ছোটআদালতের প্রথম বাঙ্গালী জজ ছিলেন। দেশ বিখ্যাত রমেশচন্দ্র দত্তও এই বংশোদ্ভব ছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের অরু ও তরু নামে দুই কন্যা ও অব্জ নামে এক পুত্র ছিল। সন্তানদিগের মধ্যে তরু সর্ব্ব কনিষ্ঠা ছিলেন।

১২৬২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে (১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দ মার্চ্চ) তরুর জন্ম হয়। গোবিন্দচন্দ্র নিজ তত্ত্বাবধানে গৃহেই সন্তানগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে শোকার্ত্ত হইয়া গোবিন্দচন্দ্র কন্যাদ্বয়কে লইয়া ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে ইয়োরোপে যাত্রা করেন। প্রথমে তাঁহারা ফরাসী দেশে উপস্থিত হন এবং নীশ (Nice) সহরে একটি বালিকা বিদ্যালয়ে ভগিনীদ্বয়ের শিক্ষা আরম্ভ হয়। ঐ সময়েই তাঁহারা উভয়েই, বিশেষভাবে তরু, উৎকৃষ্টরূপে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কয়েক মাস পরে তাঁহারা

ইংলণ্ডে গমন করেন। ফরাসী দেশে অল্পকাল থাকিলেও তরু ঐ দেশ এবং ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে যুদ্ধে প্রুশীয়ানদের হস্তে ফরাসীদের পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া মনে কিরূপ বেদনা পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার তৎকালীন দৈনিকলিপি (Diary) হইতে জানিতে পারা যায়।

১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে গোবিন্দচন্দ্র কন্যা-দ্বয় সমভিব্যাহারে কেম্ব্রিজে গমন করেন। ঐ স্থানে অবস্থানকালে তাঁহারা উৎকৃষ্টরূপ শিক্ষা লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। সঙ্গীত বিদ্যাতেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহারা সকলে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

দেশে আসিয়া দুই ভগিনী সাহিত্য চর্চ্চায় মনোনীবেশ করেন। তরু ফরাসী ভাষায় একখানি উপন্যাস রচনা করেন। কথা ছিল অরু উহার জন্য চিত্র অঙ্কিত করিবেন। কিন্তু ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় উহা আর সম্ভব হয় নাই। কয়েক বৎসর পরে (১৮৭৯) পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানির নাম De Journal de Mille d' Arvors (অর্থাৎ কুমারী দ' আরভরসের দৈনিক লিপি)। উক্ত পুস্তকখানির বঙ্গানুবাদ (ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত) এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ঔপন্যাসিক অপেক্ষা কবিরূপেই তরু সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি প্রায় সত্তর আশীজন খ্যাতনামা ফরাসী কবির অনেকগুলি কবিতা ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া A Sheaf Gleaned in French Fields নামে একখানি কবিতা পুস্তক মুদ্রিত করেন। কলিকাতার ভবানীপুরস্থ "সাপ্তাহিক সংবাদ" নামক মুদ্রাযন্ত্রে উহা মুদ্রিত হয়। উহা প্রকাশিত হইবার পর, প্রথমে অনেকেরই ধারণা হইয়াছিল যে, উহা ভারত প্রবাসী কোনও ইংরেজের রচনা। গ্রন্থের মুদ্রন সৌকুমার্য্য না থাকাতে উহা অধিক লোকপ্রিয় হয় নাই। কিন্তু প্রসিদ্ধ ইংরেজ সমালোচক এডমণ্ড গস্ (Edmund Gosse) এবং খ্যাতনামা ফরাসী সমালোচক আঁদ্রে থুরিয়ে (Andre Thurieh) উহার বিশেষ প্রশংসা করাতে, সকলের দৃষ্টি উহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তৎফলে কয়েক বৎসর পরে উহার পুনর্মুদ্রণ হয়। উক্ত কবিতাগুলির ভাষান্তর কার্য্যে তরু যে বিশেষ কৃতীত্বের পরিচয় প্রদান করেন তাহা বলাই বাহুল্য। ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ Ancient Ballads and Legends of Hindusthan (ভারতের প্রাচীন গাথা ও কাহিনী)

প্রকাশিত হয়। এই ধরণের গ্রন্থ রচনা করিয়া পাশ্চাত্য জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা তিনিই বোধ হয় প্রথম করেন। ধ্রুবোপাখ্যান, রাজর্ষি ভরতের কাহিনী; সাবিত্রীর উপাখ্যান প্রভৃতি কয়েকটি পুরাণান্তর্গত কাহিনী তিনি প্রাঞ্জল ইংরেজিতে বর্ণনা করিয়া নিজের কবিত্ব শক্তির পরিচয় দেন। ঐ সকল কবিতার মধ্যে, তিনি বহুস্থলে নিজের মৌলিক চিন্তা শক্তির পরিচয় প্রদান করেন। উক্ত গ্রন্থান্তর্গত ধ্রুবোপাখ্যান ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে প্রথম Bengal Magazineএ প্রকাশিত হইয়াছিল।

তরুর কবি প্রকৃতি স্বভাবতঃই প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিল। তাঁহার দৈনন্দিন লিপি পুস্তকে, অথবা কাহারও নিকটে লিখিতপত্র হইতে, ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সেইজন্য প্রকৃতির রূপ বর্ণনায়ও তিনি বিশেষ কৃতীত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁহার কবিতার ভাষা অতি প্রাঞ্জল ও মধুর এবং তাহাতে কল্পনার সাবলীল গতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ ইংরেজ সাহিত্যিক রিচার্ড গারনেট (Richard Garnet) সম্পাদিত The World Classics নামক গ্রন্থে তরুর কয়েকটি কবিতা স্থান পাইয়াছিল।

তরু জার্ম্মান ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থাগারে জার্ম্মান ও ফরাসী ভাষার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সমূহের সমাবেশ ছিল। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর, তিনি পরম যত্নে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। দুঃখের বিষয় মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে দুরন্ত যক্ষ্মা রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। (১২৮৪ বঙ্গাব্দে ভাদ্র; ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দ আগষ্ট)।

তহমাস্প কলি মির্জা—তিনি দিল্লীর সম্রাট শাহজাহানের সমকালবর্ত্তী (১৬২৭—১৬৫৮ খ্রীঃ) একজন প্রসিদ্ধ কবি। তাঁহার জন্ম স্থান তুর্কি স্থানে ছিল।

তাজউদ্দিন—শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ দরবেশ হজরত শাহ জালাল এমনির অনুগত অন্যতম শিষ্য। ধর্ম্ম যুদ্ধে তিনি নিহত হন। শ্রীহট্টের অরঙ্গপুর নামক স্থানে তিনি বাস করিতেন। তথায় তাঁহার সমাধি আছে। তথাকার চৌধুরীরা তাঁহারই বংশধর।

তাজউদ্দিন ইলদোজ—তিনি প্রথমে গজনীর অধিপতি সাহেব উদ্দিন মোহাম্মদ ঘোরীর অন্যতম প্রিয় ক্রীতদাস ছিলেন। ঘোরীর মৃত্যুর পরে তাঁহার ভ্রাতা গিয়াসউদ্দিন ঘোরীর পুত্র মামুদ ঘোরী শুধু ঘোর প্রদেশ লইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। এদিকে ইলদোজ গজনীর অধিপতি হইলেন। কিন্তু তিনি ঘোরের অধীনস্থ রাজা ছিলেন। দিল্লীর সম্রাট কুতুব উদ্দিনের সঙ্গে তাঁহার অনেকবার যুদ্ধ হইয়াছিল। কুতব

উদ্দিনের মৃত্যুর পরে বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, ইলদোজ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তদানীন্তন দিল্লীর সম্রাট সামসউদ্দিন ইলতিমাসের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে ইলদোজ পরাজিত ও বন্দী হন। বদায়ুন নগরে ১২১৫ খ্রীঃ অব্দে বন্দী অবস্থায় তিনি কালগ্রাসে পতিত হন। তিনি মাত্র নয় বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

তাজউদ্দিন কুচি—তিনি জালাল-উদ্দিন খিলিজির একজন প্রতিষ্ঠাবান্ সেনাপতি ছিলেন। কতকগুলি ওমরাহ জালালউদ্দিনকে অপসারিত করিয়া তাজউদ্দিনকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করিতে অভিলাষী হন। তাঁহাদের মধ্যে তাজউদ্দিনের সম্পর্কিত লোকই বেশী ছিল। একদিন তাজউদ্দিনের গৃহে ষড়যন্ত্রের পরামর্শ করিবার জন্য মিলিত হইয়া তাঁহারা অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়াছিলেন। মত্তাবস্থায় জালাল-উদ্দিন সম্বন্ধীয় ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সমাগত লোকদের মধ্যে এক-জন সম্রাটের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি গোপনে সম্রাটের নিকট সমস্ত সংবাদ তখনই প্রেরণ করিলেন। সম্রাটের আদেশে তাঁহারা বন্দী হইয়া সম্রাটের সমীপে নীত হইলেন। সম্রাট তাঁহাদিগকে বিশেষ তিরস্কার করি-লেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন সাহস করিয়া বলিলেন—"মদ্যপের বাক্য বায়ুর ন্যায় অসার। জাঁহাপনার অভাবে এরূপ সদাশয় ও মহদন্তঃকরণ অধিপতি কোথায় পাইব?" ইহা শুনিয়া সম্রাট তাঁহাদের সকলকে সাবধান করিয়া ক্ষমা করিলেন।

তাজ উল মুলুক—তাঁহার প্রকৃত নাম মালিক তাজু। দিল্লীর সৈয়দবংশীয় নরপতি খিজির খাঁ তাঁহাকে উক্ত উপাধি প্রদানপূর্ব্বক প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। ১৪২১ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেকেন্দর, উক্ত মন্ত্রী পদ ও মালিক উসথক উপাধি প্রাপ্ত হন।

তাজি—চুনার দুর্গের অধিপতি তাজির লোদী মালেকী নামে এক বন্ধ্যা পত্নী ছিলেন। তাজি তাঁহার অপরা পত্নীর গর্ভজাত পুত্রকর্ত্তৃক নিহত হইলে, সেরশাহ সেই লোদী মালেকীকে বিবাহ করিয়া চুনার দুর্গ ও প্রচুর ধন রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শেরশাহ দেখ।

তাড়ক—একজন সিদ্ধাচার্য্য। তাঁহার রচিত চর্য্যাপদ বা কীর্ত্তনের গান পাওয়া গিয়াছে। এই সকল গান মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং পরবর্ত্তী সময়ে দুর্ব্বোধ্য হওয়ায় সংস্কৃতে তাহার টীকা রচিত হইয়াছিল।

তাড়ক পাদ—একজন সিদ্ধাচার্য্য। তাঁহার রচিত একটী গান পাওয়া গিয়াছে। ইহা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা মিশ্রিত কবিতা।

তাড়াদেবী বা তান্দ্রাদেবী—বঙ্গের সেনবংশীয় নরপতি লক্ষ্মণ সেনের পত্নী। তাঁহার গর্ভে বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন নামে দুই পুত্র জন্মে। লক্ষ্মণ সেন দেখ।

তাতার খাঁ—(১) তিনি দিল্লীর সম্রাট গিয়াসউদ্দিন তোগলকের (১৩২১—১৩২৫ খ্রীঃ অব্দ) পালিত পুত্র। তিনি দিল্লীর সম্রাটের আদেশে পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী সুবর্ণগ্রামের বিদ্রোহী শাসন-কর্ত্তা গিয়াসউদ্দিন বহাদরশাহকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করেন। তৎপরে তাতার খাঁ সুবর্ণ-গ্রামের শাসনকর্ত্তার পদ লাভ করিয়া বহরাম খাঁ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে শাসনকার্য্যের জন্য বঙ্গদেশ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। সুবর্ণগ্রামে তাতার খাঁ, সপ্তগ্রামে ইজ্জউদ্দিনয়াহিরা খাঁ ও লক্ষ্মণাবতীতে নাশিরউদ্দিন ইব্রাহিমশাহ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৩২৫ খ্রীঃ অব্দে গিয়াসউদ্দিন তোগলকের মৃত্যুর পরে, তাঁহার পুত্র মোহাম্মদ বিন তোগলক (১৩২৫—১৩৫১ খ্রীঃ অব্দ) দিল্লীর সম্রাট হইয়াছিলেন। তিনি সুবর্ণ গ্রামের বন্দী শাসনকর্ত্তা গিয়াস-উদ্দিন বহাদরশাহকে, দিল্লীর সম্রাটের অনুগত থাকিবার সর্ত্তে মুক্তি প্রদান করেন। কিন্তু গিয়াসউদ্দিন বাঙ্গালা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, আবার বিদ্রোহী হন। এইবার দিল্লী হইতে আগত সৈন্যের সাহায্যে তাতার খাঁ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। গিয়াসউদ্দিন বহাদরশাহের মৃতদেহ দিল্লীর পথে পথে প্রদর্শিত হইয়াছিল। এইরূপে তোগলক বংশের অভ্যুদয়ে বাঙ্গালার বলবনবংশীয় স্বাধীন সুলতানগণের রাজত্বের অবসান হয় (১৩৩০ খ্রীঃ অব্দ)। তাতার খাঁ অতি যোগ্যতার সহিত সুবর্ণ গ্রামে রাজত্ব করিয়া ১৩৩৮ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার বর্ম্মবহনকারী সেনাপতি ফকরউদ্দিন সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তার পদ অধিকার করিয়াছিলেন। তাতার খাঁ একজন বিদ্বান্ ব্যক্তিও ছিলেন। 'তপশির তাতারখানি' নামক কুরাণের ভাষ্য, 'কতোয়ী তাতারখানি' নামক ব্যবহার শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রভৃতি তাঁহারই রচিত।

তাতার খাঁ—(২) তিনি খোরাসানের অধিবাসী। সম্রাট আকবরের সময়ের একজন একহাজারী সেনাপতি ও দিল্লীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৫৮৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার তথায় মৃত্যু হয়

তাতার খাঁ—(৩) তিনি গুজরাটের অধিপতি প্রথম মোজাফর শাহের পুত্র। ১৪১১ খ্রীঃ অব্দে মোজাফর শাহের মৃত্যুর পরে তাতার খাঁর পুত্র আহাম্মদ শাহ গুজরাটের সুলতান হইয়াছিলেন।

তাঁতিয়া টোপী—একজন মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তিনি প্রসিদ্ধ বিদ্রোহী নেতা নানা-সাহেবের সহিত যুক্ত থাকিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এইরূপ কথিত হয় যে তাঁহারই প্ররোচনায় কানপুরের প্রসিদ্ধ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় (২৭শে জুন, ১৮৫৭)। বিঠুরের যুদ্ধে তিনি সেনা-পতি হ্যাবলকের (Sir Henry Havelock) নিকট পরাস্ত হন। সেনা-পতি উইণ্ডহ্যাম তাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়া কানপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পরে সার জন ক্যাম্পবেল (Sir John Campbell) এক যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করেন। ঝান্সীর রাণী লক্ষীবাই এর সহিত মিলিত হইয়া তিনি যে অভিযান করেন, তাহাতে সার হিউ রোজ (Sir Hugh Rose) তাঁহাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করেন। তিনি পলায়ন করিয়া পুনরায় বিপুল বিদ্রোহী সৈন্যসহ পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এইবারও সার হিউ তাঁহাকে পরাজিত করেন। কিছুকাল গোয়ালিয়র দুর্গ তাঁহার অধিকারে থাকে। সার হিউ রোজ তাঁহাকে ঐ স্থান হইতে বিতাড়িত করেন। অতঃপর তিনি পলায়নপূর্ব্বক মধ্যভারতের নানাস্থানে কিছুকাল উপদ্রব করিতে থাকেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে মেজর মিড (Major Meade) নামক ইংরেজ সেনানী অতিকষ্টে মধ্যভারতের এক অরণ্যময় স্থানে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন। বিচারে তিনি প্রাণদণ্ড লাভ করেন। ঐতি-হাসিকগণ তাঁহাকে চতুর, যুদ্ধকৌশলী কিন্তু নিষ্ঠুর স্বভাব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

তাঁতিয়া ভীল—মধ্যভারতের একজন প্রসিদ্ধ দস্যু সর্দ্দার। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ইংরেজ অধিকৃত মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ-ভাগে এবং ইন্দোর রাজ্যে দস্যুবৃত্তি করিয়া শাসনকর্ত্তৃপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

মধ্যপ্রদেশের নিমার জিলার এক গণ্ডগ্রামে এক ভীল পরিবারে তাহার জন্ম হয়। তাহার পিতা ভাউসিং একজন সামান্য কৃষক ছিল। তাঁতিয়া বাল্যকাল হইতে পুরুষোচিত শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় দিয়া স্বজাতীর প্রিয় হইয়াছিল। জ্ঞাতি ও অবস্থাপন্ন গ্রাম-বাসীদের চক্রান্তে পিতা-পুত্র নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী সামান্য কৃষি ভূমি হইতেও বঞ্চিত হওয়ায়, প্রতি-হিংসাপরবশ হইয়া, তাঁতিয়া দস্যু বৃত্তি অবলম্বন করে এবং দীর্ঘকাল কর্ত্তৃ-পক্ষের সকল প্রকার প্রবল চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া, জনসাধারণের ভীতি উৎপাদন করিতে থাকে। ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে একবার ধৃত হইয়া, কারাদণ্ড লাভ করে, কিন্তু অচিরেই তাঁতিয়া ও তাহার কয়েকজন সহযোগী কারাগার

হইতে পলায়নপূর্ব্বক, পূর্ব্বের ন্যায় জনসাধারণের শঙ্কা উৎপাদন করিতে থাকে। তাহার সহকর্ম্মীদের মধ্যে কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে ধৃত হইয়া, শাস্তি ভোগ করিতে থাকে। হোলকারের ইন্দোর রাজ্য ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী ইংরেজ রাজ্য প্রধানতঃ তাঁতিয়ার দস্যু বৃত্তির এলাকা ছিল। ইংরেজ সরকার ও হোলকার সরকার তাহাকে ধৃত করিবার জন্য, কোনওরূপ চেষ্টার ত্রুটী করিতেন না। কিন্তু তাঁহাদের সকল প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করিয়া, তাঁতিয়া ও তাহার সহকর্ম্মীগণ নানাস্থানে উপদ্রব করিয়া বেড়াইত। তাঁতিয়ার সহকর্ম্মী ভ্রমে অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিও ধৃত হইয়া, শাস্তি ভোগ করিতে থাকে। যে সকল লোক তাঁতিয়া অথবা তাহার সহযোগীদের বিরুদ্ধে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সংবাদাদি প্রদান করিত, তাহারাই প্রধানতঃ অধিক উপদ্রুত হইত। মধ্যে একবার তাঁতিয়ার প্রধান সহযোগী দৌলিয়া ধৃত হইয়া দণ্ড লাভ করে। কিন্তু সেও কারাগার হইতে পলায়ন করে। কয়েক বৎসর পরে দৌলিয়া ও হিরিয়া নামক তাঁতিয়ার আর দুইজন দলভুক্ত ব্যক্তি, ধৃত হইয়া, যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড লাভ করে। এই দুইজনের অভাবে তাঁতিয়া অনেকটা শক্তিহীন হইয়া পড়ে। তদ্ভিন্ন প্রায় দশ বৎসর দস্যুবৃত্তি করিতে করিতে তাহার একটা অবসাদও উপস্থিত হয় এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের শক্তিও কমিয়া আসাতে, তাঁতিয়া দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে ধৃত করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন জানিয়া, তাঁতিয়া প্রথমে মধ্যবর্ত্তীদের সহায়তায় ইংরেজ সরকারের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করে। এই উপলক্ষে সে গণপৎ নামক এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করে এবং তাহাকে প্রচুর পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে মার্জ্জনা লাভের জন্য চেষ্টা করিতে বলে। কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি গণপৎ সরকার-কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত পুরস্কারের লোভে, তাঁতিয়াকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়া, গোপনে ইংরেজ পক্ষীয় রাজকর্ম্মচারীদের সংবাদ প্রদান করে। তাঁহারা যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়া, অতর্কিতে গণপতের গৃহে উপস্থিত হইয়া, তাঁতিয়াকে বন্দী করেন। তৎপরে জব্বলপুরে যথাবিধি বিচারের পর ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে তাঁতিয়ার প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হয়।

তান সেন—ভারতের একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি হিন্দুকুলোদ্ভব ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল মকরন্দ পাঁড়ে। তান সেনের হিন্দু নাম ছিল রত্নাকর পাঁড়ে। তাঁহারা গৌড়ীয় ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন এবং গোয়ালীয়র নগরীতে তাঁহাদের পৈতৃক নিবাস ছিল।

যৌবনকালে এক মুসলমান নারীর সহিত প্রণয় হওয়াতে তিনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অনুমান ৯৫৬ বঙ্গাব্দে (১৫৪৮ খ্রীঃ) তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতে তিনি বিশেষ সঙ্গীত প্রতিভার পরিচয় দেন। তিনি প্রথমে রাজা রামচাঁদের সভার গায়ক ছিলেন। পরে সম্রাট আকবরের অনুরোধে রামচাঁদ তাঁহাকে দিল্লীর রাজ সভায় প্রেরণ করেন। কথিত হয় সম্রাট একবার তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণে অতিশয় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দুই লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করেন। সম্রাটই তাঁহাকে 'তানসেন' এই উপাধি প্রদান করেন। তানসেন অনেকগুলি মৌলিক রাগ ও রাগিনীর প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার জীবিতকালে সমগ্র ভারতবর্ষে তত্তুল্য সঙ্গীত বিশারদ আর কেহ ছিল না। ১৫৯৬ খ্রীঃ (আনুঃ) তাঁহার মৃত্যু হয়।

সম্রাট আকবরের সহিত কোনও কারণে মনান্তর হওয়ায় তানসেন একবার কিছুকালের জন্য দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া আকবরের মাতামহ রাজারামের নিকট চলিয়া যান। পরে আবার সম্রাটের অনুরোধে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

হরিদাস সাধু তানসেনের সঙ্গীত বিষয়ে গুরু ছিলেন। একবার আকবর ছদ্মবেশে হরিদাস স্বামীর গান শুনিয়া মোহিত হন এবং তানসেনকে জিজ্ঞাসা করেন যে স্বামিজীর গান শুনিয়া যেরূপ ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তানসেনের গান শুনিয়া তাহা হয় না কেন। তদুত্তরে তানসেন নাকি বলেন "আমি যাহার সভায় গান করি তিনি এই দেশের রাজা, আর আমার গুরু যাঁহার সভায় গান করেন, তিনি জগতের রাজা। সুতরাং উভয় গানের তুলনা সম্ভব হয় না।

প্রবাদ এইরূপ যে আকবরের সভায় দীপক রাগিণী গাহিতে গাহিতে তানসেন অগ্নি দগ্ধ হইয়া মারা যান। খুব সম্ভব তাঁহার শত্রুপক্ষীয় লোকেরা তাঁহাকে বিষ প্রদান করিয়া তাঁহার দ্বারা রাজসভায় দীপক রাগিণীর আলাপ করান। ঐ সময়ে বিষক্রিয়ায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

আইন-ই- আকবরী হইতে জানা যায় যে, তানসেন প্রথমে রাজা রামচাঁদ রাঘেলার সভায় প্রধান গায়ক ছিলেন। সম্রাট আকররের আদেশে রাজা রামচাঁদ তাঁহাকে দিল্লীতে প্রেরণ করেন।

তারকচন্দ্র চূড়ামণি—তিনি হুগলী জেলা নিবাসী ছিলেন। তাঁহার রচিত বহু বিবাহ বিষয়ক 'সপত্নী নাটক' ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে উত্তর পাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অর্থানুকুল্যে প্রকাশিত হয়। ইহা পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন বিরচিত প্রসিদ্ধ 'কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব'

নাটকের একটী অতি অযোগ্য অনুকরণ মাত্র।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—খ্যাত-নামা বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক। তাঁহার পিতার নাম মহানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়। যশোহর জিলার বনগ্রাম মহাকুমায় তাঁহাদের নিবাস ছিল। ১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। পরে কলিকাতা ভবানীপুরস্থ খ্রীষ্টিয় পাদ্রীদের পরিচালিত বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চৌদ্দ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। অতঃপর পাঁচ বৎসর কলিকাতা মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করেন। কৃতী ও মেধাবী ছাত্ররূপে তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া তিনি বহু স্থানে যাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। এই সকল পর্য্যটন-লব্ধ অভিজ্ঞতার পরিচয় তাহার গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়।

তারকনাথ স্বর্ণলতা, অদৃষ্ট, হরিষে-বিষাদ ও ললিত-সৌদামিনী নামে চারিখানি পুস্তক রচনা করেন। তন্মধ্যে স্বর্ণলতাখানিই সমধিক খ্যাতি লাভ করে। প্রথমে উহা "জ্ঞানাঙ্কুর" নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে ১২৮০ বঙ্গাব্দে পুস্তাকাকারে মুদ্রিত হয়। তাঁহার অপর পুস্তকগুলি তাদৃশ জনপ্রিয় হয় নাই। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তারকনাথ ঘোষ—১৮১৫ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় চোরবাগানে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম মদনমোহন ঘোষ। তাঁহাদের পূর্ব্বনিবাস তারকে-শ্বরের নিকটবর্ত্তী ইলিপুর গ্রামে ছিল। তারকনাথের এগার মাস বয়সের সময় পিতার মৃত্যু হইলে মাতা সহমৃতা হন। পিতৃ মাতৃহীন শিশু মাতুলালয়ে প্রতি-পালিত হন। প্রথমে হেয়ার সাহেবের স্কুলে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়, পরে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৮৩২ সাল পর্য্যন্ত তথায় অধ্যয়ন করেন। তিনি হেয়ার সাহেবের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং প্রথমে তাঁহারই স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া-ছিলেন। পরে হেয়ার সাহেবেরই চেষ্টায় ১৮৩৮ সালে থাকবস্তার ডিপুটী কালেক্টারের পদে নিযুক্ত হন। প্রথম বাঙ্গালী ডিপুটী কালেক্টারদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। তিনি প্রায় তেত্রিশ বৎসর উক্ত পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৭১ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। দেশের নানাবিধ সৎকাজে তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তারকনাথ পালিত, সার—শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রসিদ্ধ দানবীর। ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতা নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা কালীকিঙ্কর পালিত কয়েকটি ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীদিগের মুৎসুদ্দি

ছিলেন। কালীকিঙ্কর নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। জনহিতকর বহু কাজে তিনি উদারভাবে অর্থ ব্যয় করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতা ভাজন হন। অত্যধিক দানশীলতার জন্য তিনি মৃত্যুকালে বিশেষ কিছু সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার সদ্‌গুণাবলী পুত্র তারকনাথে বর্ত্তিয়াছিল।

শৈশবেই তারকনাথ পিতৃহীন হন। কিন্তু মাতামহের সম্পত্তি লাভ করাতে আর্থিক দুরবস্থায় পতিত হন নাই। হিন্দু কলেজে তিনি প্রথম বাঙ্গালী সিবিলিয়ান (I. C. S.) সত্যেন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন। শিক্ষা সমাপনান্তে কিছুকাল এক উকীলের নিকট শিক্ষা-নবীশ থাকিয়া ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, চার বৎসর পরে দেশে প্রত্যাগমন করেন।

আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া মেধা ও প্রতিভাবলে অল্পকাল মধ্যেই তিনি প্রথম শ্রেণীর ব্যবহারজীবীরূপে গণ্য হইলেন। অন্যায়ের প্রতি তাঁহার পূর্ব্বাপরই বিশেষ ঘৃণা ছিল। আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইলেও, তিনি কখনও অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতেন না।

তারকনাথের দেশানুরাগ ও স্বজাতি প্রীতি অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় প্রবাহিত হইত। দেশের সকল প্রকার মঙ্গল কাজে তিনি মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য করিতেন। ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে বাঙ্গালা দেশে যে জাতীয় আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহারই অনুষঙ্গীরূপে "জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ" (National Council of Education) গঠিত হয়। তারকনাথ তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকিয়া, সর্ব্বপ্রকারে উহার উন্নতির জন্য যত্ন ও পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। ঐ পরিষৎকর্ত্তৃক পরিচালিত একটি শিল্প বিদ্যালয়ের (Technical School) উন্নতির জন্য তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হয়। তৎফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন। কিছুকাল পরে উক্ত বিদ্যালয়ের স্থায়ীত্ব ও সুপরিচালনা সম্পর্কে সহকর্ম্মী-গণের সহিত মতদ্বৈধ হওয়ায় তিনি উহার সংস্রব পরিত্যাগ করেন।

এদেশে উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান চর্চ্চার নানারূপ প্রতিবন্ধক ছিল। ইচ্ছা ও উৎসাহ থাকিলেও মেধাবী ছাত্রগণ উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান চর্চ্চা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইত না। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞানানুশীলন সভা (Indian Association for the Cultivation of Science) এ বিষয়ে সামান্য মাত্র সাহায্য করিতে পারিত। এই সব অসুবিধা দূর করিবার জন্য, তারকনাথ রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য নগদ ও সম্পত্তি বাবদ প্রায় পনর লক্ষ টাকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে প্রদান করেন। ঐ সম্পত্তির আয় হইতে এদেশীয় কৃতী ছাত্রদিগকে উক্ত দুই বিষয় শিক্ষার জন্য নানাভাবে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা হইল। তদ্ভিন্ন দুই বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য দুইজন অধ্যাপক নিয়োগেরও ব্যবস্থা হইল এবং অধ্যাপনার জন্য একটি বিজ্ঞানাগারও (Science Laboratory) প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি দানপত্রে একটি সর্ত্ত করিয়াছিলেন যে অধ্যাপনার জন্য যোগ্য ভারতীয় অধ্যাপকই নিযুক্ত করিতে হইবে। ঐরূপ যোগ্য অধ্যাপক সকল সময়ে পাওয়া না গেলে, মেধাবী ও কৃতী অধ্যাপককে অধিকতর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য বিদেশে প্রেরণ করিয়া উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে।

তারকনাথের এই বিজ্ঞানাগার পরবর্ত্তীকালে অপর দানবীর সার রাসবিহারী ঘোষের বহু লক্ষ মুদ্রা দান লাভে পুষ্ট হইয়া, ভারতের একটী শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানানুশীলন কেন্দ্র হইয়াছে। (রাসবিহারী ঘোষ দ্রষ্টব্য)।

১৯১৪ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে (১৩২১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন) এই দানবীর মানবলীলা সংবরণ করেন।

তারকনাথ প্রামাণিক—কলিকাতা নিবাসী প্রসিদ্ধ দানবীর ও ব্যবসায়ী। পুরুষানুক্রমে ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া প্রামাণিক বংশ প্রভূত ধনের অধিকারী হন। ইহাঁদের পূর্ব্ব নিবাস হুগলী জিলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ সপ্ত গ্রামের নিকটবর্ত্তী মিরকালা সাহাগঞ্জ নামক স্থানে ছিল। খুব সম্ভব তারকনাথের পিতামহ মদনমোহনই প্রথম ব্যবসায় উপলক্ষে কলিকাতায় আগমন করেন। মদনমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র গুরুচরণ প্রামাণিক কলিকাতার অন্যতম খ্যাতনামা ব্যবসায়ী হইয়াছিলেন। এদেশবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম জাহাজ সারাইবার জন্য কারখানা (Dock) স্থাপন করেন। ঐ কারখানা হইতে তিনি প্রচুর লাভবান হইতেন। গুরুচরণ অমায়িক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও দাতা ছিলেন। একবার শীতকালে তিনি এক সহস্র ব্রাহ্মণকে শীত বস্ত্র দান করেন। যতদিন তাহা দিতে পারেন নাই, ততদিন নিজেও মূল্যবান শীতবস্ত্র ব্যবহার করিতেন না। মৃত্যুকালে তিনি বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি ও বিস্তৃত ব্যবসায় রাখিয়া যান। তারকনাথ তাঁহার একমাত্র পুত্র ছিলেন।

১২২৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে (১৮১৬ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর) কলিকাতার পৈতৃকভবনে তারকনাথের জন্ম হয়। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বেই গুরুচরণের ব্যবসায় অতি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। পুত্রের জন্মের পর উহার আরও শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে ‘পয়মন্ত’ বলিয়া

তারকনাথ শৈশবাবধি পরিবারবর্গের বিশেষ স্নেহের পাত্র হন। পল্লীর এক পাঠশালায় দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভ করিয়া তারকনাথ পিতার সহকারীরূপে ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের বলে তিনি অল্প দিনের মধ্যেই ব্যবসায় ক্ষেত্রে কৃতীত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক ব্যবসায়ের আরও বিস্তৃতি সাধন করেন। কলিকাতার বড় বাজার ও চাঁদনীতে তাঁহাদের বিস্তৃত আড়ৎ ছিল। কলিকাতার অপর পারে শালখিয়াতে গুরুচরণের যে জাহাজ মেরামতির কারখানা ছিল, তারকনাথ তাহারও উন্নতি ও বিস্তৃতি সাধন করেন। জাহাজের তলায় লাগাইবার জন্য পিতল ও তামার চাদর (sheet) তিনি বিদেশেও রপ্তানী করিতেন। এইরূপে ব্যবসায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য কৃতীত্ব প্রদর্শন করেন.

কিন্তু তারকনাথ প্রধানতঃ দাতা রূপেই সর্ব্বজনমান্য হন। তাঁহার দানশীলতা প্রবাদ বাক্যের ন্যায় প্রচলিত হইয়াছে। কোনও প্রার্থী কখনও তাঁহার নিকট হইতে নিরাশ হয় নাই। বহু লোকে আশাতিরিক্ত দান পাইয়া বিস্মিত হইতেন। বস্তুতঃ দান করিবার জন্য তারকনাথ যেন সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া থাকিতেন। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহার নিকট দান পাইয়া উপকৃত হইয়া তাহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। দান করিয়া কখনও স্বীয় নাম প্রচার করিবার তাঁহার বাসনা ছিল না। কাহাকে কিছু দিবার সময়ে বলিতেন 'অতি সামান্যই কিছু দিলাম, আপনার যোগ্যতা বা প্রয়োজনীয়তার উপযুক্ত হইল না। তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।' বস্তুতঃ দাতা প্রার্থীর নিকট এইরূপ বিনয় প্রদর্শন করেন এইরূপ দৃষ্টান্ত জগতে অতি বিরল।

প্রামাণিক বংশ স্বধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। সনাতন মতানুযায়ী ব্রাহ্মণে অচলা ভক্তি প্রামাণিক বংশের বিশেষ ধারা ছিল এবং দেশ প্রচলিত বিবিধ প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল। এই সকল পূজাপার্ব্বণাদিতে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন। তদ্ভিন্ন প্রতিবেশীবর্গ, আত্মীয় বন্ধুগণও নানারূপে আপ্যায়িত হইতেন। দীন দরিদ্রগণও আহার ও বস্ত্রাদি লাভ করিয়া দাতার জয়গান করিতেন। বস্তুতঃ তারকনাথ যেমন প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন সেইরূপ নানাদিকে নানাভাবে অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যয় করিয়া ধন্য হইতেন। নিরহঙ্কার, ধর্ম্মপ্রাণ, বন্ধুবৎসল, দীন দরিদ্রের আশ্রয়স্থল তারকনাথ সকল সম্প্রদায়ের লোকের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন। তারকনাথের দানশীলতার কথা রাজপুরুষ-

গণেরও অজ্ঞাত ছিল না। ভূতপূর্ব্ব সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড (Edward VII) যুবরাজরূপে যখন ভারতে আগমন করেন, তখন তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি দিবার প্রস্তাব হয়। প্রসিদ্ধনামা কৃষ্ণদাস পাল তদুপলক্ষে আদিষ্ট হইয়া তারকনাথের নিকট রাজপুরুষদের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু তারকনাথ কোনও মতেই উক্ত উপাধি গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই।

আচার ব্যবহার, চালচলনে তারকনাথ অত্যন্ত সাধাসিধা খাঁটি দেশীয় ভাব রক্ষা করিতেন। এই বিবিধ গুণ সম্পন্ন মহাপুরুষ ১২৯১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে দেহ ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার একমাত্র পুত্র কালীকৃষ্ণ প্রামাণিক জীবিত ছিলেন।

তারকনাথ বিশ্বাস—বাঙ্গালী সাহিত্যিক। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করেন। এককালে তাঁহার গ্রন্থাবলী খুব লোক প্রিয় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার কশাঘাত সহ্য করিয়াও, তারকনাথের গ্রন্থাবলী জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের মধ্যভাগে প্রায় আশী বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তারকনাথ সাধু, রায় বাহাদুর—লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী ও সাহিত্যিক। বাঙ্গালা ১২৭৪ সালের ২০শে কার্ত্তিক তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা রামনাথ সাধুর বড়বাজারে একটি কবিরাজী গাছগাছড়ার দোকান ছিল। দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি পিতৃহীন হন।

তিনি মতিশীল ফ্রী কলেজে কোন মতে ভর্ত্তি হন এবং এক বৎসর তথায় পাঠ করিয়া পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তৎপর জেনারেল এসেমব্লি ইনষ্টিটিউসনে তিনি ভর্ত্তি হন ও তথা হইতে ১০ টাকা বৃত্তি লইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সকল বিষয়ে অসাধারণ কৃতীত্বের পরিচয় দেওয়ায় ইনি এক বিশেষ বৃত্তিরও অধিকারী হন এবং ক্রমে আইন (B. L.) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পুলিশ কোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন ও বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেন। ১৯০৭ সালে ইনি কলিকাতার পাবলিক প্রসিকিউটরের (Public Prosecutor) পদ প্রাপ্ত হন। ১৯১৬ সালে রায়-বাহাদুর ও ১৯২৪ সালে ইনি সি আই ই (C. I. E.) উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯১৯ সালে তাঁহার পত্নী সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মৃত্যু হয়। তারকনাথ কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে (১) ভোলানাথের ভুল, (২) মেনকারাণী (৩) ঋণমোক্ষ (৪) মহামায়ার মহাদান (৫) সুরীতি কথা (৬) উপেক্ষিতার

উপকারিতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকাতে নিয়মিত ভাবে লিখিতেন। মৃত্যুকালে তাঁহার চারি পুত্র ও এক কন্যা বর্ত্তমান ছিলেন।

তারদি বেগ—তিনি জাতিতে তুর্কি ছিলেন। দিল্লীর দ্বিতীয় মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের তিনি অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। হুমায়ুনের পক্ষে তিনি কয়েকবার যুদ্ধেও লিপ্ত হইয়াছিলেন। মধ্যে তিনি একবার হুমায়ুনের ভ্রাতা ও শত্রু কাবুলপতি কামবক্সের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। পরে কামবক্সকে পরিত্যাগ করিয়া আবার হুমায়ুনের পক্ষ অবলম্বন করেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পরে তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় আকবরের রাজ্যাভিষেক নিরাপদে সম্পন্ন হইয়াছিল। আকবরের পাঞ্জাবে অবস্থানকালে, তিনি দিল্লীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন (১৫৫৬ খ্রীঃ)। এই সময়ে আদিল শাহ শূরের প্রধান সেনাপতি হিমু দিল্লী আক্রমণ করেন এবং তারদি বেগ পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। আকবরের প্রধান সেনাপতি বৈরাম খাঁ তাঁহার প্রতি পূর্ব্ব হইতে বিরূপ ছিলেন। বৈরাম খাঁ সিয়া মতাবলম্বী এবং তারদি বেগ সুন্নি মতাবলম্বী ছিলেন। এই পলায়নে বৈরাম খাঁ তারদি বেগের উপর অতিশয় বিরক্ত হন এবং তাঁহাকে স্বীয় বস্ত্রাবাসে আনয়নপূর্ব্বক স্বহস্তে বধ করেন। সম্রাট আকবর তাঁহার এই নিষ্ঠুর আচরণে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন।

তারাকুমার কবিরত্ন—বাঙ্গালী পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণমোহন শিরোমণি। কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে চাঙ্গড়িপোতা নামক স্থানে তাঁহাদের নিবাস ছিল। ১২৪৫ বঙ্গাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি কিছুকাল রাজসাহী কলেজে পরে কিছুকাল মেট্রপলিটান (অধুনা বিদ্যাসাগর) কলেজে অধ্যাপনা করেন। মধ্যে তিনি কিছুকাল রেশমের ব্যবসায়ও করিয়াছিলেন। সংস্কৃত শ্লোকের সরল পদ্যানুবাদে এবং সংস্কৃত রচনায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি অনেকগুলি ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক এবং বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন।

তারাচরণ শিকদার—১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে তিনি 'ভদ্রার্জ্জুন' নামে একখানা নাটক রচনা করেন।

তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। ১৮০৪ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় তাঁহার জন্ম হয়। ডেভিড হেয়ারের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষারম্ভ হয়। পরে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিয়া কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। তৎপরে কিয়ৎকাল সদর দেওয়ানী আদালতের

রেজিষ্ট্রার ও অব্যবহিত পরে মুন্সেফ হইয়াছিলেন।

তিনি রাজা রামমোহন রায়ের একজন অনুরাগী শিষ্য ছিলেন এবং ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দে রামমোহন যখন প্রথম ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তারাচাঁদ তাহার প্রথম কর্ম্ম সচিব হইয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি কিছুকাল বর্দ্ধমানের মহারাজার জমিদারীতে চাকুরী করিয়াছিলেন। ঐ পদে নিযুক্ত থাকিতে থাকিতেই তাঁহার দেহান্ত হয়।

তাঁরাচাঁদ দি কুইল (The Quill) নামে একখানি পত্রিকা পরিচালনা করিতেন। তাহাতে শাসককর্তৃপক্ষের দোষগুণাবলীর সমালোচনা করিতেন বলিয়া, তিনি সরকার পক্ষের বিশেষ অপ্রিয় হন। তারাচাঁদ মনুসংহিতার ইংরেজি অনুবাদ এবং একখানি ইংরেজি বাঙ্গালা অভিধানও সঙ্কলন করেন। তৎকালিন নানা জনহিতকর কার্য্যের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। সুবিখ্যাত বেঙ্গল স্পেক্টেটর (The Bengal Spectator) পত্রিকার সহিতও কিছুকাল তাঁহার যোগ ছিল। ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল ঘোষ তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মিলিত হইয়া "জ্ঞানার্জ্জন সভা" (Society for the Acquisition of General Knowledge) নামে সভা স্থাপন করেন। তারাচাঁদ উহার প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন। ঐ সভায় অধিবেশনেগুলিতে রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, জজ হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ মনস্বীগণ মূল্যবান বক্তৃতা করিতেন। তারাচাঁদ সেই সময়ে নব্য শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে একজন প্রধান ছিলেন। ডিরোজিয়োর শিক্ষা দীক্ষায় তাঁহারা দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

তারাদেবী—(১) প্রাচীন তক্ষশীলা তোডাতঙ্ক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহা চালুক্যবংশীয় রাওশূরতানের হস্তে ন্যস্ত ছিল। তাঁহারই কন্যা অপরূপ লাবণ্যবতী তারাদেবী। শূরতান, আফগান বীর লীলকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া আরাবল্লী পর্ব্বতের পাদপ্রান্তস্থিত বেদনোর নগরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—'যে আমার তোড়াতঙ্ক নগর উদ্ধার করিয়া দিবে, তাঁহারই হস্তে আমি আমার এই কন্যাকে সমর্পণ করিব'। মিবারপতি রায় মল্লের (১৪৬৯—১৫০৫ খ্রীঃ) পুত্র পৃথ্বীরাজ, মুসলমানদিগকে পরাস্ত করিয়া তোডাতঙ্ক শূরতানকে প্রদান করেন ও তাঁহার কন্যা তারাবাইকে বিবাহ করেন। তারাবাই বিবাহের পূর্ব্বেই পৃথ্বীরাজের সঙ্গে যুদ্ধে গমনপূর্ব্বক দুর্গপতি আফগানকে প্রথমেই তীর

নিক্ষেপে আহত করিয়াছিলেন। তৎপরে পৃথ্বীরাজের শরাঘাতে আফগান সর্দ্দার মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শিরোহির রাজা জয়মল্ল পৃথ্বীরাজের ভগিনীপতি ছিলেন। জয়মল্ল অহিফেন সেবী ছিলেন। মত্ততাবস্থায় সহধর্ম্মিণীর প্রতি দুর্ব্যবহার করিতেন। পৃথ্বীরাজ তাহার প্রতীকার করিতে যাইয়া, জয়মল্লকর্তৃক বিষপ্রয়োগে নিহত হন। তারাদেবী পৃথ্বীরাজের মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া চিতারোহণে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। পৃথ্বীরাজ দেখ।

তারা দেবী—(২) আসামের পরাক্রান্ত নরপতি হর্জ্জরের মহিষী। তিনি বনমাল নামক পুত্রকে প্রসব করেন। প্রলম্ব ও হর্জ্জর দ্রষ্টব্য।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি—খ্যাতনামা আভিধানিক ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তাঁহার পিতার নাম কালিদাস সার্ব্বভৌম। তাঁহারা পূর্ব্বে যশোহরের অধিবাসী ছিলেন। তারানাথের পিতামহ রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত, বিবাহ সূত্রে বর্দ্ধমান জিলার কালনাতে বসবাস আরম্ভ করেন। তারানাথের পিতাও দেশবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাদাস তর্কপঞ্চাননের মৃত্যুর পর তিনি বর্দ্ধমানের জজ পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। কিন্তু উহার ফলে পরিবারে অশান্তি হইবার সম্ভাবনা ঘটায়, তিনি স্বেচ্ছায় উহা পরিত্যাগ করিয়া, চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন।

১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে তারানাথ জন্মগ্রহণ করেন। বয়স এক বৎসর হইবার পূর্ব্বেই, তিনি মাতৃহীন হন। কালিদাস পরে আবার বিবাহ করিয়াছিলেন। তারানাথ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মেধার পরিচয় প্রদান করেন। কালিদাস সার্ব্বভৌম স্বয়ং পুত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। প্রথমে বাঙ্গালা ও পরে সংস্কৃত শিক্ষা প্রদান করেন। এই সময়ে পারিবারিক অশান্তির জন্য পূর্ব্বের একান্নবর্ত্তী পরিবার নষ্ট হইয়া গেল এবং কালিদাস নিজ অংশ লইয়া পৃথক হইলেন।

১৮৩০ খ্রীঃ অব্দে তারানাথ কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। পাঁচ বৎসর অধ্যয়নান্তে বিবিধ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ পূর্ব্বক "তর্কবাচস্পতি" উপাধি লাভ করিয়া, ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলেজ পরিত্যাগ করেন। অতঃপর কালিদাস পুত্রকে লইয়া কাশীতে গমন করেন। তারানাথ চারি বৎসর তথায় থাকিয়া, বিশ্বরূপ স্বামীর নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। ঐ সময়ে তিনি পাণিনিও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

কালিদাস তাহার মধ্যম পুত্র তারাচরণের ব্যবহারে চিন্তাকুল হইয়া ভবিষ্যতে গৃহ বিবাদের সম্ভাবনা বোধ

করিতে প্রয়াস পান এবং জীবদ্দশাতেই সম্পত্তি পৃথক করিয়া দেন। কালিদাস অসাধারণ পণ্ডিত হইলেও, বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। পূর্ব্বপুরুষদের উপার্জ্জিত সম্পত্তি নিজ চেষ্টায় প্রভূত বর্দ্ধিত করেন। তারানাথ সেজন্য প্রথম জীবনে কখনও অর্থাভাব বোধ করেন নাই।

সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তারানাথ কিন্তু পিতার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া চতুষ্পাঠী খুলিলেন না। ঐ সময়ে কালনা একটি বাণিজ্য প্রধান স্থান ছিল। তিনি কলিকাতা হইতে সূতা আমদানী করিয়া তদ্দ্বারা বস্ত্র বয়ন করাইতেন এবং ঐ বস্ত্র বিক্রয়াদির জন্য দোকান খুলিলেন। ক্রমে তাঁহার ব্যবসায় স্পৃহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি নানাদিকে নানাভাবে ব্যবসায় বিস্তৃত করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য কালিদাস পুত্রের এই বৈশ্যজনোচিত কার্য্য আদৌ অনুমোদন করেন নাই। ১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার পূর্ব্বে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঐ কর্ম্ম প্রাপ্তিতে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করেন। সরকারী চাকুরীর নিয়মানুসারে ব্যবসায় করিতে অনধিকারী হওয়ায়, তিনি অতঃপর মধ্যম পুত্রের নামে ব্যবসায় পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কার, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন প্রমুখ খ্যাতনামা অধ্যাপকগণ সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা দিতেন। চাকুরীতে প্রবেশ করিবার তিন বৎসর পরে কালনাতে নিজ ব্যয়ে প্রাসাদোপম বাস ভবন নির্ম্মাণ করেন। ব্যবসায়ে প্রধানতঃ লিপ্ত থাকিলেও তিনি শাস্ত্র চর্চ্চা আদৌ অবহেলা করিতেন না। সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাগারের অমূল্য গ্রন্থরাজির তিনি যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না।

আনুমানিক ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে তারানাথের পিতৃবিয়োগ হয়। তৎপূর্ব্বে, ব্যবসায়ের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের অসাধুতার জন্য, তাঁহার বিলক্ষণ ধনহানী হয়। ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে তিনি "শব্দার্থ-রত্ন" নামে একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। কিন্তু উঁহা বিক্রয় করিয়া কিছুই অর্থ লাভ করিতে পারেন নাই। অন্যান্য ব্যবসায়তেও পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারীদের অসাধুতা ভিন্ন অন্যান্য নানা কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, তিনি ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। কয়েক বৎসর এই ঋণের জন্য তাঁহাকে দুর্ভাবনা ও উত্তমর্ণের উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল।

তারানাথ বিধবা বিবাহ আন্দোলনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একজন পরম সহায়ক ছিলেন। বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত বলিয়া অনুমোদন করায়

তাঁহার অর্থ লাভের পথ অনেক হ্রাস হয়। ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ঋণ-জালে জড়িত হইয়াও তিনি অর্থ লাভের আশায় নিজ বিবেচনানুমোদিত মত পরিবর্ত্তন করেন নাই। সামাজিক এবং পারিবারিক ক্রিয়াকর্ম্ম তিনি শ্রৌত মতে সম্পন্ন করিতেন। এজন্যও তিনি পণ্ডিত সমাজে অপ্রিয় ছিলেন। সংসারক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করিয়া তিনি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন নাই। পরবর্ত্তী-কালে, ব্যবসায় ও অন্যান্য সূত্রে লব্ধ অর্থে বিত্তবান হইয়া নিজ ভবনে চতু-ষ্পাঠী স্থাপন করেন। কাব্য ও অলঙ্কার ভিন্ন অপর যে কোনও বিষয় শিক্ষার্থী-দের প্রতি বিশেষ স্নেহ ও যত্ন ছিল। কাব্য বা অলঙ্কার পাঠে তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন না। তাঁহার বিদ্যাবত্ত্বা ও অধ্যাপনা খ্যাতি এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, সুদূর সিংহল ও শ্যাম দেশ হইতেও বৌদ্ধ ছাত্রগণ তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিতে আসিতেন।

ঋণগ্রস্ত হওয়ায় তিনি ব্যবসায় অনেক সংকোচন করেন। তিনি জ্ঞান-চর্চ্চার অবহেলা করিতেন না। বরঞ্চ অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, তিনি কিঞ্চিৎ পরিমাণে ঋণমুক্ত হন। সিদ্ধান্ত কৌমুদীর উপর "সরলা" নাম্নী টীকা পাশ্চাত্য দেশেও বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। আশুবোধ নাম্নী একখানি ছাত্র পাঠ্য ব্যাকরণ, মুদ্রারাক্ষস, বেণীসংসার, কাদম্বরী, রত্নাবলী, মালবিকাগ্নিমিত্র, মহাবীর চরিত প্রভৃতি ছাত্র পাঠ্য গ্রন্থের টীকাভিন্ন তিনি দুইখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত অভিধান সংকলন করেন। একখানির নাম শব্দস্তোম মহানিধি ও অপর-খানি বাচস্পত্যাভিধান। প্রথমখানি প্রধানতঃ ছাত্রদিগের উপযোগী। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে উহার প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হয়। এবং ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে উহা সম্পূর্ণ হয়। বাচস্পত্যাভিধান খানির মুদ্রণের জন্য তিনি রাজকীয় সাহায্য লাভ করেন। এইরূপ একখানি সুবৃহৎ সর্ব্বগুণান্বিত অভিধান আর দ্বিতীয় প্রকাশিত হয় নাই। এই মহা-অভিধান জগতের সকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে উহার মুদ্রণ শেষ হয়। এই অভিধান প্রণয়নে নিযুক্ত থাকার কালে, ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজের কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তৎপূর্ব্বে ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে তিনি ধাতুরূপাদর্শ নামে একখানি ব্যাকরণও রচনা করেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে যুবরাজ এড্‌ওয়ার্ড (যিনি পরে সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড হইয়াছিলেন) ভারত পরিদর্শনে আগমন করিলে বাঙ্গালীদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে যে অভ্যর্থনা করা হয়, তদুপলক্ষে তারা-নাথ এক রাজপ্রশস্তি রচনা করেন।

এই সকল ভিন্ন তুলাদানাদি পদ্ধতি, শ্রাদ্ধাদি পদ্ধতি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ এবং গায়ত্রী ব্যাখ্যা রচনা করেন।

বিধবা বিবাহ সম্পর্কে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহযোগী ছিলেন। কিন্তু পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বহু বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন, তখন তারানাথ তাঁহার বিরোধী হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুক্তির অশাস্ত্রীয়ত্ব প্রমাণের জন্য পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই সংশ্রবে উভয়ের মধ্যে অতিশয় বিরোধ সৃষ্টি হয়।

পরবর্ত্তী জীবনে তারানাথের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ভারতের অতি দূরবর্ত্তী স্থানেও বিস্তৃত হইয়াছিল। একাধিক দেশীয় নৃপতি তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহার বিশেষ গুণগ্রাহী হন। শাস্ত্রের মর্ম্ম যথাযথ উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া দেশ প্রচলিত প্রতিমা পূজায় তাঁহার আস্থা ছিল না। বহু বিবাহ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের বিরুদ্ধতা করিলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে বহু বিবাহের বিরুদ্ধেই ছিলেন। ঔষধার্থেও সুরাপান তিনি অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন। যৌবনের প্রারম্ভেই, কাশীতে অধ্যয়নকালে তিনি আমীষ ভোজন চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করেন। সমুদ্রযাত্রা তাঁহার মতে অশাস্ত্রীয় নহে।

বাচস্পতি মহাশয়ের প্রকৃতি কিঞ্চিৎ রুক্ষ ছিল এবং কোনও স্থলে তাঁহার প্রচলিত শিষ্টাচার বিরুদ্ধ আচরণ লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিত। কিন্তু কোনওরূপ ছলনা বা কুটিলতার লেশমাত্র তাঁহার চরিত্রে ছিল না। ঋণগ্রস্ত হইবার পর পুনরায় যখন স্বচেষ্টায় অর্থশালী হন, তখন যে সকল উত্তমর্ণ আইনানুসারে প্রাপ্ত টাকা পাইতে পারিতেন না, তাঁহাদেরও প্রাপ্য সমুদয় অর্থ পরিশোধ করেন।

তারানাথ ব্যাকরণ, স্মৃতি, অলঙ্কার ন্যায় প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। বেদ ও উপনিষদেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। সংস্কৃত কলেজে তিনিই তৎকালে একমাত্র পাণিনী ব্যাকরণে পারদর্শী ছিলেন। বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল তিনি বাক্যালাপ করিতে পারিতেন। অন্য প্রদেশ হইতে কোনও পণ্ডিত সংস্কৃত কলেজে আসিলে তারানাথের উপরই তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ করিবার ভার পড়িত। তাঁহার সংস্কৃত উচ্চারণও খুব বিশুদ্ধ ছিল। জ্যোতিষেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। নিজের জন্মপত্রিকা নিজেই সংকলন করেন এবং নিজ নির্দ্ধারিত দিবসেই কাশীধামে তিনি দেহত্যাগ করেন। (জুন—১৮৮৫ খ্রীঃ আষাঢ় ১২৯২ বঙ্গাব্দ)

তারানাথ, লামা—তিনি তিব্বত দেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত। তিনি তিব্বত ও ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাস রচনা

করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ জাতীয় পণ্ডিত ভট্টঘটী প্রণীত 'গুরুপরম্পরার ইতিহাস' গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি স্বীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ক্ষত্রিয় জাতীয় পণ্ডিত ইন্দ্রদত্ত প্রণীত 'বুদ্ধ পুরাণ' মগধবাসী ক্ষেমেন্দ্র ভদ্র প্রণীত ইতিহাস, সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত 'রাম চরিত' প্রভৃতি গ্রন্থের তিনি নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই এক 'রাম চরিত' ব্যতীত অন্য কোনও বই এখন পর্যান্ত পাওয়া যায় নাই। তারানাথ ১৫৭৩ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬০৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাস গ্রন্থ শেষ হয়।

তারানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ—ত্রিপুরা জিলা লেসিয়াড়ার বিখ্যাত ভট্টাচার্য্য-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯শ শতাব্দীর তৃতীয়াপাদে তিনি পূর্ব্ববঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার পিতামহ গৌরীদাস তর্কবাগীশ এবং পিতৃব্য ভৈরবচন্দ্র তর্ক-ভূষণ, ত্রিপুরার "জজ্ পণ্ডিত" ছিলেন।

তারাবাই—(১) তিনি জনকজী সিন্ধিয়ার (১৮২৭—১৮৪৩ খ্রীঃ) মহিষী। ১৮৪৩ খ্রীঃ অব্দে জনকজী পরলোক গমন করিলে, দৌলতরাও (অন্য নাম জয়াজীরাও) নামে সিন্ধিয়াবংশের এক-জনকে রাণী তারাবাই পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ভারতের বড়লাট লর্ড এলেন-বরা (১৮৪২—১৮৪৮ খ্রীঃ) সিন্ধিয়ার গোয়ালিয়র রাজ্যের বিশৃঙ্খলা নিবারণার্থ একজন ইংরেজ অভিভাবক নিযুক্ত করিলেন। ইহা রাণী তারাবাই মানিয়া লইতে সম্মত হইলেন না। সুতরাং যুদ্ধ বাঁধিল। অচিরে মহারাজপুর ও পানিয়ার নামক স্থানে ইংরেজ ও সিন্ধিয়া সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হইল। এই যুদ্ধে গোয়ালিয়ার সৈন্য পরাজিত হইল। এই পরাজয়ের পর গোয়া-লিয়ারের সহিত ইংরেজদের নূতন সন্ধি হইল। সেই সন্ধির ফলে সিন্ধিয়ার সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করিতে হইল এবং কতক সৈন্য ইংরেজ সেনাপতির অধি-নায়কত্বে রক্ষিত হইল। কিন্তু তাঁহার ব্যয়ভার সিন্ধিয়া বহন করিতে বাধ্য হইলেন।

তারাবাই—(২) শিবাজীর বংশধর, সেতারার অধিপতি রাজা রামের মহিষী। ১৭০০ খ্রীঃ অব্দে রাজারামের মৃত্যুর পরে, তিনি রামচন্দ্র পন্থ, শঙ্করজী-নারায়ণ প্রভৃতি সচিব ও ধন্যজী প্রভৃতি সেনাপতির সাহায্যে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার দশ বৎসর বয়স্ক পুত্র শিবাজী রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। রাজারামের অন্যতমা মহিষী রাজস বাইএর গর্ভজাত পুত্র সম্ভাজী তখন তিন বৎসর বয়স্ক ছিলেন। রাজারাম ও শিবাজী দ্বিতীয় দেখ।

তারিণীচরণ ন্যায়বাচস্পতি—ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুর ইছাপুরার কুলীন ভট্টাচার্য্য (বন্দ্যোপাধ্যায়) বংশীয় একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত। তিনি এবং তাঁহার খুল্লতাত কাশীকান্ত ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়, বিক্রমপুর পণ্ডিত সমাজে ন্যায়ের প্রাধান্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। অনুমান ১২৮০ সনে তিনি স্বর্গী হন। তিনি অতি ধীর প্রকৃতি প্রবীণ এবং বিচারকুশল ছিলেন। তাঁহার অন্যতম প্রধান ছাত্র, কামারখাড়ার চন্দ্রকুমার তর্কালঙ্কার।

তারিণীচরণ বিদ্যাবাগীশ—তিনি নবদ্বীপের একজন প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। কৃষ্ণনগরের রাজা সতীশচন্দ্র রায় ও রাণী ভুবনেশ্বরীর সময়ে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তৎপরে রাজা ক্ষিতিশচন্দ্র রায়ের সময়ে দুর্গাদাস বিদ্যারত্ন প্রধান জ্যোতিষী হইয়াছিলেন।

তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়—প্রবাসী বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারী। তাঁহার পৈতৃক নিবাস হুগলী জিলার অন্তর্গত খানিসানিতে ছিল। ১৮১৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি অর্থোপার্জ্জন মানসে উত্তর পশ্চিম প্রদেশান্তর্গত ফরক্কাবাদে গমন করেন। তিনি প্রথমে ডাক মুন্সির কাজ করেন পরে আলিগড় ডাকঘরে চাকুরী পান। তখন প্রধানতঃ ঘোড়ার ডাকের প্রচলন ছিল। ১৮০৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি ডাকের জন্য অশ্ব সরবরাহ করিবার ঠিকা প্রাপ্ত হন। ঐ সময়ে সিবিল সার্জ্জনরাই সরকার পক্ষে ডাক অশ্বের ঠিকাদার হইতেন। তারিণীবাবু এড্‌মাণ্ড টিরিটিন (Edmund Tiriteen) নামক সিবিল সার্জ্জনের অধীনস্থ ঠিকাদার ছিলেন।

আলিগড়েই বসত বাটী নির্ম্মাণ করিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। সহরেরই নিকটস্থ এক স্থানে তিনিই প্রথম নীল কুঠী স্থাপন করেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার আরও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসায় ছিল। ১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কর্ম্মস্থলে তিনি বিস্তীর্ণ জমিদারীও ক্রয় করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার তিন পুত্র বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই আলিগড়ে জন্ম হয়। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তাঁহারা সকলে প্রাণভয়ে বৃন্দাবনে পলায়ন করেন। সেই স্থানেই ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

তারিণীচরণ শিরোমণি— ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুর, দক্ষিণপাড়া তোজেশ্বর নিবাসী প্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিত। সর্ব্বপ্রথম যাহারা "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি (১৮৮৭ খ্রীঃ) পাইয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম। ১২৯৭ সনে তিনি স্বর্গী হন। তাঁহার রচিত নব্য স্মৃতিশাস্ত্র পত্রিকা পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত ছিল। গুরুচরণ বিদ্যাভূষণ, হরচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি বহু স্মার্ত্ত পণ্ডিত তাঁহার ছাত্র ছিলেন।

তারিণী সেন—তিনি একজন বৌদ্ধ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রণেতা আচার্য্য। তিনি বাঙ্গালা দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য খ্রীঃ ৮ম শতাব্দীতে তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন।

তারিণী ব্রাহ্মণী—তাঁহার রচিত একখানি 'সুবচনীর ব্রতকথা' পাওয়া গিয়াছে। অন্য পরিচয় অজ্ঞাত।

তার্ক্ষ—তিনি একজন শিল্প শাস্ত্রকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—তার্ক্ষতন্ত্র।

তালনাথ—নাথ পন্থী ৮৪ জন সিদ্ধ পুরুষের অন্যতম। অপাননাথ দেখ।

তালিব আমুলি—পারস্য দেশের অন্তর্গত আমুল নামক স্থানের, একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি দিল্লীর সম্রাট আকবর শাহের সময়ে এদেশে আগমন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর শাহ তাঁহাকে 'মালক-উস্-শোয়ারা' (রাজ কবি) উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় একশত বৎসর জীবিত থাকিয়া ১৬২৫ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার রচিত একখানা দেওয়ান রহিয়াছে।

তিক্ক—খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নেলোর ও কোডাপা নামক স্থানে তেলেগুবংশীয় তিক্ক রাজা ছিলেন। তিনি চোলরাজের সামন্ত নরপতি ছিলেন। তিক্ক এক সময়ে তাঁহার প্রভু নরপতি তৃতীয় রাজেন্দ্র চোলকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিক্কের পুত্র মন্মসিদ্ধ তম্মুসিদ্ধ খুব পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। অবশেষে রাজেন্দ্র চোলকে তিক্কের বিরুদ্ধেই দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছিল।

তিক্কন সোমযাজী—তিনি তেলেগু ভাষার একজন বড় কবি। তিনি খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তৃতীয় রাজেন্দ্র চোলের রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম তেলেগু 'ভারতম্' ও 'নিধচনোত্তররামায়ণম্'। নেলোরের রাজা মন্মসিদ্ধ এই কবির একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। একবার মন্মসিদ্ধ, তাঁহার পিতৃব্য পুত্র কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু কবি তিক্কন কাকতীয় নরপতি গণপতির সাহায্যে তাঁহাকে পুন সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তিগি—দিল্লীর সম্রাট বহরামের রাজত্বকালে (১২৩৯—৪১ খ্রীঃ) তিনি একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি অতিশয় ক্ষমতাশালী হইয়া রাজসিংহাসনের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকেন। তজ্জন্য সুলতান বহরাম তাঁহাকে দুইজন ক্রীতদাস দ্বারা বধ করান।

তিষ্যদেব—তিষ্যদেব দেখ।

তিতুমীর—একজন ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমান। তাঁহার বাস নদীয়া (বর্ত্তমান যশোহর) জিলার গোবরডাঙ্গার সন্নিকটস্থ বাদুড়িয়া থানার এলাকাধীন হায়দর গ্রামে ছিল। ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দে

তিতুর জন্ম হয়। তিনি বাল্যকাল হইতে অতিশয় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্বধর্ম্মনিষ্ঠা উৎকট ধর্ম্মোন্মত্ততায় পরিণত হয়। তিনি প্রথম জীবনে কিছুকাল স্থানীয় জমিদারদের অধীনে লাঠিয়ালের কাজ করেন। ঐ সময়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা করার জন্য তাঁহার কারাদণ্ড হয়। ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দে তিতু মক্কা যাত্রা করেন। তথায় ওহাবী সম্প্রদায়ের নেতা সৈয়দ আহাম্মদের সহিত তাহার পরিচয় ঘটে। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, তিতু নিম্ন-শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে নানারূপ সংস্কার প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করেন। নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের উপরই তাঁহার প্রভাব খুব বিস্তার লাভ করে। এই সময়ে মক্কা-প্রত্যাগত একজন ফকীরও তাঁহার সঙ্গে যোগ দেন এবং তাঁহাদের উভয়ের চেষ্টায় বহু অশিক্ষিত ধর্ম্মান্ধ মুসলমান তিতুমীরের শিষ্য হয়। এই সকল অনুচরদিগের নানারূপ আবশ্য-কীয় ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অর্থের প্রয়োজন হওয়ায়, তিতুমীর ধনী ব্যক্তিদের গৃহ লুণ্ঠন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। স্থানীয় কয়েকজন হিন্দু জমি-দারের কাছারী অথবা বাড়ী লুঠ করিয়া তিনি অনেক অর্থ সংগ্রহ করেন। তিতুকে দমন করিবার জন্য পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় তাঁহার এলাকা-ধীন তিতুর মতানুসারী সমস্ত লোকের দাড়ীর জন্য মাথা পিছু পাঁচ সিকা কর ধার্য্য করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তিতু কৃষ্ণদেব রায়ের বাড়ী লুণ্ঠন করিতে গমন করেন, কিন্তু বিশেষ কৃত-কার্য্য হন নাই। এই সংবাদ পাইয়া জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে একজন দারোগা তিতুকে দমন করিতে যাইয়া নিহত হন। ইহাতে তিতুর সাহস আরও বাড়িয়া যায়। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী টাকী ও গোবরডাঙ্গার জমীদারদের নিকট হইতে কর চাহিয়া পাঠাইলেন। এই ভাবে তাঁহার উপদ্রবে নিকটবর্ত্তী বহু স্থান জনশূন্য হইয়া পড়িল। তিতু নাড়িকেলবেড়িয়া নামক স্থানে বাঁশ ও মাটি দিয়া এক দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সদর্পে রাজত্ব (?) করিতে লাগিলেন। তাঁহার অত্যাচার ও উপদ্রব ক্রমশঃই বাড়িতে থাকায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সৈন্য সাহায্য চাহিয়া পাঠান। কর্ত্তৃ-পক্ষ প্রথমে সৈন্য না পাঠাইয়া অস্ত্রধারী বরকন্দাজ, লাঠিয়াল, চৌকীদার প্রভৃতি প্রেরণ করিলেন। তাহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হওয়ায়, ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে একজন ইংরেজ সেনা-পতির অধীনে একদল ইংরেজ সেনা, একদল দেশীয় সেনা ও কয়েকটি কামান প্রেরিত হইল। তিতুমীর সদর্পে অনুচরবর্গ সহ এই বাহিনীর সম্মুখীন হইলেন। তিতুমীর তাঁহার শিষ্যগণকে অভয় দিয়া বলিলেন যে, ধর্ম্মবলে তিনি

কামানের গোলাগুলি খাইয়া ফেলিবেন। ইংরেজ সেনাপতি প্রথমে ভীতি প্রদর্শনের জন্য কয়েক বার কামানের ফাঁকা আওয়াজ করেন। ইহাতে কোনও অনিষ্ট না হওয়ায়, তিতুমীরের অনুচরগণ "হজরত গোলা খা ডালা" এই বলিয়া সদর্পে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল। তখন সামান্য আক্রমণেই তিতুমীরের বাঁশের দুর্গ ধ্বংস হইল এবং অনেক অনুচর সহ তিতুমীর স্বয়ং দুর্গ মধ্যে নিহত হইলেন। অনেক লোক ধৃত হইয়া আদালতের বিচারে কঠোর দণ্ড লাভ করিলে দেশ শান্ত হয়।

তিথিমেধা—আদিশূর কর্তৃক আনীত পাঁচজন ব্রাহ্মণের অন্যতম। অপর চারিজনের নাম ক্ষিতীশ, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরী (আদিশূর দেখ)।

তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। তিনি ফরাসী চন্দননগর হইতে প্রকাশিত প্রজাবন্ধু নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইংরেজ সরকারের কাজের সমালোচনা করাতে তিনি কর্ম্মচ্যুত হন। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি ফরাসী আইনের অনুবাদ প্রকাশ করেন। শিশু পাঠ্য কয়েকখানি গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। এবিষয়ে তিনি অনেকের পূর্ব্বগামী ছিলেন।

তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়—বাঙ্গালী সাহিত্যিক। ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতনামা কবিগণও তাঁহার কবিত্বশক্তির প্রশংসা করিতেন। "শশিপ্রভা" নামক বাঙ্গালা নাটকখানি এককালে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি দীর্ঘকাল সংবাদপত্র সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তৎকালীন "প্রভাতী" নামক সংবাদপত্র তাঁহার সুযোগ্য সম্পাদনায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এবিষয়ে রায় সাহেব বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন। তিনকড়ি বাবু পরে কিছুকাল "বসুমতী"র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন। নববিভাকর, প্রজাবন্ধু, সুরভি ও পতাকা, হিতবাদী প্রভৃতি বিবিধ পত্রিকার সহিত তাঁহার সাহিত্যিক যোগ ছিল। কয়েক বৎসর তিনি সাপ্তাহিক বঙ্গবাসীও সম্পাদন করেন। হালিসহর পত্রিকা, নবজীবন, কমলা প্রভৃতি পত্রিকাতে তাঁহার বহু সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই ভাবে তিনি দীর্ঘকাল নানাভাবে বঙ্গ সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিরভিমান, স্বার্থলেশশূন্য এবং বঙ্গ সাহিত্যের ঐকান্তিক অনুরাগী পুরুষ ছিলেন। ১৩৪১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে (১৯৩৪ খ্রীঃ আগষ্ট) কলিকাতা নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তিবর—মৌর্য্যপতি অশোকের পুত্র।

তিনি রাণী কৌরুবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অন্য নাম তিভল বা তিতিভর।

তিম্মাপ্পা—কানেড়ী ভাষার একজন কৃষ্ণভক্ত কবি। তিনি খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি অনেকগুলি ভক্তি রসাশ্রিত সংগীত রচনা করিয়াছিলেন।

তিরমিনি খাঁ, নবাব—তিনি দিল্লীর সম্রাট গিয়াসউদ্দিন বলবনের অন্যতম প্রধান সেনাপতি ছিলেন। বাঙ্গালার নবাব মগিসউদ্দিন তোগরল বিদ্রোহী হইলে, সম্রাট প্রথমে নবাব আমীন খাঁকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু আমীন খাঁ যুদ্ধে পরাজিত হন। সম্রাট এই অপরাধে আমীন খাঁকে ফাঁসী দেন ও তৎপর তিরমিনি খাঁকে তোগরলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন কিন্তু তিনিও পরাজিত হন।

তিরুক্কালত্তি দেব—তিনি বেঙ্গির অধিপতি ও চোল রাজা তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গের (১১৭৮—১২১৬ খ্রীঃ) সামন্ত নরপতি ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার পুত্র বীরনরসিংহ দেব খুব পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন।

তিরুক্কোটিয়ার পুর্ণ—তিনি যামুনাচার্য্যের অন্যতম ভক্ত শিষ্য ছিলেন। যামুনাচার্য্যের মৃত্যুর পর তাঁহারাই কিছুদিনের জন্য মঠের কার্য্যাদি পরিচালনা করিতেন। রামানুজাচার্য্য তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন।

তিরুচ্চিরম্বল মুদালিয়ার—একজন বিশিষ্ট শৈব উপাসক। তিনি খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তিরুত্তুরৈ প্পুণ্ডি নামক স্থানে একটী শিব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। সেই তীর্থ স্থানে আগত সমস্ত যাত্রীদিগকে তিনি আহার্য্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণেতর জাতি ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণেরা তাঁহার বিরোধী ছিলেন।

তিরুজ্ঞান সম্বন্দর—একজন শৈব সন্ন্যাসী। খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে পাণ্ড্যবংশীয় জৈন নরপতি কোনসুন্দর বা লেডুমারণ পাণ্ড্য শৈব মত গ্রহণ পূর্ব্বক তিরুজ্ঞান সম্বন্দরের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। রাজা শৈব হইয়া জৈনদের উপর অতিশয় অত্যাচার করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি ৮ হাজার জৈনকে বধ করিয়াছিলেন।

তিরুপ্পান আলোয়ার—একজন ভক্ত। খ্রীষ্টিয় প্রথম শতাব্দীতে কার্ত্তিক মাসের রোহিণী নক্ষত্রে নিচুলাপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এই ভক্ত শ্রেষ্ঠ নীচ বংশ সম্ভূত ছিলেন। তিনি সুগায়ক ছিলেন। কথিত আছে একদিন তিনি শ্রীরঙ্গনাথের তীর্থ প্রদেশে হরিগুণ গান করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। এমন সময়ে একজন শ্রীরঙ্গনাথের সেবক কাবেরী নদী হইতে

বিগ্রহের স্নানার্থ জল লইয়া আসিতেছিলেন। তিনি পথে শায়িত নীচ জাতীয় লোকটীকে লোষ্ট্রাঘাতে তাড়াইয়া জল লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিলেন দ্বার বন্ধ। অনেক চেষ্টা করিয়াও দ্বার খুলিতে পারিলেন না। অবশেষে অভ্যন্তর হইতে ধ্বনি হইল—'তুমি আমাকে আঘাত করিয়াছ, আমার ভক্তকে আঘাত করিয়া আমাকে আঘাত করিয়াছ। তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিলে, মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবে।' সেবক তৎক্ষণাৎ সেই ভক্তকে আনয়নপূর্ব্বক স্কন্ধে আরোপিত করিয়া, মন্দির প্রদক্ষিণ করিবামাত্র দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। তদবধি তিনি মুনিবাহন আলোয়ার নামে খ্যাত হন।

তিরুপুল্লাণি দাসর—তিনি একজন শৈব ভক্ত। দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্যবংশীয় নরপতি দ্বিতীয় মারবর্ম্মণ সুন্দর পাণ্ড্যের রাজত্বকালে (১২৩৮—১২৫৫ তিনি কিলচেব্বল নামক স্থানের বিখ্যাত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের জন্য হয়শালবংশীয় রাণী পল্মিয়কণ ভূমি দান করিয়াছিলেন।

তিরুমঙ্গই আলোয়ার—খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি সুকবি ছিলেন এবং তীর্থ পর্য্যটন করিতে খুব ভালবাসিতেন। তীর্থ পর্য্যটনকালেই তাঁহার চারিজন শিষ্য লাভ হইয়াছিল। তাঁহাদের নাম—(১) তোরাবড়ক্কুন (অর্থাৎ তার্কিক শিরোমণি), (২) তাড়ভুয়ান (অর্থাৎ দারোদ্‌ঘাটক), (৩) নেড়েলাই মেরিপ্পান (অর্থাৎ ছায়া গ্রহ), (৪) নীলমেল নরপ্পান্ (অর্থাৎ জলের উপর ভ্রমণকারী)। তাঁহারা তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে কাবেরীর দ্বীপস্থ শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের দুরবস্থা দর্শনে তাঁহাদের মনে বড়ই দুঃখ হইল; কিন্তু কি করিবেন নিজেরা নিঃসম্বল সন্ন্যাসী। সুতরাং তাঁহারা ধনীর দ্বারস্থ হওয়াই সঙ্কল্প করিলেন। ধনীরা তাঁহাদিগকে পথের ভিখারী মনে করিয়া অতি তাচ্ছিল্যভাবে তাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। ধনীদের এই ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহারা এক দস্যুদল গঠন করিলেন এবং ধনীদের গৃহে লুণ্ঠন কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। এইভাবে কিছু অর্থ সংগ্রহ হইলে, তাঁহারা মন্দিরের সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহাদের দস্যুদল সংখ্যায় অনেক হইল। ধনী রাজা মহারাজারা ভয়ে নিজেরাই অর্থ আনিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে মন্দিরের সংস্কার কার্য্য সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাহ হইল। একদিন দস্যুদল তিরুমঙ্গাইয়ের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিল। তখন রিক্ত হস্ত

তিরুমঙ্গাই প্রিয় শিষ্য নীলমেল নরপ্পানের সাহায্যে তাহাদিগকে জলে ডুবাইয়া মারিলেন। কথিত আছে তিরুমঙ্গাই জীবনের অবশিষ্টকাল শিষ্য সমভি-ব্যাহারে সেবায় যাপন করিয়াছিলেন।

তিরুমড়িশি আলোয়ার—তিনি মহিসারপুরে (বর্ত্তমান তিরুমড়িষি) খ্রীঃ পূঃ ৪২০২ অব্দে মাঘ মাসের মঘা নক্ষত্রে ভার্গববংশে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন কবি ও অতি প্রধান ভক্ত ছিলেন।

তিরুমল নায়ক—তিনি দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত মাতুরা রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। এই রাজ্যের অধিপতিরা প্রথমে কিছুকাল বিজয়নগর রাজ্যের সামন্ত নরপতি ছিলেন। ঐ রাজ্যের একজন কর্ম্মচারীর পুত্র বিশ্বনাথ নায়ক বিখ্যাত সেনাপতি আর্য্যনায়ক মুথলির সহ-কারীতায় মাতুরা রাজ্যের পত্তন করেন। বিশ্বনাথ একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ ছিলেন। সমস্ত মাতুরা নগরী বাহাত্তরটী অংশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক অংশের এক একটী ক্ষুদ্র দুর্গ এক একজন সর্দ্দারের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। তাঁহারা সেই দুর্গ ও তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ভূমি বৃত্তি লাভ করিতেন। দুর্গ ও নগর রক্ষার্থ সৈন্যদ্বারা সাহায্য করা তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল।

বিশ্বনাথ ১৫৫৯—১৫৬৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার বংশধরেরা ১৭৪০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত অতি যোগ্যতার সহিত রাজ্য পরিচালনা করেন। তিরুমল নায়ক এই বংশের একজন শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন। তিনি ১৬২৩—১৬৫৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি প্রান্তবর্ত্তী রাজ্য জয় করিয়া স্বীয় শক্তি সংবর্দ্ধন করিয়া-ছিলেন। ত্রিনবল্লী (Tinnevelli), ত্রিবঙ্কনগর (Travancore), কোয়েম্বা-টোর (Coimbatore), সালম (Salem) ত্রিচনপল্লী (Trichinpoly), প্রভৃতি স্থান তাঁহার রাজ্যান্তর্গত হইয়াছিল। তিনি মাতুরানগরীকে বিবিধ হর্ম্ম্যরাজিতে সুশোভিত করিয়াছিলেন। তাহার কতকগুলি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাঁহার রাজস্ব সার্দ্ধেক কোটি মুদ্রা ছিল। কালক্রমে তিনি বিজয়নগর রাজ্যের আনুগত্য পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তজ্জন্য বিজয়নগরের নবাবের সহিত তাঁহার যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তিনি তাঁহার বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথের ন্যায় দূরদর্শী রাজনীতিবিদ্ ছিলেন না। মহীশূর ও অন্যান্য হিন্দু রাজন্যবর্গের মধ্যে পরস্পর বিবাদ সংঘটনে সহায়তা করিয়া স্বীয় প্রাধান্য লাভের পথ তিনি পরিষ্কার করিয়া ছিলেন, কিন্তু হিন্দু সাম্রাজ্য ধ্বংসেরও

পথ সেই সঙ্গেই উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি যদি হিন্দু রাজাদেরে সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন, তবে দাক্ষিণাত্যে মুসলমান প্রাধান্য স্থাপিত হইত কিনা সন্দেহ। তাঁহার মৃত্যুর পরেই মাদুরা রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়।

তিরুমলাই নম্বি—তিনি যামুনাচার্য্যের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। যামুনাচার্য্য রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যখন শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, তাঁহারই পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হন। তাঁহার অন্য নাম শ্রীশৈল পূর্ণ। তাঁহার দুইটি ভগিনী ছিল। প্রথমটির নাম ভূমিপেরাট্টি ভূদেবী বা কান্তিমতী। তাঁহাকে আধুরি সর্ব্বকেতু দীক্ষিত বিবাহ করেন। তাঁহারই গর্ভে প্রসিদ্ধ রামানুজাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয়টির নাম পেয়ারি পেরাট্টি বা মহাদেবী। এই মহাদেবীকে কমলনয়ন ভট্ট বিবাহ করেন। তাঁহাদেরই পুত্র গোবিন্দ বা বালগোবিন্দ।

তিলকচন্দ্র রায়—বর্দ্ধমানের রাজা চিত্রসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র। চিত্রসেন অপুত্রক গতায়ু হইলে, তিলকচন্দ্র রায় ১৭৪৪খ্রীঃ অব্দে বর্দ্ধমানের রাজা হন। ১৭৫৩ সালে তিনি দিল্লীর সম্রাট হইতে সনন্দ ও তাহার কিছু পরে মহারাজাধিরাজ উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি বীরভূমের রাজার সহিত মিলিত হইয়া, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রথমে পরাজিত করেন, কিন্তু পরে স্বয়ং পরাজিত হইয়া কোম্পানীর বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৭৬০ খ্রীঃ অব্দে তিনি কোম্পানীকে রাজস্ব প্রদান করেন। ১৭৭০ সালে তিনি পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র তেজচন্দ্র রাজা হইয়াছিলেন।

তিলকরাজ—কাশ্মীরপতি হর্ষদেবের (১০৮৯—১১০২খ্রীঃ) অন্যতম সেনাপতি হর্ষদেবের জ্ঞাতি উচ্চল সিংহাসনলাভে অগ্রসর হইলে, তিলকরাজ তাঁহার দমনার্থ প্রেরিত হন। কিন্তু তিলকরাজ হর্ষদেবের অন্যতম সেনাপতি পট্টের সহিত মিলিত হইয়া অগ্রসর হইলেন না। তিনি রাজা উচ্চল (১১০২—১১১১ খ্রীঃ) ও সুস্সলের (১১১২—১১২৮) সময়েও মন্ত্রী ছিলেন। রাজা সুস্সল কখনও এই বিশ্বস্ত মন্ত্রীর প্রতি ভাল ব্যবহার করেন নাই। এমন কি তিনি বিদ্রোহী বিজয়ের ছিন্ন মস্তক উপহার দিয়াও রাজার প্রসাদ লাভে সমর্থ হন নাই। এই ঘটনার পর হইতে তিলকরাজ বিদ্রোহোন্মুখী হইয়া রহিলেন। এবং কয়েক বৎসর পরে ভিক্ষাচরকে রাজ-সিংহাসনে স্থাপন করিয়া, সুস্সলকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিলেন। হর্ষদেব, উচ্চল ও সুস্সল দেখ।

তিলকরাম — একজন জ্যোতিষী। তিনি ১৬৭০ শকে (১৭৪৮ খ্রীঃ) তন্তুবায়

কুলজী নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। এই সকল কুলজী গ্রন্থে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

তিলক সিংহ—আলাউদ্দিন খিলিজীর আক্রমণে যশল্মীর নগর ১৩৯৫ খ্রীঃ অব্দে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। দুই বৎসর উক্ত স্থান মুসলমানদের অধিকারে ছিল। সেই সময়ের পরে পরিত্যক্ত যশল্মীর নগরে, রাঠোররাজ মলোজীর পুত্র জগমল বাস করিতে উদ্যোগী হইয়া সাতশত শকট দ্রব্য সম্ভারে পূর্ণ করিয়া তথায় উপস্থিত হন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভট্টীবীর যশিরের পুত্র দুদু ও তিলক সিংহ উভয়ে স্বীয় আত্মীয় স্বজন সংগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া সমস্ত অধিকার করেন। যশল্মীরের সর্দ্দারগণ দুদুকে রাবল পদে (রাজপদে) বরণ করেন। দুদু ও তিলক সিংহ নিকটবর্ত্তী রাজ্য আক্রমণ করিয়া, স্বীয় ক্ষমতা বর্দ্ধন করেন। দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। আবার যশল্মীর আক্রান্ত হইল। দুদু ও তিলক সিংহ সমরে নিহত হইলেন। পরে দিল্লীর সুলতানের অধীনতা স্বীকার করিয়া রতন সিংহের পুত্র গরসিংহ যশল্মীর রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন।

তিলকাচার্য্য—তিনি শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত চন্দ্র গচ্ছ শাখা ভুক্ত একজন আচার্য্য ছিলেন। তিনি চন্দ্রপ্রভা সূরীর প্রধান শিষ্য ছিলেন। গুরুর মৃত্যুর পরে তিনিই স্বীয় সম্প্রদায়ের গদিতে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে ১২০৪ খ্রীঃ অব্দে 'প্রত্যেক বুদ্ধ চরিত্র' ও ১২৩৯ খ্রীঃ অব্দে 'আবশ্যক লঘু বৃত্তি' রচিত হয়। তিনি ১১৮০ হইতে ১২৪০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

তিলিপ—একজন সিদ্ধাচার্য্য। তাঁহার রচিত বৌদ্ধ গান ও দোঁহা পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ তিনি খ্রীঃ নবম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

তিষ্য—(১) মৌর্য্যবংশীয় রাজা বিন্দুসারের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনিও অশোকের মত বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং পরে সন্ন্যাসী হন। অশোকের রাজত্বের অষ্টম বর্ষে তিষ্য ও সুমিত্র ভিক্ষুদ্বয় নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের অন্ত্যেষ্টী ক্রিয়া অতিশয় সমারোহে সম্পন্ন হয়।

তিষ্য—(২) সিংহলের রাজা তিষ্য, অশোকের পুত্র মহেন্দ্র কর্ত্তৃক বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁহারই ঐকান্তিক আগ্রহে অশোকের কন্যা সঙ্ঘমিত্রা সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন।

তিষ্যদেব—আসাম প্রদেশের একজন রাজা। তিনি পালবংশীয় বঙ্গদেশের রাজা কুমারপাল দেবের সামন্ত নরপতি ছিলেন। কিন্তু তিনি কুমারপাল

দেবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে, কুমারপাল তাঁহার দমনার্থ স্বীয় ব্রাহ্মণ সেনাপতি বৈদ্যদেবকে প্রেরণ করেন। বৈদ্যদেব তিষ্যদেবকে পরাজিত ও নিহত করিয়া (আনুঃ) ১১৩৩ খ্রীঃ অব্দে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধীশ্বর হন। কোনও কোনও গ্রন্থকার তাঁহার নাম তিঙ্গ্যদেব লিখিয়াছেন। গৌহাটীর নিকটবর্ত্তী কামরূপ নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল।

তিষ্যরক্ষিতা—মৌর্য্য সম্রাট অশোকের অন্যতমা মহিষী। তিনি ষড়যন্ত্র করিয়া সপত্নী পুত্র কুণালের চক্ষু নষ্ট করিয়াছিলেন। এই জন্য অশোক তাঁহাকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া বধ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

তিস্‌স—মোগ্‌গলি পুত্ত তিস্‌স (মৌদ্‌গলপুত্র তিষ্য) মৌর্য্য নৃপতি অশোকের ধর্ম্মগুরু ছিলেন। অশোকের রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে (২৫৮ খ্রীঃ পূঃ অব্দে) পাটলীপুত্র নগরে অশোকের আহ্বানে তৃতীয় বৌদ্ধ ধর্ম্ম সঙ্গীতি হয়। এই ধর্ম্ম সঙ্গীতিতে মোগ্‌গলিপুত্ততিস্‌স সভাপতি হইয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠান নয় মাস কাল স্থায়ী হইয়াছিল এবং সম্মিলনীতেই স্থির হয় যে, দেশ বিদেশে বৌদ্ধ প্রচারক প্রেরণ কর্ত্তব্য। তদনুসারে বিভিন্ন দেশে বহু বৌদ্ধ প্রচারক গমন করিয়াছিলেন। অভিধর্ম্ম পিটকের অন্তর্গত কথাবত্থু (কথাবস্তু) গ্রন্থ তাঁহার রচিত। ঐ পুস্তকে তিনি বহু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতবাদ খণ্ডণ করিয়া মূল স্থবিরবাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। অশোক দ্রষ্টব্য।

তীর্থপতি—তিনি একজন বরুণোপাসক ছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিয়া, স্বীয় মতে আনয়ন করিয়াছিলেন।

তীর্থস্বামী—তাঁহার রচিত 'কণিকা সংগ্রহ' নামক দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় একখানা পুস্তক আছে।

তুকাবাঈ—তিনি শাহজীর অন্যতমা পত্নী। তিনি মোহিতবংশীয়া ছিলেন। বংশমর্য্যাদায় জিজিবাঈয়ের সমকক্ষা ছিলেন না। ১৬৩০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার বিবাহ হয়।

তুকারাম—খ্যাতনামা মহারাষ্ট্রীয় সাধু ও ভক্ত। ১৫১০ শকে (১৫৮৮ খ্রীঃ) বোম্বাই প্রদেশে পুণানগরীর অদূরে দেহু নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বহ্লোবা ও মাতার নাম কনকাবাঈ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম সাওজী এবং কনিষ্ঠের নাম কান্হাইয়া। ইহা ছাড়া তাঁহার একটি কনিষ্ঠা ভগিনীও ছিল। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর নাম রুক্মাবাঈ ও দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম অবলাবাঈ। প্রথমা রখুমাঈ ও দ্বিতীয়া জিজিবাঈ বা জিজাঈ নামে অভিহিতা হইতেন। বহ্লোবা বৃদ্ধ বয়সে জ্যেষ্ঠ সাওজীর হস্তে সংসারের সমস্ত ভার অর্পণ করিতে চাহিলেন;

কিন্তু সাওজী তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন। সুতরাং তুকারাম বাধ্য হইয়া ১৩ বৎসর বয়সেই সংসারের ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। সাওজীর সংসারে বিশেষ আসক্তি ছিল না। এই বৈষ্ণব পরিবার পণ্ঢরপুরের বিঠোবাদেবের (বিষ্ণুর অবতার) ভক্ত ছিলেন। তুকারামের প্রথম অবস্থায় সংসার খুব ভালই চলিয়াছিল। তাঁহারা জাতিতে শূদ্র হইলেও ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন। তুকারাম মাতাপিতার আদরে প্রতিপালিত হইয়া, দুঃখ কাহাকে বলে জানিতেন না। তাঁহার সপ্তদশ বর্ষ বয়ক্রমকালে মাতা পিতা পরলোক গমন করেন। এই শোকভার দূরীভূত হইতে না হইতে এক বৎসর পরে, তাঁহার বড় ভাই সাওঙ্গীর স্ত্রী পরলোক গমন করেন এবং সাওজীও গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। এই সব ঘটনায় তাহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল, ফলে ব্যবসায় ও বাণিজ্যের প্রতি অনুরাগ শিথিল হইতে লাগিল এবং অন্তদিকে বিঠোবার প্রতি অনুরাগ তাঁহার আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তৎফলে ব্যবসায়ে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, ক্রমে ক্রমে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী জিজিবাঈ ধনীর কন্যা ছিলেন। তিনি কর্কশ ভাষিণী ও মুখরা হইলেও স্বামীর প্রতি অনুরাগ বিহীনা ছিলেন না। স্বামীর এই বিপদে তিনি সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন এবং পিত্রালয় হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া, স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন। এই সময়ে দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। বিপদের উপর বিপদ। একদিকে ব্যবসায় ক্ষতি অন্যদিকে এই সময়েই তাঁহার প্রথমা স্ত্রী রুক্মাবাঈ পরলোক গমন করেন। এই সমস্ত ঘটনায় তাঁহার মন সংসার হইতে আরও দূরে চলিয়া গেল, কিছুতেই সংসারে আর আবদ্ধ হইল না। তিনি গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভাম্বনাথ পর্ব্বতে গমন করিলেন। আত্মীয়গণ তাঁহাকে না পাইয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর, তাঁহাকে দেহোর নিকটবর্ত্তী ভাম্বনাথ পর্ব্বতে পাওয়া গেল এবং জিজিবাঈ ও তাঁহার ভ্রাতা কান্হাইয়া অতি কষ্টে তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিলেন। কিন্তু সংসার হইতে যাঁহার মন উঠিয়াছে তাঁহাকে পুনরায় সংসারে ফিরাইয়া আনা সহজ নহে। তুকারাম কনিষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে সংসার ছাড়িয়া একেবারে সংসার ত্যাগী হইলেন। এই সময়ে এক কৃষক তাঁহাকে ক্ষেত্র হইতে পাখী তাড়াইবার কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তিনি ক্ষেত্র হইতে পাখী না তাড়াইয়া, নিশ্চিত মনে পাখীদিগকে শস্য খাইতে দিতেন। ক্ষেত্র স্বামী এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের নিকট তাঁহার শস্য নষ্ট হইয়াছে বলিয়া

ক্ষতিপূরণ দাবী করিলেন । কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল, যে পরিমাণ শস্য ক্ষেত্রস্বামী পাইতে আশা করিয়াছিলেন, ক্ষেত্রে তদপেক্ষা অনেক বেশী শস্য আছে। সুতরাং গ্রাম্য পঞ্চায়েতগণ অতিরিক্ত শস্য তুকারামকে দিতে বাধ্য করিলেন। তুকারাম এই অতিরিক্ত শস্য বিক্রয়লব্ধ অর্থে বিঠোবার মন্দিরের সংস্কার করিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই কিছু কিছু সদ্‌গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এখন হইতে পাঠ ও অভঙ্গ (কবিতা) রচনায় মন দিলেন। পূর্ব্বগামী নামদেব প্রভৃতি ভক্তগণের অভঙ্গ পাঠ করিয়া তাঁহার মন তদনুরূপ অভঙ্গ রচনায় উৎসুক হইল। তাঁহার সরল, সরস উদার অভঙ্গে সকলের মন আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ইহাতে একদল লোক বিশেষতঃ ব্রাহ্মণবংশীয় সংস্কার বিরোধী দল, তাঁহার উপর অতিশয় রুষ্ট হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, তুকারামের ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া, কোন কোন ব্রাহ্মণ যুবক তাঁহাকে প্রণাম করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এই ব্যাপার ব্রাহ্মণদের পক্ষে অসহনীয় হইল। মম্বাজীবাবা গোসাই নামক একজন সাধু একদিন সামান্য কারণে অথবা বিনা কারণে তুকারামকে কন্টক দ্বারা বিষম প্রহার করিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা গোসাইজীর ব্যবহারে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার শাপ ভয়ে কেহই অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। এদিকে অসাধারণ সহিষ্ণু তুকারাম এই নিদারুণ আঘাতেও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তুকারাম মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক বিঠোবার চরণে প্রণত হইয়া বলিলেন—

ছাড়িব না ছাড়িব না, ছাড়িব না
হে বিঠোবা তোমারই চরণ।
যতই যন্ত্রণা আসে, আসুক
কি করিবে সে, না হয় হইবে মরণ।
অস্ত্রধারী আসি কেহ, খণ্ড যদি
করে দেহ, তবু নাহি ডরি।
তুকা বলে সাবধান, হয়ে আছি
আগুয়ান, চিতে মোর শমগুণ ধরি।
(সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ)।

প্রকৃত ঈশ্বর ভক্তের কি আশ্চর্য্য প্রকৃতি। কঠোর আত্মসংযম দ্বারা যে চরিত্র গঠিত, এবার তাঁহার পরীক্ষা হইল। এদিকে সন্ধ্যায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। মম্বাজী প্রতিদিন বিঠোবা মন্দিরে কীর্ত্তন শুনিতে আসিতেন। সেইদিন লজ্জায় আর আসিলেন না, তুকারাম স্বয়ং যাইয়া বিনয়ের সহিত তাঁহাকে কীর্ত্তনে যোগ দিতে লইয়া আসিলেন। তুকারামের ব্যবহারে তিনি লজ্জিত হইয়া তাহার পরম ভক্ত হইলেন

রামেশ্বর ভট্ট নামক এক ব্রাহ্মণও প্রথমে তুকারামের প্রতি অত্যাচার করিয়া, পরে তাঁহার পরম ভক্ত, ভক্ত

শুধু নয় শিষ্য হইয়াছিলেন। এইরূপে নানাস্থান হইতে বহু লোক আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

একবার মহারাষ্ট্রপতি ছত্রপতি শিবাজী তাঁহার সাধুতার কথা শুনিয়া তাঁহার দর্শনের অভিলাষী হন। শিবাজী তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য সম্মান-সূচক ছত্র, যানাদি ও উপহার দ্রব্যাদি সহ একজন কর্ম্মচারী প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তুকারাম অতি বিনয়ের সহিত এই সমস্ত প্রত্যাখ্যান করিয়া যাইতে অস্বীকার করিলেন। শিবাজী ইহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন না, বরং তুকারাম যে কয়টি কবিতা প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে উপদেশ প্রদান এবং যাইতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া তুকারামের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। একদিন তিনি অতি সামান্য বেশে তুকারামকে দর্শন করিতে গমন করিলেন। যাহা একদিন কল্পনা চক্ষে দেখিয়াছিলেন, এখন সম্মুখে উপস্থিত প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন। কথিত আছে শিবাজী কয়েকদিন তাঁহার সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, অবশেষে সন্ন্যাসী হইবার উপক্রম করিয়াছিলেন। শিবাজীর মাতা জিজিবাঈ অতিমাত্র ভীত হইয়া তুকারামের চরণ প্রান্তে পতিত হইয়া শিবাজীকে ভিক্ষা চাহিলেন। তুকারাম সদুপদেশ দ্বারা শিবাজীকে রাজধর্ম্মে অনুরাগী করিয়া, জিজিবাঈয়ের কামনা পূর্ণ করিলেন।

তুকারাম এইরূপে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বহু শিষ্য সংগ্রহপূর্ব্বক দেশ মধ্যে এক ধর্ম্মোন্মাদনা জাগরিত করেন। তিনি বহু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ১৫৭১ শকের ফাল্গুন মাসে (১৬৪৯ খ্রীঃ অব্দ) কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে তিনি মহাপ্রস্থান করেন।

তুকাজীরাও হোলকার—ইন্দোরের মারাঠা-বংশীয় নৃপতি। ১৮৪৩ খ্রীঃ অব্দে খণ্ডেরাও পরলোক গমন করিলে ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দের জুন মাসে তিনি রাজগদী প্রাপ্ত হন। খণ্ডেরাও নিঃসন্তান ছিলেন। তুকাজী তাঁহার রাজবংশীয় নিকটতম আত্মীয় ছিলেন। তুকাজী তাঁহার অভিষেকান্তে লব্ধনাম। তাঁহার নাবালক অবস্থায় ইন্দোর রাজ্য একটি শাসন পরিষদ (Council of Regency) কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত। তুকাজী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া শাসন ভার গ্রহণপূর্ব্বক নানা ভাবে রাজ্য শাসনে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তিনি ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন। শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য তিনি দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত কতকগুলি প্রদেশের পরিবর্ত্তে, ইন্দোরের পার্শ্ববর্ত্তী

কয়েকটি স্থান ইংরেজদের নিকট হইতে গ্রহণ করেন। বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি আকরাপঞ্চ নামে একটি বাণিজ্য সমিতি গঠন করেন। ইংরেজ অধিকৃত স্থান সমূহের বণিক সঙ্ঘের (Chamber of Commerce) ন্যায় উহা বণিকদিগের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া রাজা ও ব্যবসায়ী-দিগের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিত। রাজ্য মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, বিচার ও শাসন কার্য্যের উন্নতি, কৃষিবিভাগের উন্নতি প্রভৃতি নানা জনহিতকর কার্য্যে তিনি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিয়া ইন্দোর রাজ্যের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। রাজস্ববিভাগকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া তিনি বহু পুরাতন ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হন। স্বয়ং মারাঠী, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষায় সুদক্ষ ছিলেন এবং জ্ঞান চর্চ্চার বিশেষ উৎসাহ দাতা ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বিবিধ সদ্‌গুণালঙ্কৃত নৃপতি ভারতের রাজন্যবর্গের মধ্যে অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র শিবাজীরাও পিতৃসিংহাসন লাভ করেন।

তুক্ক—বল্লাপুরের অধিপতি তুক্ক রাজ, কাশ্মীরপতি অনন্তদেবের (১০২৯—১০৮১ খ্রীঃ) একজন সামন্ত নরপতি ছিলেন। তুক্কার পুত্র কলসরাজও অতি-শয় প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন। মহারাজ অনন্তদেব তাঁহাকে দমন করিতে যাইয়া অতিশয় বিপন্ন হন। মন্ত্রী হলধরের বুদ্ধি কৌশলে রাজা বল্লাপুর হইতে সে যাত্রা মুক্তি লাভ করেন।

তুজজী—একজন সিদ্ধাচার্য্য। জ্যোতি-রীশ্বর প্রণীত 'বর্ণরত্নাকর' গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ আছে।

ন—কাশ্মীরপতি প্রতাপাদিত্যের পৌত্র ও জলৌকার পুত্র। তাঁহার রাজত্বকালে একবার তুষার পাতে সমু-দয় শস্য নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। নৃপতি তুঞ্জীন রাজকোষের সমুদয় ধন ব্যয় করিয়াও দুর্ভিক্ষ দমন করিতে অসমর্থ হইয়া মনোদুঃখে নিজ জীবন বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হন। তাঁহার মহিষী বাক্‌পুষ্টা প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে বিরত করেন। কথিত হয় যে, রাণীর অসাধারণ বিশ্বাসের ফলে পরদিন মৃত কপোত সকল আকাশ হইতে প্রজা সকলের গৃহদ্বারে পড়িতে থাকে এবং প্রজারা সেই কপোত মাংস আহার করিয়া জীবন রক্ষা করে। তুঞ্জীন প্রায় ছয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া, নিঃসন্তান পর-লোক গমন করেন। তাঁহার মহিষী তাঁহার সহিত সহমৃতা হন।

জ—তিনি একজন জ্যোতি-র্ব্বিদ পণ্ডিত। 'ইনকুল তেজোনিধি' নামক একখানা জাতক গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছেন। 'বাক্যামৃত' নামক গণিত গ্রন্থও তাঁহার রচিত।

তুলজী—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র-

কার। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—ধন্বন্তরিসারনিধি।

তুলসী দাস গোস্বামী—খ্যাতনামা হিন্দি কবি। আগ্রা ও অযোধ্যা প্রদেশে বাঁদা জিলার রাজাপুর গ্রামে বঙ্গাব্দের দশম শতকের মধ্যভাগে তাঁহার জন্ম হয় (আনুঃ ৯৩১ বঙ্গাব্দ, ১৫২৪ খ্রীঃ অব্দ)। তাঁহার পিতার নাম আত্মারাম দ্বিবেদী। তাঁহারা উক্ত প্রদেশীয় সরযূপারী শ্রেণীর পরাশর গোত্রজ ব্রাহ্মণ ছিলেন। মতান্তরে তাঁহারা কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তুলসীদাস মূলা নক্ষত্রের প্রথম চরণে জন্ম লাভ করেন। ঐ সময়ে জাত সন্তান পিতার অমঙ্গলকারী ও অশুভ জনক হয় বলিয়া, দেশের সংস্কার। তজ্জন্য ঐ সময়ে জাত পুত্রকে অনেক পিতামাতা পরিত্যাগ করেন অথবা আট বৎসর পর্য্যন্ত উহার মুখ দর্শনে বিরত থাকেন। কথিত হয় যে তুলসীদাসও ঐ কারণে জনকজননী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায়, এক সাধুর কৃপায় প্রাণে রক্ষা পান এবং সাধুর আশ্রমেই প্রতিপালিত হন। তাঁহার প্রকৃত নাম রামবোলা। তুলসীদাস তাঁহার গুরুদত্ত নাম। সুবার ক্ষেত্রে নরসিংহ দাস সাধুর নিকট তিনি দীক্ষা লাভ করেন। দীনবন্ধু পাঠকের কন্যা রত্নাবলী তাঁহার পত্নী ছিলেন।

তুলসীদাস প্রথম জীবনে অতিশয় স্ত্রৈণ ছিলেন। একবার রত্নাবলী পিত্রালয়ে গমন করিলে তুলসীদাস পত্নীর অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া নিজ শ্বশুরালয়ে যাইয়া উপস্থিত হন। রত্নাবলী তাঁহার ঐরূপ মনোভাবের জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলেন যে, পত্নীর সঙ্গলাভের জন্য তুলসীদাস যেরূপ ব্যাকুল, ভগবানকে পাইবার জন্য যদি তাহার সামান্য অংশ ব্যাকুলতা থাকিত, তবে তিনি অশেষ উপকৃত হইতেন। পত্নীর ঐ তিরস্কারে তুলসীদাসের মনে অতিশয় গ্লানি উপস্থিত হয় এবং তিনি আর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করিয়া, তাপস বেশে দেশে দেশে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দীর্ঘকাল পরে তিনি আবার নিজ গ্রামেই আসিয়া নিজের অজ্ঞাতে নিজেরই গৃহে অতিথি হন। রত্নাবলী তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া নিজ পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গিনী হইতে বাসনা প্রকাশ করেন। কিন্তু তুলসীদাস তাহাতে সম্মত না হইয়া পুনরায় পরিব্রাজকরূপে দেশে দেশে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে তিনি অযোধ্যাতে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ঐখানেই তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ রামায়ণ রচনা আরম্ভ করেন। কিছুকাল তথায় থাকিবার পর স্থানীয় বৈরাগীদের সহিত বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় তিনি কাশীতে গমন করেন। ঐ স্থানেই তাঁহার

রামচরিত মানস গ্রন্থ রচনা শেষ হয়। তুলসীদাসের রামায়ণের প্রকৃত নাম "রামচরিত মানস"। উহা অতি মধুর এবং ভক্তি রসাত্মক গ্রন্থ। পশ্চিম অঞ্চলের সাধুভক্তেরা ভাগবতের ন্যায় এই রামায়ণের আদর করিয়া থাকেন। ভারতের যে যে স্থানে হিন্দি প্রচলিত সর্ব্বত্রই তুলসীদাসের রামায়ণ যত্ন পূর্ব্বক পঠিত হইয়া থাকে। ঐরূপ ধর্ম্মভাব সমন্বিত পুস্তক ভারতের অন্য কোনও ভাষায় অধিক নাই। সেই সময়ে প্রধানতঃ ব্রজ ভাষাতেই গ্রন্থাদি রচনা করার পদ্ধতি থাকিলেও তুলসীদাস ঠিক সেই ভাষায় রামচরিত মানস রচনা করেন নাই। সরল ভাষায় সব ব্যক্ত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া, তিনি নিজ সুবিধানুযায়ী ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন। রামায়ণ ব্যতীত নিম্ন লিখিত গ্রন্থগুলিও তুলসীদাসের রচনা, গীতাবলী ; দোঁহাবলী ; বিনয় পত্রিকা ; কৃষ্ণাবলী ; বৈরাগ্য সন্দীপনী ; শঙ্কট মোচন পার্ব্বতীমঙ্গলী ; রামসতসই ; রামতলা ; রাম নহছু ; বরবা রামায়ণ ; জানকীমঙ্গল ; রামশকুনাবলী ; চোপাই রামায়ণ ; হনুমানবাহুক ; রামশলাকা ; কুন্তলী রামায়ণ ; কড়কা রামায়ণ ; বোলা রামায়ণ ; ঝুলন রামায়ণ।

মীরাবাঈ তুলসীদাসের সমসাময়িক ছিলেন। একবার মীরাবাই এর অনুরোধে তুলসীদাস, তাঁহাকে কয়েকটি ছত্রে, কি প্রকারে মনের শান্তি পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। সুপ্রসিদ্ধ হিন্দি কবি আবদুর রহিম খাঁ'র সহিত তুলসীদাসের বিশেষ প্রণয় ছিল। তাঁহার ভক্তি ও নিষ্ঠার জন্য সমসাময়িক অনেক দেশীয় নৃপতি তাঁহার অনুরাগী হইয়াছিলেন।

তুলসীদাসের জীবন কথা কালক্রমে অনেক অতি প্রাকৃত অলৌকিক ঘটনার সহিত জড়িত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তুলসী চরিত্রের আসল মাধুর্য্যটুকু নষ্ট হয় নাই। অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাস না করিলেও, সে সকল কাহিনী যে তুলসীর দৃঢ় ভক্তি, নিষ্ঠা ও অন্তর বাহিরে ভগবদ্দর্শনের পরিচায়ক তাহার সন্দেহ নাই।

তুলসীদাসের স্বরচিত গ্রন্থে তাঁহার কোনও পরিচয় নাই। গোঁসাই চরিত্র ও নাভাজী রচিত ভক্তমাল গ্রন্থে কিছু কিছু বিবরণ আছে। প্রথমোক্ত গ্রন্থের বিবরণ তাদৃশ বিশ্বাস্য নহে। নাভাজী তুলসীদাসের সমসাময়িক ছিলেন এবং বৃন্দাবনে উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এজন্য তাঁহার বিবরণ অপেক্ষাকৃত বিশ্বাসযোগ্য। তুলসীদাসের মৃত্যুর প্রায় সত্তর বৎসর পরে প্রিয়দাস রচিত ভক্তমালের টীকায় তাঁহার জীবনাখ্যান পাওয়া যায়। প্রায় আশী বৎসর বয়সে কাশীধামে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তুলসী বাই—মহারাজা যশোবন্তরাও

হোলকারের অন্যতমা মহিষী। ১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে যশোবন্তরাও উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইলে রাণী তুলসীবাই রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। ১৮১১ সালে যশোবন্ত রাও পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র তৃতীয় মলহর রাও রাজা হন। এবং রাণী তুলসীবাই রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন। কিন্তু রাণীর সপত্নীপুত্র মলহর রাওয়ের চক্রান্তে ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি নিহত হন।

তুলসীরাম—একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা চিকিৎসক। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—যোগ সংগ্রহ।

তুলাজী আংগ্রিয়া—একজন মারাঠা জলদস্যু। খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি ও তাঁহার কয়েক ভ্রাতা ভারতের পশ্চিম উপকূলে কয়েকটি দুর্গ অধিকার করিয়া, জলদস্যুর কার্য্যে রত ছিলেন। তাঁহার পিতামহ কাহ্নজী আংগ্রিয়া প্রথম জীবনে পেশোয়াদের অধীনে একজন নৌ-সেনাপতি ছিলেন। তিনি ১৭১৩ খ্রীঃ অব্দে পেশোয়াদের প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া স্বাধীনভাবে চলিতে আরম্ভ করেন। বর্ত্তমান বোম্বাই নগরীর অতি সন্নিকটস্থ কোলাবা দ্বীপস্থিত দুর্গ তাঁহার প্রধান আবাস স্থান ছিল। পশ্চিম উপকূলভাগের বহু দুর্গ স্বাধীকারে রাখিয়া বহু বৎসর পর্য্যন্ত তিনি বাণিজ্য পোত লুণ্ঠনাদিদ্বারা ইয়োরোপীয় বণিকদিগের বিশেষ ক্ষতি সাধন করেন। ইংরেজ ও পর্ত্তুগীজ বণিক সঙ্ঘ সমূহ তাঁহাকে দমন করিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হন। ১৭৩১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র শম্ভুজী আংগ্রিয়া তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বের ন্যায় উপদ্রব করিয়াছিলেন। ১৭৪৮ খ্রীঃ অব্দে শম্ভুজীর মৃত্যুর পর তৎপুত্র তুলাজী পিতৃস্থান অধিকার করেন। তিনিও পূর্ব্বপুরুষদের কৃতীত্ব বজায় রাখিয়া দস্যুবৃত্তিদ্বারা জলপথে বাণিজ্যের সমূহ ব্যাঘাত করিতে থাকেন। তাঁহার উপদ্রবে অতিষ্ঠ হইয়া পেশোয়া ও ইংরাজেরা একত্রে তাঁহাকে দমন করিতে বদ্ধপরিকর হন এবং ১৭৫৫ খ্রীঃ অব্দে উভয়ের এক মিলিত শক্তি তুলাজীর বিরুদ্ধে অভিযান করেন। প্রথমে মারাঠা সেনাপতি খাণ্ডুজী মানকর তুলাজীর অনেকগুলি দুর্গ অধিকার করেন। তৎপরে ইংরেজ নৌ-সেনাপতি ওয়াটসন (Admiral Watson) জলপথে এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেনাপতি ক্লাইব স্থলপথে তুলাজীর ঘেরিয়াস্থিত প্রসিদ্ধ দুর্গ আক্রমণ করিয়া উহা অধিকার করেন (১৭৫৬ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী)। তুলাজী সপরিবারে মারাঠাদের একটি দুর্গে বন্দী হইলেন। কয়েক বৎসর বন্দীদশায় থাকিয়া শোলাপুর দুর্গে তাঁহার বিচিত্র কর্ম্মময় জীবনের অবসান হয়।

তুলারাম—তিনি কিছুদিন উত্তর কাছাড় প্রদেশের রাজা ছিলেন। তাঁহার পিতা কাঁচাদিন তদানীন্তন কাছাড় জিলার অধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণের সেবক ছিলেন। কাঁচাদিন পার্ব্বত্য প্রদেশের শাসন ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বীয় প্রভু কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পরে (১৮১৩ খ্রীঃ) কাঁচাদিন স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন। অপুত্রক কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পরে, তাঁহার ভ্রাতা রাজা গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন। তিনি নানা কৌশলে কাঁচাদিনকে সমতল ক্ষেত্রে আনয়নপূর্ব্বক হত্যা করেন। ইহার ফলে তুলারাম, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার মানসে নরপতি গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণের ভয়ানক শত্রু হইলেন। তিনি পার্ব্বত্য জাতিদের সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলেন। পঞ্চদশ বৎসর কলহের পরে ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দে, গোবিন্দচন্দ্র তুলারামকে ২২২৪ বর্গ মাইল পরিমিত স্থানের ভূম্যধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার এক বৎসর পরেই গোবিন্দচন্দ্র দস্যু হস্তে নিহত হইলেন। অপুত্রক গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অধিকার করিলেন। তুলারামের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র নকুলরাম ও ব্রজনাথ ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। নকুলরাম এই সময়ে নিশোমা নাগাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যাইয়া নিহত হন। এই অপরাধে ইংরেজ সরকার তুলারামের বংশধরদিগকে কিঞ্চিৎ বৃত্তি ও নিস্কর ভূমি প্রদানপূর্ব্বক রাজ্যটী গ্রহণ করেন।

তেগবাহাদুর, গুরু—শিখ সম্প্রদায়ের নবম গুরু। তাঁহার পিতা হরগোবিন্দ ষষ্ঠ গুরু ছিলেন। তেগবাহাদুরের মাতার নাম নানকী। হরগোবিন্দের জীবিতকালেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মারা যান। হরগোবিন্দ মৃত্যু কালে উক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রের একমাত্র তনয় হর রায়কে গুরু মনোনীত করেন। গুরু হররায়ের মৃত্যুর পর, কনিষ্ঠ পুত্র হরকিষণ গুরু হন। ইহাতে তাঁহার অগ্রজ রামরায় বিশেষ দুঃখিত হন। হরকিষণ মৃত্যু-কালে বলিয়া যান, পরবর্ত্তী গুরু বিপাসার তীরে গোবিন্দওয়ালের নিকটে বাকালা গ্রামে বাস করিতেছেন। ঐ সময়ে তেগবাহাদুর তথায় বাস করিতেছিলেন। শিখগণ সন্ধান লইয়া, তাঁহাকেই গুরু নির্ব্বাচন করিলেন। রাম রায় ইহাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া, তেগবাহাদুরের অনিষ্টসাধন করিতে চেষ্টা করেন। রামরায়ের প্ররোচনায় আরও অনেক লোক তেগবাহাদুরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে থাকায়, তিনি নিরাপত্তার জন্য কর্ত্তারপুর নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া, তথায় বাস করিতে থাকেন। ইহাতে রাম রায়, সম্রাট

আওরঙ্গজীবকে সংবাদ দেন যে, তেগ-বাহাদুর সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। সম্রাট সন্দেহ করিয়া, তেগবাহাদুরকে রাজধানীতে ডাকিয়া পাঠান। জয়পুরের মহারাজা তেগবাহাদুরের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার মধ্যবর্ত্তীতায় সম্রাট সেই বারে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিশ্বাস না করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন।

ইহার পর কিছুকাল তেগবাহাদুর পাটনায় অবস্থান করেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি, আসামেও গমন করিয়াছিলেন। এই আসাম গমন ব্যাপারেও দুই মত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন মুঘল সেনা-সেনাপতির অধীনে তিনি আসামের বিরুদ্ধে প্রেরিত অভিযানে যোগ দান করিয়াছিলেন। কাহারও মতে তিনি ধর্ম্ম প্রচার ও দেশ পর্য্যটন উপলক্ষে আসামে গমন করেন। যাহা হউক, তিনি আসাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বায় কিছুকাল পাটনাতে অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি প্রধানতঃ জ্ঞানচর্চ্চাতেই নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি শিখদিগের জন্য তথায় একটি বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র গোবিন্দ, যিনি পরে গুরুগোবিন্দ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন, তিনি পাটনাতেই জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর কিছুকাল পরে তিনি পাঞ্জাবে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দীর্ঘ-কাল পরে স্বদেশে উপস্থিত হইয়াও তিনি বিরুদ্ধবাদীদের চক্রান্ত ও অত্যাচারের হাত হইতে মুক্তি পাইলেন না। অবস্থার প্রভাবে, শান্তিপ্রিয়, জ্ঞানপিপাসু গুরু তেগবাহাদুর কতকটা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। তাঁহার এই অধর্ম্মোচিত কার্য্য প্রণালী গ্রহণ করিবার, যথার্থ কারণ অবগত হওয়া যায় না। এই সময়ে অনেক দুষ্ট প্রকৃতি লোক আসিয়া তাঁহার দলভুক্ত হইল। আদম হাফিজ নামে একজন মুসলমানও তাঁহার সহিত যোগ দিলেন এবং তাঁহারা উভয়ে লুণ্ঠনাদির দ্বারা অর্থ সংগ্রহ ও সামরিক শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই সংবাদ সম্রাট আওরঙ্গজীবের নিকট পঁহুছিলে তিনি উভয়কে দমন করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তেগবাহাদুর যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইয়া, রাজধানীতে নীত হইলে, সম্রাট তাঁহাকে বলিলেন, হয় তিনি কোনও অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন দ্বারা স্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করুন, অথবা ইসলাম গ্রহণ করুন। তেগবাহাদুর উভয়েতেই অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, ধর্ম্ম অন্তরের জিনিষ, ভেল্কী দেখাইবার বিষয় নহে। কিন্তু সম্রাট তাহাতেও নিরস্ত না হওয়ায়, তিনি এক টুকরা কাগজে কয়েকটি কথা লিখিয়া গলদেশে বন্ধন করিলেন এবং বলিলেন যে স্থানে ঐ কাগজ বন্ধন করা রহিয়াছে

সেস্থানে ঘাতকের খড়্গ স্পর্শ করিবে না। অতঃপর ঘাতকের খড়্গাঘাতে তাঁহার মস্তক দেহচ্যুত হইলে সেই কাগজ খুলিয়া দেখা গেল, তাহাতে লেখা রহিয়াছে "শির দিয়া সার নাহি দিয়া", অর্থাৎ প্রাণ দিলাম কিন্তু ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বিসর্জ্জন দিলাম না। (গুরু গোবিন্দ দ্রষ্টব্য)।

তেজচন্দ্র রায়—তিনি বর্দ্ধমানের মহারাধিরাজ তিলকচন্দ্রের পুত্র। তিনি ১৭৭০—১৮৩২ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহারই সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। তাঁহার পুত্র প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যু হইলে, মহাতাপচাঁদ পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হন।

তেজবরাঙ্গ—তিনি উড়িষ্যার বরাহ-বংশীয় নরপতি উদিত রায়ের পুত্র। তাঁহার পুত্র উদয় বরাহ।

তেজব্রহ্ম শৈবাচার্য্য—তিনি একজন শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য। ১৪১১ খ্রীঃ অব্দে তিনি হোমবিধি নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। নেপাল মহারাজের পুস্তকাগারে উক্ত গ্রন্থখানা রক্ষিত আছে।

তেজসিংহ—(১) তিনি খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে একখানা 'তাজিক' গ্রন্থ রচনা করেন 'দৈবজ্ঞালঙ্কৃতি' গ্রন্থও তাঁহার রচিত।

তেজসিংহ—(২) চিতোরের রাণা বারসিংহের পুত্র। তিনি চৌহান রাজ বিশাল দেবের সঙ্গে মিলিত হইয়া দেশ শত্রু আততায়ীদের বিরুদ্ধে সমরাঙ্গনে অবতরণ করিয়াছিলেন। বীরসিংহ ও বিশালদেব দ্রষ্টব্য।

তেলাঙ্গা সাহা ফকির—'মোনাই' যাত্রার প্রণেতা। তাঁহার নিবাস রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত পালিচড়া গ্রামে। তিনি একজন ভক্ত কবি ও সমদর্শী ছিলেন। সাধারণতঃ তিনি তেলাঙ্গ গীতাল নামে পরিচিত।

তেলিপ বা তৈলিক পাদ—একজন সহজিয়াচার্য্য। তিব্বতীয় টেঞ্জুর গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ আছে।

তৈমুর, আমীর—সাধারণতঃ তিনি তৈমুরলঙ্গ নামেই পরিচিত। তাঁহার একখানা পা ছোট ছিল বলিয়া, তাঁহার এই নাম (লঙ্গ-খোঁড়া) হইয়াছিল। মধ্য এসিয়ার প্রাচীন সগদনিয়া রাজ্যের অন্তর্গত কুশনগরে ১৩৩৬ খ্রীঃ অব্দের ৯ই এপ্রিল মঙ্গলবার (হিঃ ৭৩৬, ২৭শে শাবান) তাঁহার জন্ম হয়। তিনি প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী জঙ্গিশ খাঁর বংশধর। তাঁহার পিতার নাম আমীর তুরা খাই এবং মাতার নাম তকিনা খাতুন। তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ কতকগুলি বিশ্বস্ত অনুচরের সাহায্যে, তিনি খোরাসানের রাজধানী বল্ক নগর আক্রমণপূর্ব্বক, তাহার অধিপতি আপন শ্যালক আমীর হোশেনকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া, রাজ্য অধিকার করেন। ১৩৭০ খ্রীঃ অব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎপরে তিনি

পারস্য, বোগদাদ, কান্দার প্রভৃতি স্থান আক্রমণ করিয়া, শোণিত ধারায় ধরা-পৃষ্ঠ রঞ্জিত করেন। ১৩৯৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি সিন্ধু নদ অতিক্রম করিয়া, দিল্লীর উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার প্রবল আক্রমণ ও নৃশংসাচরণের কথা পূর্ব্বেই দেশময় ব্যাপ্ত হইয়াছিল। পথে তিনি সাত আটটী নগর ধ্বংস করিয়া, লক্ষাধিক বন্দী সহ দিল্লীতে উপনীত হইয়াছিলেন। দিল্লীর সুলতান মোহাম্মদ তোগলক সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। এই বন্দীরা তাঁহার অসুবিধা সৃষ্টি করিবে, এই মনে করিয়া তৈমুর তাহাদিগকে হত্যা করিবার আদেশ দিলেন। বলা বাহুল্য আদেশ অচিরে প্রতিপালিত হইল। সুলতান মোহাম্মদ এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গুজরাটে পলায়ন করিলেন। তৈমুর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সমস্ত মস্‌জিদে তাঁহার নামে খোতবা পাঠের আদেশ দিলেন। ইহার এক সপ্তাহ পরেই, ভয়ঙ্কর লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল। পাঁচ দিনে অসংখ্য নরহত্যা সংঘটিত হইল। দিল্লীর রাজপথ মৃত দেহের স্তূপে পরিপূর্ণ হইল। এইরূপে দুই সপ্তাহ পরে তৈমুর দিল্লী পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথে তিনি মিরাট, হরিদ্বার, নগরকোট, জম্বু প্রভৃতি স্থান ধ্বংস করিয়া, পূর্ব্ব পথে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই, তিনি বোগদাদ অভিমুখে অভিযান করেন। কথিত আছে, উক্ত নগর লুণ্ঠনকালে প্রায় অশীতি সহস্র মানব অসিমুখে সমর্পিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে তুরস্কের সম্রাট বায়জিদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বায়জিদ পরাজিত হইলে, তৈমুর তাঁহাকে লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করেন। মিশর দেশও তাঁহার সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। এই সকল দেশ জয় করিয়া, তৈমুর বিপুল অর্থরাশি প্রাপ্ত হন। সমরকন্দ নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার রাজ্য উত্তরে সাইবেরিয়া হইতে দক্ষিণে হিন্দুকোশ, পশ্চিমে ডন ও ভল্‌গা নদী হইতে, পূর্ব্বে চীন দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অনেক ইউরোপীয় রাজা দূত পাঠাইয়া, তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বদেশস্থ চীন বিজয়ের সঙ্কল্প করিয়া সৈন্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এমন সময়ে ১৪০৫ খ্রীঃ অব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী বুধবার তাঁহাকে পরলোকের দূতের সহগামী হইতে হইল। ভারতবর্ষের মুঘলবংশের স্থাপয়িতা বাবর শাহ তাঁহারই বংশধর। ১৪৭০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তৈমুরের বংশধরেরা সমরকন্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

তৈমুর খাঁ কিরাণ—তাঁহার সম্পূর্ণ

নাম মালিক কমরউদ্দিন তৈমুর খাঁ-ই-কিরাণ। তিনি কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরবর্ত্তী কিচক প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। দিল্লীর সুলতান আলতমাস তাঁহাকে পঞ্চাশ হাজার মুদ্রায় দাসরূপে ক্রয় করেন। সুলতানের অনুগ্রহে তিনি দ্রুত উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে উন্নিত হইলেন। অবশেষে তিনি অযোধ্যার শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হন। এই স্থান হইতেই ১২৪৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি তোগান খাঁর পরে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হন। মাত্র দুই বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া ১২৪৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

তৈয়ফ আলামী—একজন বিখ্যাত দরবেশ। শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ দরবেশ হজরত শাহ জালাল এমনির অনুগত অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তিনি শ্রীহট্টের গোধরালি পরগণার সালাম নামক স্থানে বাস করিতেন।

তৈলপ—(প্রথম) তিনি চালুক্যবংশীয় একজন নরপতি। তাঁহা হইতে এই বংশের বিশেষ উন্নতি হয়। ৯৭৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি রাষ্ট্রকূটবংশীয় শেষ নরপতি কক্কলকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। তিনি কক্কলের কন্যা জক্কবাকে বিবাহ করিয়া প্রজাদেরে বশীভূত করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি মালব প্রদেশ আক্রমণ করেন। প্রথমে উভয়পক্ষেই সমান সমান ছিলেন; কিন্তু অবশেষে তৈলপ ৯৯৫ খ্রীঃ অব্দে মালব পতি মুঞ্জকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করেন এবং পরে তাঁহার মস্তক ছেদন করা হয়। তৈলপের মৃত্যুর পর ৯৯৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যাশ্রয় রাজা হইয়াছিলেন।

তৈলপ—(দ্বিতীয়) তিনি চালুক্যবংশীয় নরপতি তৃতীয় সোমেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগদেক মল্ল বার বৎসর রাজত্ব করিয়া ১১৫০ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে তৈলপ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে সামন্ত নরপতিরা প্রায় স্ব স্ব প্রধান হইয়াছিলেন। বনবাসীর সামন্ত নরপতি বিজ্জল তৈলপকে বন্দী করিয়া চালুক্য সিংহাসন অধিকার করেন। তৈলপ কোন প্রকারে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন।

তোগরল খাঁ—তাঁহার সম্পূর্ণ নাম সুলতান মগীসউদ্দিন তোগরল খাঁ। তিনি তাতার দেশবাসী ক্রীতদাস ছিলেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৫—৮৭ খ্রীঃ) তাঁহাকে ক্রয় করেন। তিনি নানাবিধ রাজকার্য্যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া অবশেষে অযোধ্যার শাসন কর্ত্তা আমীন খাঁর অধীনে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। কি কারণে জানা যায় না, সম্রাট গিয়াসউদ্দিন বঙ্গের শাসনকর্ত্তা তাতার খাঁর উপর বিরক্ত হইয়া তোগ

রলকে বঙ্গের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। তোগরল সাহস, দানশক্তি ও চতুরতায় অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইয়াই কামরূপ আক্রমণ করিয়া তাহার কিয়দংশ অধিকার করেন। এই সময়ে ঘিয়াসউদ্দিন বলবন পীড়িত হইয়াছিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়াই তিনি স্বাধীন নরপতির লোহিতবর্ণ ছত্র ব্যবহার ও মগিসউদ্দিন উপাধি গ্রহণ করিলেন। সুলতান তোগরলের বিদ্রোহে অতিশয় বিচলিত হইয়া অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা আমীন খাঁকে তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। আমীন খাঁ পরাজিত হইয়া অযোধ্যায় পলায়ন করিলেন। সুলতান এই অপরাধে আমীন খাঁকে ফাঁসি কাষ্ঠে বিলম্বিত করিলেন। তৎপরে সুলতান নবাব তিরমিনিকে বহু সৈন্যসহ তোগরলের দমনার্থ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারাও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। এইবার সুলতান ঘিয়াসউদ্দিন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং বৃদ্ধ বয়সে যুদ্ধার্থ বহু সৈন্যসহ বঙ্গদেশে উপনীত হইলেন। তোগরল পলায়নপূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় লইলেন। মনে করিয়াছিলেন যে বর্ষান্তে সম্রাটসৈন্য অপনীত হইলে তিনি রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। কিন্তু সুলতানের সৈন্য তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাঁহাকে বধ করিল (১৭৮২ খ্রী)। সুলতান তাঁহার পুত্র অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা বগড়া খাঁকে (নাসিরউদ্দিন মোহাম্মদ) বঙ্গের শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তোগান খাঁ—তাঁহার সম্পূর্ণ নাম মালিক ইজ্জউদ্দিন তোগরল তোগান খাঁ। মধ্য এসিয়ার অন্তর্গত তাতার দেশের খোটা জিলায় তাঁহার জন্ম হয়। তিনি শারীরিক সৌন্দর্য্যে ও নানাপ্রকার উদার গুণে বিভূষিত ছিলেন। তাঁহার যৌবনকালে দিল্লীর সম্রাট সামসউদ্দিন আলতমাস তাঁহাকে দাসরূপে ক্রয় করেন। কয়েক বৎসর তোগান খাঁ রাজপরিবারের নানাবিধ বিশ্বস্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১২৩২ সালে সম্রাট তাঁহাকে বদায়ুন (রোহিল খণ্ড) প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। এই কার্য্যে প্রতিপত্তি লাভের পর, সুলতান তাঁহাকে বিহারের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। এই সময়ে লক্ষ্মণাবতীর অধীনস্থ বসন্‌কোট দুর্গের সেনাপতি ইবক্ খাঁর সহিত তোগান খাঁর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে ইবক্ খাঁ নিহত হন। তোগান খাঁ এই যুদ্ধের পরে পশ্চিমে রাঢ় দেশের অন্তর্গত লখ্‌নোর পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বে বরেন্দ্র ভূমিতে বসনকোট দুর্গ পর্য্যন্ত স্থানের অধিকারী হইলেন।

দিল্লীর সম্রাট আলতমাস ১২৫৩ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার অযোগ্য পুত্র মাত্র ৭ মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে সুলতানা রেজিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১২৩৬—১২৩৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপূর্ব্বে বঙ্গের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা সৈফউদ্দিনের মৃত্যুর পরে, তোগান খাঁ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার পদ লাভ করিয়াছিলেন। সুলতানা রেজিয়া সিংহাসনারোহণ করিলে, তিনি কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি-দ্বারা নানাবিধ উপহার দ্রব্য দিল্লীতে প্রেরণ করেন। তদ্দৃষ্টে সুলতানা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে স্বপদে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং সর্ব্বোচ্চ অভিজাত শ্রেণীতে তিনি প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সুলতানার প্রতিনিধিস্বরূপ লোহিত ছত্র ধারণের অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন।

এই সময়ে তিনি স্বীয় প্রভাব প্রতি-পত্তি প্রদর্শনার্থ ত্রিহুত রাজ্য আক্রমণ করিয়া, তথাকার রাজার নিকট হইতে প্রচুর অর্থ লাভ করেন। তৎপরে তিনি উড়িষ্যা বিজয়ে অভিলাষী হইয়া তৎ-প্রদেশ আক্রমণ করেন। সেই সময়ে গঙ্গাবংশীয় প্রথম নরসিংহ দেব (১২৩৮—১২৬৪ খ্রীঃ) উড়িষ্যার রাজা ছিলেন তোগান খাঁ প্রথম যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া, কটাসিন দুর্গ অধিকার করি-লেন। তৎপরে উড়িষ্যার সেনাপতি বিষ্ণু তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের হস্তী অধিকার করিলেন এবং তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। তোগানখাঁ পরাজিত হইয়া, লক্ষ্মণাবতীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। অবিলম্বে মহারাজ নরসিংহ দেবের সেনাপতি বিষ্ণু লক্ষ্মণাবতী পরিবেষ্টন করিলেন। তোগান খাঁ, মন্ত্রী শরফ-উল মুল্‌ক আশারী ও কাজী জালালউদ্দিন কাসানীর পরামর্শে, দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন মসায়ুদের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইলেন। সুলতান অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা তৈমুর খাঁ কিরাগকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন এবং তোগান খাঁকে দিল্লীতে আহ্বান করিলেন। নরসিংহ দেবের সৈন্য দিল্লীর সৈন্যের আগমনে স্বদেশে প্রতি-গত হয়। তোগান খাঁ সুলতানের অনুগ্রহে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা হইলেন। উক্ত পদেই অবস্থান করিয়া ১২৫৩ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

তোটকাচার্য্য—তিনি শঙ্করাচার্য্যের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁহার নাম গিরি ছিল। এই ব্রাহ্মণ বালকের, শঙ্করের শিষ্য হইবার পূর্ব্বে, কিছুই লেখা পড়ার জ্ঞান ছিল না। কিন্তু এই বালক স্বভাবতঃ মৃদুভাষী, বিনীত, অনলস, গুরুসেবাপরায়ণ এবং সকলের প্রিয়ানুষ্ঠানে তৎপর ছিলেন। তাঁহার

ভক্তিতে ও সেবায় শঙ্কর তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। আচার্য্য যখন শিষ্য-গণকে অধ্যাপনা করিতেন অথবা উপ-দেশ দিতেন। গিরি করজোড়ে দণ্ডায়-মান থাকিয়া, তাহা শ্রবণ করিতেন। এইরূপে গিরির মধ্যেও জ্ঞান পিপাসা জাগ্রত হইল। ক্রমে ক্রমে অধ্যয়নে রত হইলেন। একদিন গিরি একটী তোটকচ্ছন্দে স্বীয় রচিত শ্লোকে গুরুর বন্দনা করিয়া, সকলকে মোহিত করি-লেন। গুরু শঙ্করাচার্য্য অতিশয় প্রীত হইয়া, তাঁহাব নাম তোটকাচার্য্য রাখি-লেন। তদবধি তিনি এই নামেই পরিচিত হইলেন। অচিরকাল মধ্যেই তিনি শঙ্করাচার্য্যের অন্যতম প্রধান শিষ্য হইলেন। আচার্য্য তাঁহাকে বদরিকা আশ্রমস্থিত যোশীমঠের অধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

তোণ্ডারাড়িপ্পোড়ি আলোয়ার— তিনি খ্রীঃ পূঃ ২৮১৪ অব্দে পৌষ মাসে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে ত্রিচিন পল্লীর নিকটস্থ মাস্তঙ্গুড়িপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুন্দর মাল্য রচনা করিয়া ভগবানের অর্চ্চনা করিতেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই ভক্ত কবির রচিত অনেক সংগীত সাদরে গীত হইয়া থাকে।

তোরমাণ— খ্যাতনামা হূণ জাতীয় নরপতি। তিনি উত্তর পশ্চিম ভারতে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে পুরগুপ্তের পুত্র নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য মগধে রাজত্ব করিতেন। তিনি গুর্জরাধিপতি ভটার্ক ও অন্যান্য সামন্ত রাজগণের সাহায্যে তোরমাণকে সিন্ধু নদের পশ্চিম পারে দূর করিয়া দেন। তোর-মাণের পুত্র মিহিরগুপ্ত বা মিহিরকুল পুনর্ব্বার বিজিত পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য, যশোধর্ম্ম দেব প্রভৃতি সামন্ত নরপতি-গণের সাহায্যে, মিহিরকুলকে কোরু-রের যুদ্ধে পরাজিত করেন। সম্ভবতঃ এই ঘটনা ৫২৮ খ্রীঃ অব্দে সংঘটিত হয়।

তৌতাতিত আচার্য্য—সম্ভবতঃ খ্রীঃ তৃতীয় শতাব্দীর শেষে তিনি দাক্ষিণাত্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি একজন মীমাংসা শাস্ত্রকার। সম্ভবতঃ তিনি কুমারিল ভট্টের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন এবং শাবর ভাষ্যের উপর একখানা কারিকা রচনা করিয়াছিলেন।

ত্যাগরাজ চেট্টিয়ার, সার— তাঁহার জন্মস্থান মাদ্রাজ প্রদেশে। তিনি অব্রাহ্মণ দলের নেতা ছিলেন এবং ঐ দলের উন্নতির জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টাও করিতেন। তিনি ১৯২৫ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী ছিলেন না।

ত্যাগসিংহ—প্রলম্বেরবংশীয় শেষ নর-পতি। তিনি অনপত্য অবস্থায় প্রাণ-ত্যাগ করিলে, জনসাধারণ পালবংশীয়

ব্রহ্মপালকে রাজপদ প্রদান করেন। ত্যাগসিংহ সম্ভবতঃ ৯৯০ খ্রীঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

ত্রিকলিঙ্গ মহাদেবী—উড়িষ্যার ভঞ্জ-বংশীয় নরপতি বিদ্যাধর ভঞ্জের মহিষী। তিনি ত্রিকলিঙ্গ নরপতির কন্যা ছিলেন। বিদ্যাধর ভঞ্জ দ্রষ্টব্য।

ত্রিকাণ্ড মণ্ডন—তিনি গৌতম ধর্ম্ম সূত্রের ভাষ্যকার। তিনি মেধাতিথির পরবর্ত্তী লোক।

ত্রিগুণানন্দ—বৌদ্ধতন্ত্র পূর্ব্ব বাঙ্গালায় যাঁহারা প্রচার করেন, তাঁহাদের মধ্যে ত্রিগুণানন্দ, তাঁহার শিষ্য ব্রহ্মানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের শিষ্য পূর্ণানন্দ প্রধান ছিলেন। পূর্ণানন্দের 'তত্ত্বচিন্তামণি' ১৫৭৯ খ্রীঃ অব্দে (১৫০১ শক) রচিত।

ত্রিপাঠী ভট্ট—একজন জ্যোতিষী পণ্ডিত। তিনি একখানি জাতক পদ্ধতি রচনা করেন।

ত্রিপুরারি—'রোগ প্রতিক্রিয়া' নামক আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

ত্রিবিক্রম—(১) শাণ্ডিল্য গোত্রিয় একজন কবি চক্রবর্ত্তী। তিনি একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতও ছিলেন। ভারতভাস্কর ভাস্করাচার্য্য তাঁহারই অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র ছিলেন। ভাস্করের বংশে পুরুষানুক্রমে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ত্রিবিক্রম 'কালবিধান' নামে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ত্রিবিক্রম—(২) নারায়ণ পুত্র ত্রিবিক্রম ১১৮৫ শকের (১২৬৩ খ্রীঃ) পূর্ব্বে 'ত্রিবিক্রম শতক' বা 'জাতক' নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন।

ত্রিবিক্রম—(৩) তিনি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ আমরাজ বা আমশর্ম্মার গুরুদেব। ত্রিবিক্রম ব্রহ্মগুপ্ত প্রণীত 'খণ্ড খাদ্যক' গ্রন্থের উত্তরার্দ্ধের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ইহার রচনাকাল ১১০২ শক বা ১১৮০ খ্রীঃ অব্দ।

ত্রিবিক্রম ভঞ্জ—তিনি উড়িষ্যার অন্তর্গত ময়ূরভঞ্জের নরপতি দামোদর ভঞ্জের (১৭৬১—১৭৯৭ খ্রীঃ) পোষ্যপুত্র। রাজা দামোদর ভঞ্জের মৃত্যুর পর মহারাণী সুমিত্রা দেবী কিছুকাল রাজ্য শাসন করেন। তৎপরে ১৮১০ খ্রীঃ অব্দে ত্রিবিক্রম ভঞ্জ রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

ত্রিবিক্রমাচার্য্য—একজন খ্যাতনামা জ্যোতিষী। তিনি ব্রহ্মব্যবহার নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

ত্রিভন সিংহ—তিনি মানভূম জিলার অন্তর্গত সতেরখানির প্রবল পরাক্রান্ত সর্দ্দার বা রাজা ছিলেন। তিনি খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি বরাহভূমের রাজার অধীন সামন্ত রাজা বা সর্দ্দার ছিলেন। বাটালুকা দুর্গ তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি তাঁহার নিকটবর্ত্তী শ্যামসুন্দরপুর, অম্বিকানগর, সুপুর, ধলভূম প্রভৃতি

রাজ্য আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিতেন। তাঁহার এই প্রকার অত্যাচারে প্রপীড়িত, এই সকল দেশের রাজারা বরাহভূমের রাজার শরণাপন্ন হইলেন। বরাহভূমের রাজা তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া ত্রিভন সিংহের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। এক ঘোরতর যুদ্ধ সমুপস্থিত হইলে, ত্রিভন সিংহ নিহত হইলেন। তাঁহার মহিষী পুত্র লাল সিংহকে লইয়া পলায়ন করিলেন। এই লাল সিংহ একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। লাল সিংহ দেখ।

ত্রিভুবন—কম্পন প্রদেশের অধিপতি ত্রিভুবন কাশ্মীরপতি অনন্ত দেবের (১০২৯—৮১ খ্রীঃ) একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি কৌশলে সমস্ত ডামর সৈন্য ও রাজসৈন্য হস্তগত করিয়া, কাশ্মীরের সিংহাসন লাভ করিবার জন্য, প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক আত্ম রক্ষা করেন। কিছুকাল পরে অনন্তরাজের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, ত্রিভুবন ক্ষমা প্রার্থনা করেন। উদার হৃদয় শৌর্য্যবান্ রাজা, সেনাপতির সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন।

ত্রিভুবন গুপ্ত—তিনি কাশ্মীরের অধিপতি ক্ষেমগুপ্তের (৯৪৯—৯৫১ খ্রীঃ) পৌত্র ও অভিমন্যু গুপ্তের (৯৫১—৫৫ খ্রীঃ) দ্বিতীয় পুত্র। তিনি নন্দী গুপ্তের (৯৬৫—৯৬৬ খ্রীঃ) পরে রাজা হইয়া দুই বৎসর রাজ্য শাসন করেন। কিন্তু অভিমন্যু গুপ্তের ৯৫৮—৯৭২ খ্রীঃ অব্দের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

ত্রিভুবন পাল—বঙ্গের পালবংশীয় নরপতি ধর্ম্ম পালের (৭৯৫—৮৩৪ খ্রীঃ) অন্যতম পুত্র।

ত্রিভুবনমল্ল বিক্রমাদিত্য—তিনি কল্যাণের চালুক্যবংশীয় অন্যতম নরপতি। কৌঠেম গ্রামে আবিষ্কৃত তাঁহার তাম্রশাসনে প্রাচীন চালুক্য-বংশের সুদীর্ঘ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

ত্রিভুবন মহাদেবী—তিনি উড়িষ্যার করবংশীয় নরপতি ললিতভারের মহিষী ছিলেন। ললিতভারের মৃত্যুর পরে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শান্তিকর রাজা হন। শান্তিকরের মৃত্যুর পরে রাণী ত্রিভুবন মহাদেবী রাজ্যশাসন করেন। তদ্দত্ত তাম্রশাসনানুসারে জানা যায় ৯০৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। ত্রিভুবন মহাদেবীর পরে দ্বিতীয় শোভাকর রাজা হইয়াছিলেন। ত্রিভুবন মহাদেবী নরপতি রাজমল্লের কন্যা ছিলেন। উন্মত্ত-সিংহ দ্রষ্টব্য।

ত্রিমল্ল—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম বৈদ্যক চন্দ্রোদয়।

ত্রিমল্ল—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—সুধাসাগর ও শতশ্লোকী।

ত্রিমল্ল ভট্ট—একজন ত্রৈলঙ্গদেশীয়

ব্রাহ্মণ। তাঁহার পিতার নাম বল্লভ-ভট্ট, পিতামহ শিঙ্গনভট্ট। তাঁহারা সকলেই আয়ূর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত ছিলেন। ত্রিমল্ল ভট্টকৃত গ্রন্থাবলী ১। দ্রব্যগুণ শত শ্লোকী, ২। যোগ তরঙ্গিণী, ৩। বৃহৎ যোগতরঙ্গিণী, ৪। বৃত্তমাণিক্য মালা ও ৫। বৈদ্যচন্দ্রোদয়। এতদ্ব্যতীত কাশীতে অবস্থানকালে তিনি অলঙ্কার মঞ্জুরী নামক, অলঙ্কার শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কৃষ্ণ-দত্ত প্রণীত শতশ্লোকী পুস্তকের দ্রব্য দীপিকা নামে এক টীকা প্রণয়ন করেন। তিনি তাঁহার যোগতরঙ্গিণী গ্রন্থে বহু গ্রন্থকার ও বহু গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শঙ্কর ভট্টও একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম রস প্রদীপ।

ত্রিম্বকজী দাঙ্গালিয়া—তিনি একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। প্রথমে তিনি দ্বিতীয় বাজীরাও পেশোয়ার (১৭৯৬—১৮১৮ খ্রীঃ) গুপ্তচর ছিলেন। এই কার্য্যে নৈপুণ্য দেখাইয়া তিনি পেশোয়ার প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। বাজীরাও স্বয়ং অতি দুর্ব্বল চিত্ত লোক ছিলেন। তিনি ত্রিম্বকজীর ন্যায় স্তাবকের বাক্যেই পরিচালিত হইতেন। এমন কি ক্রমে ত্রিম্বকজী পেশোয়ায় প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। অচিরে ধারোয়ারের সেনাপতি বাপু সিন্ধিয়া তৎকর্ত্তৃক অপমানিত হইলেন। ইংরেজ বিদ্বেষ ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। খুসরুজী মুধিকে ইংরেজদের সহায়ক মনে করিয়া হত্যা করিল। ক্রমে ত্রিম্বকজী আহম্মদাবাদে সুবেদার হইলেন। এই সময়ে পেশোয়ার সহিত বরোদার গায়কোয়ারের বিবাদ চলিতেছিল। ইহার মীমাংসার জন্য, গায়কোয়ার গঙ্গাধর শাস্ত্রীকে প্রেরণ করেন। ত্রিম্বকজী তাঁহাকেও প্রতারণা পূর্ব্বক হত্যা করেন। এই সময়ে ইংরেজ সরকার, এই দুর্বৃত্তকে থানা নামক স্থানের দুর্গে আবদ্ধ করেন। ত্রিম্বকজী তথা হইতে পলায়ন করিয়া ভিলদের মধ্যে আত্ম গোপন করিয়া অবস্থান করেন। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দের তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধের সময়ে, কতকগুলি ভিল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া চুনার দুর্গে বন্দী হন। এই বন্দী অবস্থায়ই তিনি পরলোক গমন করেন।

ত্রিলোকচন্দ্র—খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি বাঙ্গালার রাজা ছিলেন। তাঁহার নামাঙ্কিত ১৬১০—২৫ খ্রীঃ অব্দের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

ত্রিলোচন—(১) তিনি একজন দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি বৈশেষিক দর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'পার্থ বিজয়' একখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। 'ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্যটিকা' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা বাচস্পতি মিশ্র, তাঁহারই শিষ্য ছিলেন। তিনি

খ্রীঃ দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

ত্রিলোচন—(২) অন্যতম বৈষ্ণব সম্প্রদায়কর্ত্তা বিষ্ণুস্বামী সম্ভবতঃ খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বিষ্ণুস্বামীর শিষ্য জ্ঞানদেব, তৎশিষ্য নামদেব, তৎশিষ্য ত্রিলোচন। তৎপরে বল্লভাচার্য্যের সময়ে এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নাম "বল্লভাচারী" হয়।

ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী—বৈষ্ণব যুগের একজন বাঙ্গালী কবি। তাঁহার জন্মকাল বা বাসস্থানাদির পরিচয় কিছুই পাওয়া যায় নাই। তিনি সুমধুর কবিতায় বেদব্যাস প্রণীত মহাভারতের সরল অনুবাদ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কবিত্ব শক্তির স্ফুরণ হয়। তাঁহার 'ভারত' রচনা বঙ্গ সাহিত্যের আদরের সামগ্রী।

ত্রিলোচন তর্কালঙ্কার—খ্যাতনামা বাঙ্গালী নৈয়ায়িক। ঢাকা জিলার পারজোয়ার পরগণাস্থিত শাক্তা গ্রামে তাঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল। ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দে (১২৪৪ বঙ্গাব্দে) তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ভৈরবচন্দ্র পঞ্চানন। অতি শৈশবেই পিতৃহীন হইয়া, তিনি খুল্ল মাতামহ রাধাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যত্নে লালিত পালিত হন। প্রায় চারি বৎসর পুরাপাড়া নিবাসী নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের টোলে ব্যাকরণ ও ন্যায় অধ্যয়ন করিয়া তর্কালঙ্কার উপাধি প্রাপ্ত হন। অতঃপর নিজেই চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার অধ্যাপনার কৃতিত্বের কথা অল্পদিনেই চারিদিকে ব্যাপ্ত হয় এবং বাঙ্গালা দেশের অনেক দূরবর্ত্তী জিলা হইতেও শিক্ষার্থীগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে থাকেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় "মনোদূত" নামে একখানি কাব্য এবং "পরিশেষ রত্ন" নামে কলাপ ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় একখানি টীকা রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থে পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক টীকাকারের মত আলোচিত হইয়াছে। তিনি ন্যায় এবং স্মৃতি শাস্ত্রেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দে (১৩০৪ বঙ্গাব্দ) তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার চারি পুত্র বর্ত্তমান ছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয় পিতৃদেবের অনুসরণ করিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী আছেন।

ত্রিলোচন দাস—তিনি কলাপ ব্যাকরণের পঞ্জিকা নামক টীকাকার। বরিশাল জিলার অন্তর্গত গৈলা গ্রামের বৈদ্যবংশে তাঁহার জন্ম হয়।

ত্রিলোচন পাল—(১) কান্যকুব্জের গুর্জ্জর প্রতীহারবংশীয় একজন নরপতি। রাজ্যপালের পরে তিনি রাজা হইয়াছিলেন।

ত্রিলোচন পাল—(২) কাবুলের শাহীবংশীয় রাজা জয়পালের পৌত্র ও

আনন্দপালের পুত্র। আনন্দপাল কাবুলে ১০২১ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র ত্রিলোচন পাল রাজা হইয়াছিলেন। ত্রিলোচন পাল ১০২৬ খ্রীঃ অব্দে পরলোকগত হইলে, তাহার পুত্র ভীমপাল রাজা হইয়াছিলেন। শাহীবংশ কাশ্মীরের সামন্ত নরপতি ছিলেন। সুলতান মাহমুদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। সেই সময়ে কাশ্মীরপতি সংগ্রাম রাজ, ত্রিলোচনের সাহায্যার্থ স্বীয় সেনাপতি তুঙ্গের অধীনে এক বিপুল সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তুঙ্গের বুদ্ধি দোষে শাহীরাজ পরাভুত হন। শাহীবংশ কাবুল হইতে তাড়িত হইয়া কাশ্মীরে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন।

ত্রিশটাচার্য্য—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—চিকিৎসা কথিকা বা যোগ মালা। তাঁহার পুত্র চন্দ্রাট চিকিৎসা কথিকার এক মনোরম টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

ত্রিশলা—তিনি জৈনতীর্থঙ্কর মহাবীরের জননী ও বৈশালীর রাজা চেটকের ভগিনী ছিলেন। মহাবীর দেখ।

ত্রৈলিঙ্গ স্বামী—ভারতবিখ্যাত যোগী। তিনি দাক্ষিণাত্যের এক ব্রাহ্মণবংশসম্ভুত ছিলেন। ১৬০৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে কাশীধামে তিনি দেহরক্ষা করেন। সুতরাং এই হিসাবে তিনি ২৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন বলিয়া ধরিতে হয়।

তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ত্রৈলিঙ্গধর। তাঁহার পিতা নৃসিংহধর ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা পত্নীর গর্ভে ত্রৈলিঙ্গধর এবং অপরা পত্নীর গর্ভে শ্রীধর নামে আর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। চল্লিশ বৎসর বয়সে ত্রৈলিঙ্গধর পিতৃহীন হন এবং কয়েক বৎসর পরে তাঁহার মাতারও মৃত্যু হয়। ইহাতে তাঁহার মনে গভীর বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি মাতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পর আর সংসারাশ্রমে গমন করিলেন না। শ্রীধর ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সানুনয় অনুরোধ ও চেষ্টা সকলই বিফল হইল। তাঁহার মাতা যোগপরায়ণা মহিলা ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর ত্রৈলিঙ্গধর কিছুকাল তাঁহার নিকট যোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি শ্মশান ক্ষেত্রেই অনুজকর্ত্তৃক নির্ম্মিত কুটীরে অবস্থান করিয়া, গভীর যোগসাধনায় নিমগ্ন হইলেন। এইভাবে বহু বৎসর অতীত হয়। এই সময়ের মধ্যে ভগীরথ স্বামী নামে আর একজন বিখ্যাত যোগীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং ত্রৈলিঙ্গধর ভগীরথের সহিত পুষ্কর তীর্থে গমন করেন। তথায় কিছুকাল বাস করিয়া তিনি যোগসাধনার গূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা করেন এবং ভগীরথ স্বামীর নিকট দীক্ষিত হইয়া, গণপতি স্বামী নাম

প্রাপ্ত হন। ভগীরথ স্বামীর দেহত্যাগের পর ত্রৈলিঙ্গস্বামী তীর্থ ভ্রমণ ব্যপদেশে, ভারতের বহু স্থানে এমনকি নেপালও গমন করেন। যোগসাধনার জন্য তিনি নেপালের এক গুহায় বহু বৎসর বাস করেন। এই সময়ে মধ্যে তিনি অনেক অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দেন। তজ্জন্য তাঁহার অনুগ্রহ লাভের আশায় বহু লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে থাকে। ইহাতে যোগ সাধনার ব্যাঘাত হওয়াতে, তিনি নেপাল পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে তিব্বত ও পরে মানস সরোবরে গমন করিয়া, দীর্ঘকাল যোগ সাধনা করেন। অতঃপর পুনরায় ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কিছুকাল মধ্য প্রদেশে নর্ম্মদা তীরবর্ত্তী সন্ন্যাসীদের এক আশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক পরে কাশীধামে গমন করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন।

দীর্ঘকাল কঠোর যোগ সাধনার ফলে তিনি অনেক প্রকার অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। এইরূপ অলৌকীক ক্ষমতার পরিচয়ও অনেকে পাইয়াছিলেন। কাশীধামে অবস্থানকালে, তিনি নগ্ন অবস্থায় বিচরণ করিতেন। তজ্জন্য ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে বস্ত্র পরিধান করাইবার চেষ্টা করেন। পরে তাঁহার নির্ব্বিকারচিত্ত ও অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া, সে চেষ্টা পরিত্যাগ করেন।

ত্রৈলোক্যচন্দ্র— খড়্গবংশের অধঃপতনের পরে বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী চন্দ্রবংশীয় রাজগণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এই বংশের পূর্ণচন্দ্র, রোহিত গিরি (রোহতাস গড়) পর্ব্বতের অধিপতি ছিলেন। পূর্ণচন্দ্রের পুত্র সুবর্ণচন্দ্রও রাজা বলিয়া পরিচিত ছিলেন না। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে (হরিকেল ও চন্দ্র দ্বীপে) রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্রদেবের তিনখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। শ্রীচন্দ্রদেবের মাতার নাম কাঞ্চনা। বিক্রমপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। শ্রীচন্দ্র দেবের বংশধরেরা পরে পাল রাজগণের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে এই বংশের গোবিন্দচন্দ্র নামক (মহীপালের সমসাময়িক) একজন রাজা কলিঙ্গরাজ রাজেন্দ্র চোলকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ—প্রবাসী কৃতী বাঙ্গালা চিকিৎসক। হুগলী জিলার চুঁচুড়াতে তাঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল। কৃতীত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন এবং যথাসময়ে বিবিধ পুরস্কার ও বৃত্তি লাভ করিয়া, পাঠ সমাপন করেন। ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি সরকারী চাকুরী লাভ করিয়া

যুক্তপ্রদেশে গমন করেন এবং পর বৎসর মীরাট হাঁসপাতালের ভার প্রাপ্ত হন। তাঁহার চিকিৎসা নৈপুণ্য ও তৎসহ সরল অমায়িক ব্যবহারে অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার যশ বিস্তৃত হয়। অস্ত্র চিকিৎসাতেই তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। অতিশয় কঠিন অস্ত্রোপচারও তিনি অনায়াসে সম্পন্ন করিয়া প্রশংসা লাভ করিতেন। তাঁহার চিকিৎসা দক্ষতার জন্য কর্তৃপক্ষ সুদীর্ঘ তেইশ বৎসরকাল তাঁহাকে স্থানান্তরে প্রেরণ করেন নাই। সরকারী চিকিৎসা বিভাগের বিবরণীতে প্রতি বৎসরই তাঁহার নাম সুখ্যাতির সহিত উল্লিখিত হইয়াছিল। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে আফগান যুদ্ধের আশঙ্কা ঘটিলে তদানীন্তন প্রধান চিকিৎসক (Civil Surgeon) ত্রৈলোক্যনাথের দক্ষতার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে পরামর্শ দেন। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে তিনি সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে গুণমুগ্ধ মীরাটবাসীগণ প্রকাশ্য সভায় তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন এবং মীরাটে থাকিয়াই চিকিৎসা ব্যবসায় করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করেন।

ত্রৈলোক্যনাথ মীরাটের বহু জন হিতকর কার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তিনি তৎস্থানবাসী বাঙ্গালীদের অবিসংবাদী নেতা ছিলেন। বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে চিকিৎসাপ্রার্থী হইয়া লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। তিনি চক্ষুচিকিৎসাতেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। পরদুঃখকাতরতা ও রোগীর প্রতি সহানুভূতির জন্য তিনি বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন। মৃত্যু ১৯১১খ্রীঃ।

ত্রৈলোক্যনাথ দেব—তাঁহার জন্মস্থান ২৪ পরগণার অন্তর্গত কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে মজিলপুর গ্রামে। তিনি সেইকালের কাষ্ঠ খোদাই কার্য্যে একজন সুদক্ষ শিল্পী ছিলেন। তখন এখনকার মত হাপটোন ব্লক প্রচলিত ছিল না। এই শিল্পে তিনি বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি সরল প্রকৃতি অমায়িক অতি সাধু চরিত্রের লোক ছিলেন। যাঁহারা একবার তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার সৌজন্য ও সাধু ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। ৮১ বৎসর বয়সে ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। সেকালের ব্রাহ্মসমাজ' নামে একখানি গ্রন্থও তিনি লিখিয়াছেন। তাঁহারই সুযোগ্য পুত্র পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেব চীনা মাটীর পাত্র, পুতুল, টেলিগ্রামের সরঞ্জাম প্রভৃতি নির্ম্মাণ প্রণালী বিদেশ হইতে শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য—ঢাকা জিলার অন্তর্গত পাঁচদোনা গ্রামে এক

বিখ্যাত পণ্ডিতবংশে ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দের জুন মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য। ছয় বৎসর বয়সে ত্রৈলোক্যনাথ পিতৃহীন হন। তাঁহার মাতা কয়েকটী অপগোণ্ড শিশু লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়েন। ১২ বৎসর বয়সে ত্রৈলোক্যনাথ গ্রামের স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া চারি টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তৎপরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১০ টাকা ও তখনকার এফ, এ পরীক্ষা দিয়া ২০ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তৎপরে কিছু-দিন ময়মনসিংহের অন্তর্গত সুসঙ্গ মহা-রাজের স্কুলে শিক্ষকের কাজ করেন। তৎপরে বি, এ পাশ করিয়া কুড়ি টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইতিপূর্ব্বে কুমিল্লা মহারাজের স্কুলেও কিছুদিন শিক্ষক ছিলেন। ১৮৮৫ সালে এম, এ পাশ করিয়া বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলে হেড্-মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন। ইহার পরে তিনি বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়ের অনুগ্রহে নয়াদা খাস মহলে প্রথমে সাব ডিপুটীর পদ লাভ করেন। পরে ডিপুটির পদ লাভ করেন। ১৩০৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (১৯০০ খ্রীঃ) মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি একজন কর্ম্মনিপুণ, সত্যনিষ্ঠ রাজকর্ম্ম-চারী ছিলেন। তাঁহার বিচার নৈপুণ্যে সকলেই প্রীত হইতেন। তিনি একজন সাহিত্যিকও ছিলেন। মাসিক পত্রে তাঁহার অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি নেপালের পুরাতত্ত্ব, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম ভাগ, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের জীবনী, প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র— খ্যাতনামা বাঙ্গালী ব্যবহারজীবী। তাঁহার পিতার নাম জয়গোপাল মিত্র। হুগলী জিলার কোন্নগরে তাঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল। ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে (১২৫১ বঙ্গাব্দ বৈশাখ) তাঁহার জন্ম হয়। শ্রীরামপুরের এক পাঠশালায় তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি উত্তরপাড়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং চারি বৎসর পরে, দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি-বার সময়েই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া বিশেষ কৃতীত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। পর বৎসর সিনিয়ার স্কলারশিপ (Senior Scholarship) পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এফ্-এ (First Arts) পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন এবং ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে, প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পঠিতব্য সকল বিষয়েই তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন। তৎপরে অঙ্ক শাস্ত্রে এম্-এ পরীক্ষা দেন এবং প্রথম স্থান

অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে আইন পরীক্ষা (B. L.) ও তৎপর বৎসর আইনেরই অপর একটি উচ্চতর পরীক্ষা (Honours in Law) সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। এই শেষোক্ত পরীক্ষায় দেশীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম কৃতকার্য্য হন। তৎপরেও বহু বৎসর আর কেহ ইহাতে কৃতকার্য্য হন নাই। পরবর্ত্তীকালের কৃতীছাত্রদের মধ্যে সার রাসবিহারী ঘোষ এবং সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ যোগ্য।

ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহার প্রতিভার কথা বহুল প্রচারিত হইয়াছিল। এম্.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরেই, তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। দুই বৎসর পরে তিনি হুগলী কলেজের আইন অধ্যাপক হন। পরে ঐ কলেজের তদানীন্তন দর্শন শাস্ত্রাধ্যাপক আল্‌ফ্রেড ক্রফ্‌ট (Sir Alfred Croft) অবসর গ্রহণ করিলে তিনি কিছুকাল একাধারে দর্শন শাস্ত্র ও আইনের অধ্যাপনা করেন। অল্প-কাল পরেই তিনি কলেজের চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া, স্বাধীন ভাবে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তৎসঙ্গে কেবল আইন অধ্যাপনা করিতে থাকেন। আট বৎসর হুগলীতে আইন ব্যবসায় করিবার পর, তিনি কলিকাতা হাই-কোর্টে যোগদান করেন। ঐ সময়ে তিনি কিছুকালের জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন অধ্যাপনাও করিতেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই অসাধারণ অধ্য-বসায়, প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞান ও বাগ্মীতার গুণে তিনি কলিকাতার শ্রেষ্ঠ আইন জীবীদের মধ্যে পরিগণিত হইলেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সদস্য (Fellow) মনোনীত হন। ঐ বৎসর তিনি "ঠাকুর আইন অধ্যাপক"ও নিযুক্ত হন। ঐ পদে তাঁহার অধ্যাপনার বিষয় ছিল "হিন্দু বিধবা সংক্রান্ত আইন"। ঐ বিষয়ে পরে তিনি যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাহা তদ্বিষয়ে প্রামাণিক গ্রন্থরূপে আদৃত হইয়া থাকে। সার রাসবিহারী ঘোষের পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যক্ষ (Dean of Faculty of Law) নিযুক্ত হন। তিনি ইংলণ্ডের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির (Royal Asiatic Societyof Great Britain) সদস্যও হইয়াছিলেন।

হুগলীতে আইন ব্যবসায় করিবার সময় তিনি বহুকাল শ্রীরামপুর পুর-তন্ত্রের (Municipality) সভাপতি হইয়া-ছিলেন। তাঁহার কার্য্যকুশলতায় শ্রীরাম-পুরের স্বাস্থ্য বিভাগের অনেক উন্নতি হয়। তিনি জাতীয় মহাসমিতির (Indian National Congress) একজন বিশেষ উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ অসাধারণ পণ্ডিত,

অপূর্ব্ব কর্ম্মকুশল, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, নিরহঙ্কার মধুর প্রকৃতির পুরুষ ছিলেন। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে, মাত্র ৫১ বৎসর বয়সে কলিকাতা নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পরলোক গমনে দেশব্যাপী শোকের প্রবাহ বহিয়াছিল। সকল পরিচিত লোক তাঁহার গুণগ্রামের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, শোক প্রকাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন ভবনে (Senate Hall) তাঁহার একটি তৈলচিত্র স্থাপিত আছে।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় — বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারী ও গ্রন্থকার। ১২৫৪ বঙ্গাব্দে (১৮৪৭ খ্রীঃ) ২৪ পরগণা জিলার অন্তর্গত রাহুতা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায় ও মাতার নাম ভবসুন্দরী দেবী।

ত্রৈলোক্যনাথ বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। কিন্তু পাঠে কোন সময়ই অমনোযোগী ছিলেন না, ক্লাসের মধ্যে সর্ব্বদাই প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। গ্রামের স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া, তিনি চুঁচুড়ার ডফ সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হন। ১৮৫৫ সালে গ্রামে অত্যন্ত ম্যালেরিয়া হওয়ায় তাঁহার পিতামহী, মাতা ও পিতার মৃত্যু হয়। সংসারের অবস্থা শোচনীয় দেখিয়া, তিনি ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে নিরুদ্দেশ হন। নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে বীরভূম জিলার দ্বারকা গ্রামের স্কুলে শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। তথা হইতে কিছুদিন বর্দ্ধমান জিলার উখরা গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুকম্পায় পাবনা জিলার শাহাজাদপুরের স্কুলে শিক্ষক হন। ইহার কিছুকাল পরে, তিনি কটকে চলিয়া যান। সেখানে দারোগার পদ প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে হয়। এই সময় তিনি উড়িয়া ভাষাও শিক্ষা করেন এবং 'উৎকল শুভকরী' নামে এক মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করেন। ১২৭০ সালের মে মাসে হাণ্টার সাহেবের অনুকম্পায় তিনি ১২৫ টাকা বেতনে কলিকাতায় একটী চাকুরী পান। অল্পদিন মধ্যে তাহা ছাড়িয়া দিয়া উত্তর পশ্চিমে কৃষি বাণিজ্য অফিসের প্রধান কেরাণীর কাজ পাইয়া পশ্চিম অঞ্চলে চলিয়া যান। ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে ভারত সরকারের রাজস্ব বিভাগে তিনি চাকুরী পান। ঐ সময়ে হলাণ্ড দেশে আমষ্টার্ডম নগরে এক মহামেলা হয়। ভারত সরকার তাঁহাকে ঐ মেলায় যাইতে অনুরোধ করিলে, তিনি তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। সেই সময়ে তিনি অকারাদি বর্ণানুক্রমে ভারতে কি কি জিনিষ উৎপন্ন হয়, তাহার একখানি ইংরেজী অভিধান প্রণয়ন করেন। ১৮৮৩ খ্রীঃ কলিকাতার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে কয়েকটী

বিষয়ের অধ্যক্ষ হন। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে বিলাতের প্রদর্শনী আরম্ভ হইলে,তাঁহাকে বাধ্য হইয়া বিলাত যাইতে হইল। প্রদর্শনী শেষ হইলে, তিনি ইউরোপের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া 'ইউরোপ পরিদর্শন' (Visit to Europe) নাম দিয়া একখানি পুস্তক রচনা করেন। ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, তিনি কলিকাতা মিউজিয়মে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং গবর্ণমেন্টের অনুরোধে 'Art Manufactures of India' নামে একখানি বৃহৎ পুস্তক রচনা করেন।

ত্রৈলোক্যনাথ তৎকালীন বিবিধ সাময়িক পত্রিকাগুলিতে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। 'বিশ্বকোষ' অভিধান রচনা কার্য্যে তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে সাহায্য করিতেন। তিনি 'Wealth of India' নামে একখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদন কার্য্যে সাহায্য করিতেন। 'কঙ্কাবতী', 'ভূত ও মানুষ', 'ফোকলা দিগম্বর', 'মুক্তামালা,' প্রভৃতি কয়েকখানি গল্পের বই তিনি রচনা করেন। ডাক্তার কানাইলাল দে ও ত্রৈলোক্যনাথ একত্রে 'বিজ্ঞান বোধ' নামে একখানি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও কতকগুলি ঐরূপ পুস্তক লিখিয়াছিলেন।

ত্রৈলোক্য বর্ম্মা—তিনি মধ্যভারতের জেজাক ভুক্তির চন্দ্রাত্রেয় বা চন্দেল্লবংশীয় নরপতি। এই বংশীয় পরমর্দ্দি দেব ১২০১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাহার পরে ত্রৈলোক্য বর্ম্মা ১২০১ খ্রীঃ হইতে ১২৪১ খ্রীঃ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র বীর বর্ম্মা ১২৬১—১২৮৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং রাজাও হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রচলিত স্বুবর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

ত্রৈলোক্য মল্ল—তিনি নেপালের ভাতগাঁ'ও নগরের রাজা বিশ্বমল্লের পুত্র। তাঁহার অন্যনাম ত্রিভুবন মল্ল। তাঁহারা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

ত্রৈলোক্যমোহন—তিনি একজন শিল্প বা বাস্তুশাস্ত্র প্রণেতা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'ত্রৈলোক্যমোহন তন্ত্র'। গ্রন্থখানি এখন দুষ্প্রাপ্য।

ত্রোটক—তিনি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। তিনি আনন্দ গিরি নামেও পরিচিত ছিলেন। গীতার প্রসিদ্ধ টীকাকার এই আনন্দ গিরি নহেন।

ত্র্যম্বক ভট্ট—(১) তিনি বিষ্ণু দৈবজ্ঞ কৃত বিষ্ণুসরণ বা সৌরপক্ষসরণ নামক গ্রন্থের এক টীকা রচনা করেন।

ত্র্যম্বক ভট্ট—(২) তদ্রচিত 'স্বপ্নাধ্যায় ত্র্যম্বক' নামীয় একখানি গ্রন্থ আছে।

থক্কিয়—কাশ্মীরের অধিপতি জয়াপীড় (৭৪৮—৭৮০খ্রীঃ) অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার রাজসভায় নানা দেশীয় বহু পণ্ডিত বর্ত্তমান ছিলেন। মহারাজ থক্কিয়ের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিতেন। থক্কিয় প্রথমে মহারাজের মন্ত্রী শুক্র দত্তের পাচক ছিলেন।

থঙ্গাল জেনেরেল—মণিপুরের একজন প্রসিদ্ধ সেনাধ্যক্ষ। মণিপুররাজ শূরচন্দ্রের পিতামহ গম্ভীরসিংহের সময় হইতে তিনি মণিপুরে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দের মণিপুর যুদ্ধের সময়ে তাঁহারই আদেশে পাঁচজন উচ্চ পদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীকে বন্দী করিয়া হত্যা করা হয়। মণিপুর পরে ইংরেজাধিকৃত হইলে, থঙ্গাল ও টিকেন্দ্রজিতের ফাঁসী হয় (টিকেন্দ্রজিৎ দ্রষ্টব্য)। থঙ্গালের আদেশে যাঁহাদিগকে বধ করা হয়, তাঁহাদের মধ্যে আসামের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা কুইণ্টন সাহেব (James Wallace Quinton I. C. S.) একজন ছিলেন।

থর্ণটন, এডওয়ার্ড (Edward Thornton)—উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও গ্রন্থ রচয়িতা ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ইংলণ্ডস্থিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান কার্য্যালয়ে তিনি সুদীর্ঘকাল নানা উচ্চ দায়ীত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি নিম্নলিখিত মূল্যবান তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ সকল সংকলন করেন—India—Its State and Products; A Gazeteer of the Countries Adjacent to India on the North West; Gazeteer of the Territories Under the Government of E. I. Company; Chapters of the Modern History of British India. ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়!

থিব, জর্জ্জ ফ্রেডারিক উইলিয়াম (George Frederick William Thibaut)— খ্যাতনামা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি জাতিতে জর্ম্মন ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে জর্ম্মন দেশের হিডলবর্গ (Heidelberg) নগরে তাঁহার জন্ম হন। তাঁহার পিতা তত্রস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। স্বদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া, তিনি ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডে গমন করেন এবং কয়েক বৎসর ইংলণ্ড প্রবাসী, প্রসিদ্ধ জর্ম্মন ভারত-পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মোক্ষ মুলারের (Max Muller) সহকর্ম্মীরূপে কাজ করেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পদ লাভ করিয়া, ভারতে আগমন করেন। চারি বৎসর পরে, ঐ কলেজেরই অধ্যক্ষ পদ লাভ করেন। ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি কাশী হইতে এলাহাবাদের মিউর সেণ্ট্রাল

কলেজে (Muir Central College) এর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি ঐ কলেজেরই অধ্যক্ষ হন।

থিব ভারতীয় পুরাতত্ত্বে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় দর্শন জ্যোতিষ, অঙ্ক শাস্ত্র প্রভৃতিতেই তিনি প্রধানতঃ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। অন্যতম সংস্কৃত শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত রালফ্ গ্রিফিথ (Ralph Griffith) সাহেবের সহ-যোগীতায় তিনি, কাশী সংস্কৃত গ্রন্থ-মালা'র (Benares Sanskrit Series) অন্তর্গত অনেকগুলি গ্রন্থ সম্পাদন করেন। তদ্ভিন্ন নিজেও বহু গ্রন্থ অনু-বাদ ও সম্পাদন করেন। তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান—সানুবাদ বৌধায়ন রচিত গৃহ্যসূত্র; সানুবাদ অর্থ সংগ্রহ; বরাহমিহির রচিত পঞ্চ সিদ্ধান্ত (সানুবাদ, ইহার সম্পাদনে পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী তাঁহার সহ-যোগী ছিলেন); মোক্ষমুলারের সম্পাদিত "প্রাচ্য ধর্ম্ম গ্রন্থমালার" (Sacred Books of the East) অন্তর্ভূত বেদান্ত সূত্রের অনুবাদ (দুই খণ্ড; একখানি শঙ্করের ভাষ্য সমন্বিত, অপর খানি রামানুজের ভাষ্য সমন্বিত)। এতদ্ব্যতীত বুলার সাহেব (John Buhler) সম্পাদিত "ভারতীয় জ্ঞান-কোষ" (Encyclopaedia of Indian Researches) প্রভৃতি গ্রন্থাবলীতে তাঁহার বহু মূল্যবান প্রবন্ধাদি প্রকা-শিত হইয়াছিল।

কর্ম্ম জীবনের শেষে কয়েক বৎসর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্ম্ম সচিব (Registrar) ছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করিবার সময়ে তিনি পণ্ডিত বহুবল্লভ শাস্ত্রীর সহযোগীতায় একখানি বিদ্যালয় পাঠ্য সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

কর্ম্মজীবন শেষ করিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেইখানেই ১৯১৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়

দক্ষ—শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত বানিয়াচঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা কেশবমিশ্রের পুত্র। তাঁহার পুত্র নন্দন। নন্দনের গণপতি ও কল্যাণ নামে দুই পুত্র হয়, তন্মধ্যে কল্যাণের পুত্র বাহুধর ও পদ্মনাভ। এই পদ্মনাভ একজন স্বনাম ধন্য পুরুষ ছিলেন।

দক্ষরূপ—তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বেত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—পথ্যাপথ্যবিধি।

দক্ষিণ নাথ, দক্ষিণ তর্কনাথ, দক্ষিণ সিদ্ধনাথ—তাঁহারা সকলেই এক এক জন সিদ্ধাচার্য্য। অপাননাথ দেখ।

দক্ষিণ রায়—হালুমিয়া ও গোলাম মত্তালা নামক দুইজন মুসলমান কবির গ্রন্থে পাঠে জানা যায় যে সুন্দরবন অঞ্চলে মটুক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার গোঁসাইএর নাম দক্ষিণ রায় ছিল। তিনি খুব বীর পুরুষ ছিলেন। তাঁহার ভক্তেরা তাঁহাকে দেবতা স্থানে স্থাপন করিয়া পূজা আরম্ভ করেন। পরে তিনি একেবারে সর্ব্বসাধারণের পূজা দেবতা হইয়াছেন। এইরূপে পাবনা জিলার জালজীবী শম্ভুনাথ 'শম্ভুনাথ ঠাকুর' রূপে পূজিত হইতেছেন। ফরিদপুরের নলিয়া গ্রামের হরিঠাকুর দেশ বিদেশে পূজিত হইতেছেন।

দক্ষিণাবর্ত্ত নাথ—তিনি একজন প্রাচীন টীকাকার। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত প্রভৃতি গ্রন্থের তিনি উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার টীকার অনুকরণে মল্লিনাথ কোলাচল ভট্ট, রঘুবংশাদির টীকা রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের প্রথম যুগে যে সকল প্রতিভাবান বাঙ্গালী বাঙ্গালা দেশে এক নবযুগের আরম্ভ করিয়াছিলেন, দক্ষিণারঞ্জন তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা জগন্মোহন কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশীয় জমিদার সূর্য্যকুমার ঠাকুরের কন্যাকে বিবাহ করিয়া, গৃহজামাতারূপে কলিকাতাতেই বাস করিতে থাকেন। দক্ষিণারঞ্জনের জন্মের অল্পকাল পরেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। জগন্মোহন তৎপরে সূর্য্যকুমার ঠাকুরের মধ্যমা কন্যাকে বিবাহ করেন। ডেভিড হেয়ারের বিদ্যালয়ে দক্ষিণারঞ্জনের শিক্ষা আরম্ভ হয়। পরে তিনি হিন্দু কলেজে যোগদান করেন। রামতনু লাহিড়ী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার প্রভৃতি তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। ডিরোজিও'র অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের তিনি একজন পরম উৎসাহী সভ্য ছিলেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দ হইতে নিজ

ব্যয়ে 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিয়া ছাত্র সমাজে বিতরণ করিতে থাকেন। পত্রিকাখানি প্রায় তের বৎসর প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ পত্রিকায় প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম ও সামাজিক রীতিনীতির তীব্র সমালোচনা হইত। ডিরোজিওর শিষ্যগণের মধ্যে তিনি বিশেষভাবে নব্যভাবাপন্ন ছিলেন এবং তৎকালে 'নব্য' দলের সকল প্রকার প্রাচীন রীতি-নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ মনীষা ও মেধার পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি বন্ধুবৎসল, সহৃদয় ও পরোপচীকির্ষু ব্যক্তি ছিলেন। এইরূপ কথিত আছে যে, তিনি মহামতি ডেভিড হেয়ারের অর্থকষ্টের সময়ে তাঁহাকে বহুসহস্র মুদ্রা ঋণস্বরূপ প্রদান করেন। হেয়ার সাহেব সে সমুদয় অর্থ পরিশোধ করিতে না পারিয়া অ-দত্ত অর্থের বিনিময়ে কিছু ভূ-সম্পত্তি প্রদান করেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অন্যান্য সুহৃদগণও তাঁহার নিকট হইতে অনেক সময়ে অর্থ সাহায্য লাভ করিয়া উপকৃত হইয়াছিলেন। জনহিতকর কার্য্যের সহিতও দক্ষিণারঞ্জনের বিশেষ সহানুভূতি ও যোগ ছিল। কলিকাতাস্থ বেথুন কলেজ নামক নারী শিক্ষালয় যে ভূমিতে বর্ত্তমানে অধিষ্ঠিত, তাহা দক্ষিণারঞ্জনের প্রদত্ত।

হিন্দু কলেজের নব্য ভাবাপন্ন ছাত্রগণ একবার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করাতে, কৃষ্ণমোহনের মাতামহ তাঁহাকে গৃহ হইতে নিষ্কাষিত করিয়া দেন। কৃষ্ণমোহন অন্যত্র আশ্রয় না পাইয়া, দক্ষিণারঞ্জনের গৃহে আশ্রয় লয়েন। কিছুকাল পরে কৃষ্ণমোহনের 'ইন্কোয়ারার' পত্রে যখন প্রকাশিত হয় যে, দক্ষিণারঞ্জন প্রমুখ ডিরোজিওর শিষ্যগণের অনেকেই শীঘ্র খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তখন দক্ষিণারঞ্জনের পিতা কৃষ্ণমোহনকে, নিজ গৃহ হইতেও বিতাড়িত করেন। বন্ধুবৎসল দক্ষিণারঞ্জন ইহাতে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া নিজেও পিতৃভবন ত্যাগ করেন।

ডিরোজিওর মৃত্যুর পর, পূর্ব্বোক্ত অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন উঠিয়া যায়। কিছুকাল পরে তাঁহার শিষ্যবর্গ ঐরূপ একটি সভার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া, 'সাধারণ জ্ঞানার্জ্জন সভা' (The Society for the Acquisition of General Knowledge) নামে, আর একটি সভা স্থাপন করেন। হিন্দু কলেজের ভবনে উহার অধিবেশন হইত। একবার এক অধিবেশনে দক্ষিণারঞ্জন আদালত ও পুলিশের অবস্থা বিষয়ে, একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কলেজের অধ্যক্ষ

কলেজ ভবনে সভার অধিবেশন রহিত করিয়া দেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির (British India Society) তিনি একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। উক্ত সভার মুখপত্রস্বরূপ বেঙ্গল স্পেক্টেটর (Bengal Spectator) পত্রিকার সহিতও তাঁহার বিশেষ যোগ ছিল।

বৈষয়িক জীবনে তিনি কিছুকাল সদর আদালতে আইন ব্যবসায় করেন। পরে তিনি কলিকাতার কালেক্টার (Collector) নিযুক্ত হন। দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিই প্রথম ঐ পদ লাভ করেন। তিনি কিছুকাল ত্রিপুরার রাজদরবারে এবং মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারেও কাজ করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদে কাজ করিবার সময়ে তদানীন্তন নবাব নাজিম ফরেদুন জা বাহাদুর তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা সার চার্লস মেটকাফ (Sir Charles Metcalfe) যখন দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করেন, তখন সর্ব্বশ্রেণীর নাগরিকগণের দ্বারা আহুত, সার চার্লসের সম্বর্দ্ধনা সভায়, দক্ষিণারঞ্জন উচ্ছ্বসিত ভাষায়, তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

কোনও বৈষয়িক কার্য্যে দক্ষিণারঞ্জন একবার বর্দ্ধমান গমন করেন এবং তথায় বর্দ্ধমানের বিধবা রাণী বসন্তকুমারীর সহিত তাঁহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় এবং দক্ষিণারঞ্জন কলিকাতাতে আসিয়া অসবর্ণ বিবাহ আইন অনুসারে বসন্তকুমারীকে বিবাহ করেন। এই সকল কারণে তাঁহার পুরাতন বন্ধুগণ অনেকেই তাঁহার সংস্রব পরিত্যাগ করেন। তৎফলে খুব সম্ভব ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে দক্ষিণারঞ্জন কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ প্রবাসী হন।

লক্ষ্ণৌতে ক্রমে তিনি বাঙ্গালী সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। এমন কি পরে নিজ ক্ষমতাতে তিনি যুক্তপ্রদেশের একজন প্রথম শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হন। সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে, তিনি ইংলণ্ডের টাইম্‌স (The Times) পত্রিকায় তিনি ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কয়েকটি সুচিন্তিত সন্দর্ভ প্রকাশ করেন।

সিপাহী বিদ্রোহের একটি প্রধান কেন্দ্র অযোধ্যায় ছিল। বিদ্রোহের পর ঐ প্রদেশবাসী সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তিদিগকে বশীভূত করিবার জন্য, একজন যোগ্য ব্যক্তির প্রয়োজন অনুভূত হয়। তখন অযোধ্যায় ইংরেজ বিদ্বেষ এত প্রবল ছিল যে, কোনও ইংরেজ দ্বারা ঐ কাজ সম্ভবপর ছিল না। সেইজন্য কর্ত্তৃপক্ষ একজন সুযোগ্য দেশীয় ব্যক্তির সন্ধান করিতে থাকেন।

দক্ষিণারঞ্জনই, ঐ কাজের উপযুক্ত বিবেচনায়, বড়লাট লর্ড ক্যানিং তাঁহাকেই মনোনয়ন করিয়া, অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন। সুপ্রসিদ্ধ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক আলেকজাণ্ডার ডাফ (Alexander Duff) এই বিষয়ে দক্ষিণারঞ্জনকেই সুপারিশ করেন। বিদ্রোহের সময়ে শঙ্করপুরের তালুকদার রাজা বেণীমাধব বক্স বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। এই অপরাধে, তাঁহার তালুক বাজেয়াপ্ত হয়। ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবরমাসে, লক্ষ্ণৌনগরে একটি দরবার করিয়া, বড়লাট ঐ তালুকটি দক্ষিণারঞ্জনকে প্রদান করেন। তৎসঙ্গে তিনি অবৈতনিক অ্যাসিষ্টাণ্ট কমিশনারের সম্মানিত পদও লাভ করেন। ঐ সময় হইতেই কলিকাতার পরিবর্ত্তে অযোধ্যা তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র হইল। স্থায়ীভাবে ঐ প্রদেশেই বাস করার প্রয়োজন হওয়ায়, দক্ষিণারঞ্জন যতদূর সম্ভব আচার ব্যবহার, পোষাকপরিচ্ছদে ঐ প্রদেশবাসীর মত চলিতে আরম্ভ করেন।

ইংরেজি শিক্ষা ও তদানুষঙ্গিক প্রভাব, পশ্চিমোত্তর প্রদেশে তখনও বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে নাই। ধনী ও সম্ভ্রান্ত জনের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষা ও মার্জ্জিত ভাবের বিশেষ অভাব ছিল। যেসকল প্রবাসী বাঙ্গালীর চেষ্টায়, সেই তামসিক ভাবাপন্ন সমাজে, উন্নত ভাবধারা প্রবাহিত হয়, তিনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে লক্ষ্ণৌতে জমীদার সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য যে শিক্ষায়তন (Wards Institution) স্থাপিত হয়, দক্ষিণারঞ্জন তাহার একজন বেসরকারী পরিদর্শক নিযুক্ত হন। তাঁহারই বিশেষ চেষ্টায় অযোধ্যার তালুকদার সংঘ (Taluqdar's Association) প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তিনি উহার প্রথম কর্ম্মসচিব (Secretary) মনোনীত হন। লক্ষ্ণৌএর প্রসিদ্ধ ক্যানিং কলেজ প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যেও তিনি একজন প্রধান ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত তালুকদার সভার মুখপাত্র লক্ষ্ণৌ টাইমস (The Lucknow Times) পত্রিকার স্বত্ব, তিনি ক্রয় করিয়া লইয়া, কয়েক বৎসর পরিচালনা করিয়াছিলেন।

তালুকদার সভা স্থাপন ব্যতীত, তিনি তালুকদার সভার মুখপত্র স্বরূপ 'সমাচার হিন্দুস্থানী' ও 'ভারত পত্রিকা' নামক দুইখানি সংবাদপত্রও প্রকাশ করেন। অযোধ্যাপ্রবাসী রাজপুতগণের মধ্যে শিশু কন্যা হত্যা নিবারণ কল্পে, তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহার পরিচালনাগুণে, তালুকদার সভা রাজনীতিক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

বিবিধ জনহিতকর কাজের নায়ক ছিলেন বলিয়া, কৃতীত্বের পুরস্কারস্বরূপ বড়লাট লর্ড মেয়ো (Lord Mayo)

পুনরায় তাঁহাকে রাজা উপাধি দান করেন। পারিবারিক জীবনে দক্ষিণারঞ্জন প্রথমে বিশেষ সুখী ছিলেন না। তাঁহার প্রথমা পত্নী, হরচন্দ্র ঠাকুরের কন্যা ছিলেন। তিনি চিররুগ্না ছিলেন। পরে তিনি বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্রের অন্যতমা বিধবা রাণী বসন্তকুমারীকে বিবাহ করেন। প্রথমে সনাতন হিন্দু প্রণালীতে অনুষ্ঠান হয়, পরে অসবর্ণ বিবাহ আইন সিদ্ধ করিবার জন্য ১৮৭২ অব্দের তিন আইন (Act III of 1872) মতে উহা রেজিষ্টারী হয়।

১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে জুলাই মাসে মস্তিষ্ক পীড়ায় প্রায় চৌষট্টি বৎসর বয়সে লক্ষ্ণৌনগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দণ্ডক—তিনি কাশ্মীর পতি কলসের (১০৭৩—৮৯ খ্রীঃ) মহত্তর নামক কর্ম্মচারী ছিলেন। কলস রাজের পুত্র হর্ষ পিতৃদ্রোহী হন। কিন্তু রাজা ইহা সহজেই প্রশমিত করিয়া পুত্রকে ক্ষমা করেন। পুত্রের সঙ্গে যাহারা বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এমন সময়ে জানিতে পারিলেন যে, বিদ্রোহীরা হর্ষকে হস্তগত করিয়া, আবার বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত করিতেছে। এই বিপদ হইতে দণ্ডক হর্ষকে কৌশলে উদ্ধার করিয়া, রাজার প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।

দণ্ডী—তাঁহার রচিত কাব্যাদর্শ ও দশকুমার চরিত অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তিনি খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

দণ্ডী মহাদেবী—তিনি উড়িষ্যার কর-বংশীয় নরপতি দ্বিতীয় শোভাকরের কন্যা। শোভাকরের মৃত্যুর পরে, তাঁহার মহিষী গৌরী মহাদেবী কিছুকাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তৎপরে ৯৫৮—৯৬৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত, দণ্ডী মহাদেবী রাজ্য শাসন করেন। তাঁহার পরে করবংশীয়দের বিষয় আর কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় না। সম্ভবতঃ ভঞ্জবংশীয়েরা রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন। উন্মত্ত সিংহ দ্রষ্টব্য।

দত্তক—তাঁহার জন্মস্থান পাটলীপুত্র নগর। তিনি কামশাস্ত্র সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া চারায়ণ, সুবর্ণ নাভ, ঘোটক মুখ, গোনর্দ্দিয়, গণিকা পুত্র, কুচুমার প্রভৃতিও উক্ত কামশাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

দত্তজি সিন্ধিয়া— গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা রণজী সিন্ধিয়ার পঞ্চ পুত্রের মধ্যে তিনি তৃতীয় ছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার অধীনে অশীতি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে আহাম্মদ শাহ আবদালীর সঙ্গে যুদ্ধে তিনি সমর শয্যায় শয়ন করেন। রণজী সিন্ধিয়া দেখ।

দত্ত দেবী—প্রাগ জ্যোতিষপুরের নরপতি সমুদ্রবর্ম্মার মহিষী। পুষ্যবর্ম্মা দ্রষ্টব্য।

দত্তরাম—তিনি একজন বিশিষ্ট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বেত্তা। তাঁহার রচিত—বর্ষাচন্দ্রোদয়, নাড়ী দর্পণ, নাড়ী প্রকাশ, রসরাজমহোদধি প্রভৃতি গ্রন্থ খুব বিখ্যাত।

দত্তাত্রেয়—(১) এই পণ্ডিত 'ঘটিতালঙ্কার' নামক একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

দত্তাত্রেয়—(২) দত্তাত্রেয় দৈবজ্ঞ 'বিবাহ ভূষণ' নামক গ্রন্থের রচয়িতা।

দত্তাত্রেয়—(৩) তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বেত্তা। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম—'নাড়ী পরীক্ষা'। (৪) তিনি একজন মুক্তযোগী ও বিদ্বান্ সন্ন্যাসী। তাঁহার প্রণীত যোগ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় দত্তাত্রেয় সংহিতা ও দত্তাত্রেয়োপনিষৎ সন্ন্যাসীগণের অতি আদরের বস্তু। গিরনার পর্ব্বতে দত্তাত্রেয় প্রবর্ত্তিত যোগী সম্প্রদায় এখনও বর্ত্তমান আছে। গিরিনার শৈল জৈনদের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান, গুজরাটের অন্তর্গত জুনাগড় হইতে দশ মাইল পূর্ব্বদিকে।

দত্থু—১৫৩৩ খ্রীঃ অব্দে গুর্জ্জর পতি সুলতান বাহাদুর চিতোর আক্রমণ করেন। সেই সময়ে চিতোর রক্ষার্থে যে সকল বীরপুরুষ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, চন্দাবৎসর্দ্দার, সত্যু ও দত্থু তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। তাঁহারা অসংখ্য মুসলমান সৈন্য নিপাত করিয়া সমরশায়ী হন।

দদ্দ—(প্রথম) তিনি গুর্জ্জরবংশীয় ব্রোচ ও নন্দীপুরের (বর্ত্তমান রাজপিপ্‌লা রাজ্যে অন্তর্গত নন্দোরী) প্রথম নরপতি। তাঁহারা মহাভারতোক্ত কর্ণের বংশধর বলিয়া বলেন। তাঁহারা ভীলমলের গুর্জ্জরবংশীয় নরপতিদের সামন্ত রাজা ছিলেন। এই বংশের ছয়জন রাজার নাম বিশ্বাসযোগ্য সন তারিখ সহ পাওয়া যায়। তাঁহাদের নাম দেওয়া হইল—দদ্দ (১ম)—৫৮০ খ্রীঃ, জয়ভট্ট (১ম)—৬০৫ খ্রীঃ, দদ্দ (২য়)—৬৩৩ খ্রীঃ, জয়ভট্ট (২য়)—৬৫৫ খ্রীঃ, দদ্দ (৩য়)—৬৮০ খ্রীঃ, জয়ভট্ট (৩য়)—৭০৬—৭৩৪, খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত।

দদ্দ—(দ্বিতীয়) দদ্দ প্রথম দেখ।

দদ্দ—(তৃতীয়) দদ্দ প্রথম দেখ।

দধিবাহন—'বর্দ্ধমান দেশনা' নামক জৈন গ্রন্থে চম্পাপুরীর জৈন ধর্ম্মাবলম্বী অধীশ্বর দধিবাহন নামক রাজার উল্লেখ আছে।

দনুজমর্দ্দন দেব—তিনি চন্দ্রদ্বীপের রাজা ছিলেন। ১৪১৬ খ্রীঃ অব্দের তাঁহার নামীয় মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার রাজধানী পাণ্ডুয়া নগরে ছিল। দনুজমর্দ্দনের পুত্র মহেন্দ্র দেব ও রামাবল্লভ দেব, রামাবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ দেব রায়, তৎপুত্র হরিবল্লভদেব রায়,

তৎপুত্র জয়দেব রায়। তাঁহারা সকলেই চন্দ্রদ্বীপের রাজা ছিলেন।

দনুজ মাধব—তিনি বাঙ্গালা দেশের একজন স্বাধীন রাজা। তিনি ১২৮০খ্রীঃ অব্দে দিল্লীর সুলতান ঘিয়াসউদ্দিন বলবনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

দনুজ রায়—১২৮২ খ্রীঃ অব্দে তিনি পূর্ব্ববঙ্গের স্বাধীন নরপতি ছিলেন। তাঁহার পিতামহ দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন, পিতা সুষেণ বা সুর সেন। দনুজ রায়ের পুত্র দ্বিতীয় বল্লাল সেনের সময়ে ১৩০০ শকে (১৩৭৮ খ্রীঃ) গোপাল ভট্ট কর্ত্তৃক বল্লালচরিত গ্রন্থ রচিত হয়।

দনুজারি মিশ্র—এই বৈদিক ব্রাহ্মণ বিরচিত 'সারাবলী' নামে একখানা কুল গ্রন্থ আছে। তাহা হইতে অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়।

দন্তিগ—তিনি পল্লববংশীয় এবং কাঞ্চীর রাজা ছিলেন। ৮০৪ খ্রীঃ অব্দে রাষ্ট্রকূট-বংশীয় তৃতীয় গোবিন্দ তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

দন্তীদুর্গ—তিনি রাষ্ট্রকূটবংশীয় নরপতি ইন্দ্রের পুত্র ও কর্কের পৌত্র। এক সময়ে রাষ্ট্রকূটবংশীয়েরাই মহারাষ্ট্রে প্রধান ছিলেন। চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় পুলকেশী প্রবল হইয়া. রাষ্ট্রকূটবংশকে সামন্ত শ্রেণীতে পরিণত করিয়াছিলেন। দন্তীদুর্গ প্রবল হইয়া, তাঁহাদিগকে পরাজিত করেন এবং রাষ্ট্রকূটবংশের পুন প্রাধান্য স্থাপন করেন। তিনি চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় কীর্ত্তিবর্ম্মাকে পরাস্ত করিয়া, রাজধানী বাদামী অধিকার করেন। তিনি অনপত্য অবস্থায় কাল-গ্রাসে পতিত হইলে, তাঁহার পিতৃব্য কৃষ্ণরাজ সিংহাসনে অরোহণ করেন।

দন্তিবর্ম্মা—(প্রথম) তিনি রাষ্ট্রকূট-বংশীয় নরপতি। তাঁহারা রট্ট উপাধি-ধারী ক্ষত্রিয় বংশ জাত। মহারাষ্ট্র দেশের তাঁহারাই প্রাচীন অধিবাসী এবং তাঁহাদের নামানুসারেই দেশের নাম হইয়াছে। মৌর্য্য নরপতি অশো-কের সময়েও রাষ্ট্রকূটগণ তদ্দেশের অধিবাসী ছিলেন। রাষ্ট্রকুট রাজবংশের তাম্র শাসনে তাঁহারা যদুবংশীয় বলিয়া আপনাদের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যে ইলোরা পর্ব্বত গুহায় দশাবতারের বিগ্রহ আছে। তাঁহার পাদপীঠে মান্যখেতের রাষ্ট্রকূট রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা দন্তিবর্ম্মার নাম পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ তিনি খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে বর্ত্তমান ছিলেন। মান্যখেতের রাষ্ট্রকূট বংশের অভ্যুদয়কাল এখনও অজ্ঞাত। কিন্তু ৯৭২ খ্রীঃ অব্দে চালুক্যবংশীয় তৈলপ্প কর্ত্তৃক মান্যখেতের রাষ্ট্রকূট পতি রাজ্য-চ্যুত হইয়াছিলেন। দন্তিবর্ম্মার পৌত্র প্রথম গোবিন্দের পুত্র প্রথম কর্ক। এই কর্কের পৌত্র দন্তিদুর্গ বা দ্বিতীয় দন্তিবর্ম্মা বাদামী বা বাতাপীপুরের চালুক্য রাজগণকে পরাজিত করিয়া

দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

দন্তিবর্ম্মা—(দ্বিতীয়) সমনগড় তাম্র শাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কর্ণাট দেশীয় সেনা উত্তরাপথেশ্বর শ্রীহর্ষকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দন্তিবর্ম্মা সেই কর্ণাট সেনাকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন। দন্তিবর্ম্মা অপুত্রক পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পিতৃব্য প্রথম কৃষ্ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। গুর্জ্জর প্রতীহারবংশীয় বৎস রাজ, কান্যকুব্জরাজ ইন্দ্রায়ুধ ও রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কৃষ্ণ, এই তিনজন ৭৮৩খ্রীঃ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। প্রথম দন্তিবর্ম্মা দেখ।

দন্তিবর্ম্মা—(তৃতীয়) তিনি রাষ্ট্রকূট পতি দ্বিতীয় ইন্দ্রের পৌত্র ও তৃতীয় কক্কের পুত্র।

দবিরউদ্দৌলা আমীর-উল-মুল্‌ক, নবাব—পারস্যের রাজদূত বোম্বে নগরে কোনও বিবাদে নিহত হয়। ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য,ইংরেজ সরকার দবিরউদ্দৌলাকে পারস্য রাজ্যে দূতরূপে প্রেরণ করেন। সেখানে সন্তোষজনকভাবে কাজ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, ইংরেজ সরকার তাঁহাকে আবার আভা নগরে বর্ম্মার রাজার নিকটে, রাজদূত স্বরূপ প্রেরণ করেন। এই কার্য্যের পর তিনি কিছুদিন দিল্লীর নাম মাত্র পাতশাহ দ্বিতীয় আকবর শাহের মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

দমন—এরণ্ডপল্লব দেশের অধিপতি। খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি মগধের অধিপতি সমুদ্রগুপ্তকর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়াছিলেন।

দমরাজ—তিনি জয়শল্মীর পতি বিজয় সিংহের কর্ম্মচারী। এক সময়ে তিনি আজমীর দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন। সেই সময়ে কিষণগড়ের অধিপতি বাহাদুর সিংহ নামক একজন সামন্ত নরপতি কোন কারণে বিজয় সিংহের প্রতি বিরক্ত হইয়া, তাঁহার শত্রু সিন্ধিয়ার সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। সিন্ধিয়ার ফরাসী সেনাপতি এই সুযোগে আজমীর দুর্গ আক্রমণ করেন। এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার শক্তি দুর্গাধ্যক্ষ দমরাজে খুব ছিল। কিন্তু জয়শল্মীর পতি বিজয় সিংহ ভয় পাইয়া, দমরাজকে দুর্গ শত্রু হস্তে সমর্পণ করিতে লিখিলেন। সমর্থ দমরাজ দুর্গ সমর্পণ করিবার অপমান সহ্য করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এদিকে রাজার আদেশ দুর্গ সমর্পণ না করিয়াও পারেন না। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া, তিনি বিষ পানে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়া গেলেন—'রাজাকে বলিও, তাঁহার আদেশ পালনের আমি অন্য উপায় পাইলাম না। আমি না মরিলে, দাক্ষিণীগণ (মহারাষ্ট্রীয়েরা—সিন্ধিয়ার সৈন্যেরা) আজমীরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না, সেইজন্য আমি মরিলাম।

দয়ানন্দ, ঠাকুর—বাঙ্গালী সাধক ও ধর্ম্মাচার্য্য। শ্রীহট্ট জিলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বামৈ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ চৌধুরী বংশে ১২৮৮ বঙ্গাব্দের জ্যেষ্ঠ মাসে (১৮৮১ খ্রীঃ মে) তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম গুরুচরণ চৌধুরী। তিনি হবিগঞ্জের একজন প্রধান মোক্তার ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম কামাখ্যা দেবী। দয়ানন্দের গৃহস্থাশ্রমের নাম ছিল গুরুদাস চৌধুরী।

দয়ানন্দ প্রথম জীবনে বিদ্যালয়ের শিক্ষা অধিক লাভ করিতে পারেন নাই। পড়াশুনাতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহও ছিল না। ছাত্রাবস্থাতে এক সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তাঁহার প্রভাবে দয়ানন্দের মতি গতি পরিবর্ত্তিত হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই পাঠ ত্যাগ করিয়া চাকুরী গ্রহণপূর্ব্বক গৌহাটীতে গমন করেন। তথা হইতে শিলং পরে শিলচরে গমন করেন। এই শিলচরই পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র হয়। এই সময়েই তাঁহার মনে ধর্ম্মভাবের উদ্ভব হয়। কীর্ত্তনে তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল। অনেক লোক ঐ সময় হইতে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকেন।

১৩০৮ বঙ্গাব্দের প্রথমভাগে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার প্রথমা পত্নীর নাম সর্ব্বমঙ্গলা দেবী। ১৩১২ বঙ্গাব্দে তিনি পরলোক গমন করিলে গুরুদাস দ্বিতীয়বার কাদম্বিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

১৩১৫ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিনে তিনি শিলচর নগরীর সন্নিকটস্থ এক স্থানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ আশ্রমের নাম অরুণাচল আশ্রম রাখা হয়। ঐ সময় হইতে অনেক লোক তাঁহার ধর্ম্মভাবে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে থাকেন। ১৩১৬ বঙ্গাব্দের মধ্যভাগ হইতে তিনি দয়ানন্দ নামে পরিচিত হন। তদবধি আশ্রমের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়িতে থাকে।

কয়েক বৎসরের মধ্যে, কি কারণে সঠিক জানা যায় না, অরুণাচল আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ দৃষ্টিতে পতিত হইল। তৎফলে দয়ানন্দ ঠাকুর একবার গ্রেপ্তার হন। তাঁহার নিজের ও শিষ্যগণের কার্য্য কলাপ গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করা হইল। পরে এই নিয়ন্ত্রণাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়।

সম্প্রতি তিনি ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে (১৮৩৭ খ্রীঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গ আসামের বহু স্থানে তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিশেষ বিস্তৃত হইয়াছিল।

দয়ানন্দ সরস্বতী—খ্যাতনামা ধর্ম্মসংস্কারক সন্ন্যাসী ও আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি গুজরাটের অন্তর্গত

কাটিওয়াড়ের প্রদেশে মর্ভি নামক এক ক্ষুদ্র নগরে ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উদিচ্য ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত ছিলেন। দয়ানন্দের পিতা একজন বিশিষ্ট শিবোপাসক ছিলেন। পিতার ধর্ম্মনিষ্ঠা পুত্রেও বর্ত্তিয়াছিল। দয়ানন্দ বাল্যকাল হইতেই শিব পূজা ও তদানুষঙ্গিক ব্রত-উপবাসাদিতে অভ্যস্ত ছিলেন

কৌলিক প্রথানুযায়ী দয়ানন্দের শিক্ষা আরম্ভ হয়। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত তিনি রুদ্রাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। তৎপরে অন্যান্য বেদ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ও দর্শনশাস্ত্রাদিও অধ্যয়ন করেন। তাঁহার জ্ঞানপিপাসা অতি তীব্র ছিল। তিনি কাশীধামে গমন করিয়া, আরও শাস্ত্রাদি পাঠে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু মাতার একান্ত আপত্তি হওয়ায় তাহা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু স্বাভাবিক জ্ঞানস্পৃহার জন্য যৌবনের প্রারম্ভেই বিবিধ শাস্ত্রে পারদর্শীতা লাভ করেন।

বাল্যকালেই তাঁহার পিতামহ ও এক সহোদরার মৃত্যু হওয়ায়, তিনি গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হন। ঐ বাল্যকালেই, সকল জীবের পরিণাম চিন্তা করিয়া, বালক দয়ানন্দ চিন্তান্বিত হইলেন। মৃত্যুচিন্তা ও মৃত্যুর আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায়, তাঁহাকে এতদূর ব্যাকুল করিয়া তুলিল যে, তিনি আত্মীয় স্বজনকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন জগতে অমরত্ব লাভের কোনও উপায় আছে কিনা? ঐ সময় হইতে গভীর বৈরাগ্য তাঁহার মনকে অভিভূত করে। তাঁহার পিতামাতা তাঁহার মনোভাবের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। কোনও মতে পরিত্রাণের উপায় না পাইয়া, অবশেষে ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি গৃহ হইতে পলায়ন করেন।

গৃহত্যাগ করিয়া কিছুকাল যথেচ্ছ পর্য্যটন করিয়া, তিনি সিদ্ধপুর নামক স্থানে সন্ন্যাসীদের এক মেলায় উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পিতা লোকমুখে সংবাদ পাইয়া, প্রহরীসহ তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য, মেলায় গমন করেন। ঐরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে পিতাকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তিনি অতিশয় ভীত হইলেন এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রথমে পিতার সহিত গৃহে প্রত্যাগমনে সম্মত হইলেন। কিন্তু একদিন রাত্রকালে যখন সকলে নিদ্রিত ছিলেন তখন দয়ানন্দ পুনরায় পলায়ন করিলেন।

সিদ্ধপুরে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তিনি শঙ্করপন্থী এক সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষিত হইয়া শুদ্ধ চৈতন্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিদ্ধপুরের মেলা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, তিনি প্রথমে আহমদাবাদে উপনীত হন। তৎপরে ক্রমে বরোদা, বারাণসী, ব্যাসাশ্রম প্রভৃতি

বহুস্থানে পর্য্যটন করেন এবং নানাস্থানে বিভিন্ন সন্ন্যাসীদের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। এইভাবে প্রায় আট বৎসর অতিবাহিত করিয়া, ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় উপস্থিত হন। তৎপরে পুনরায় বহু তীর্থস্থান ও প্রসিদ্ধ নগরনগরী পরিভ্রমণ করিয়া, তিনি মথুরাধামে উপস্থিত হন। এই সময়ের মধ্যেই তিনি চানোদ কল্যাণী নামক স্থানে, পরমানন্দ পরমহংসের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক দয়ানন্দ সরস্বতী আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি বহু খ্যাতনামা সাধু সন্ন্যাসীর সহিতও পরিচিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নিকট যোগবিদ্যার অনেক নিগূঢ়তত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন। টেহরি নামক স্থানে অবস্থানকালে তিনি কিছুকাল তন্ত্র শাস্ত্রের আলোচনা করেন। কিন্তু ঐ আলোচনাতে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার মন বিরূপ হয়। তিনি তন্ত্র আলোচনা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রধানতঃ দর্শন ও যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থাদিই পাঠে নিয়ত থাকেন।

১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে দয়ানন্দ মথুরাতে উপস্থিত হন। তথায় তিনি মথুরাবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিরজানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বিরজানন্দ দণ্ডী সন্ন্যাসী ছিলেন। দয়ানন্দ মথুরাতে ছয় বৎসর অবস্থান করেন এবং বিরজানন্দের নিকট শাস্ত্রাদি নূতনভাবে শিক্ষা করেন। বিরজানন্দ জন্মান্ধ ছিলেন কিন্তু অসাধারণ প্রজ্ঞা ও স্মৃতিশক্তির বলে, তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। দয়ানন্দ নিজ গুরুকে প্রজ্ঞাচক্ষু নামে অভিহিত করিতেন। বিরজনন্দও দয়ানন্দকে 'কালজিহ্ব' আখ্যা প্রদান করেন। কালজিহ্ব অর্থ যাহার জিহ্বা অসত্য বা ভ্রান্তিজাল খণ্ডনে কালস্বরূপ হইবে। তদ্ভিন্ন তিনি তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে কুলক্করও বলিতেন। কুলক্কর অর্থ বিচার ক্ষেত্রে কুলক্কর অর্থাৎ খোঁটার মত অবিচলিত থাকে।

বিরজানন্দের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, দয়ানন্দ প্রথম আগ্রায় গমন করিয়া, দুই বৎসর তথায় অবস্থান করেন। তথায় তিনি প্রধানতঃ যোগাভ্যাস ও শাস্ত্রালোচনাতেই কাল কর্ত্তন করিতেন। স্বীয় মতামত সেই সময়ে পরিস্ফুটভাবে ব্যক্ত করিতেন না। তবে তাঁহার সহিত আলাপের ফলে অনুমিত হইত যে, তিনি বৈষ্ণব মতের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন এবং শৈবমতকে অপেক্ষাকৃত সমর্থন করিতেন। আগ্রাতে দুই বৎসর অবস্থান করিয়া, তিনি গোয়ালিয়র নগরে গমন করেন। সেই স্থানে অবস্থানকালেও তিনি বৈষ্ণব মতের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতেন। তৎপরে তিনি কেরোলিতে গমন ও কিছুকাল তথায় অবস্থান করেন এবং তথা হইতে

জয়পুরে গমন করেন। তথায় হরিশ্চন্দ্র নামক একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মতাবলম্বী ব্যক্তিকে শৈবমতে আনয়ন করাতে, জয়পুরে শৈবমতের বিশেষ প্রচার হয়। স্বয়ং মহারাজাও ঘোর শৈব মতানুসারী হন। এযাবৎ বৈষ্ণব মতের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া, শৈবমত স্থাপনে সচেষ্ট থাকিলেও, দয়ানন্দ স্বয়ং তখন পর্য্যন্তও ঠিক কোন্ মত অবলম্বন করিবেন, তাহা নিশ্চিতরূপে ধারণা করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য মনের সংশয় দূর করিবার জন্য তিনি পুনরায় মথুরায় গুরু সন্নিধানে, উপস্থিত হইলেন এবং নিজের মনের সকল সংশয় অকপটে তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। তথায় কিছুকাল গুরুর সহিত শাস্ত্রালোচনা করিয়া, দয়ানন্দ সংশয় মুক্ত হইলেন। বিরজানন্দ তাঁহাকে ভারতে বৈদিক ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য উপদেশ প্রদান করিলেন।

অতঃপর গুরুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া দয়ানন্দ হরিদ্বারে কুম্ভ মেলায় গমন করিলেন। তথায় তিনি তাঁহার পর্ণকুটীরোপরি 'পাষণ্ডমর্দ্দন' বাক্য অঙ্কিত এক পতাকা উড্ডীন করিলেন। তথায় উপস্থিত সাধু সন্ন্যাসী অনেকের সহিত তিনি বৈদিক ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বিচার করেন। কিন্তু বিশেষ ফল লাভ করিতে পারিলেন না। বৈদিক ধর্ম্ম গ্রহণের জন্য লোকের কোনও উৎসাহ নাই দেখিয়া, তিনি নিজেও কিয়ৎপরিমাণে নিরুৎসাহ হইলেন এবং কিছুকাল মেলাক্ষেত্রে যোগাবলম্বন করিয়া, অবস্থানপূর্ব্বক কুম্ভের অবসানে তৎস্থান পরিত্যাগ করিলেন।

তৎপরে কিছুকাল তিনি যুক্তপ্রদেশের অনেক স্থানে পর্য্যটন করিয়া, বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার মতবাদ প্রচার করিতে যাইয়া, তিনি প্রচলিত বিগ্রহপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন। তৎফলে সনাতন পন্থী ব্যক্তিরা তাঁহার উপর বিলক্ষণ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ফরক্কাবাদ ও রামগড়ে একাধিকবার তাঁহারা স্বামিজীর প্রাণবধের চেষ্টা করিলেন। তৎসত্ত্বেও তিনি অকুতোভয়ে, সর্ব্বত্র মূর্ত্তি পূজার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। এইভাবে ফরক্কাবাদ, রামগড়, কানপুর, প্রয়াগ প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানে, পর্য্যটন করিয়া ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দের শেষভাগে কাশীতে গমন করিলেন।

দয়ানন্দের উপস্থিতিতে কাশীতে এক প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল। মূর্ত্তি পূজার বিরুদ্ধে তাঁহার প্রচার বার্ত্তা পূর্ব্বেই কাশীধামবাসী পণ্ডিতগণের গোচরে আসিয়াছিল। তৎপরে যখন সংবাদ আসিল যে দয়ানন্দ বৈদিক ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য, স্বয়ং কাশীধামেই উপস্থিত হইয়াছেন, তখন কাশীনিবাসী শাস্ত্রিগণ এবং ধর্ম্ম-

ব্যবসায়ী পাণ্ডাগণ বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। দয়ানন্দের মত প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রানুমোদিত কিনা, তাহা জানিবার জন্য জনসাধারণের মধ্যেও বিশেষ কৌতুহল জাগ্রত হইল। দয়ানন্দ স্বয়ংই যথন প্রচার করিলেন মূর্ত্তি পূজা খণ্ডণ ও বৈদিকধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য পণ্ডিতদের সহিত বিচারার্থী হইয়াছেন, তখন তাঁহাকে উপেক্ষা করা পণ্ডিত মণ্ডলীর পক্ষে অসম্ভব হইল। অবশেষে ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসের মধ্যভাগে, বিচারের জন্য এক দিন নির্দ্দিষ্ট হইল। ঐ বিচার সভায় কাশীনরেশ সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। তাঁহার সভা-পণ্ডিত তারাচরণ তর্করত্ন, পণ্ডিতবর বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, বালশাস্ত্রী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ, দয়ানন্দের আবাস-স্থান আনন্দবাগ নামক উদ্যানে সমাগত হইলেন। সহস্র সহস্র ব্যক্তি কৌতুহল নিবৃত্তির, জন্য উক্ত সভায় উপস্থিত হইল। উক্ত পণ্ডিতাগ্রগণ্যদের সহিত দয়ানন্দের বেদ প্রামাণ্য কিনা ইহা লইয়া বিচার আরম্ভ হইল। পরে উহা মূর্ত্তি পূজার যৌক্তিকতা আছে কিনা তদ্বিষয়ে পরিণত হইল। বিচারে বাস্তবিক দয়ানন্দ পরাজিত হইয়া-ছিলেন কিনা, তদ্বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ রহিয়াছে। সমসাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত বিবরণ হইতে প্রতীতি হয় যে, দয়ানন্দ বিজয়ী না হইলেও বিচার যথাযথভাবে নির্ব্বাহ হয় নাই। অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই উহা। পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু সনাতন পন্থী ব্যক্তিরা সংস্কৃত ও হিন্দিতে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন যে, বিচারে দয়ানন্দের পরাজয় হইয়াছে। ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দের প্রথমভাগে তিনি কাশী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন।

বৎসরাধিককাল পরে তিনি (১৮৭২ খ্রীঃ ডিসেম্বর) কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতাতে তিনি রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উদ্যান বাটিকাতে অবস্থান করিতেন। এযাত্রা কলিকাতাতে তিনি প্রায় চারি মাস অবস্থান করিয়া-ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে কলিকাতার তৎকালীন প্রধান প্রধান মনস্বীগণের সহিত, অনেক আলাপ আলোচনা হয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর, মনস্বী রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তিদিগের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্প্রীতি স্থাপিত হয়। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পরি-চালিত ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করেন। কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া তিনি প্রথমে হুগলীতে গমন করেন। তথায় পণ্ডিতবর তারাচরণ তর্করত্নের সহিত বিচার হয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনস্বীগণ ঐ বিচার কালে উপস্থিত ছিলেন। তদ্ভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক লালবিহারী

দে'র সহিতও তাঁহার বর্ণভেদ বিষয়ে বিচার হইয়াছিল।

বাঙ্গালাদেশ হইতে প্রস্থান করিয়া, তিনি বিহারে গমন করেন এবং বিহারের ছাপরা, ডুমরাওন প্রভৃতি স্থানে কিছুকাল অবস্থান করিয়া, পুনরায় কাশীতে উপনীত হন। এযাত্রা তিনি তথায় একটি বৈদিক পাঠশালা (বেদ বিদ্যালয়) স্থাপন করেন। পণ্ডিত শিবকুমার শাস্ত্রী উহার প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অতঃপর কিছুকাল ফরক্কাবাদে অবস্থান করিয়া, এলাহাবাদে গমন করেন। তথায় সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম ও ইসলাম সম্বন্ধে তত্তৎমতাবলম্বীদের সহিত তাঁহার আলোচনা ও বিচার হয়। কিছুকাল এলাহাবাদে থাকিয়া ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দের মধ্যভাগে জব্বলপুর গমন করেন, এবং মাত্র অল্প কিছুদিন তথায়থাকিয়া বোম্বাইতে উপস্থিত হন।

বোম্বাই প্রদেশের আহম্মদাবাদ, ইন্দোর, বরোদা প্রভৃতি বহুস্থানে তিনি পর্য্যটন করেন। সর্ব্বত্রই মূর্ত্তি পূজার প্রতিবাদ ও বৈদিকমত প্রচার উপলক্ষে বক্তৃতা, আলোচনা ও বিচার হয়। তিনি যখন যেখানেই গিয়াছিলেন, সেইখানেই একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। একপক্ষে সনাতন পন্থীরা তাঁহার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিতেন। অপর পক্ষে ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁহার বৈদিকমত বিষয়ে কৌতুহলী হইয়া, তাঁহার সহিত আলোচনা ও বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন। আহম্মদাবাদে প্রার্থনা সমাজের অন্যতম সংস্থাপক ও দেশকর্ম্মী রায়বাহাদুর ভোলানাথ সারাভাইএর সহিত তাঁহার ধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট নানা প্রকার আলোচনা হয়। বোম্বাইতে বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। ঐ সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিদের সহিত তাঁহার একবার সংঘর্ষ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন দয়ানন্দের পক্ষপাতী লোকদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার মতে সংশয় চিত্ত হইলেন। বেদে বাস্তবিকই মূর্ত্তি পূজার ব্যবস্থা আছে কিনা তাহা লইয়া মতভেদ উপস্থিত হইল। দয়ানন্দ বলেন যে বেদে মূর্ত্তি পূজার উল্লেখমাত্র নাই। তখন বাস্তবিকই স্বামিজীর কথা সত্য কিনা, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হইল। দুইজন ধনী বণিক, ঘোষণা করিলেন যে মূর্ত্তিপূজা বেদে আছে সপ্রমাণ করিতে পারিলে, সর্ব্বানুকূলে পনর সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হইবে। কিন্তু পারিতোষিকের লোভেও কেহ দয়ানন্দের মত খণ্ডণ করিতে অগ্রসর হইল না। তৎফলে বোম্বাইতে তাঁহার পক্ষাবলম্বী ব্যক্তিদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত লইতে লাগিল। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে বোম্বাই নগরে 'আর্য্যসমাজ' নামে দয়ানন্দের মতানুসারীদের এক

প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। বোম্বাইতে অবস্থানকালে কমলা নেনাচারী নামক একজন প্রসিদ্ধ দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতের সহিত স্বামিজীর বিচারের কথা হয়। কিন্তু তাঁহার প্রতিপক্ষ প্রথমে সম্মত হইয়াও, পরে নানারূপ অসার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন না। ইহাতে নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা স্বামিজীর উপর আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। অতঃপর কিছুকাল তিনি পুনাতে অবস্থান করেন। পুনাতে যে দিন তিনি উপস্থিত হইলেন সেই-দিন তাঁহার পক্ষীয় জনসাধারণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সুসজ্জিত হস্তী লইয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহার বিরুদ্ধ বাদীরা একটি সুসজ্জিত গর্দ্দভ লইয়া উপস্থিত হন। পুনাতে তিনি কিঞ্চি-দধিক দুই মাসকাল ছিলেন, এই সময়ের মধ্যে একাধিক্রমে চল্লিশ দিন তিনি আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্যশাস্ত্র সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। এই সময়ে দেশবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় বিচার-পতি মহাদেব গোবিন্দ রানাডের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। অতঃপর ইন্দোর বরোদা, প্রভৃতি স্থানে স্বীয় মত প্রচার করিয়া ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে তিনি পুনরায় কাশীধামে গমন করেন।

এই বারে কাশীতে অবস্থান করি-বার সময়ে, তিনি নিজের প্রসিদ্ধ বেদ-ভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। কোনও এক স্থলে দীর্ঘকাল অবস্থান করা, তাঁহার ন্যায় পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর উপ-যুক্ত বোধ না হওয়ায় তিনি পুনরায় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারে বহির্গত হইলেন। এইবারে জৌনপুর, সাহজাহানপুর, বেরিলী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নগরীসমূহ পর্য্যটন করিয়া দিল্লীতে উপনীত হন। ঐ সময়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারত সাম্রাজ্ঞী" উপাধি (Empress of India) গ্রহণ করা উপলক্ষে দিল্লীতে দরবার হইতেছিল। ঐ সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজের নেতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন বোম্বাইএর প্রসিদ্ধ জননায়ক গোপাল রাও হরি দেশমুখ, সার সৈয়দ আহম্মদ পঞ্জাবের কানাইলাল আলখধারী প্রভৃতি দেশবিখ্যাত জননায়ক ও ধর্ম্ম-নেতাগণও তথায় উপস্থিত ছিলেন। দিল্লীতে এক মহতী সভার অধিবেশন হয় এবং কোন ধর্ম্মমত প্রচার দ্বারা ভারতে এক জাতি গঠনে সহায়তা হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সেই সভাতে আলোচনা ও বিতর্ক হয়। বলা বাহুল্য ঐ আলোচনা ও বিতর্কের ফলে, কোনও স্থির পন্থা নিরূপিত হইতে পারে নাই।

দরবার সমাপ্ত হইলে স্বামিজী মীরাট হইয়া চাঁদাপুর নামক স্থানে গমন করেন। তথায় সেই সময়ে এক বৃহৎ মেলা হইতেছিল। সেই মেলাতে ইসলাম, খ্রীষ্ট, সনাতন হিন্দু প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রচারক-

বর্গ উপস্থিত হইয়া, নিজ নিজ ধর্ম্ম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দের মার্চ্চ মাসের মধ্যভাগে সেই মেলায় এক বৃহৎ সভার অধিবেশন হয়। সেই সভাতে দীর্ঘসময় ব্যাপিয়া নিম্ন লিখিত বিষয়গুলির আলোচনা হয়—(১) পরমেশ্বর কোন সময়ে এবং কি উপায়ে বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন। (২) ঈশ্বরের করুণা ও ন্যায় পরতা কি প্রকার? (৩) পরমেশ্বর সর্ব্বত্র বিদ্যমান কি না? (৪) বেদ, কোরাণ ও বাইবেল যে ব্রহ্ম বাণী তাঁহার প্রমাণ কি? (৫) মুক্তি ও তাহার উপায় কি? মেলার অবসান ঘটিলে, দয়ানন্দ পঞ্জাবে গমন করেন। প্রথমে কিছুকাল লুধিয়ানা নগরে অবস্থানপূর্ব্বক, তিনি লাহোরে উপনীত হন। লাহোর প্রবাসী ব্রাহ্মগণ প্রধানতঃ উদ্যোগী হইয়া, তাঁহাকে তথায় নিমন্ত্রণ করেন। লাহোরেও অন্যান্য স্থানের ন্যায়, তাঁহার মূর্ত্তি পূজার বিরুদ্ধে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী বিলক্ষণ আন্দোলন ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে। সনাতন পন্থী ব্রাহ্মণগণ, নানা উপায়ে তাঁহাকে অপদস্থ ও বিপদগ্রস্ত করিবার চেষ্টা করেন। ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যগণ প্রথম অবস্থায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু স্বামিজীর জন্মান্তরবাদ ও বেদান্ত সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতাতে ব্রাহ্মগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হন এবং তৎফলে তাঁহাদের মধ্যে দুইটি পৃথক দল হয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের অনুরোধে দয়ানন্দ লাহোর নগরেও 'আর্য্য সমাজ' প্রতিষ্ঠা করিলেন (জুন, ১৮৭৭ খ্রীঃ)। পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত যে সব সদস্য বেদকে আপ্ত ও অপৌরুষেয় বলিয়া মনে করিতেন, তাহারাই নব প্রতিষ্ঠিত আর্য্য সমাজের প্রধান উদ্যোগী হইলেন। লাহোর হইতে তিনি, পঞ্জাবের আরও অনেক প্রসিদ্ধ নগরীতে গমনপূর্ব্বক, স্বীয় মত প্রচার করেন। সে সকলের মধ্যে মুলতান নগরেই তাঁহার প্রভাব বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয় এবং তথায়ও একটি আর্য্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপরে পঞ্চনদের আরও কতকগুলি স্থান পরিদর্শন করিয়া, পুনরায় মীরাটে গমন করেন। সেই স্থানেও একটি একটি আর্য্য সমাজ স্থাপিত হয় এবং কয়েকজন বেদনিষ্ঠ বৈশ্যের উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনায় তত্রস্থ সনাতন পন্থীদের মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়। মীরাট হইতে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান পরিদর্শন করিয়া, তিনি আজমীর গমন করেন। আজমীরের পুষ্কর ক্ষেত্রে তখন মেলা হইতেছিল। তিনি প্রত্যাদেশের আবশ্যকতা, বেদই সত্যজ্ঞানের আধার, সতীদাহের অশাস্ত্রীয়তা, হিন্দুর সমুদ্র যাত্রার বৈধতা, প্রভৃতি বিষয়ে দ্বাদশটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তদ্ভিন্ন

দুইজন খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মযাজকের সহিতও তাঁহার বিচার হয়। আজমীর হইতে তিনি দ্বিতীয়বার হরিদ্বারে গমন করেন এবং অল্প কয়েকদিন মাত্র তথায় অবস্থান করিয়া, সাহারাণপুরে গমন করেন। ঐ স্থানে প্রসিদ্ধ তত্ত্ব-বিদ্যা সম্প্রদায়ের (Theosophist) নেতা কর্ণেল অল্‌কট (Col. Olcott) এবং শ্রীযুক্তা ব্লাভাস্কি (Madam Blavatsky)র সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কয়েক মাস পূর্ব্বে আমেরিকায় অবস্থিত, তত্ত্ববিদ্যা সভার (Theosophical Society) এক অধিবেশনে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, তত্ত্ববিদ্যা সভা স্বামিজীর প্রতিষ্ঠিত আর্য্য সমাজেরই সহকর্ম্মী অথবা অনুগামী সভার ন্যায় পরিচালিত হইবে। বোধ হয় সেই কারণেই তত্ত্ববিদ্যা সভার পূর্ব্বোক্ত নায়কদ্বয় স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, ভারতবর্ষে আগমন করেন। সাহারাণপুরে কিছুকাল অবস্থান করিয়া তাঁহারা মীরাট গমন করেন। তথায় কর্ণেল অলকট কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তত্ত্ববিদ্যা সভার প্রচারকগণ প্রস্থান করিলে, দয়ানন্দ পূর্ব্বের ন্যায় মোরাদাবাদ, কানপুর, এলাহাবাদ, মৃজাপুর, দানাপুর প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, কাশীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি বিজ্ঞাপন প্রচার দ্বারা কাশীস্থিত পণ্ডিতগণকে বিচারে আহ্বান করিলেন। কিন্তু কেহই আহ্বানে প্রত্যুত্তর দিলেন না। কেবল রাজা শিবপ্রসাদ নামে এক ব্যক্তি স্বামিজীর মতের বিরুদ্ধতা করিয়া, প্রথম নিবেদন, নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন মাত্র। তদুত্তরে স্বামিজী 'ভ্রমোচ্ছেদন' নামে একখানি প্রতিবাদ পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

এইবারে কাশীতে অবস্থানকালে, একবার বাঙ্গালীটোলার এক বিদ্যালয়ে স্বামিজী বক্তৃতা করিবেন স্থির হয়। কিন্তু যথা সময়ে সভাস্থলে উপনীত হইয়া, স্বামিজী দেখিলেন কাশীর ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে কিছুকাল তাঁহার এলাকাধীন স্থানে বক্তৃতা করিতে নিষেধ করিয়া পরোয়ানা জারী করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের এই কার্য্যে চতুর্দ্দিকে বিশেষ আন্দোলন আরম্ভ হইল। এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র পাইওনীয়ারএ (The Pioneer) এই বিষয়ে অনেক রচনা প্রকাশিত হইল। পরিশেষে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, সেই আদেশ প্রত্যাহার করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি বারাণসী পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পুনরায় প্রচারে বহির্গত হইলেন। আগ্রাতে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় ভুক্ত ধর্ম্মযাজকগণের সহিতও, তাঁহার আলোচনা হয়। সেই স্থানে নারায়ণদাস নামক এক ব্যক্তি নানা কৌশলে স্বামিজীকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করেন। তাহাতে

সফলকাম না হইয়া নারায়ণদাস রামসুবা শাস্ত্রী নামক একজন পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া, কলিকাতায় উপস্থিত হন। তাঁহার বিশেষ চেষ্টায় ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় এক বৃহৎ সভার অধিবেশন হয়। সেই সভাতে নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থান হইতে বহু পণ্ডিত উপস্থিত হন। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরাও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেই সভাতে স্বামিজীর অনুপস্থিতিতে পণ্ডিতবর্গ নির্দ্ধারণ করিলেন যে, দয়ানন্দের সমস্ত সিদ্ধান্তই হিন্দুশাস্ত্র বহির্ভূত। পূর্ব্বোক্ত রামসুবা শাস্ত্রী "দয়ানন্দ কণ্টক উদ্ধারক" নামে একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়া, ঐ সভায় পাঠ করেন। পণ্ডিতগণ ঐ পুস্তকের মন্তব্য এক বাক্যে অনুমোদন করেন। স্বামিজী এই সময়ে আগ্রাতে অবস্থান করিতেছিলেন। আগ্রা হইতে পুনরায় প্রচারে বহির্গত হইয়া, ভরতপুর ও আজমীর পরিদর্শন করিয়া বোম্বাইতে উপস্থিত হন। তথায় অবস্থানকালে তত্ত্ববিদ্যা সভার সহিত আর্য্য সমাজের অনেক বিষয়ে অনৈক্য বোধ হওয়াতে, তিনি প্রকাণ্ড বক্তৃতা দ্বারা ঘোষণা করিলেন যে, তত্ত্ববিদ্যা সভা আর্য্যসমাজ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এই বোম্বাইতে অবস্থান করিবার সময়েই, প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মনিয়ার উইলিয়াম্‌স (Monier Williams) এর সহিত স্বামিজীর সাক্ষাৎ হয়।

বোম্বাই হইতে, মধ্য ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, তিনি রাজপুতানার অন্তর্গত উদয়পুরে উপস্থিত হন। উদয়পুরের মহারাণা অসামান্য সমাদরের সহিত তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। স্বামিজীর উপদেশে উদয়পুরের মহারাজা রাজ্য মধ্যে অনেক মঙ্গলকর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করেন এবং বৈদিক মতানুসারী হইয়া বৈদিক ক্রিয়া কলাপ অনুষ্ঠানে অনুরাগী হন।

অতঃপর স্বামিজী সাহাপুর, চিতোর প্রভৃতি রাজ্য পরিদর্শন করিয়া মহারাজের অনুরোধে যোধপুরে উপনীত হন। যোধপুরেও তিনি পরম সমাদরে সম্বর্দ্ধিত হন। এই যোধপুরে অবস্থান করিবার সময়েই, তিনি গুরুতর পীড়াগ্রস্ত হন। যথাসাধ্য চিকিৎসাতেও কোনও ফল না হওয়ায়, তাঁহার ইচ্ছা অনুসারেই তাঁহাকে আবুতে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানেও চিকিৎসার কোনও ফল না হওয়ায়, তাঁহাকে আজমীরে লইয়া যাওয়া হয়। শেষোক্ত স্থানে, সকল প্রকার চিকিৎসা ব্যর্থ করিয়া, ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দের ২৯শে অক্টোবর তাঁহার দেহান্ত হয়।

স্বামী দয়ানন্দ ঋগ্বেদাদির এক ভাষ্য ভূমিকা রচনা করেন। উহা গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। উহাতে বেদ

ভাষ্য, বেদের নিত্যত্ব বিচার, বিজ্ঞান কাণ্ড, বেদ সংজ্ঞা, ব্রহ্ম সংজ্ঞা, ব্রহ্মবিদ্যা বেদোক্তধর্ম্ম, প্রার্থনা, মুক্তি, রাজা-প্রজা-ধর্ম্ম প্রভৃতি সাতান্নটি বিষয়ে নিবন্ধ রহিয়াছে। তাঁহার সত্যার্থ প্রকাশ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আর্য্যসমাজভুক্ত ব্যক্তিদিগের একাধারে শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র। উহাও গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ।

স্বামী দয়ানন্দ, বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্ম সংস্কারকদিগের মধ্যে, একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। আজীবন তিনি মূর্ত্তি পূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই সংগ্রামের উপযোগী সমুদয় অস্ত্রই ভারতের প্রাচীন শাস্ত্ররূপ দুর্গ হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে অকপট ধর্ম্মনিষ্ঠা, উদ্যমশীলতা, দেশহিতার্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগ, সত্যপ্রিয়তা প্রভৃতি মহাপুরুষোচিত গুণের অপরূপ সমাবেশ হইয়াছিল।

দয়ারাম—(১)তিনি একজন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বেত্তা; তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম —রসমানস বা রসরসার্ণব।

দয়ারাম—(২) গুজরাটের একজন নাগর ব্রাহ্মণ জাতীয় খ্যাতনামা কবি। ১৭৭৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ভারতের অনেকগুলি ভাষাতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। একশতেরও অধিক গ্রন্থ তাঁহার রচিত। অনেক সুন্দর সুন্দর পারমার্থিক গান ও কবিতা তিনি রচনা করিয়া গুজরাটি ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রায় পঁচাত্তর বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দয়ারাম গিধমল—বোম্বাই প্রদেশের একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও জনহিত ব্রতী। তিনি সিন্ধু দেশের আমিল সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি কিছুকাল বোম্বাইপ্রদেশে বিচারপতির কাজ করিয়াছিলেন। সিন্ধু দেশের সকল প্রকার সৎকাজে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল এবং সকল বিষয়েই তিনি মুক্ত হস্তে দান করিতেন। সিন্ধু দেশের অন্তর্গত হায়দ্রাবাদ নগরীতে তিনি পিতার নামে একটি সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপন করেন।

দয়ারাম জেঠমল—সিন্ধুদেশের একজন জনহিত ব্রতী। তাঁহারই প্রধান চেষ্টা ও অর্থ সাহায্যে করাচী নগরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা তাঁহার নামে পরিচিত।

দয়ারাম ঠাকুর— খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশশতাব্দীর প্রথম ভাগে, তিনি আলীগড় জিলার হাতরাস গড়ের অধিপতি ছিলেন। তিনি জাতিতে জাঠ ছিলেন। ১৮০৩ সালে আলীগড় ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হইলে, দয়ারাম বিদ্রোহী হন। ১৮১৭ সালে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এক দল সৈন্য পাঠাইয়া দুর্গ অধিকার করিলে দয়ারাম পলায়ন করেন। এই স্থান এখন ব্যবসায়ের একটী প্রধান কেন্দ্র।

দয়ারাম ন্যায়ালঙ্কার— ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত কালীকচ্ছগ্রামে মৌদ্গল্য গোত্রে খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই অসাধারণ নৈয়ায়িক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া, বহু দূরদেশ হইতে পাঠার্থী তাঁহার চতুষ্পাঠীতে আগমন করিত।

দয়ারাম রায়—রাজসাহী জিলার অন্তর্গত দিঘাপাতিয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই স্বনাম ধন্য পুরুষ স্বীয় সাধুতা ও কর্ম্মশক্তির বলে, অতি সামান্য অবস্থা হইতে বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রামজীবন রায়ের অধীনে এক সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তখন রামজীবন রায়ও অতি সামান্য বেতনের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। রামজীবন রায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও উন্নতি হইতে থাকে। দয়ারাম অবশেষে নাটোরের রাজা রামজীবন রায়ের জমীদারীতে পাঁচ শত টাকা বেতনে দেওয়ান নিযুক্ত হন।

যশোহরের অন্তর্গত মোহাম্মদপুরের জমিদার সীতারাম রায়কে দমন করিবার জন্য রামজীবন রায় নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। সেই সময়ে দয়ারাম সেনাপতি হইয়া রামজীবনের সঙ্গে গিয়াছিলেন। দয়ারামের বুদ্ধি কৌশলে ও বীরত্বে রামজীবন সীতারামকে সপরিবারে ১৭১৪ খ্রীঃ অব্দে বন্দী করিতে সমর্থ হন। এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ দয়ারাম রায় রায়ান্ উপাধি প্রাপ্ত হন এবং নবাব সরকারে তাঁহার প্রতিপত্তি খুব বৃদ্ধি পায়। তিনি রাজা রামজীবনের সময় হইতে রাণী ভবানীর সময় পর্য্যন্ত নাটোর রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। তিনি প্রভূত অর্থও উপার্জ্জন করেন। মহারাজ রামকৃষ্ণের সময়ে রাজস্ব অনাদায়ের জন্য, নাটোরের অনেক জমিদারী নিলাম হয়। দয়ারাম তাহার কতকগুলি ক্রয় করেন। এই উপায়েও তিনি প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি সংস্কৃত ভাষার অনুরাগী ছিলেন। তদর্থে তিনি রাজসাহীতে একটী চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তিনি দিঘাপাতিয়া রাজবাটীতে কৃষ্ণজীউ, গোবিন্দজীউ ও গোপালজীউ নামে বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তথায় একটী মঠ নির্ম্মাণ ও নানা স্থানে জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর তাঁহার পুত্র জগন্নাথ রায় বিষয়ের অধিকারী হন। কিন্তু তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র প্রাণনাথ রায় সম্পত্তির ভার প্রাপ্ত হন। তিনি কয়েকজন বিচক্ষণ পারিষদের সাহায্যে জমিদারীর কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ

করিতেন। তিনি অসাধারণ স্বার্থত্যাগী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক ছিলেন। তিনি জমিদারীর উন্নতি ও মঙ্গল সাধনের জন্য, অতিশয় দক্ষতার সহিত জমিদারী সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য স্বয়ং পরিদর্শন করিতেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন, সেইজন্য প্রসন্ননাথ রায়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রসন্ননাথ বিষয়ের অধিকারী হন। প্রসন্ননাথ রায় দেখ।

দয়ালচন্দ্র সোম—খ্যাতনামা প্রবাসী বাঙ্গালী চিকিৎসক। ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে চুঁচুড়ায় প্রসিদ্ধ সোমবংশে, তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা ওলন্দাজ কুঠীতে উচ্চ পদে নিযুক্ত থাকিয়া প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তখন চুঁচুড়া ওলন্দাজদের উপনিবেশ ছিল। দয়ালচন্দ্র প্রতিভাশালী ছাত্র ছিলেন। পরীক্ষায় অনেক বৃত্তি ও পুরস্কার তিনি পাইতেন। ১৮৫৯ সালে এফ, এ, পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া তিনি মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৬৪ সালে এল, এম, এস ও ১৮৬৫ সালে এম, বি পরীক্ষায় অতি যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হন। মেডিকেল কলেজেও তিনি বৃত্তি পুরস্কার প্রভৃতি লাভ করিয়াছিলেন। মেডিকেল কলেজের পাঠ শেষ করিয়া উক্ত কলেজে ধাত্রী চিকিৎসা বিভাগে তিনি হাউস সার্জেনের (House Surgeon) কাজে নিযুক্ত হন। পরে চক্ষু চিকিৎসাগারে হাউস সার্জেন হন। ১৮৬৭ সালে তিনি লক্ষ্ণৌ কিংস হাসপাতালের (King's Hospital) ভার প্রাপ্ত হইয়া তথায় গমন করেন। ১৮৬৮ সালে তিনি আগ্রা মেডিকেল স্কুলের অস্ত্র চিকিৎসার শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই পদে ক্রমান্বয়ে ছয় বৎসর থাকিয়া, উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারী ও জনসাধারণ সকলেরই, শ্রদ্ধা তিনি সমভাবে অর্জ্জন করেন। এই স্থানে অবস্থান কালে সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থী হইয়া, তিনি একটী পুস্তকাগার স্থাপন করেন এবং স্বয়ং ইহার প্রথম সম্পাদক হন। আগ্রার সকল প্রকার সদনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার আন্তরিক যোগ ছিল। তিনি আগ্রা হইতে বদলী হইয়া বাঁকিপুরে গমন করেন। সেইখানেও তিনি খুব জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। বাঁকিপুর মেডিকেল স্কুল হইতে অবসর গ্রহণ কালে জনসাধারণ তাঁহাকে সোনার ঘড়ি, চেন প্রভৃতি উপহার প্রদান করেন এবং তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ প্রতি বৎসর অস্ত্রোপচার পরীক্ষাতে উৎকৃষ্ট ছাত্রকে পদক পুরস্কারের ব্যবস্থা হয়। ১৮৭৭ সালে তিনি কলিকাতার ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের (Cambell Medical School) ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক হইয়া আগমন করেন। এই সময়ে তিনি ধাত্রী বিদ্যায় অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত

হইয়াছিলেন। তিনি একবার নেপালের মহারাণীর চিকিৎসার জন্য নেপাল গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার চিকিৎসা নৈপুণ্যে মহারাণী সম্পূর্ণ রোগ মুক্ত হইলে, মহারাজ ও মহারাণী তাঁহাকে পারিশ্রমিক ব্যতীত, কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ প্রচুর উপহার দ্রব্য প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে সম্মানজনক ভাবে তিনি বড়লাট লর্ড ডাফরিনের চিকিৎসক (Honorary Assistant Surgeon) নিযুক্ত হন এবং বড় লাটের প্রাসাদে প্রবেশ লাভের বিশেষ অধিকার (Private Entree) লাভ করেন। ঐ বৎসরই তিনি রায় বাহাদুর উপাধিও লাভ করেন। ১৮৯০ সালে তিনি ধাত্রী বিদ্যা সম্বন্ধে একখানি (Manual of Medicine for Midwives) বই লিখেন। ইহা ভারতের নানা প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদিত হইয়া পাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আগ্রা মেডিকেল স্কুলে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতা উর্দ্দু ভাষায় রচিত হইয়া গ্রন্থকারে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং বহু দিন স্কুল পাঠ্য ছিল। এই স্বনাম ধন্য চিকিৎসক ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে পরলোক গমন করেন।

দয়ালদাস স্বামী—এই অসাধারণ সাধুর জন্মস্থান পাঞ্জাব প্রদেশের কপিয়ালা গ্রামে। তাঁহার পিতা অতিশয় সাধু সেবা পরায়ণ ছিলেন। ১২ বৎসর বয়সেই দয়াল দাসের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। এই সময়ে পাতিয়ালা রাজ্যের বসেরা গ্রামে বাবা ঠাকুরদাস নামে এক সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তিনি তাঁহার নিকট যাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং পরে পনের বৎসর শাস্ত্র শিক্ষা যোগাভ্যাস ও কঠিন তপশ্চরণ করিয়া, সিদ্ধি লাভ করেন। তিনি নানক সাহী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হইলেও সম্পূর্ণভাবে নানকসাহী ছিলেন না। গরীবদাস সাধু 'গরীবদাসী' নামে একটী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। সাধু দয়ালদাস স্বামী, এই সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ লোক ছিলেন। তিনি জ্ঞানী ও কর্ম্মী ছিলেন।

দয়াল শা—মিবারের রাণা রাজসিংহের দেওয়ান ছিলেন। তিনি যেমন কর্ম্ম কুশল, তেমনই সাহসী বীরও ছিলেন। দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজীবের রাজ্যশাসন প্রণালীতে ক্ষুব্ধ হইয়া সমস্ত রাজপুত জাতি মুঘলদের উপর অতিশয় বিরূপ হইয়া প্রতিশোধ পরায়ণ হইয়াছিলেন। দয়াল শাও সেই প্রতিশোধ লইতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া মুঘল রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক মালব প্রদেশের বহু নগর লুণ্ঠন ও জনপদ অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করিলেন। তৎপরে রাজকুমার আমিজকেও যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

দয়ালসিংহ, সর্দ্দার—তিনি পাঞ্জাবের অন্তর্গত মাজিথিয়া নামক স্থানের সর্দ্দার

বংশে ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা শেরগুলির জাঠবংশসম্ভূত। তাঁহার প্রপিতামহ যোধসিংহ, গুরুদাস পুরের সর্দ্দার অমরসিংহ বেগ্গার সহকারী সেনাপতি ছিলেন। ১৭৮৪খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র সর্দ্দার দেশাসিংহ পিতার পদেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। উক্ত পদে তিনি ১৮০৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ছিলেন। তৎপর উক্ত রাজ্য মহারাজ রণজিৎ সিংহের হস্তগত হইলে, তিনিও রণজিৎ সিংহের অন্যতম সেনাপতি হইলেন। তিনি ১৮৩২ সালে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র লহনা সিংহ পিতার সম্পত্তি ও পদ প্রাপ্ত হন। রণজিৎসিংহের মৃত্যুর পরে, তাঁহার পুত্র রাজা হিরা সিংহের রাজত্বকালে, রাজ্যের আভ্যন্তরিণ গোলযোগ দর্শনে তিনি বারাণসীতে চলিয়া যান এবং তথায় কিছুকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর সময়ে তাঁহার পুত্র সর্দ্দার দয়াল সিংহ নাবালক ছিলেন। পাঞ্জাবে শান্তি স্থাপিত হইলে, তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং স্বীয় বিস্তৃত জমিদারী পরিচালনে প্রবৃত্ত হন। ইতিপূর্ব্বেই বাঙ্গালীদের চেষ্টায় পাঞ্জাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। দয়ালসিংহ তথাকার প্রবাসী বাঙ্গালীদের সত্যনিষ্ঠা, কর্ম্মানুরাগ ও চরিত্রবলে মুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হন। ১৮৭৬ সালে তিনি কলিকাতা আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ১৮৭৭ সালে তিনি ট্রিবিউন পত্রিকা (The Tribune) প্রকাশিত করেন। প্রসিদ্ধ শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় উহার সম্পাদক হইয়াছিলেন। এই পত্রিকা প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে সপ্তাহে তিন বার প্রকাশিত হইত। এখন ইহা দৈনিক হইয়াছে।

সর্দ্দার দয়াল সিংহ ট্রিবিউন পত্রিকা স্থাপন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তথনকার লাহোরের সকল প্রকার জনহিতকর কার্য্যেই তাঁহার যোগ ছিল। তিনি অপুত্রক ছিলেন। তিনি 'দয়াল সিংহ কলেজ' নামে এক কলেজ স্থাপন করিয়া, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি এই কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহ ও উন্নতি কল্পে দান করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের হস্তে সমর্পণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার স্ত্রী এই চরম পত্র ব্যর্থ করিবার জন্য হাইকোর্টে নালিশ করিয়া অকৃতকার্য্য হন। এখনও এই কলেজ অতি সুপরিচালিত হইয়া পাঞ্জাবীদের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। এই দানবীর এইপ্রকার নানাবিধ কার্য্যে স্বীয় শক্তি সামর্থ্য ব্যয় করিয়া পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন।

দয়াশঙ্কর—(১) তিনি একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। 'গ্রন্থদীপিকা' নামক গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

দয়াশঙ্কর—(২) তিনি গর্গকৃত 'প্রশ্ন মনোরমা' গ্রন্থের টীকাকার।

দয়িতবিষ্ণু—তিনি বঙ্গের পালবংশের আদি পুরুষ।

দর—চিতোরের মহারাণা খোমানের আহ্বানে যে সকল স্বদেশ প্রেমিক মহাবীর, স্বদেশের শত্রু আততায়ীগণকে তাড়াইবার জন্য খোমানের পতাকাতলে সম্মিলিত হইয়াছিলেন, কাসুন্দির অধিপতি দর, তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। খোমান দ্রষ্টব্য।

দরওয়া খাঁ—শ্রীহট্টের অন্তর্গত তরফের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ সিকান্দর শাহের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার অন্য নাম আব্বাস খাঁ। তিনি স্বীয় ভ্রাতা নাসির খাঁ কর্ত্তৃক নিহত হন। তাঁহার খনিত 'দরওয়া খাঁর দীঘি' এখনও তরফের অন্তর্গত গোগোওরা গ্রামে বর্ত্তমান আছে।

দরঙ্গ শাহ—একজন প্রসিদ্ধ দরবেশ। তিনি শ্রীহট্টের বিখ্যাত দরবেশ হজরত শাহ জালাল এমনির অনুসঙ্গী ছিলেন। শ্রীহট্টের মৌলবী বাজারের অন্তর্গত মনুমুখ নামক স্থানে তাঁহার সমাধি আছে। তাঁহার বংশধরেরা তথায় অবস্থান করেন। কেহ কেহ তাঁহার নাম শাহ ফরঙ্গও বলেন।

দরদমীর—দিল্লীর খাজা মোহাম্মদ মীবারের কবিজন সুলভ নাম। তিনি বিখ্যাত খাজা নাশিরের পুত্র। তিনি একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। প্রথমে তিনি সৈনিক বিভাগে কাজ করিতেন, পরে পিতার উপদেশে কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দরবেশের বেশ ধারণ করেন। তিনি ধন দৌলত অপেক্ষা দরিদ্রতাই অতিশয় শ্লাঘ্য মনে করিতেন এবং দীন ভাবেই দিন যাপন করিতেন। কেহ কেহ বলেন—তিনি প্রসিদ্ধ দরবেশ শাহ গুলশানের (শেখ সায়েদ উল্লা) শিষ্য ছিলেন। তিনি নানা বিষয়ে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ১৭৮৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

দরদমন্দ—দিল্লীর কবি মোহাম্মদতকির কবিজন সুলভ নাম। তিনি একখানা সাকিনামা ও একখানা দেওয়ান লিখিয়াছেন। ১৭৬২ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১১৭৬) মুরশিদাবাদ নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দরাব খাঁ—তিনি প্রসিদ্ধ খান খানান বৈরাম খাঁর পৌত্র ও খান খানান মির্জা আবদুর রহিমের পুত্র। শাহ জাহান তাঁহার পিতা সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে একবার বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি শাহজাহানের পক্ষে ছিলেন শাহজাহান বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিয়া ইব্রাহিম খাঁকে পরাজয়পূর্ব্বক তদ্দেশ অধিকার করেন এবং দরাব খাঁকে তাঁহার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন তৎপরে তিনি দিল্লী আক্রমণ করি৷

যাইয়া রাজকুমার পারভেজের হস্তে পরাজিত হইয়া বঙ্গদেশাভিমুখে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। পলায়নকালে শাহজাহান পাটনায় উপস্থিত হইয়া দরাব খাঁকে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে লিখিলেন। কৃতঘ্ন দরাব খাঁ শাহজাহানের পরাজয় সংবাদ শুনিয়া ছলনাপূর্ব্বক তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন না। বরং রাজকুমার পারভেজের নিকট সম্রাটের আনুগত্য স্বীকারপূর্ব্বক বঙ্গের শাসনকর্ত্তার পদে স্থায়ী হইলেন। শাহজাহান দরাব খাঁর ব্যবহারে অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন এবং দাক্ষিণাত্যে গমনপূর্ব্বক সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পিতৃক্রোধের নির্ব্বাণ করিলেন। এদিকে পারভেজের অনুরোধ সত্ত্বেও সম্রাট দরাব খাঁকে ক্ষমা করিলেন না। সম্রাটের আদেশে দরাব খাঁ নিহত হইলেন এবং তাঁহার ছিন্ন মস্তক দিল্লীতে প্রেরিত হইল (১৬২৬ খ্রীঃ)।

দরায়ুস—ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কোনও প্রবল শক্তিশালী নরপতির অভ্যুদয় না হওয়ায়, বহু বিদেশী রাজা কর্ত্তৃক এই পথে ভারতবর্ষ বার বার আক্রান্ত হইয়াছে। শক ও হুণেরা এই পথেই ভারতে প্রবেশ করিয়া, এদেশের স্থায়ী অধিবাসী হইয়াছে। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে (৫৫৮—৫৩০ খ্রীঃ পূঃ) পারস্যের নরপতি কুরুস প্রথম ভারত সীমান্তে দুইটী অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। তৎপরে দরায়ুস (৫২২—৪৮৬ খ্রীঃ পূঃ) খ্রীঃ পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষ আক্রমণ পূর্ব্বক পঞ্চনদের কিয়দংশ স্বীয় সাম্রাজ্য ভুক্ত করিয়াছিলেন। দরায়ুসের পুত্র জ্যারাক্ সেনের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত গান্ধার ও হিন্দু (হিন্দু = ইণ্ডিয়া = ইণ্ডাস বা সিন্ধু উপত্যকা) এই প্রদেশদ্বয় পারসিকদের অধিকার ভুক্ত ছিল। কথিত আছে জ্যারাক্ সেন যখন বহু সৈন্য সহ গ্রীস দেশ আক্রমণ করেন, তখন তাঁহার সৈন্য দলে ভারতীয় সৈন্যও ছিল। ভারতবর্ষ হইতে পারস্য পতি বার্ষিক প্রায় দেড় কোটী টাকার স্বর্ণ মুদ্রা রাজস্ব প্রাপ্ত হইতেন। প্রায় দুইশত বৎসর ভারতবর্ষের এই অংশ পারসিকদের অধিকৃত ছিল। খুব সম্ভব গ্রীকদের হস্তে পারসিকদের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষ পারসিকদের হস্তচ্যুত হইয়াছিল।

দরিয়া ইমাদ শাহ—তিনি বেরারের ইমাদ শাহী বংশের অন্যতম নবাব। ১৫৩২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পিতা আলাউদ্দীন ইমাদ শাহের মৃত্যুর পরে তিনি বেরারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫৪৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার ভগিনী রাবিয়া খাতুনের সহিত আহম্মদনগরের আদিল শাহী বংশীয় নবাব ইব্রাহিম আদিল শাহের বিবাহ হয়। ১৫৫৮ খ্রীঃ অব্দে

হুসেন নিজাম শাহের সঙ্গে তাঁহার অপর এক ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল। তিনি দীর্ঘকাল শান্তিতে রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র বোরহান ইমাদশাহ রাজা হইয়াছিলেন।

দরিয়া খাঁ রোহিলা—তিনি সম্রাট শাহজাহানের সময়ের একজন সম্ভ্রান্ত লোক। সম্রাট তাঁহাকে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পরবর্ত্তীকালে বিদ্রোহী খাঁন জাহান লোদির সঙ্গে মিলিত হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। সম্রাটের অন্যতম হিন্দু সেনাপতি রাজা বিক্রমজিৎ বুন্দেলা ১৫৩০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া তাঁহার ছিন্ন মস্তক সম্রাট সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

দরিয়া পীর—একজন বিখ্যাত দরবেশ। তিনি শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ দরবেশ হজরত শাহ জালাল এমনির অনুগত অন্যতম শিষ্য ছিলেন। শাহ জালালের উপাসনা গৃহের পূর্ব্বভাগে তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান আছে।

দরিয়া বাঈ—তিনি নাগপুরের অধিপতি জানুজী (জাকজীর) ভোঁসলের মহিষী। মহারাজ জানুজী অপুত্রক ছিলেন বলিয়া, তিনি স্বীয় দেবর মাধুজীর পুত্র রঘুজীকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দর্পনারায়ণ ঠাকুর—তিনি পাথুরিয়া ঘাটা ঠাকুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা জয়রাম ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি প্রথম জীবনে, খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, ফরাসী কোম্পানীর অধীনে কাজ করিতেন। পরে বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। এই উভয় কার্য্য করিয়া তিনি প্রভূত ধন উপার্জ্জন করেন। তিনি দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রী হইতে রাধামোহন, গোপীমোহন, কৃষ্ণমোহন, হরিমোহন ও প্যারীমোহন নামে পাঁচ পুত্র এবং দ্বিতীয়া স্ত্রী হইতে লাডলিমোহন ও মোহিনীমোহন নামে দুই পুত্র জন্মে। দর্পনারায়ণ সেই সময়ের কলিকাতাবাসী বাঙ্গালী সমাজে একজন প্রতিষ্ঠাবান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন।

দর্পনারায়ণ রায়—বাঙ্গালার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর একজন রাজস্ব সচিব। তাঁহার পিতা হরিনারায়ণ রায়ও রাজস্ব সচিব ছিলেন। তাঁহারা উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থবংশীয় ছিলেন। তাঁহাদের কৌলিক পদবী মিত্র। বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কাটোয়া মহাকুমার থাজুটি গ্রামে তাঁহাদের পৈতৃক নিবাস ছিল। পিতা হরিনারায়ণের মৃত্যুর পর দর্পনারায়ণ পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। ১৭০৪ খ্রীঃ অব্দে মুর্শিকুলি খাঁ রাজধানী ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করিলে সমুদয় উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীও নূতন

রাজধানীতে আগমন করেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান কাননগু দর্পনারায়ণ ভাগীথীর পশ্চিম পারে ডাহাপাড়াতে বাসস্থান স্থাপন করেন। রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যে দর্পনারায়ণের গভীর অভিজ্ঞতা ছিল। নবাব সরকারে দেওয়ানই রাজস্ব সম্বন্ধে প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে প্রধানতঃ কাননগুর পরামর্শ অনুসারেই চলিতে হইত। কথিত আছে মুর্শিদকুলি খাঁ একবার রাজস্ব বিষয়ক হিসাব পত্র প্রস্তুত করিয়া সম্রাট আওরঙ্গজীবের নিকট প্রেরণের পূর্ব্বে প্রধান কাননগু দর্পনারাণকে তাহাতে স্বাক্ষর করিতে বলেন। দর্পনারায়ণ তিন লক্ষ টাকা "রসুম" না পাইলে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হন। সেজন্য দ্বিতীয় কাননগু জয়নারায়ণের স্বাক্ষর যুক্ত হিসাবই সম্রাট সমীপে প্রেরিত হয়। মুর্শিদকুলি খাঁ এই কারণে দর্পনারায়ণের উপর বিরূপ হন এবং তাঁহার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হ্রাস করিয়া দেন। কিছুকাল পরে কোনও এক অজুহাতে তিনি দর্পনারায়ণকে বন্দী করেন। ইহাতে মনদুঃখে দর্পনারায়ণের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং কয়েক বৎসর পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। দর্পনারায়ণ রাজস্ব বিভাগের নানাবিধ উন্নতি সাধন পূর্ব্বক অনেক আয় বৃদ্ধি করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র শিবনারায়ণ পিতৃপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দলপতরাম ডাহ্যাভাই—গুজরাটের একজন প্রসিদ্ধ কবি। ১৮২০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। এককালে তাঁহার কবিতা খুব জনপ্রিয় ছিল। তজ্জন্য তিনি কবীশ্বর উপাধি লাভ করেন। তিনি হিন্দি ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং হিন্দিতেও অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন।

দলসিংহ, রাও—উত্তর পশ্চিম প্রদেশের শাহজাহানপুর জিলার অন্তর্গত নাহিল নামক স্থানের জমিদার। ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়, ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি পিতা জেতসিংহের মৃত্যুতে সম্পত্তির অধিকারী হন। রাও উপাধি তাঁহাদের বংশানুক্রমিক এবং জাতীতে তাহারা কটেরিয়া রাজপুত। খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ গোলারায়পুরে বসতি স্থাপন করেন। ১৬৪৫ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট শাহজাহান, হরসিংহের বংশধর বিক্রমসিংহকে গোলারায়পুরের জমিদারীর সনন্দ প্রদান করেন। পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহার বংশধরেরা নাহিল নামক স্থানে বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন। খ্রীঃ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাঠানদিগের সহিত তাঁহাদের ক্রমাগত বিবাদ চলিয়াছিল। এইরূপ এক বিবাদে এই বংশের রাও গোলাপসিংহ নিহত হন। তৎকালে বিধবা পত্নী ও দুইটী শিশুপুত্র বর্ত্তমান ছিল। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহে

দলসিংহের পিতা, জেতসিংহ ইংরেজ সরকারকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। জেতসিংহের বীরত্বেই পাবাইন সহর রক্ষা পাইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইংরেজ সৈন্যের রসদও তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দলসিংহও সেই সময়ে যথেষ্ট সাহায্য করেন। দলসিংহ মৃত্যুকালে বেচুসিংহ, জগন্নাথসিংহ ও সরদনসিংহ নামে তিন পুত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন।

দলিল সিংহ—রাজস্থানের অন্তর্গত অম্বরপতি জয়সিংহের সহিত বুন্দিরাজ বুধসিংহের বিশেষ শত্রুতা জন্মে এবং বুধসিংহ একবার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বুন্দি হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তখন জয়সিংহ সর্দ্দার সলিমসিংহের পুত্র দলিল সিংহকে রাওরাজা উপাধি প্রদান পূর্ব্বক, বুন্দির সিংহাসনে স্থাপন করেন। বুধসিংহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র উমেদ সিংহ পুনরায় বুন্দি স্বাধিকারে আনয়ন করেন। (উমেদসিংহ দেখ)।

দলীপসিংহ—পঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের পুত্র। ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। মাত্র ছয় বৎসর বয়সে তিনি পিতৃ সিংহাসন লাভ করেন। লর্ড ডালহৌসীর শাসন কালে যখন সমগ্র পঞ্জাব ইংরেজাধিকৃত হয়, তখন তিনি (১৮৪৮ খ্রীঃ) বাৎসরিক বৃত্তিভুক্ হইয়া প্রথম কয়েক বৎসর ফতেগড় নামক স্থানে বাস করেন। তৎপরে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংলণ্ডে অবস্থান করিবার সময়ে অমিত ব্যয়িতার জন্য তিনি ঋণগ্রস্ত হন। ইংরেজ সরকার উহার কারণ অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, দলীপ ক্রুদ্ধ হইয়া ইংলণ্ডের টাইম্‌স (The Times) প্রভৃতি সংবাদ পত্রে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে থাকেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার উদ্যোগ করেন এবং সেই সময়েই পঞ্জাব রাজ্য পুনরায় ফিরিয়া পাইবার জন্য এক দাবী উত্থাপন করেন। তিনি ভারতে উপস্থিত হইলে, পাছে শিখদিগের মধ্যে উত্তেজনার উদ্ভব হয়, এই আশঙ্কায় তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডাফরীণ, তাঁহাকে ভারতে আগমন করিতে নিষেধ করেন। দলীপ ভারতবর্ষে আসিবার জন্য, এডেন বন্দরে উপস্থিত হন এবং দীর্ঘকাল, ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আদেশ লাভের আশায়, বৃথা কালক্ষেপ করিয়া পুনরায় ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া, তিনি খ্রীষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, পুনরায় শিখ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারীতে অবস্থান করিবার সময়ে, তাঁহার মৃত্যু হয়। ঝিন্দনকুমারী দেখ।

দলীপ সামন্ত-ময়মনসিংহ জিলার সেরপুর পরগণার একজন কোচবংশীয় সামন্ত রাজা। পাঠানরাজ

হোশেন সাহের সেনাপতি মজলিস খাঁ। হুমায়ুন সেরপুর আক্রমণ ও অধিকার করেন। ঐ সময়েই ময়মনসিংহে প্রথম মুসলমান অধিকার হয়। (খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর ১ম ভাগ)।

দলীপসিংহ, হাজারী—তিনি নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর (১৭০৪—১৭২৫ খ্রীঃ) একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। জিয়াউদ্দিন খাঁ হুগলীর স্বাধীন ফৌজদার ছিলেন। নবাব দিল্লীর মুঘল বাদশাহের অনুমতি ক্রমে হুগলীর ফৌজদারকে আপন অধীনে আনয়ন করেন এবং উক্ত পদে জিয়াউদ্দিনের পরিবর্ত্তে আলীবেগকে নিযুক্ত করেন। ইহাতে আলীবেগের সহিত জিয়াউদ্দিনের বিরোধ ঘটে। জিয়াউদ্দিন দিল্লীতে চলিয়া যাবার ভান করিয়া, হুগলীর নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন। দলীপসিংহ সসৈন্যে আলীবেগের সাহায্যার্থ হুগলী উপস্থিত হইলেন। জিয়াউদ্দিন সন্ধির ভান করিয়া একখানা পত্রসহ একটী লোককে দলীপসিংহের নিকট প্রেরণ করেন। এদিকে পত্রবাহক যখন পত্র দলীপসিংহের হস্তে অর্পণ করে, দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে তাহা লক্ষ্য করিয়া একজন অব্যর্থ সন্ধানী, ইংরেজ গোলন্দাজ কামানের গোলা নিক্ষেপ করিয়া দলীপসিংহকে হত্যা করেন।

দশ পুত্র—একজন স্মৃতিশাস্ত্রকার। মলমাস নির্ণয় গ্রন্থ তাঁহারই রচিত।

দশবল—বল্লভবংশের একজন নৃপতি। তিনি একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতও ছিলেন। ৯৮০ শকে (১০৫৭ খ্রীঃ) তিনি 'করণ কমল মার্ত্তণ্ড' নামে এক খানা করণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ ব্রহ্ম গুপ্তকেই অনুসরণ করিয়াছিলেন।

দশরথ—মৌর্য্যবংশীয় নৃপতি অশোকের দশরথ নাম * এক পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। গয়া জিলার বরাবর পর্ব্বতস্থ গুহায় তাঁহার নামাঙ্কিত শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

দশালো—চিতোরের মহারাণা খোমানের আহ্বানে যে সকল স্বদেশ প্রেমিক মহাপ্রাণ বীর স্বদেশ শত্রু আততায়ীদিগকে তাড়াইবার জন্য খোমানের পতাকাতলে সম্মিলিত হইয়াছিলেন, যোয়েন গড়ের অধিপতি দশালো তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। খোমান দেখ।

দহর্শিয়া— সিন্ধুদেশের ব্রাহ্মণবংশীয় রাজা দাহিরের ভ্রাতা। তিনি দাহিরেরই জীবিতকালে ব্রাহ্মণাবাদ নামক স্থানের রাজা ছিলেন। দাহিরের নাম কোনও কোনও ঐতিহাসিক দহর লিখিয়াছেন। দাহির দেখ।

দহ্রসেন—গুপ্তবংশীয় সম্রাট স্কন্দ গুপ্তের মৃত্যুর পর গুজরাটে বলভীর মৈত্রকবংশীয় রাজাদের অভ্যুদয় হয়। ঐ মৈত্রকবংশীয় রাজা দহ্রসেন অনুমান খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে

অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার পুত্র ব্যাঘ্রসেন।

দাউদ কুরেষী—একজন প্রসিদ্ধ দরবেশ। তিনি শ্রীহট্টের বিখ্যাত দরবেশ হজরতশাহ জালালের জ্ঞাতি ও অনুগত অন্যতম শিষ্য ছিলেন। তিনি শ্রীহট্টের রেঙ্গা পরগণার দাউদপুর নামক স্থানে বাস করিতেন এবং তথায় তাঁহার সমাধি আছে। তত্রত্য চৌধুরীগণ তাঁহারই বংশধর।

দাউদ খাঁ-তিনি খিজলীর রাজা ইখ্‌তিয়ার খাঁর পুত্র তাঁহারই পুত্র প্রসিদ্ধ তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা। ইখ তিয়ার খাঁ ও তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা দেখ।

দাউদ খাঁ পনি—মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজাবের একজন উচ্চ পদস্থ পাঠান কর্ম্মচারী। তাঁহার পিতার নাম খিজির খাঁ পনি। কিছুকাল তিনি দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। সম্রাট ফেরুক্‌শিয়ারের সময়ে আমীর উল-উমরা হোশেন আলি খাঁর সহিত যুদ্ধে ১৭১৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি নিহত হন।

দাউদ খাঁ ফরোকী—তিনি খান্দেশের ষষ্ঠ অধিপতি। ১৫০৩ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার ভ্রাতা মিরাণ গণির মৃত্যুর পরে তিনি রাজ্য লাভ করেন। তিনি ১৫১০ সাল পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়া পরলোক গমন করিলে, দ্বিতীয় আদিল খাঁ ফরোকী রাজ্য প্রাপ্ত হন। মালিক রাজা ফরোকী দেখ।

দাউদ বিদারী মোল্লা—দাক্ষিণাত্যের বিদারের একজন অধিবাসী। তাঁহার জন্ম ১৩৫৬ খ্রীঃ অব্দে। বার বৎসর বয়সের সময়ে তিনি দাক্ষিণাত্যের কুল বর্গের বাহমনীবংশীয় সুলতান (প্রথম) মোহাম্মদ শাহ সুলতানের ভৃত্যের কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং ক্রমে ক্রমে রাজানুগ্রহে উচ্চতর কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। তাঁহার রচিত ‘তহকাস-উস্-সালাতিন বাহমনি’ নামক বাহমনি বংশের ইতিহাস অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

দাউদ শাহ—(১) গুজরাটের পাঠানবংশীয় একজন সুলতান। ১৪৩৯ খ্রীঃ অব্দে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র কুতব শাহের মৃত্যুর পরে, তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। মাত্র সাত দিন পরেই তাঁহার অপর ভ্রাতুষ্পুত্র মাহ্‌মুদ শাহ তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন।

দাউদ শাহ—(২) শ্রীহট্টের তরফ পরগণার লস্করপুরগ্রামের প্রসিদ্ধ আওলিয়া সয়েফ মিন্নতউদ্দিন সৈয়দ শাহের তিনি প্রপৌত্র ছিলেন। তিনি নিজেও একজন বড়দরের আওলিয়া ছিলেন। তাঁহার পুত্র সৈয়দ মহিব উল্লা। এই দাউদ শাহের নামেই দাউদপুর পরগণা হইয়াছে। সয়েফ মিন্নতউদ্দিন সৈয়দ শাহ দেখ।

দাউদ শাহ—(৩) বাঙ্গালার কররাণী-বংশীয় পাঠান ভূপতি। তিনি ১৫৭৩ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মাত্র চারি বৎসর রাজত্ব করেন। এই চারি বৎসর প্রধানতঃ সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াই তাঁহার সময় অতিবাহিত হয়। দাউদশাহের পিতা সুলেমান কররাণী সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু দাউদ খাঁ সিংহাসন অধিকার করিয়াই সর্ব্ব প্রকারে স্বাধীন ভূপতির ন্যায় চলিতে আরম্ভ করেন। তৎফলে সম্রাট আকবর তাঁহাকে দমন করিবার জন্য মুনাইম খাঁ নামক সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। তৎপরে রাজা টোডরমল, লাল খাঁ, রাজা ভগবন্ত দাস, মানসিংহ, জৈন খাঁ, কোকা প্রভৃতি অনেক সেনাধ্যক্ষও মুনাইম খাঁর সাহায্যের জন্য প্রেরিত হন। সম্রাট স্বয়ংও দাউদ শাহকে দমন করিতে পাটনা পর্য্যন্ত আগমন করেন।

বিভিন্ন অবস্থা বিপর্য্যয়ের পরে ১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে দাউদ শাহ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন এবং তাঁহার ছিন্ন শির সম্রাট সমীপে প্রেরিত হয়। দাউদ শাহ গৌড়ের বা মধ্য বাঙ্গালার শেষ পাঠান ভূপতি। তিনি নিজ নামে আরবী ও হিন্দি ভাষায় মুদ্রা মুদ্রিত করাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার পাঠান আধিপত্য বিনষ্ট হয় এবং মুঘল প্রাধান্য বিস্তার লাভ করিতে থাকে। সম্পূর্ণরূপে মুঘল প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে অবশ্য দীর্ঘকাল লাগিয়াছিল। (আকবর ১৪৪পৃঃ ও মুনাইম খাঁ দেখ)।

দাউদ শাহ বাহমনী, সুলতান—দাক্ষিণাত্যের বাহমনীবংশীয় একজন সুলতান। তাঁহার পিতার নাম সুলতান আলা-উদ্দিন হাসান। ১৩৭৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র মুজাহির শাহকে নিহত করিয়া, কুলবর্গের সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু সেই বৎসরই তিনি নিহত হইলে, তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

দাক্ষিণ—ত্রিপুরার প্রাচীন রাজা। তাঁহার পিতার নাম ত্রিলোচন। তিনি চন্দ্র হইতে ৪৮তম এবং ত্রিপুর হইতে ৩য় স্থানীয় ছিলেন। তাঁহার অপর সহোদর হেড়ম্বরাজকর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইলে, তিনি কপিল নদী তীরবর্ত্তী রাজধানী ত্রিবেগ পরিত্যাগ করিয়া খলংমা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার সময় হইতে রাজভ্রাতাগণ সেনাপতির পদ লাভ করিয়া আসিতেছেন।

দাদাজী কুণ্ডদেব—এই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, ছত্রপতি শিবাজীর বাল্যকালের অভিভাবক ও শিক্ষক ছিলেন। তিনি এক সময়ে শাহজীর সঙ্গে সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, অসীম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি বড়ই সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। কথিত আছে তাঁহার

রচিত শাহজীর আম্রকাননস্থ একটি বৃক্ষ হইতে একদা অতিশয় ক্লান্ত হইয়া, তিনি একটি আম্রফল গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার মনে হইল, প্রভুর বিনা অনুমতিতে ইহা গ্রহণ করিয়া, তিনি চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। সেজন্য দক্ষিণ হস্ত কর্ত্তন করিতে উদ্যত হইলে, অন্যকর্ত্তৃক নিরস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল জামা পরিধান কালে দক্ষিণ হস্তে জামার হাতা পরিধান করিতেন না। পরে শাহজীর নিতান্ত অনুরোধে এই প্রকার কার্য্য হইতে নিরস্ত হইয়াছিলেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতও ছিলেন। 'মহাভারত' হইতে ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতির পুণ্য কাহিনী শিবাজীকে শুনাইয়া স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করিতেন। তিনি দেশস্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন। পুনা জিলার অন্তর্গত মালথানা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। নানা অবস্থার ভিতর দিয়া তাঁহার জীবন অতিবাহিত হওয়ায়, বিষয় কার্য্যে ও জমিদারী কার্য্য পরিচালনে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। তাহা এখন ধ্বংসপ্রায় জমিদারীর উন্নতি কল্পে, বিশেষ প্রয়োজনে লাগিয়াছিল। তিনি শিবাজীর সিংহগড় দুর্গ নির্ম্মাণের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে, শিবাজীকে তাঁহার আরব্ধ কার্য্যে ভগবানের নাম শরণ করিয়া, অগ্রসর হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ১৬৪৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

দাদাপীর—একজন বিখ্যাত পীর। তিনি শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ দরবেশ হজরত শাহ জালাল এমনের অনুগত অন্যতম শিষ্য ছিলেন। শ্রীহট্ট সহরের রায় নগরের উপকণ্ঠে মোকৃতা থাকী মহল্লায় তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান আছে।

দাদাভট— চিত্তপাবন ব্রাহ্মণবংশীয় মহারাষ্ট্র দেশবাসী মাধবের পুত্র দাদাভট ১৬৪১ শকে (১৭১৯ খ্রীঃ) 'সূর্য্যসিদ্ধান্তে'র উপর 'কিরণাবলী' নামে এক টীকা রচনা করেন। তাঁহার পুত্র নারায়ণও একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার ছিলেন। তিনি হোরাসার সুধানিধি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

দাদাভাই নৌরজী— খ্যাতনামা ভারতীয় রাষ্ট্রনায়ক। ১৮২৫ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাই নগরের এক প্রসিদ্ধ পারশী পুরোহিত বংশে তাঁহার জন্ম হয়। অতি শৈশবেই তিনি পিতৃহীন হন। তাঁহার মাতা অতি বুদ্ধিমতী নারী ছিলেন। মাতার যত্নে ও সুশিক্ষায় তিনি পিতার অভাব বিশেষ বোধ করেন নাই। তাঁহার মাতুলও পিতৃহীন ভাগিনেয়ের শিক্ষার জন্য নানারূপে সাহায্য করেন। কিছু প্রাথমিক শিক্ষার পর দাদাভাই বোম্বাইএর প্রসিদ্ধ এল্‌ফিনষ্টোন ইনষ্টিটিউশনে (Elphin

stone Institution) প্রবেশ করেন। ছাত্রাবস্থার প্রথম হইতেই তিনি বিশেষ প্রতিভা ও মেধার পরিচয় প্রদান করেন। পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া, তিনি বহু পুরস্কার ও পদক প্রাপ্ত হন। ১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার পাঠ্য জীবন শেষ হয়। বোম্বাই এর তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ও শিক্ষা বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ দাদাভাইএর অসাধারণ প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া, প্রস্তাব করেন যে, যদি বোম্বাইএর পারশী সমাজপতিগণ অর্দ্ধেক ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হন, তবে তিনি অপর অর্দ্ধাংশ প্রদান করিয়া দাদাভাইকে আইন পড়িবার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে সম্মত আছেন। কিন্তু দাদাভাইএর আত্মীয় স্বজন ও সমাজপতিগণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তৎপূর্ব্বে আরও দুই একজন পারশী ছাত্র ইংলণ্ডে গমন করিয়া, খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করাতে, তাঁহারা আশঙ্কা করিলেন যে, দাদাভাইও হয়ত খ্রীষ্টান হইয়া যাইবেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত না হওয়াতে, দাদাভাই প্রথমে বোম্বাই সরকারের দপ্তরে (Secretariat) চাকুরী পাইবার চেষ্টা করেন। তাহাতে বিফল হইয়া এলফিনষ্টোন ইনষ্টিটিউশনে একটি শিক্ষকের পদ লাভ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই(১৮৫০ খ্রীঃ) তিনি ঐ শিক্ষায়তনে গণিত ও বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপকের পদ লাভ করিলেন। চারি বৎসর পরে তিনি প্রধান অধ্যাপক হইলেন। ভারতবাসীর মধ্যে তিনিই প্রথম ঐ পদ লাভ করেন। ছয় বৎসর অধ্যাপনা করিয়া, তিনি উহা পরিত্যাগ করেন এবং একটি পারশী যৌথ ব্যবসায়ের অংশীদাররূপে, ব্যবসায়েরই প্রয়োজনে ইংলণ্ডে গমন করেন।

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া এই কয় বৎসরেই তিনি নানাভাবে দেশের ও দশের অনেক হিতকর কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ছাত্রগণের মধ্যে বিবিধ জ্ঞানের প্রসারকল্পে তিনি ছাত্রীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান সমিতি (Students' Literary and Scientific Society) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ঐ সমিতির পক্ষ হইতে একটি সাময়িক পত্রও (Students' Literary Miscellany) প্রকাশ করিতে থাকেন। উহারই সহযোগীরূপে "জ্ঞান প্রসারক মণ্ডলী" নামে শাখা সমিতিও প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাদের মধ্যে গুজরাটি ভাষা চর্চ্চার জন্য যে সমিতি স্থাপিত হয়, তিনি উহার একজন বিশেষ উৎসাহী সভ্য ছিলেন এবং উহার অধিবেশন গুলিতে প্রায়ই বক্তৃতা করিতেন। বোম্বাইতে প্রথম বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় স্থাপিত হয়। ঐ বিদ্যালয় স্থাপনে তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়া-

ছিল। কিন্তু দাদাভাইএর নেতৃত্বে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান প্রসারিণী সভার সদস্যগণ অল্পকালের মধ্যে বোম্বাই প্রদেশের নানাস্থানে অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিতে সমর্থ হন। ঐ সকল সদস্যগণ নিজেদের অবসর সময়ে দরিদ্র বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতেন। বোম্বাই প্রদেশে দাদাভাই নৌরজীকে স্ত্রীশিক্ষার অগ্রদূত বলিলেও, অত্যুক্তি করা হয় না। এই সকল ভিন্ন 'বিধবা বিবাহ সভা' প্রভৃতি সমাজ সংস্কার মূলক প্রতিষ্ঠানের সহিতও তিনি বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন।

ইংলণ্ডে গমন করিবার পূর্ব্বে দাদা-ভাই রাজনীতিক্ষেত্রে বিশেষ প্রবেশ লাভ করেন নাই। বিলাতে উপস্থিত হইয়া তিনি প্রধানতঃ রাজনীতি চর্চ্চাতেই মনোনিবেশ করেন। ঐ সময়ে বিলাতে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার্থী একটি পারশী যুবকের পক্ষ লইয়া, তিনি প্রথম প্রত্যক্ষ-ভাবে রাজনীতি আন্দোলনে যোগ দিলেন। উক্ত পরীক্ষার্থীর বয়স লইয়া পরীক্ষা পরিচালকবর্গের সহিত তাঁহার বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। ইংলণ্ডের রাজনীতি ক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ জন ব্রাইট (John Bright) এবিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করেন। কিন্তু এই বিষয়ে তিনি কৃতকার্য্য হন নাই। অতঃ-পর যাহাতে একই সময়ে, একাধারে ভারতে ও ইংলণ্ডে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা গৃহীত হয়, তদ্বিষয়ে তিনি আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। প্রথম প্রথম তিনি কাহারও নিকট হইতে সহানুভূতি পান নাই। কিন্তু নিরুৎসাহ না হইয়া, তিনি আন্দোলন চালাইতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে কেহ কেহ তাঁহার প্রস্তাবের অনুকূলতা করিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর অনেক আন্দোলনের পর, ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে পার্লামেন্টের (Parliament) হাউস্-অব্-কমন্সের (House of Commons) সদস্যগণও তাঁহার অনুকূলে মত প্রকাশ করেন।

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে দাদাভাই বুঝিতে পারেন যে, ইংলণ্ডবাসীগণ ভারতবাসী সম্বন্ধে ও ভারতের শাসন-পদ্ধতি বিষয়ে, অত্যন্ত ভ্রমাত্মক ধারণা পোষণ করেন। ইহাতে শাসক ও শাসিত উভয়েরই অত্যন্ত অসুবিধার কারণ হয়। ইংরেজদিগকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ দানের জন্য তিনি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগে প্রথমে লণ্ডন ভারতীয় সমিতি (London Indian Society) নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন (East India Asso-ciation) নামে আরও একটি সভা স্থাপন করেন। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে ভারতের হিতাকাঙ্খী ব্যক্তি মাত্রেই উহার সদস্য হইতে পারিতেন। দাদাভাইএর চেষ্টায় অনেক দেশীয়

রাজন্যগণের নিকট হইতে এই সমিতির জন্য সাহায্য পাওয়া যায়। ভারতের শাসন সংক্রান্ত বিষয় সমূহ এবং ভারতের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার কি প্রকারে উন্নতি হইতে পারে, এই সমস্ত বিষয়ই এই সমিতির পক্ষ হইতে আলোচিত হইত। এই সকল বিষয় আলোচনায় দাদাভাই রাষ্ট্রীয় বিষয়ে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়া, সকলেরই প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ফিরোজ শা মেটা প্রভৃতি মনস্বীগণ এই সমিতির অধিবেশনগুলিতে উপস্থিত থাকিয়া, প্রবন্ধাদি পাঠ করিতেন। অল্পকালের মধ্যে এই সমিতির প্রভাব চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বৈষয়িক কাজেই দাদাভাই প্রধানতঃ ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৮৬২ অব্দে তিনি পূর্ব্ব ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া, এক নূতন কারবার আরম্ভ করেন। চারি বৎসর তাঁহার নিজ নূতন ব্যবসায় ভালরূপেই চলিয়াছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিত কারণে কয়েক বৎসরের মধ্যেই উহা নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু তাঁহার সাধুতার প্রতি লোকের এরূপ আস্থা ছিল যে, মহাজনগণ তাঁহাকে কোনওরূপ দোষারোপ করেন নাই। কারবার নষ্ট হইয়া গেলে ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে তিনি ভারতের হিতার্থে যে সকল কাজ করিয়াছিলেন, তাহার জন্য কৃতজ্ঞ বোম্বাইবাসীগণ, এক প্রকাশ্য জনসভায় তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।

১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করেন। এইবারে, ভারতের অর্থ নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য গঠিত এক কমিটির (Fawcet Committee) নিকট সাক্ষ্য প্রদান করিবার জন্যই তিনি বিলাত যাত্রা করেন। ঐ কমিটির সদস্যগণের নিকট ভারতের জনসাধারণের গভীর দারিদ্র্যের বিষয় বর্ণনা করেন। তিনি হিসাব করিয়া দেখান যে প্রত্যেক ভারতবাসীর বার্ষিক আয় গড়ে কুড়ি টাকা। তাঁহার এই মন্তব্যে সদস্যগণ বিদ্রূপ করেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে তদানীন্তন ভারতীয় রাজস্ব সচিব (Lord Cromer) হিসাব করিয়া দেখান যে, ভারতবাসীর মাথা পিছু বার্ষিক আয় বাস্তবিকই সাতাশ টাকা। উক্ত সমিতির সমক্ষে তিনি যুক্তি ও তথ্যদ্বারা ইহাও প্রমাণ করেন যে, ভারতের বিভিন্ন প্রকার কর ও শুল্ক প্রভৃতির হার অত্যন্ত অধিক। এই সকল কারণে ভারত প্রবাসী ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীগণ তাঁহার উপর বিশেষ ক্রুদ্ধ হন। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি 'ভারতের দারিদ্র্য' (Poverty in India) এই নামে গভীর পাণ্ডিত্য ও বহুতথ্যপূর্ণ একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কয়েক বৎসর

পরে উহা পরিবর্দ্ধিত ও সংস্কৃত হইয়া 'ভারতের অবস্থা' (Conditions in India) এই নামে প্রকাশিত হয়।

এইবারে ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি ভারতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বরোদা রাজ্যের মন্ত্রীর পদ লাভ করেন। বরোদার তদানীন্তন অধিপতি মলহর রাও গায়কোয়ারের কুশাসনে, রাজ্যে বিশেষ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। দাদাভাই নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও দুই বৎসরের মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন এবং নানারূপ উন্নতি বিধান করেন। দুই বৎসর বরোদাতে থাকিয়া তিনি পুনরায় বোম্বাইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ে পাঁচ বৎসরকাল বিবিধ প্রকারে জনসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দের প্রথমভাগে পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করেন। তাহার পূর্ব্বেই ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইনগরে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির (Indian National Congress) প্রথম অধিবেশন হয়। খ্যাতনামা বাঙ্গালী ব্যবহারজীবী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee) উহার সভাপতি হইয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় পৌরসভা পার্লামেণ্টের (Parliament) সদস্য পদ লাভের ইচ্ছাতেই এইবার তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন। উদার মতাবলম্বী দলভুক্ত (Liberal) হইয়া তিনি সভ্যপদ প্রার্থী হন। ঐ সময়ে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী আয়র্লণ্ডকে স্বায়ত্ত শাসন দানের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। ইংরেজেরা সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। এই নির্ব্বাচনে দাদাভাই সফলকাম হইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি নিরুৎসাহ না হইয়া, পরবর্ত্তীবারে যাহাতে সফলকাম হইতে পারেন, তজ্জন্য নানাভাবে চেষ্টা ও আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময়েই, ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দের শেষভাগে কলিকাতা নগরে অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া ভারতে আগমন করেন। ঐ অধিবেশনের পর জানুয়ারী মাসে, পাবলিক সার্ভিস কমিশন (Public Service Commission) নামক অনুসন্ধান সমিতির নিকট তিনি সাক্ষ্য প্রদান করেন। ঐ সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে প্রদত্ত তাঁহার মন্তব্য সমূহ ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের পক্ষে অতি মূল্যবান বস্তু। বস্তুতঃ দাদাভাই নৌরজী প্রভৃতির বিশেষ চেষ্টার ফলেই, ঐ অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হয়। ইহার অল্পকাল পরেই তিনি পুনরায় পার্লামেণ্টের সদস্য হইবার ইচ্ছায় ইংলণ্ডে গমন করেন এবং কয়েক বৎসর বিশেষরূপ চেষ্টার ফলে ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে মধ্য ফিন্সবারী (Central Finsbury) নির্ব্বাচক সম্প্রদায় (Constituency)

হইতে উদার মতাবলম্বী (Liberal) প্রার্থীরূপে তিনি সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ভারতবাসীর মধ্যে তিনিই প্রথম এই অসামান্য সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁহার এই সাফল্যে ভারতের সর্ব্বত্র আনন্দের প্রবাহ বহিতে থাকে।

নির্ব্বাচিত হইয়া দাদাভাই তিন বৎসর পার্লামেণ্টের সদস্য ছিলেন। ঐ সময়ের অন্যান্য কাজের মধ্যে, তিনি ভারতের সকল বিষয়ে ইংরেজদিগের যাহাতে অধিক দৃষ্টি পড়ে. যাহাতে পার্লামেণ্টের অন্যান্য সদস্যগণের ভারত বিষয়ক জ্ঞান ও তথ্য বিস্তৃত ও সত্য হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতে থাকেন। এবিষয়ে ভালরূপ কাজ করিবার জন্য তিনি ভারতবন্ধু সার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ (Sir William Wedderburn) এবং মিঃ কেন-এর (Mr. W. S. Caine) সহযোগীতায় ইণ্ডিয়ান পার্লামেণ্টারী কমিটি (Indian Parliamentary) Committee) নামে একটি সমিতি গঠন করেন। যাহাতে একই সময়ে ভারতে ও ইংলণ্ডে সিবিল সার্বিস (Civil Service) পরীক্ষা গৃহীত হয় তজ্জন্য তিনি প্রথম হইতেই চেষ্টা করিতে থাকেন। পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সভ্য ঐ ব্যবস্থার যৌক্তিকতায় নিঃসন্দেহ হওয়ায় উহার সপক্ষে নির্দ্ধারণ হয়। কিন্তু ঐ নির্দ্ধারণানুযায়ী কোনও কাজ তাহার পর দীর্ঘকালের মধ্যেও হয় নাই।

পার্লামেণ্টের সদস্য থাকিবার সময়েই তিনি লাহোরে অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসমিতির নবম অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন (১৮৯৩ খ্রীঃ ডিসেম্বর)। সেই উপলক্ষে ভারতে আগমন করিলে তাঁহাকে যে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হয়, তাহা সকলেরই বিস্ময় উদ্রেক করে। ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দে ভারতের আয় ব্যয় বিভাগের কার্য্য অনুসন্ধান করিবার জন্য এক রাজকীয় অনুসন্ধান সমিতি (Royal Commission) গঠিত হয়। উহার সভাপতি লর্ড ওয়েলবীর নামানুসারে ঐ সমিতি ওয়েলবী কমিশন (Welby Commission) নামেই সমধিক পরিচিত। দাদাভাই নৌরজী স্বয়ং এবং পূর্ব্বোক্ত সার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ ও কেন (Caine) সাহেব উহার সদস্য হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি নিজে, ব্যয় বিভাগ, ব্যয় বণ্টন এবং কি ভাবে আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা সম্ভব হয়, এই সকল বিষয়ে লিখিত মন্তব্য দাখিল করেন। তাঁহার ঐ লিখিত সাক্ষ্য হইতেই সকলে বুঝিতে পারেন, ভারতের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক ব্যবস্থা বিষয়ে তিনি কিরূপ গভীর ভাবে চিন্তা করিতেন এবং ঐ সকল বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান কত বহুদূর প্রসারী ছিল।

চারি বৎসর পরে পার্লামেন্টের পুনরায় নির্ব্বাচন হয়, সেইবার দাদাভাই আর নির্ব্বাচিত হইতে পারিলেন না। সেই বারের নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল সম্প্রদায় সাফল্য লাভ করেন।

১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দ হইতে তিনি সৈন্য বিভাগে ও নৌবিভাগে ভারতবাসীরা যাহাতে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই আন্দোলন অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়াছিল। প্রথম প্রথম উহার কিছুই ফল হয় নাই।

প্রথমবারে ১৮৮৬খ্রীঃ অব্দে, পার্লামেন্টের নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে, তিনি যে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন, তখন হইতে ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি প্রধানতঃ সেইখানেই বাস করিতেন। মধ্যে মধ্যে অল্পকালের জন্য বিশেষ দরকারে ভারতে আগমন করিতেন মাত্র।

১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে, ভারতে স্বর্ণ মুদ্রা প্রবর্ত্তনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। সার হেনরী ফাউলার (Sir Henry Fowler) উহার সভাপতি ছিলেন। ঐ কমিশনের নিকটেও দাদাভাই দুইটি লিখিত মন্তব্য প্রদান করেন। ১৯০২ খ্রীঃ অব্দে ভারতে দারিদ্র্য এবং অ-ব্রিটিশোচিত শাসন (Poverty and un-British Rule in India) নামে একখানি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশ করেন। উহাতে তিনি বহু তথ্য এবং যুক্তি প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে, ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতবর্ষ দিন দিন দরিদ্রতর হইয়া পড়িতেছে। ভারতীয় নানা সমস্যার মীমাংসার পক্ষে উক্ত পুস্তকখানি একরূপ অদ্বিতীয়।

১৯০৬ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা নগরে জাতীয় মহাসভার যে অধিবেশন হয় তাহাতে তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। নানা কারণে সেই বৎসরের অধিবেশন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছিল। তাহার কিছুপূর্ব্বেই বড়লাট লর্ড কার্জ্জনের নির্দ্দেশে বাঙ্গালা দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়। সেই কারণে বাঙ্গালা দেশে প্রসিদ্ধ বঙ্গ ভঙ্গের আন্দোলন চলিতেছিল। ভারতের অন্যত্রও লর্ড কার্জ্জনের শাসননীতির ফলে অশান্তির বিস্তার হইতেছিল। লর্ড কার্জ্জনের পরবর্ত্তী বড় লাট লর্ড মিণ্টোর (Lord Minto) কতকটা সহানুভূতিপূর্ণ শাসন প্রণালীতে দেশে খানিকটা শান্তি স্থাপিত হইলেও, অশান্তির একেবারে উপশম হয় নাই। দেশীয় নেতৃবৃন্দের অনেকে শাসক সম্প্রদায়ের কার্য্য ও কথার উপর ক্রমেই আস্থা হারাইয়া ফেলিতে ছিলেন। তদ্ভিন্ন জাতীয় মহাসভা এযাবৎ যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া কাজ চালাইয়া আসিতে ছিলেন, তাঁহারা তাহার বিরুদ্ধবাদী

হইয়া উঠিতেছিলেন। মহাসভার কার্য্য প্রণালীর উপর তাঁহাদের যে কিছু বিদ্বেষ ভাব না জন্মিয়াছিল, তাহাও নহে। কারণ তাঁহারা প্রকাশ্য ভাবেই মহাসভার কার্য্য প্রণালীকে ভিক্ষাবৃত্তি বলিয়া, আখ্যা প্রদান করিতে লাগিলেন এবং মহাসভার প্রতি কার্য্যেই তাঁহারা বিরুদ্ধ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে দেশের নেতৃবর্গের মধ্যে চরমপন্থী ও মধ্যপন্থী এই দুইটি দলের সৃষ্টি হইল। ইহাদের কোনও দলের প্রাধান্য অপর দলের অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। দেশীয় নেতৃবর্গের মধ্যে এইরূপ দুইটি দলের সৃষ্টি হওয়ায়, দেশের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। তখন সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন, যে এই উভয় দলের মধ্যে ঐক্য বিধান করিতে সমর্থ এইরূপ একজন লোকের বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে এবং দাদাভাই নৌরজীই এই কার্য্যের যোগ্যতম ব্যক্তি ইহা উপলব্ধি করিয়া, ১৯০৬খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা নগরে অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে, তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচন করা হইল। তাঁহার ঐ নির্ব্বাচন যে সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত হইয়াছিল, তাহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তিনি ঐ দুই দলের মধ্যে সখ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হন। তাঁহার দৃঢ়তা এবং বিভিন্ন মত সমুদয়ের সমন্বয় প্রণালীতে ঐ দুই ভিন্ন মতাবলম্বী দলের বিরোধ প্রায় তিরোহিত হয়। বিদেশী দ্রব্য পরিহার (Boycott) প্রস্তাবই ঐ উভয় দলের মতানৈক্যের প্রধান হেতু হইয়াছিল। তাঁহার মধুর এবং যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায়, উভয় দলই এবিষয়ে একটি মীমাংসিত পন্থা অবলম্বন করেন। তাঁহার বক্তৃতা প্রধানতঃ সুযুক্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আজকাল রাজনীতিক আন্দোলনে যে 'স্বরাজ' শব্দের বহুল ব্যবহার হইতেছে, তাহা দাদাভাই নৌরজী সেই অধিবেশনে প্রথম ব্যবহার করেন এবং স্বরাজই ভারতবাসীর একমাত্র ঈপ্সিত বস্তু, এই সকল বিষয়, সেই অধিবেশনে দাদাভাই নৌরজী প্রথম বিশেষ দৃঢ়তার সহিত উত্থাপন করেন। তাঁহার বক্তৃতার প্রধান বিষয় ছিল সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতের স্থান নির্দ্দেশ। বক্তৃতা প্রসঙ্গে, তিনি ভারতীয় প্রজাগণ যাহাতে সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রজার সহিত সমান রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাও দাবী করেন।

এই বৎসরে অধিবেশনের পর হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য দ্রুত খারাপ হইতে থাকায়, তিনি আর সাক্ষাৎভাবে দেশের রাজনীতিক আন্দোলনের সহিত যোগ রক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু সভা-সমিতির অধিবেশনে প্রেরিত অথবা পত্রিকা প্রভৃতিতে প্রকাশিত তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও মন্তব্যসমূহ দেশে

রাজনীতি আন্দোলনের চিন্তাধারা ও কর্ম্ম প্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিত। দেশের সকল প্রকার গুরুতর সমস্যার সমাধানের জন্য, নেতৃবর্গ তাঁহার ভূয়োদর্শন-প্রসূত পরামর্শ গ্রহণ করিতে, সর্ব্বদাই উৎসুক থাকিতেন।

১৯১৫ খ্রীঃ অব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তাঁহার একনবতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে তিনি জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে যে মহান সম্বর্দ্ধনা প্রাপ্ত হন তাহা ভারতের আর কোনও রাজনীতিকের ভাগ্যে ঘটে নাই। বড়লাট লর্ড হার্ডিং (Lord Hardinge) এবং একাধিক প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাও তাঁহাকে অভিনন্দন করেন। বোম্বাই প্রদেশের মহিলাগণ বিশেষ ভাবে তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাঁহাদের মধ্যে খ্যাতনাম্নী দেশসেবিকা সরোজিনী নাইডু, গুজরাটী স্ত্রীমণ্ডলের শ্রীমতী যমুনা ভাই সখে প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

দেশের রাজনীতি আন্দোলনের সহিত দীর্ঘকাল যুক্ত থাকিয়া দাদাভাই নিজের ব্যবহারের জন্য বহু মূল্যবান্ এবং তথ্যপূর্ণ গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ সংগ্রহের মধ্যে এমন অনেক জিনিষ ছিল, যাহা ভারতের আর কোথাও পাওয়া যাইত না। তিনি তাঁহার এই অমূল্য গ্রন্থ সংগ্রহ বোম্বাই প্রাদেশিক সঙ্ঘকে (Bombay Presidency Association) প্রদান করেন।

রাজনীতি আন্দোলনে নিযুক্ত থাকার সময়ে দেশের শিক্ষা বিস্তার ও তদানুষঙ্গিক আন্দোলনেও তিনি যথাযোগ্য মনোযোগ প্রদান করিতেন। এই বিষয়ে ইংলণ্ডের ও ভারতের বহু সাময়িক পত্রিকাতে তাঁহার সুযুক্তি পূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ এবং ভারতের রাজনীতিক আন্দোলনে তাঁহার অপরিসীম দানের কথা স্মরণ করিয়া বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে সম্মানীত ভাবে (Honorary) ডি-এল্ (Doctor of Laws) উপাধি প্রদান করেন।

১৯০৫ খ্রীঃ অব্দে ইউরোপের হলাণ্ড দেশস্থ আমষ্টারডাম (Amsterdam) নগরে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদীদের মহা সম্মেলন (International Social Democrats' Congress) হয়। সেই সম্মেলনে দাদাভাই নৌরজী ভারতের প্রতিনিধি স্বরূপ উপস্থিত হন এবং নির্ভিক ও স্পষ্ট ভাষায়, ভারতে ইংরেজ শাসনের দোষ সমূহ উদ্ঘাটন করিয়া এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার সেই ওজস্বিনী বক্তৃতা শ্রোতৃবর্গের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

শেষ জীবনে তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারতের মহান বৃদ্ধ পুরুষ (Grand Old Man of India) নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

বিভিন্ন সময়ে ইংলণ্ডে অবস্থান কালে তিনি যে সকল স্থানে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে, ১৯০১ খ্রীঃ অব্দের ৪ঠা জুলাই, North Lambeth Liberal Club এ ব্রিটিশ প্রজাতন্ত্র ও ভারত নামক বক্তৃতা; পরবর্ত্তী বৎসর মার্চ্চ মাসে London Indian Societyর বাৎসরিক ভোজ উপলক্ষে প্রদত্ত ভারতে ইংরেজ শাসন; ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দে বোম্বাই নগরে অনুষ্ঠিত জাতীয় মহাসভার দ্বাবিংশ অধিবেশনের নির্ব্বাচিত সভাপতি সার হেনরী কটন (Sir Henry Cotton) এর সম্বর্দ্ধনার জন্য আহুত প্রীতি সম্মিলনীতে প্রদত্ত জাতীয় মহাসমিতি উপলক্ষে বক্তৃতা; ১৯০১ খ্রীঃ অব্দের ৩১শে এপ্রিল, ক্রয়ডনের (Croydon) ধর্ম্ম মন্দিরে প্রদত্ত "ভারতের দুর্ভিক্ষ-তাহার কারণ ও প্রতিকার" নামক প্রভৃতি বক্তৃতাগুলি অপেক্ষাকৃত মূল্যবান।

তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের রাজনীতিক চর্চ্চায় যাঁহারা ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁহার সহিত যোগ দিয়া কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সার উইলিয়াম ওয়েভারবার্ণ, অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম (Allan Octaviun Hume), উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরোজ শাহ মেহতা, বদরুদ্দিন তায়াবজী, মনোমোহন ঘোষ, লালমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত, আনন্দ চার্লু প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। ১৯১৭ খ্রীঃ অব্দের ১লা জুন এই মহাকর্ম্মীর দেহত্যাগ হয়।

দাদু—মধ্যযুগের একজন ভক্ত ও ধর্ম্মনেতা কাহারও মতে তিনি আহাম্মদাবাদে এক মুসলমান তুলাধুনকরের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। কাহারও মতে তিনি গুজরাটের এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। স্বর্গীয় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় বহু প্রমাণ প্রয়োগদ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দাদু জোনপুরের এক মুচীবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব নাম ছিল 'মহাবলী,' তিনি সকলকেই 'দাদা' বলিয়া ডাকিতেন, সেইজন্য সকলেই তাঁহাকে দাদা এবং আদর করিয়া 'দাদু' বলিয়া ডাকিত, সেইজন্য তাঁহার নাম হইল দাদু এবং এইনামেই তিনি সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেন। তিনি কবীরের পুত্র প্রসিদ্ধ ভক্ত সাধক কমালের শিষ্য ছিলেন। কেহ কেহ গুরু পরম্পরা এইরূপ নির্দ্দেশ করেন—রামানন্দ—কবীর—কমাল—জমাল—বিমল—বুঢ্ঢন—দাদু, দাদুর শিষ্য রজ্জব প্রভৃতি। এই সকল মহাত্মারা গৃহ পরিবারে থাকিয়া ধর্ম্ম সাধনাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গৃহে থাকিয়া, দাদু দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। নানাস্থান ভ্রমণের ফলে তাঁহার চিত্ত উদার ভাবেপূর্ণ হইল। তিনি বাহিরের সাজসজ্জা, ভেক,

সম্প্রদায় বুদ্ধি ও সাম্প্রদায়িক পথ মানিলেন না ও গ্রহণও করিলেন না। একপূর্ণ ব্রহ্মকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ফলে প্রচলিত দেবদেবী, পূজা-পার্ব্বতি, তীর্থ ব্রতাদিতে বিশ্বাস, জাতি ও জন্মের বিচার প্রভৃতি চিরকালের জন্য তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। হিন্দু মুসলমান মত লইয়াও তিনি কোন বিচার করিতেন না। তিনি কাশী, বিহার, বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া, নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সহিত পরিচিত হন। কেহ কেহ বলেন এক সময়ে নাথপন্থী সম্প্রদায়ে তিনি প্রবেশ করিয়া, কুম্ভীরপাদ নাম প্রাপ্ত হন। এই নাথ পন্থী সম্প্রদায়ে প্রবেশ সত্য কিনা ঘোরতর সন্দেহ আছে। কারণ তিনি উগ্র সম্প্রদায় বিরোধী ছিলেন। এইভাবে দেশ ভ্রমণকালে দাদু নানা সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পান এবং সকল সাধনার মধ্যেই সামঞ্জস্য ও ঐক্য দেখিয়া মুগ্ধ হন। সাম্প্রদায়িকতা যে এই বিরাট সত্য উপলব্ধির অন্তরায়, ইহাও তিনি অনুভব করেন। যে সত্য কবীর, কমাল প্রভৃতি সাধকের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই সত্য কেবল উপলব্ধি করিয়া দাদু ক্ষান্ত হন নাই। সেই সত্যকে তিনি রূপ ও আকার দিয়াছিলেন। তিনি একস্থানে বলিতেছেন—
'সবহম দেখা সোধি করি, দুজা নাহী আন সব ঘট একৈ আত্মা, ক্যা হিন্দু মুসলমান'
('সব আমি সন্ধান করিয়া দেখিলাম, পর কাহাকেও পাইলাম না। সকল ঘটে একই আত্মা, কি হিন্দু কি মুসলমান'।) দাদু সম্প্রদায় বিরোধী হইলেও তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া একটী সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল, এবং তাঁহার নাম হইল ব্রহ্ম সম্প্রদায়। তিনি নির্ভয়ে সকল মানবের কল্যাণকামী হইয়া সকল কুরীতি ত্যাগ করিতে উদ্যোগী হইলেন। তিনি অলৌকিক কার্য্য প্রদর্শনের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। হইলে কি হয়, তাঁহার শিষ্যেরা পরে তাঁহার অলৌকিক যোগবলের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে ত্রুটি করেন নাই। বলাই বাহুল্য দাদু তাঁহার ব্যক্তিত্বের, সাধনার ও চরিত্রের বলেই লোকের হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দাদু সংসার আশ্রমী সাধু ছিলেন। তাঁহার গরীব ও মসকীন নামে দুই পুত্র এবং নানী বাঈ ও মাতা বাঈ নামে দুই কন্যা ছিলেন। কেহ কেহ বলেন কন্যাদ্বয়ের নাম অব্বা ও সব্বা ছিল। দাদুর পিতার নাম লোদী ও মাতার নাম বসী বাঈ। স্ত্রীর নাম হবা। ১৪৬৬ শকের (১৫৪৪ খ্রীঃ) ফাল্গুন মাসের শুক্লা অষ্টমী বৃহস্পতিবারে দাদুর জন্ম হয় এবং ১৫২৬ শকের (১৬০৩ খ্রীঃ) জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী শনিবারে নরাণা সহরে তাঁহার মৃত্যু হয়

দাদুর আমেরে অবস্থানকালে তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বহু দূরে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। দিল্লীর সম্রাট আকবরশাহ তাঁহার দর্শন প্রার্থী হইয়া, নির্জ্জনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। বলা বাহুল্য রাজাধিরাজ এই ফকিরকে দেখিয়া, যেমন প্রীত তেমনি উপকৃত হইয়াছিলেন। এই প্রকারে বহুবার তাঁহাকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার সহিত ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিয়া তিনি উপকৃত হইয়াছিলেন।

দাদুর ৫২ জন প্রখ্যাত শিষ্য ছিলেন। তন্মধ্যে খেমদাসজী, ক্ষেত্রদাসজী, গরীবদাস, ঘরশীজী, ঘাটম দাসজী, চৈনজী, জগজীবন, জগন্নাথ দাস, জনগোপাল, জয়মালজী (চৌহান), জয়মালজী (যোগী), জাইসা, টীলাজী, প্রাগদাস, বখনাজী, বনওয়ারী দাস, মাখুজী, মাধোদাস, মোহনদাস, রজ্জবজী, শঙ্করদাস, সন্তদাস, মাধুজী, সুন্দরদাস (বড়), সুন্দরদাস (ছোট), হরিসিংহ জী প্রভৃতি প্রত্যেকে এক একটী দিক্‌পাল ছিলেন। তাঁহাদের বিবরণ উক্ত নামে দেওয়া আছে। দাদুর বাণী ধর্ম্মজীবন গঠনের এক অমূল্য ও অপরিহার্য্য সম্পদ।

দাদোবা পাণ্ডুরং—বোম্বাই প্রদেশের একজন খ্যাতনামা সমাজ সংস্কারক। বোম্বাই প্রদেশের অপর প্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক আত্মারাম পাণ্ডুরং তাঁহার ভ্রাতা ছিলেন। দাদোবা সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তিনি দেশের প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতির উপর বিশেষ বীতরাগ ছিলেন। ডিরোজিওর শিষ্যগণের ন্যায় তিনিও প্রচলিত সকল প্রথা অমান্য করাই সৎসাহসের পরিচয় বলিয়া মনে করিতেন।

দাদোবা মধ্যে কিছুকাল বোম্বাই এর নর্ম্মাল স্কুলের (Normal School) অধ্যক্ষ হন। এই সুযোগ পাইয়া তিনি তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে স্বীয় মত প্রচার করিতে উৎসাহী হন। অল্প দিনের মধ্যেই অনেকগুলি লোক তাঁহার মতাবলম্বী হইলেন। তাঁহারা জাতি ভেদ এবং অন্যান্য কুরীতির উচ্ছেদ সাধন উদ্দেশ্যে এক সভা স্থাপন করিলেন। সভার নাম হইল "পরমহংস সভা"। বোম্বাই অঞ্চলে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের যে সকল চেষ্টা সময়ে সময়ে হইয়াছিল, এই পরমহংস সভা তাহাদের মধ্যে একটি প্রধান ছিল। ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। হংস যেমন জলীয় ভাগ পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধের সার গ্রহণ করে, ঐ সমাজের সভ্যগণও সেইরূপ হিন্দু সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির মধ্যে যাহা কিছু অসার তাহা পরিত্যাগ করিয়া, কেবল সারই গ্রহণ করিবেন, ইহাই প্রতিষ্ঠাতাগণের কর্ম্ম প্রণালী ছিল। ফ্রী মেসন (Free Mason) দের ন্যায় গোপনেই তাঁহাদের কাজ কর্ম্ম সম্পন্ন হইত। প্রথম হইতেই হিন্দু

সমাজকে তীব্রভাবে আক্রমণ আরম্ভ হইল। প্রতি সপ্তাহে সন্ধ্যার পর ঈশ্বর প্রার্থনার পর উহার কার্য্যারম্ভ হইত। ইহাই ধর্ম্মের সহিত একমাত্র সম্পর্ক ছিল। আর সকল বিষয়ে সভার উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক। কোনও ব্যক্তি সভ্য পদে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইত যে, তিনি জাতি ভেদ স্বীকার করেন না। পরে এক টুকরা পাঁউরুটী মুখে দিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস ও কার্য্যের সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইত। অল্পকাল মধ্যেই সভার অনেক-গুলি শাখা বোম্বাই প্রদেশের নানাস্থানে স্থাপিত হইল। প্রায় কুড়ি বৎসর কাল ইহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল। যতদিন গোপনে ইহার সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত, ততদিন ইহাদের সভার কাজ নির্ব্বিঘ্নেই চলিয়াছিল। সাপ্তাহিক অধি-বেশনগুলিতে আলোচনা, দীক্ষা ও বিতর্ক ভিন্ন তাঁহাদের করণীয় আর বিশেষ কিছু ছিল না। ইহাঁদের বার্ষিক প্রীতি সম্মিলনীতে মফস্বলের শাখা সভা হইতে সভ্যগণ উপস্থিত হইতেন। পরি-শেষে একবার কোনও এক ব্যক্তি সভার সমস্ত খাতাপত্র হরণ করিয়া, তাঁহাদের সব গুহ্য কথা সাধারণে প্রকাশ করিয়া দেন। ইহাতে চারি-দিকে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং সভ্যগণের মধ্যে অনেকেই পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়াতে সভার অস্তিত্ব লোপ পাইল

দাননৃপ—তিনি বেঙ্গীর পূর্ব্ব চালুক্য-বংশীয় শেষ নরপতি। তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র শক্তিবর্ম্মা নাম মাত্র বার বৎসর রাজত্ব করেন।

দানপাল—খ্রীঃ দশম শতকে দান পাল কর্ত্তৃক চীনভাষায় নাগার্জ্জুনকৃত 'মহাযানবিংশক' গ্রন্থের অনুবাদ হইয়া-ছিল। এইরূপ বহু সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ বহু ভারতীয় পণ্ডিতদ্বারা চীন ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল।

দানশীল—তিনি বাঙ্গালা দেশস্থিত বৌদ্ধ জগদ্দল বিহারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাভিক্ষু ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।

দানার্ণব—(প্রথম) তিনি উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নরপতি বীরসিংহের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি দন্তপুরে চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার তনয় দ্বিতীয় কামার্ণব তৎপরে পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন। কামার্ণব (প্রথম) দেখ।

দানিয়েল, রাজকুমার—তিনি সম্রাট আকবরের পঞ্চম পুত্র। ১৫৭২ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ৯৭৯) আজমীর নগরে প্রসিদ্ধ দরবেশ শেখ দানিয়েলের ভবনে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি সেইজন্য দানিয়েল নাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার মাতা জয়পুরের রাজা বিহারী মল্লের কন্যা ছিলেন। তিনি সাত হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন। রাজকুমার মুরাদের মৃত্যুর পরে, সম্রাট

আকবর তাঁহাকে একদল প্রবল সৈন্য সমভিব্যাহারে দাক্ষিণাত্যের নিজাম শাহী রাজ্য জয় করিতে প্রেরণ করেন। ১৬০০ খ্রীঃ অব্দে (হিঃ ১০০৯) উক্ত রাজ্য অধিকৃত হয়। ইহার কিছু-কাল পরেই ১৬০৫ খ্রীঃ অব্দে মাত্র তেত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি অতিরিক্ত মদ্যপানে পরলোক গমন করেন।

তিনি ১৫৯৩ সালে কুলিজ খাঁর কন্যাকেও ১৫৯৭ সালে মির্জা আবদুর রহিম খান খানানের কন্যা জানান বেগমকে বিবাহ করেন। বিজাপুরের ইব্রাহিম আদিল শাহের কন্যার সহিতও বিবাহ স্থির হইয়াছিল কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বেই তিনি পরলোকবাসী হন। তাঁহার মৃত্যুকালে তাহামুরাস, বায়াসঙ্গর ও হোসাং নাহং নামে তিন পুত্র এবং চারি কন্যা বর্ত্তমান ছিল।

দানিশ মন্দ খাঁ—(১) তিনি একজন পারস্য দেশীয় বণিক। তাঁহার প্রকৃত নাম মোহাম্মদ সফি। ১৬৪৬ খ্রীঃ অব্দে সুরাট নগরে বাণিজ্যার্থ আগমন করেন। সম্রাট শাহজাহান তাঁহাকে দিল্লীতে আনয়ন পূর্ব্বক দানিশ মন্দ খাঁ উপাধি ও তিন হাজারী মসনবদারের পদ প্রদান করেন। সম্রাট আওরঙ্গজীবের সময়ে তিনি পাঁচ হাজারী মসনবদারী ও শাজাহানবাদ নামক স্থানের শাসন-কর্ত্তা হইয়াছিলেন। ১৬৭০ খ্রীঃ অব্দে তিনি তথায় পরলোক গমন করেন।

দানিশমন্দ খাঁ—(২) তাঁহার প্রকৃত নাম মিরজা মোহাম্মদ ও কবিজন সুলভ নাম আলী। তাঁহার জন্ম স্থান সিরাজ-নগরী। তিনি ভারতবর্ষে আগমন করিলে, সম্রাট আওরঙ্গজীব তাঁহাকে ১৬৯৩ খ্রীঃ অব্দে নিয়ামত খাঁ উপাধি প্রদান করেন। সম্রাটের মৃত্যুর পরে বাহাদুর শাহ তাঁহাকে নবাব দানিশমন্দ খাঁ আলী উপাধি প্রদান করেন। বাহাদুর শাহের আদেশে 'শাহনামা' নামে তাঁহার রাজত্বের ইতিহাস সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হন কিন্তু ১৭০৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায়, তাহা আর সম্পন্ন হইতে পারে নাই।

দাবাজী—তিনি একজন দাদুপন্থী ভক্ত সাধু। তাঁহার রচিত অনেক ভক্তবাণী, বাবা ঈশ্বর দাস কর্ত্তৃক সংগৃহীত "দাদু-পন্থী ভক্তবাণী" নামক সংগ্রহ গ্রন্থে রক্ষিত আছে।

দামজদশ্রী—প্রথম তিনি সৌরাষ্ট্রের একজন শকজাতীয় ক্ষত্রপ (শাসনকর্ত্তা) ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রুদ্র-দাম এবং পুত্রের নাম জীবদাম। তাঁহাদের নামীয় মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। জীবদামের মুদ্রায় ১০০-১২০ শকাব্দের উল্লেখ আছে। সুতরাং দামজদশ্রী শকাব্দের প্রথম শতকে বর্ত্তমান ছিলেন।

দামজদশ্রী—(দ্বিতীয়, তিনি সৌরাষ্ট্রের শকজাতীয় ক্ষত্রপ (শাসনকর্ত্তা) রুদ্র-দামের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার আবিষ্কৃত

মুদ্রায় ১৪৩—১৫৫ শকের উল্লেখ আছে।

দামজদশ্রী—(তৃতীয়) তিনি সৌরাষ্ট্রের শকজাতীয় ক্ষত্রপ দামসেনের চতুর্থ পুত্র। তিনি স্বীয় ভ্রাতা বিজয়সেনের পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার মুদ্রায় ১৭৩, ১৭৬ শকাব্দের উল্লেখ আছে। তাঁহার পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বীরদামের পুত্র দ্বিতীয় রুদ্রসেন রাজা হইয়াছিলেন।

দামনারায়ণ—তিনি সহজিয়া সম্প্রদায়ের 'সহজউজ্জ্বল' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

দামসেন – তিনি সৌরাষ্ট্রের শকজাতীয় ক্ষত্রপ (শাসনকর্ত্তা) রুদ্রসিংহের তৃতীয় পুত্র। রুদ্রসিংহের দ্বিতীয় পুত্র সত্যদাসের পরে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার মুদ্রায় ১৪৫ হইতে ১৫৮ শকাব্দ পর্য্যন্ত তারিখ পাওয়া যায়। দামসেনের বীরদাম, যশোদাম, বিজয়সেন ও দামজদশ্রী (তৃতীয়) নামে চারিজন পুত্রের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহারা সকলেই সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ধরিতে হইবে।

দামাজী গাইকবাড়—তাঁহার পিতামহের নাম নন্দজী ও পিতার নাম কেরোজী। নন্দজী ভের দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন। একদা এক মুসলমান কসাই কতকগুলি গরু বধার্থ লইয়া যাইতেছিল। নন্দজী সেই কসাইকে বিতাড়িত করিলে গরুগুলি দুর্গের পশ্চাৎ দ্বার দিয়া দুর্গে প্রবেশ করে। এই ঘটনার পর হইতে তিনি গাইকবাড় (গাই=গরু, কবাড়=দ্বার, গো-দ্বার অর্থাৎ অর্থাৎ গোরক্ষক) নামে খ্যাত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র কেরোজী দুর্গাধ্যক্ষ হন। কেরোজীর দামাজী, লিঙ্গোজী, গুজোজী ও হরিরাও নামে চারি পুত্র ছিল। মারাঠা সেনাপতি খণ্ডেরাও দাভারের অধীনে দামাজী কর্ম্ম গ্রহণ করেন। মুঘল সৈন্যকে বালাপুরের যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া তিনি পেশোয়ার সুনজরে পতিত হন। তিনি অপুত্রক ছিলেন এবং স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র পিলাজীকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে পিলাজীকে সেনাপতি খণ্ডেরাও দাভারের গৃহের সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ক্রমে ক্রমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পিলাজী বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। ১৭২১ খ্রীঃ অব্দে দামাজী পরলোক গমন করেন। পিলাজী রাজ্যের ও উপাধির অধিকারী হইলেন। বলিতে গেলে তিনিই বরোদার গাইকবার বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

দামোদর—(১) তিনি সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে দর্পণ নামে একখানা গ্রন্থ খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম লক্ষ্মীধর।

দামোদর—(২) তাঁহার পিতার নাম

পদ্মনাভ এবং পিতামহের নাম নার্মদ। তাঁহারা উভয়েই জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থকার ছিলেন। দামোদর ১৩৩৯ শকে (১৪১৭ খ্রীঃ) 'ভটতুল্য' নামক একখানি করণ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইহাতে মধ্যমাধিকার, গ্রহস্ফুটি, করণাধিকারাদি আটটি অধ্যায় আছে। দামোদর বৃদ্ধ আর্য্যভট তন্ত্রে লাল্লোক্ত বীজ সংস্কার পূর্ব্বক আর্য্য পক্ষের মতানুযায়ী হইয়াছিলেন।

দামোদর—(৩) তিনি একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। 'করণ প্রকাশ বৃত্তি' নামক গ্রন্থ তাঁহার রচিত।

দামোদর—(৪) তিনি মল্লারিকৃত 'জাতক পদ্ধতি'র, 'দামোদরী' নামে এক টীকা রচনা করেন।

দামোদর—(৫) তিনি ভাস্করকৃত 'লীলাবতী'র উপর 'লীলাবতী কৌতুক' নামে এক টীকা লিখিয়াছিলেন।

দামোদর—(৬) তিনি রামচন্দ্র বাজপেয়ীকৃত 'সমরসার' গ্রন্থের 'সঙ্কেত মঞ্জরী' নামে এক টীকা রচনা করেন।

দামোদর—(৭)'যন্ত্র চিন্তামণি' নামক তান্ত্রিক নিবন্ধ তাঁহার রচিত। মারণাদি ষট্ কর্ম্ম সম্পাদনোপযোগী বিবিধ যন্ত্রের বিবরণ এই গ্রন্থে আছে। জালন্ধর পীঠে নৃসিংহ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তৎপুত্র মহাদেব, তাঁহার পুত্র দেবদত্ত তাঁহার পুত্র গঙ্গাধর, গঙ্গাধরের পুত্র দামোদর।

দামোদরগুপ্ত—(১) তিনি কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড়ের (৭৭৯—৮১৩ খ্রীঃ) মন্ত্রী ছিলেন। তিনি 'কুট্টনীমত' নামে একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

দামোদর গুপ্ত—(২) মগধের বিখ্যাত গুপ্ত রাজাদের অনেক পরে, গুপ্ত নামে আর একটী রাজবংশ মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইতিহাসে তাঁহারা 'পরবর্ত্তী যুগের মগধের গুপ্তরাজবংশ' নামে খ্যাত। এই বংশের কুমারগুপ্তের পুত্র দামোদর গুপ্ত। মৌখরীবংশীয়দের সহিত তাঁহাদের খুব বিবাদ ছিল। কুমারগুপ্ত মৌখরীরাজ ঈশানবর্ম্মাকে একবার যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই মৌখরীরা, গুপ্ত রাজাদেরে পরাস্ত করিয়া মগধের কিয়দংশ অধিকার করেন। কুমার গুপ্তের পুত্র দামোদর গুপ্ত আবার মৌখরাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সম্ভবত দামোদর গুপ্ত সমরক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করেন। এই গুপ্তবংশীয়েরা খুব প্রবল হইয়া আসাম প্রদেশ পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন।

দামোদর গুপ্তের পুত্রের নাম মহাসেন গুপ্ত ও কন্যার নাম মহাসেন গুপ্তা। এই কন্যার সহিত স্থানীশ্বর-রাজ আদিত্যবর্ম্মার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহাদেরই পুত্র প্রভাকর বর্দ্ধন সর্ব্বপ্রথম স্থানীশ্বরবংশে সম্রাট উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাসেন গুপ্ত

কামরূপপতি সুস্থিতবর্ম্মাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

দামোদরজী—তিনি নাথদ্বার নামক তীর্থস্থানের পুরোহিত ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে হোলকার ও সিন্ধিয়ার বিবাদে নাথদ্বার অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুরোহিত দেববিগ্রহ সঙ্গে করিয়া উদয়পুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে সেই স্থানও নিরাপদ মনে না করিয়া, গাসিয়ার নামক শৈলমালার অভ্যন্তরে একটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া তথায় দেব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া প্রাকার বেষ্টিত করিলেন। পরে দস্যুদের হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য চারিশত অশ্বারোহী সৈনিক শিষ্য সংগ্রহ করিলেন। নাথদ্বার চিরদিনের জন্য জনশূন্য হইল।

দামোদর দাসজী—তিনি একজন দাদুপন্থী সাধক। দাদুর মৃত্যুর পরে দাদুর অনেক শিষ্য সংস্কৃত হইতে দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ অনুবাদ কার্য্যে নিযুক্ত হন। ভক্ত দামোদর দাস ১৬৫০ খ্রীঃ অব্দে তখনকার রাজস্থানী ভাষায় গদ্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুবাদ করেন।

দামোদর দেব—(১) আসামের একজন ধর্ম্মপ্রচারক। তিনি বিজনী হইতে তাড়িত হইয়া রাজা প্রাণনারায়ণের আশ্রয়ে বাস করেন। কুচবিহারের পশ্চিমে টাকাগাছা গ্রামে তাঁহার পাট বিদ্যমান আছে। দামোদর শ্রীভাগবতের মত পদ বন্ধ করিয়া প্রচার করেন।

দামোদর দেব—(২) তিনি আসামের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারক শঙ্কর দেবের অন্যতম ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন। শঙ্কর দেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার মত প্রচারে তিনি প্রধান অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার সম্প্রদায় দামোদরীয় নামে খ্যাত। শঙ্কর দেব দেখ।

দামোদর দৈবজ্ঞ— তিনি একজন জ্যোতিষের পণ্ডিত। 'জাতকাদেশ' গ্রন্থ তাঁহারই রচিত। পৃথুযশাকৃত 'ষট্ পঞ্চাশিকা' গ্রন্থেরও তিনি এক টীকা রচনা করেন।

দামোদর ভঞ্জ—তিনি তাঁহার পিতৃব্য দাশরথি ভঞ্জকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়া ১৭৬১ খ্রীঃ অব্দে রাজ্য অধিকার করেন। ঐ সময়ে (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে) দেশে অরাজকতা পরিপূর্ণ ছিল। ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দে একাশীটি গ্রাম হইতে ময়ূরভঞ্জপতি দামোদরভঞ্জ বিনা বিচারে স্বাধীকারচ্যুত হইলেন। ১৭৯৭ খ্রীঃ অব্দের ৫ই এপ্রিল দামোদরভঞ্জ পরলোক গমন করিলে, রাণী সুমিত্রা দেবী রাজ্য লাভ করেন। তিনি ত্রিবিক্রমভঞ্জকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। মহারাজ দামোদরভঞ্জের যমুনাদেবী ও চম্পাদেবী নামে আরও দুই রাণী ছিল।

দামোদর মিশ্র—(১) তিনি 'গঙ্গাজল' নামে একখানা স্মৃতি শাস্ত্র সঙ্কলন

করিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে লিখিত।

দামোদর মিশ্র—(২) মালব দেশের অন্তর্গত ধারনগরের অধিপতি ভোজ-দেবের আশ্রয়ে খ্রীঃ দশম শতকে তিনি মহানাটক বা হনুমান নাটক প্রণয়ন করেন।

দামোদর মুখোপাধ্যায়—বাঙ্গালী সাহিত্যিক। ১২৫৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে (১৮৫৩ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী) কৃষ্ণ-নগরে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয়। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা ব্যাকরণরচয়িতা লোহা-রাম শিরোরত্ন মহাশয় তাঁহার মাতুল ছিলেন। তাঁহার পৈতৃক নিবাস শান্তি-পুর। মাতুলালয়েই তিনি প্রধানতঃ প্রতিপালিত হন। কৃষ্ণনগর ও বহরম-পুরে তাঁহার শিক্ষা লাভ হয়। তিনি ইংরেজি, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত, এই তিন ভাষাতেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। দামোদর অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাদের মধ্যে মা ও মেয়ে, দুই ভগিনী, বিমলা, কর্ম্মক্ষেত্র, শান্তি, সোনার কমল, যোগেশ্বরী, অন্নপূর্ণা, সপত্নী, ললিত-মোহন, অমরাবতী, শুক্লবসনা সুন্দরী, শম্ভুরাম, নবাবনন্দিনী ও মৃন্ময়ী প্রধান। শেষোক্ত পুস্তক দুই খানি বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা ও দুর্গেশনন্দিনীর উপ-সংহার স্বরূপ। ইংরাজিতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য তিনি অনেক ইংরেজি উপন্যাস বাঙ্গালাতে অনুবাদ করিয়াও প্রকাশ করেন। তদ্ভিন্ন তিনি নয়টি টীকাও ভাষ্যসহ শ্রীমদ্ভগবগীতার এক বৃহৎ সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই পুস্তক প্রায় সাড়ে তিন হাজার পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রবাহ নামক দুইখানি পত্রিকা তিনি কিছুকাল সম্পা-দন করেন। দেশ প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মে তিনি বিশেষ আস্থাবান ছিলেন। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দামোদর রাও—অন্য নাম আনন্দ রাও। তাঁহার পিতা বাসুদেব রাও, খান্দেশের ৪।৫ লক্ষ টাকা আয়ের একজন জায়গীরদার ছিলেন। মহারাজ গঙ্গাধর রাও (ঝাঁন্সীর রাণী লক্ষ্মী-বাঈয়ের স্বামী) অপুত্রক ছিলেন। তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে, তাঁহার জ্ঞাতি বাসুদেব রাওয়ের পুত্র দামোদর রাওকে, পোষ্য পুত্র রূপে গ্রহণ করেন। গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যুর পরে, বড়লাট লর্ড ডালহৌসী পোষ্য পুত্রকে অস্বীকার করিয়া, ঝান্সী রাজ্য ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। কেবল রাজকোষস্থিত ছয় লক্ষ টাকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে দামো-দরকে দিবেন বলিয়া, ইংরেজ হস্তে গচ্ছিত রাখিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে রাণী লক্ষ্মীবাঈ ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন। দামোদর রাও রাণীর বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী

রামচন্দ্র রাও দেশমুখ, রঘুনাথ সিংহ, গণপতি রাও মহারাট্টা, হোসেন খাঁ রিসলদার প্রভৃতির সাহায্যে দুই বৎসর কাল নানা স্থানে গোপনে অবস্থান করিয়া, অবশেষে ইংরেজহস্তে আত্ম সমর্পণ করেন। দশ বৎসর বয়স্ক এই বালক মাসিক ১৫০৲ দেড় শত টাকার বৃত্তিভোগী হইয়া, তদবধি ইন্দোরে অবস্থান করিতে থাকেন। বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক এই বৃত্তির পরিমাণ দুইশত টাকা করিয়া দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁহার নামে গচ্ছিত অর্থ তিনি ফিরিয়া আর পান নাই। ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার লষাণ রাও নামে একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। গঙ্গাধররাও এবং লক্ষ্মীবাঈ দেখ'

দারাশুকো—মুঘল সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৬১৫ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে আগ্রা নগরীতে তাঁহার জন্ম হয়। শাহজাহান তাঁহাকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া তদনুরূপ সম্মান ও মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন। অপর ভ্রাতারা এজন্য বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে প্রধানতঃ সম্রাটের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজীব দারার বিশেষ বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। সম্রাটের পীড়ার সংবাদ পাইয়া ভ্রাতৃচতুষ্টয় যখন সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হন তখন (১৬৫৭ খ্রীঃ মে,) ঢোলপুরের নিকটে আওরঙ্গজাবের সহিত তাঁহার প্রথম সংঘর্ষ হয়। কিন্তু আওরঙ্গজীবের রাজনীতি ও রণনীতির কৌশলে দারা সম্মুখ যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া, রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। পরে আবার সামুগঢ় নামক স্থানে উভয় ভ্রাতা রণক্ষেত্রে সাক্ষাৎ করেন। যুদ্ধে দারার পরাজয় হয় এবং তিনি আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। তিনি এই পরাজয়ে এত মর্ম্মাহত হন যে, সম্রাটের বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া স্ত্রী, পুত্র ও কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচরসহ অনির্দ্দেশ যাত্রা করেন। প্রথমে তিনি দিল্লীতে গমন করিয়া পুনরায় সৈন্য সংগ্রহে চেষ্টা করেন। দিল্লীতে প্রায় দশ হাজার অনুচর সংগ্রহ হইলে তিনি লাহোরে গমন করিলেন। পুর্ব্বে তিনি লাহোরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তজ্জন্য পঞ্জাব প্রদেশেও তাঁহার পক্ষাবলম্বী লোক অনেক ছিল। পঞ্জাবে দারা প্রায় কুড়ি হাজার নিজ পক্ষীয় লোক সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু আওরঙ্গজীব তাঁহাকে অধিক বল সঞ্চয় করিবার সময় দিলেন না। ১৬৫৮ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে বাহাদুর খাঁ নামক সেনাপতি আওরঙ্গজীবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া দারাকে আক্রমণ করিলেন। পরে আওরঙ্গজীব স্বয়ংও বাহাদুর খাঁর সহিত মিলিত হইলেন। দারা পুনরায় পরাজিত হইয়া মুলতানে পলায়ন করিলেন। সেই স্থানেও

আক্রান্ত হইয়া তিনি সক্কর নামক স্থানে পলায়ন করিতে বাধ্য হন এবং আওরঙ্গজীবের প্রেরিত বাহিনীর আক্রমণ রোধ করিতে অসমর্থ হইয়া ক্রমে সিন্ধুনদ বাহিয়া দক্ষিণদিকে পলায়ন করিতে থাকেন। ক্রমে তিনি কচ্ছ উপসাগরের মধ্য দিয়া কাঠিওয়ারে উপনীত হন। কচ্ছের রাজা ও নবনগরের জাম সাহেব তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের সাহায্যে দারা আহম্মদাবাদে গমন করিতে সমর্থ হন। তথাকার শাসনকর্ত্তা শাহ নওয়াজ খাঁ তাঁহার সহিত যোগ দিয়া অর্থ ও লোকবলদ্বারা তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। দারা সর্ব্বসমেত প্রায় বাইশ হাজার সৈন্য ও তদনুরূপ অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া পুনরায় আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মধ্যপথে আজমীরের সন্নিকটস্থ দেওরাই গিরিবর্ত্মে পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হইল। হতভাগ্য দারা, পুনরায় পরাজিত হইয়া স্ত্রী পুত্র ও সামান্য ধন সম্পত্তি লইয়া গুজরাট অভিমুখে পলায়ন করিলেন। সমস্ত সময়েই আওরঙ্গজীবের সৈন্য তাঁহার অনুসরণ করাতে তিনি সামান্যও বিশ্রাম লইবার অবকাশ পাইলেন না। অত্যন্ত দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে হওয়াতে তাঁহার অনুচরেরা অনেকেই পথশ্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভারবাহী পশুর অভাবে অনেক ধন সম্পত্তি হস্তচ্যুত হয়। এইভাবে নানারূপ বিপদ ভোগ করিয়া দারা কচ্ছ প্রদেশের ভিতর দিয়া পুনরায় সিন্ধুদেশের দক্ষিণ ভাগে উপস্থিত হন। তখন তাঁহার সঙ্গে মালপত্র বহন করিবার জন্য সামান্য কয়েকটি উট, পরিবারবর্গকে বহন করিবার জন্য পাঁচটি উট, একটি গো শকট এবং একটি অশ্ব মাত্র ছিল। অনুচর বর্গের সংখ্যা তদনুপাত। কিন্তু সেইখানেই তাঁহার নিস্তার হইল না। তিনি সংবাদ পাইলেন যে উত্তর, পূর্ব্ব ও পূর্ব্ব দক্ষিণ এই তিন দিক হইতে আওরঙ্গজীবের প্রেরিত সেনাপতিগণ তাঁহাকে ধরিবার জন্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সিন্ধু নদ উত্তীর্ণ হইয়া উত্তর পশ্চিমদিকে পলায়নপূর্ব্বক মুঘল সীমানার বাহিরে চলিয়া গেলেন। আওরঙ্গজীবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া জয়সিংহ অসাধারণ ত্বরিত গতিতে সিন্ধু নদীর তীরে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্প কয়েকদিন মাত্র পূর্ব্বে দারা মুঘল সীমানার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন।

দারা পারস্য রাজ্যে চলিয়া যাইবেন এইরূপ মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী নাদিরা বানুর পীড়া গুরুতর অবস্থায় উপস্থিত হওয়ায়, তিনি ঐ ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অতঃপর উপায়ান্তর না পাইয়া তিনি

দাদর নামক স্থানের জমীদার মালিক জিওয়ানের আশ্রয় প্রার্থী হইলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মালিক জিওয়ানকে সম্রাট শাহজাহান প্রাণদণ্ড প্রদান করেন। সেইবার দারারই মধ্যবর্ত্তীতায় তাঁহার প্রাণ রক্ষা হয়। সেই কারণে দারা মনে করিলেন যে, মালিক জিওয়ান সেই উপকার স্মরণ করিয়া, আশ্রয় দান করিবেন। দারা আশ্রয় পাইলেন কিন্তু পত্নীকে হারাইলেন। নাদিরা বানুর মৃতদেহ যে সামান্য কয়েকজন অনুচর তখনও তাঁহার সঙ্গে ছিল তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণে লাহোরে প্রেরিত হইল। দারা একেলা মাত্র কনিষ্ঠ পুত্র ও দুই কন্যাসহ মালিক জিওয়ানের আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃতঘ্ন মালিক জিওয়ান, মাত্র কয়েকদিন পরেই পুত্র-কন্যাসহ দারাকে বন্দী করিয়া আওরঙ্গজীবের অন্যতম সেনাপতি বাহাদুর খাঁর হস্তে সমর্পণ করিলেন।

বন্দী দারা পুত্রকন্যাসহ দিল্লীতে নীত হইলেন। সেইখানে আওরঙ্গজীবের নির্দ্দেশে তাঁহাদিগকে নানাভাবে অপমান করা ও গ্লানিজনক ব্যবহার করা হইল। আগষ্ট মাসের প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে দগ্ধ হইয়া, ছিন্নবেশে শৃঙ্খলবদ্ধ পদে তিনি হস্তী পৃষ্ঠে নগর পরিভ্রমণ করিতে বাধ্য হইলেন। হতভাগ্য দিল্লীবাসীগণ এই মর্ম্মান্তিক দৃশ্যে নীরবে অশ্রু মোচন করিতে লাগিল মাত্র। কোনও প্রতিকারের উপায় খুঁজিয়া পাইল না।

সন্ধ্যার পর সম্রাট বিচার সভা আহ্বান করিলেন। খ্যাতনামা সুধী দানেশমন্দ তাঁহাকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করেন কিন্তু সায়েস্তা খাঁ মোহাম্মদ আমিল, বাহাদুর খাঁ প্রভৃতি ওমরাও ও সেনাপতিগণ তাঁহার প্রাণদণ্ড হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। তখন রাজবেতনভুক্ কাজিগণের মত চাহিয়া পাঠান হইল। তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে বলিলেন যে দারা ইসলামের শত্রু। স্বধর্ম্মত্যাগ রূপ পাপের জন্য প্রাণদণ্ডই তাঁহার উপযুক্ত শাস্তি। সেই রাত্রেই ঘাতক হস্তে বাদশাজাদা দারার জীবনান্ত হইল। সম্রাটের আদেশে তাঁহার মৃতদেহ, অনাড়ম্বরভাবে পুনরায় হস্তী পৃষ্ঠে নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া, হুমায়ুনের সমাধির এক অংশে সমাহিত করা হইল।

সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শুকো অনেক বিষয়ে তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাগণ হইতে পৃথক প্রকৃতির ছিলেন। ইসলামে তাঁহার বিশ্বাস থাকিলেও, তিনি আওরঙ্গজীব প্রমুখ অনেকের মত উগ্র স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন না। পিতামহ সম্রাট আকবরের অনেক প্রকৃতিগত বিশেষত্ব তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন।

তিন প্রচলিত অন্যান্য সকল প্রধান ধর্ম্মেরই সার গ্রহণ করিবার জন্য, সেই সকল ধর্ম্মের শাস্ত্র গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ধর্ম্ম বিষয়ে তিনি অনেকটা উদার মতাবলম্বী হইয়া ছলেন। লালদাস নামক একজন হিন্দু যোগী এবং সরমাদ নামক একজন মুসলীম ফকির তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সুফী মত তাঁহার বিশেষ আদরের বস্তু ছিল। তিনি সাহিত্যানুরাগীও ছিলেন এবং মুসলীম সাধকগণের একখানি জীবন চরিত সঙ্কলন করেন। মীয়ামীর নামক একজন মুসলিম সাধকের নিকট তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পুত্রগণের মধ্যে তিনিই সম্রাট শাহ জাহানের অধিকতর প্রিয় পাত্র ছিলেন। তদ্ভিন্ন সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া সম্রাট তাঁহাকে প্রধানতঃ রাজধানীতেই রাখিতেন। সম্রাটের এই ব্যবস্থা প্রকারান্তরে তাঁহার ক্ষতির কারণ হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন পূর্ব্বাপর রাজ প্রাসাদের বিলাসের মধ্যে অবস্থান করাতে তিনিও কিয়ৎ পরিমাণে শ্রম বিমুখ, বিলাসী, আরামপ্রিয় ও তোষামোদ প্রিয় হইয়াছিলেন। এই সকল কারণেই, সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহাতে তিনি সফলকাম হইতে পারেন নাই। অনেক বিষয় তাঁহার অনুকূলে থাকিলেও প্রত্যক্ষ কর্ম্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা তাঁহার না থাকাতে তাঁহাকে শোচনীয় ভাবে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়।

দারিক—একজন চর্য্যাপদ রচয়িতা। তিনি খুব সম্ভব লুইপাদের শিষ্য ছিলেন। কালচক্র, কঙ্কালিনী, বজ্রযোগিনী, চক্রশম্বর প্রভৃতি মহাযান মতান্তর্গত দেবদেবী সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার একটি চর্য্যাপদে সংস্কৃত, সংস্কৃতমূলক, প্রাচীন বাঙ্গালা এবং কথ্য বাঙ্গালার শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, সেই সময়ে রচনায় সকলপ্রকার ভাষা প্রয়োগই প্রচলিত ছিল। লুই, কুক্কুরী, দারিক প্রভৃতি সিদ্ধাচার্য্যগণের চর্য্যাপদ বা কীর্ত্তনের গান, মুসলমান বিজয়ের অনেক পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে সহজিয়া মতে উহাদের সংস্কৃত টীকা রচিত হয়। দারিক পারিম নামক নদীর কূলে বাস করিতেন।

দারিপা—একজন সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। গোরক্ষনাথ দেখ।

দারিল—কৌশিক সূত্র অথর্ব্ববেদের একখানি সূত্র। দারিল ইহার একটী টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

দালসিংহ—পঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের পিতা মহাসিংহের মাতুল। রণজিৎসিংহ সপ্তদশবর্ষ বয়ক্রমকালে

রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে মন্ত্রী পদ প্রদান করিলেন। তাঁহার শৌর্য্যে ও বুদ্ধিকৌশলে অচিরেই রণজিৎ সিংহ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন।

দাশরথি—তিনি রামানুচার্য্যের ভূমি নাম্নী ভগিনীর পুত্র। রামানুজাচার্য্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পর দাশরথিই প্রথম তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার অন্য নাম আণ্ডান। দাশরথি যেমন বিদ্বান্ তেমনি নিরভিমান ছিলেন। একদা রামানুজের নিকট তাঁহার অন্যতম শিষ্য মহাপূর্ণের কন্যা অতুলা, একটী পাচক ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিলেন। রামানুজ দাশরথিকেই পাচক হইতে বলিলেন। দাশরথি অম্লানবদনে গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, অতুলার সহিত তাঁহার শ্বশুর গৃহে গমনপূর্ব্বক পাচক কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি অচিরেই প্রকাশিত হইল। একদিন একটী শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়া গৃহস্বামী তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় পাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাচকের কর্ম্মও ঘুচিল। তিনি রামানুচার্য্যের জীবিতকালেই পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্রের নাম রামানুজ দাস ছিল।

দাশরথি রায়—বাঙ্গালী কবি। বর্দ্ধমান জিলার কাটোয়া মহাকুমার অন্তর্গত বাঁধমুড়া গ্রামে ১২১২ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে (১৮০৬ খ্রীঃ জানুয়ারী) তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায়। মাতার নাম শ্রীমতী দেবী। দাশরথির ভগবানচন্দ্র নামে একজন অগ্রজ এবং তিনকড়ি ও রামধন নামে দুইজন অনুজ ছিলেন। দাশরথি শৈশবে কয়েক বৎসর বাঁধমুড়াতেই থাকিয়া ছয়, সাত বৎসরের সময়ে পীলা গ্রামে মাতুলালয়ে গমন করেন। তদবধি তিনি প্রধানতঃ মাতুলের তত্ত্বাবধানেই বাস করিতে থাকেন। পীলার পাঠশালাতেই তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। বাল্যকাল হইতে ছড়া রচনায় তাঁহার অসাধারণ কৃতীত্বের পরিচয় পাওয়া যাইত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি কবি গানের গায়কদের জন্য গীত রচনা করিতেন। এই সূত্রে গ্রামবাসী অক্ষয়া নাম্নী এক পাটনী স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। অক্ষয়ার কবি গানের দল ছিল। দাশরথির মাতুল রামজীবন চক্রবর্ত্তী এই সকল কারণে তাঁহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না।

অর্থোপার্জ্জনের জন্য প্রথম তিনি এক কবি দলে মুহুরীর কাজ গ্রহণ করেন। একদিন কবি গান করিবার জন্য নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে গমন করে। তথায় গান করিবার সময়ে তিনি প্রতিপক্ষ রামপ্রসাদ স্বর্ণকারকর্ত্তৃক অতিশয় কটুবাক্যে তিরস্কৃত হন। কবি গানে প্রতিপক্ষকে গালি দেওয়া আদৌ দোষাবহ ছিল না। কিন্তু এইবারের

তীব্র কটুক্তিতে দাশরথির মনে গ্লানি উপস্থিত হয় এবং তাঁহার হিতাকাঙ্খীদের উপদেশে তিনি ছড়ার বই ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ঐ পথ পরিত্যাগ করেন।

পূর্ব্বেই বাঙ্গালা ভিন্ন কিছু ইংরাজি শিক্ষারও সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন। কবিগান রচনা পরিত্যাগ করিলে মাতুল রামজীবন তাঁহাকে এক নীলকুঠিতে তিন টাকা বেতনের একটি কাজে নিযুক্ত করেন। কিন্তু দাশরথির তখন চাকুরী করিবার মত মনের অবস্থা নয়। তিনি কাজের মধ্যে মধ্যে গান রচনা করিতেন। ইহাতে কাজ কর্ম্মে অনবরত ভুল ত্রুটী হইতে থাকে। রামজীবনের অনুরোধে কুঠীর ম্যানেজার অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার প্রকৃতি সংশোধিত না হওয়ায়, তিনি অগত্যা তাঁহাকে বিদায় দিলেন। দাশরথির পক্ষে ইহা শাপে বর হইল। তিনি আনন্দচিত্তে পুনরায় পুর্ব্বের ন্যায় গান রচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞাবশতঃ আর আসরে নামিয়া গান করিতেন না।

অতঃপর তিনি স্বাধীন ভাবে পাঁচালীর দল গঠন করিলেন। তখন তাঁহার বয়স অনধিক ত্রিশ বৎসর। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইল এবং তিনি স্বাধীন ভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই পাঁচালী গানে তাঁহার যশ অতি দ্রুত চারিদিকে ব্যপ্ত হইতে লাগিল। নবদ্বীপের পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহার বিশেষ অনুরাগী হইলেন। প্রায়শঃই তিনি পাঁচালী গাহিবার জন্য, নবদ্বীপে আহুত হইতেন। নবদ্বীপে বিদেশাগত পাঠার্থী ছাত্র সমূহের দ্বারা ক্রমে ক্রমে তাঁহার খ্যাতি বাঙ্গালা দেশের দূরবর্ত্তী স্থানেও সহজেই বিস্তার লাভ করিল। ক্রমে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁহার খ্যাতি দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তিদের মধ্যেও দ্রুত বিস্তারলাভ করিতে থাকে। বর্দ্ধমানের মহারাজা, কলিকাতার রাজা সার রাধাকান্ত দেব প্রমুখ, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ, তাঁহার সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রচুর পুরস্কার দান করেন। এইভাবে কালক্রমে দাশরথি বিত্তশালী হইয়া উঠিলেন। তিনি নিজে পূর্ব্বের মৃৎকুটীরের স্থানে ইষ্টক নির্ম্মিত বাস ভবন নির্ম্মাণ করাইলেন এবং প্রচুর অর্থ ব্যয়ে বিষ্ণু ও শিব প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার অনুজ তিনকড়ি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এক সঙ্গেই ছিলেন কিন্তু পরে মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায়, দাশরথি একটি পৃথক বাটী নির্ম্মাণ করান।

শেষ জীবনে দাশরথির অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার কাশ রোগ ছিল। ক্রমে দ্রুত

তাঁহার শারিরীক অবস্থা খারাপ হইতে থাকে। ১২৬৪ বঙ্গাব্দের পূজার সময়ে সময়ে কাশীমবাজারে পাঁচালী গাহিতে যান। সেইখানেই তাঁহার পীড়া হয় এবং স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়া অল্প কিছুকাল রোগাক্রান্ত থাকিয়া ১২৬৪ বঙ্গাব্দের ২রা কার্ত্তিক (১৮৫৭ খ্রীঃ অক্টোবর) তাঁহার দেহান্ত হয়।

কবি দাশরথি মিষ্টভাষী, সদালাপী ও অমায়িক-প্রকৃতির ছিলেন। পরিচিত ব্যক্তিদের সহিত তাঁহার ব্যবহার অতি মধুর ছিল। তিনি কাহারও সৌভাগ্যে ঈর্ষা প্রকাশ করিতেন না। এই সকল মহৎগুণের জন্যও তিনি বিশেষ লোক-প্রিয় হইয়াছিলেন।

দাশরথির পুত্র সন্তান ছিল না। একটি মাত্র কন্যা ছিল। নবদ্বীপে তাঁহার বিবাহ হয়।

তাঁহার কবি প্রতিভার চরমোৎকর্ষের সময়ে তিনটি বিশেষ কারণে দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত হয়। প্রথম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রবর্ত্তিত বিধবা বিবাহ আন্দোলন। ঐ আন্দোলন উপলক্ষ্য করিয়া দাশরথি অনেকগুলি মধুর সঙ্গীত রচনা করেন। অনেকের মতে ঐ সঙ্গীতগুলিতে তিনি প্রশংসা-চ্ছলে ঈশ্বরচন্দ্রের নিন্দা, এবং নিন্দার ছলে বিধবা বিবাহের বিরোধী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রশংসা করেন। দ্বিতীয়তঃ এক জনবর প্রচারিত হয় যে, নবদ্বীপে গোপাল অবতার হইয়াছেন এবং তিনি আদেশ দিয়াছেন যে, কার্ত্তিক মাসের ১৫ই তারিখ মৃত ব্যক্তিরা পুনর্জীবন লাভ করিবে। এই ঘটনা উপলক্ষ্যেও দাশরথি স্বভাবসুলভ সঙ্গীত রচনা করেন। তৃতীয়তঃ এক জনবর উপস্থিত হয় যে বিল্ব গ্রামের নিকট গঙ্গা উত্তর বাহিনী ও ত্রিধারা হইয়াছেন। এই সংবাদে সহস্র সহস্র পুণ্যার্থী ত্রিধারায় স্নান করিতে গমন করেন। ঐ ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়াও তিনি কয়েকটি কালোপযোগী সঙ্গীত রচনা করেন। দাশরথির সমকালবর্ত্তী কবিদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রসিকচন্দ্র রায় ও ব্রজনাথ গুপ্তের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। দাশু রায়ের পাঁচালী হইতে উপলব্ধি হয় যে, তিনি হিন্দুর প্রধান প্রধান শাস্ত্র গ্রন্থে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার উপরও তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। শেষজীবনে একাধিক ধনী ব্যক্তিদের নিকট হইতে তিনি বৃত্তি পাইতেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের জীবনী অবলম্বনে প্রায় ত্রিশটি, রামচন্দ্র বিষয়ে দশটি, শিবশক্তি বিষয়ে দশটি এবং সামাজিক বিষয়ে দশটি, এইরূপ প্রায় ষাটটি পাঁচালী রচনা করেন। একই বিষয়ে অনেক সময়ে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তিন চারিটি পালা গানও রচনা করেন। কিন্তু পৌরাণিক বিষয়ে রচিত সঙ্গীত

সমূহে, তিনি পুরাণ বর্ণিত আখ্যায়িকা গুলি, সব সময়ে যথাযথ অনুকরণ করেন নাই। তাঁহার রচনায় উপমা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। এমন কি অনেক সময়ে উপমার বাহুল্য রচনাকে রসহীন করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এইরূপ রচনাতেও তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধিৎসা ও শব্দযোজনার কৃতীত্ব বিশেষ লক্ষিত হইয়া থাকে।

কবি দাশরথি আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাতেও পারদর্শী ছিলেন এবং দরিদ্রগণকে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করিতেন।

দাহির—সিন্ধু দেশের রাজা। মোহাম্মদ বিন্‌কাশিম তাঁহার রাজ্য ৭১২ খ্রীঃ অব্দে আক্রমণ করিয়া, বিধ্বস্ত করেন। দাহির যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। পূর্ব্বে কয়েকবার মুসলমানেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া, বিফল মনোরথ হন। কিন্তু এইবার কৃতকার্য্য হইলেন। দাহিরের পুত্র পিতার মৃত্যুর পরে চিতোর নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

দিগভঞ্জ—(১ম) তিনি উড়িষ্যার ভঞ্জবংশীয় নরপতি, প্রথম রণভঞ্জের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার অগ্রজ দ্বিতীয় নেত্রীভঞ্জের মৃত্যুর পরে, তিনি সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার পুত্র শীলভঞ্জ দ্বিতীয় এবং পৌত্র বিদ্যাধর ভঞ্জ। শত্রুভঞ্জ দেখ।

দিগভঞ্জ—(২য়) তিনি উড়িষ্যার ভঞ্জবংশীয় নরপতি কোট্টভঞ্জের পুত্র ও বীরভদ্রের পৌত্র। তাঁহার তনয় দ্বিতীয় রণভঞ্জ। কোট্টভঞ্জ দেখ।

দিগম্বর ভট্ট—'ললিতাবলী' নামে তিনি একখানা সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলন করেন।

দিগম্বর ভট্টাচার্য্য—(১)তিনি 'শব্দার্থ প্রকাশ' নামে একখানা বাঙ্গালা অভিধান রচনা করিয়াছিলেন। পত্র সংখ্যা ২১৬ ও শব্দ সংখ্যা ৯০০ ছিল।

দিগম্বর ভট্টাচার্য্য—রাজা রামমোহন রায়ের সমকালবর্ত্তী একজন কবি ও সঙ্গীত রচয়িতা। তিনি রামমোহনের বিশেষ বন্ধুও ছিলেন কিন্তু ধর্ম্মমতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিলেন। দিগম্বর প্রধানত তন্ত্রোক্ত আদ্যাশক্তির উপাসক ছিলেন। তাঁহার গীতগুলি, তৎকাল প্রচলিত রামমোহনের প্রসিদ্ধ গীত সমূহের প্রত্যুত্তরচ্ছলে রচিত হইয়াছিল। এইরূপ দুইজনের রচিত দুইটি সঙ্গীত এস্থলে প্রদত্ত হইল।

(১) রাজা রামমোহন রচিত—

মনে কর শেষের দিন কি ভয়ঙ্কর
অন্যে সবে বাক্য কবে,
কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া,
কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ,
সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,

দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ হিম কলেবর
এতএব সাবধান,
ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর সত্যেতে নির্ভর।

(২) দিগম্বর ভট্টাচার্য্য রচিত—
মনে কর শেষের দিন কি সুখকর।
আধনীরে গঙ্গাতীরে পাতকী হীন নর।
কাটায়ে সংসার মায়া,
আশীর্ব্বাদী পুত্র জায়া,
নিরমাল্য বিল্বপত্র মাথার উপর।
চিন্ময়ী ধরেছ বুকে,
কালী কালী নাম মুখে,
কালী নাম সবে ডাকে করি উচ্চৈস্বর
কালী নাম অবিচ্ছেদ,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে নাহি ভেদ,
ব্রহ্মবন্ধ্র করি ভেদ উঠে দিগম্বর।

দিগম্বর মিত্র, রাজা—খ্যাতনামা বাঙ্গালী দেশ নেতা। হুগলী জিলার কোন্নগরের মিত্র বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতামহ, পিতা ও খুল্লতাতগণ সকলেই ইংরেজ ব্যবসায়ীদের আপিসে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। দিগম্বর মিত্রের ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম শিবচন্দ্র মিত্র। কোন্নগর হইতে কার্য্য উপলক্ষে যাতায়াত কষ্ট সাধ্য হওয়াতে, শিবচন্দ্র কলিকাতাতেই বাস করিতে থাকেন। শিবচন্দ্র যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিলেও অমিত ব্যয়িতার জন্য শেষ জীবনে অর্থ কষ্টে পতিত হন এবং পারিবারিক অশান্তির হাত হইতে উদ্ধার পাইবার কাশীধামে যাইয়া বাস করিতে থাকেন।

দিগম্বরের শৈশব কোন্নগরেই অতিবাহিত হয়। স্থানীয় গুরু মহাশয়ের পাঠশালাতে সামান্য প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া, তিনি কলিকাতার হেয়ার সাহেবের স্কুলে আসিয়া ভর্ত্তি হন। পরে হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। কলেজে বিশেষ প্রতিভাবান ছাত্র বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি সকল বিষয়েই তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন। ইংরেজি রচনাতেও তিনি বিশেষ সুদক্ষ ছিলেন। তাঁহার ছাত্র জীবনে রচিত একটি প্রবন্ধ শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীর প্রশংসা লাভ করে। ছাত্রাবস্থাতেই, পনের বৎসর বয়সে দিগম্বরের বিবাহ হয়। তিন বৎসর পরে পত্নীর মৃত্যু হইলে তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন।

ইহার অল্পকাল পরেই তিনি কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিতে বাধ্য হন। প্রথমে মুর্শিদাবাদ নিজামত স্কুলে শিক্ষকের পদ লাভ করেন। অল্পকাল পরেই উহা পরিত্যাগ করিয়া, রাজসাহীতে একটি চাকুরী গ্রহণ করেন। এই ভাবে কয়েক বৎসর বিভিন্ন স্থানে কাজ করিয়া ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দে, তিনি কাশীমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায়ের জমীদারের

প্রধান পরিচালকের পাদ লাভ করেন। এই কাজই তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির সোপান হইল। মুর্শিদাবাদের তিনি যখন কাজ গ্রহণ করেন, তাহার পূর্ব্বে ঐ বিদ্যালয়ে প্রধানতঃ আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত। ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে প্রথম ইংরেজি শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করা হয় এবং দিগম্বর মিত্র, শিক্ষা বিভাগের পুর্ব্বোক্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সুপারিশে ঐ পদ লাভ করেন।

১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দের শেষভাগে মাত্র একশত টাকা বেতনে দিগম্বর কাশীম-বাজারে কাজ গ্রহণ করেন। প্রথম দুই বৎসর তিনি প্রধানতঃ রাজা কৃষ্ণ নাথের শিক্ষক ছিলেন। ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে অধিক বেতনে তিনি ম্যানেজা-রের পদ লাভ করিলেন। তিনি প্রথম হইতে গভীর মনোযোগ ও পরিশ্রম সহকারে, কার্য্যে মনোনিবেশ করেন এবং নিজের অসামান্য কর্ম্ম-দক্ষতাগুণে অল্পকাল মধ্যেই জমিদারীর বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। এই সময়ে তাঁহার কার্য্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু রাজা কৃষ্ণনাথ যে, তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করেন, ইহাই তাঁহার কর্ম্ম ক্ষমতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে, মনস্বী ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুর পর যে স্মৃতি সভা হয়, তাহার জন্য, রাজা কৃষ্ণনাথ উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং দিগম্বর মিত্রই তাঁহাকে প্রধানতঃ এ বিষয়ে তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করেন। ঐ সভায় তিনিও হেয়ার সাহেবের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়া বক্তৃতা করেন। ইহার প্রায় দুই বৎসর পরেই, কোনও সামান্য কারণে রাজা কৃষ্ণনাথের সহিত মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি কাশীমবাজারের চাকুরী ছাড়িয়া দেন।

কাশীমবাজারে চাকুরী করিবার সময়েই স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিবার জন্য তাঁহার প্রবল স্পৃহা হয়। ঐ সময়ে কাশীমবাজার ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ রেশম ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। কাশীমবাজারে অনেক ধনী-ব্যবসায়ী ও মহাজনের আবাস ছিল; তিনি এই সকল বিষয়ের সুযোগ গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন এবং কাশীম-বাজারের কাজ পরিত্যাগ করিয়া, তিনি ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দে ব্যবসায়ে ব্রতী হইলেন। সেই সময়ে বাঙ্গালা দেশে নীল ও রেশমের ব্যবসায় খুব বিস্তৃত ছিল। দিগম্বর বাবু প্রথমে মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে একটি নীলকুঠী স্থাপন করেন ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট লাভ হইতে থাকে। তাহার পর তিনি রেশমের ব্যবসায়ও আরম্ভ করিলেন এবং মুর্শি-দাবাদ জিলার রামখোলা, রাজাপটি, দৌলতবাজার, শঙ্কর মিরজাপুর প্রভৃতি

স্থানে রেশম কুঠী স্থাপন করিলেন। নিজের কারবারের ছাপ দিয়া তিনি বিক্রয়ের জন্য রেশম নানাস্থানে প্রেরণ করিতেন। এই ব্যবসায়েও তাঁহার যথেষ্ট অর্থাগম হইতেথাকে। এই সকল কাজে কখনও বা তিনি ব্যবসায় পরিদর্শনে মফস্বলে পর্য্যটন করিতেন কখনও, বিশেষ ভাবে বিক্রয়ের মরশুমে, কলিকাতায় অবস্থান করিতেন। তখন কলিকাতায় ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক (Union Bank) নামে একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল। দেশ বিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার অন্যতম অংশীদার ছিলেন। ব্যবসায় সূত্রে দিগম্বর বাবু, রমানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইলেন এবং পূর্ব্বোক্ত ব্যাঙ্কের সহিতও তাঁহার ব্যবসায় সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। এই ভাবে কয়েক বৎসর চলিবার পর, ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপী এক ভীষণ আর্থিক সমস্যা উপস্থিত হইল। তৎফলে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইল এবং সেইসঙ্গে দিগম্বর বাবু প্রমুখ বহু ব্যক্তিরও যথেষ্ট অর্থ নষ্ট হইল। ইহাতে কিছুকাল তিনি অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হন এবং গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পুনরায় চাকুরী গ্রহণ করিতেও উৎসুক হন। কিন্তু খ্যাতনামা ব্যবসায়ী মতিলাল শীলের পরামর্শে, তিনি ঐ ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন এবং পুনরায় সাহসে নির্ভর করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় রেশম ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার আবার সৌভাগ্যোদয় হইল এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি আবার বিত্তশালী হইয়া উঠিলেন।

১৮৫০ খ্রীঃ অব্দে তিনি মফস্বলের ব্যবসায় পরিদর্শনের ভার তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা প্যারীমোহন মিত্রের উপর অর্পণ করিয়া, কলিকাতার বাগমারী নামক উপকণ্ঠে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অল্পকালের মধ্যেই প্যারীমোহনের মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহার রেশম ব্যবসা তত্ত্বাবধানের অভাবে বন্ধ হইয়া যায়। পর বৎসর তাঁহার পূর্ব্বতন শুভানুধ্যায়ী সাদারল্যাণ্ড নামক একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, অপুত্রক মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ায়, তিনি তাঁহার পরিত্যক্ত জমীদারী ক্রয় করিলেন। কিন্তু মূল্য বাবদ দেয় সমুদয় অর্থ তখন নিকটে না থাকায়, তিনি বাগমারীর পৈতৃক বসত বাটী বিক্রয় করিয়া, অর্থসংগ্রহ করিতে বাধ্য হন। এই ব্যাপারটি তাঁহার জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা। কারণ জমিদার শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হইয়াই তিনি প্রধানতঃ সর্ব্বসাধারণের সহিত মিলিত হইয়া, দেশের নানাপ্রকার জনহিতকর কার্য্য করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন এবং তদ্দ্বারাই ভবিষ্যতে তিনি দেশবিখ্যাত হন। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দের ৩১শে অক্টোবর প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন

(British Indian Association) প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপূর্ব্বে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি (Landholders' Society) এবং বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি (Bengal British India Society) নামে দুইটি প্রতিষ্ঠান ছিল। প্রথমটি দেশীয় ধনী ও ভূম্যধিকারীদের এবং দ্বিতীয়টি ইয়ং বেঙ্গল (Young Bengal) নামে পরিচিত দেশের ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মুখপাত্র ছিল। এই উভয় সমিতিই একীভূত হইয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা রাধাকান্ত দেব উহার প্রথম সভাপতি, রাজা কালিকৃষ্ণ দেব সহঃ সভাপতি, বাবু (পরে মহর্ষি) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উহার কার্য্যাধ্যক্ষ (Secretary) এবং বাবু (পরে রাজা) দিগম্বর মিত্র সহ-কার্য্যাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন। এতদ্ভিন্ন রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত (রাম বাগানের), প্যারীচাঁদ মিত্র, শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রভৃতি দেশ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ উহার কার্য্য পরিচালক সভার সদস্য হন। এই ভাবে দেশের বিত্তশালী, চিন্তাশীল ও কর্ম্মীগণের একত্র মিলন হওয়াতে দেশের সমূহ কল্যাণ সাধিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল।

এই ভাবে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সহিত যুক্ত থাকিয়া দিগম্বর বাবু দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের উভয় বিভাগ হইতে এই দেশের আভ্যন্তরিণ শাসন ব্যবস্থার কি ভাবে উন্নতি সাধন করা যায়, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য এক সমিতি (Select Committee) গঠিত হয়। এই দেশবাসীর পক্ষ হইতে পূর্ব্বোক্ত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন সেই কমিটির নিকট এক আবেদন প্রেরণ করেন। অনেকের মতে সেই আবেদন খানি প্রধানতঃ দিগম্বর মিত্রেরই রচনা।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই দেশের শাসন কর্তৃপক্ষ, ভারতপ্রবাসী ইংরেজদিগকে, আইন বিরুদ্ধ অপরাধের জন্য, এই দেশের সর্ব্ব সাধারণের জন্য স্থাপিত বিচারালয়ে অভিযুক্ত করিবার জন্য, আইন প্রণয়ন করিতে মনস্থ করেন। তৎফলে ভারতপ্রবাসী ইংরেজদের মধ্যে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। এদেশের উচ্চ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া, সাধারণ ব্যবসায়ী পর্য্যন্ত সকলেই, ঐ আইন যাহাতে প্রণীত না হয়, তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তৎফলে কর্তৃপক্ষ সাময়িক ভাবে ঐ চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন মাত্র। কয়েক বৎসর পরে শাসন ও বিচার কার্য্যের সুবিধার

জন্য, কর্ত্তৃপক্ষ নূতন বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নের আবশ্যকতা বোধ করিয়া, পুনরায় তদনুসারে ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করেন। তৎফলে পুনরায় এদেশবাসী ইংরেজেরা আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। এবারে তাঁহাদের আন্দোলনের প্রধান বিষয় ছিল, দেশীয় বিচারকগণ যেন ইয়োরোপীয়দিগকে বিচার করিবার অধিকার প্রাপ্ত না হন। এ আন্দোলনে তাঁহাদের প্রধান যুক্তি ছিল যে, দেশীয় বিচারকগণ ইংলণ্ডীয় বিচারনীতি সম্যক উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহেন। তৎফলে তাঁহারা পক্ষপাত শূন্য বিচার করিতে পারিবেন না।

জাতীর এই অপমান সূচক অপবাদের বিরুদ্ধে, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন প্রতিবাদ করিতে উঠিলেন। সেই উপলক্ষে দেশীয় জনসাধারণের এক বৃহৎ সভা টাউন হলে হয় এবং দিগম্বর মিত্র সেই সভায় একটি নির্দ্ধারণের সপক্ষে বক্তৃতা করেন। সেই গুরুত্বপূর্ণ সভায় আর যাঁহারা বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সব আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায়, বিষয়টি তখনকার মত স্থগিত থাকে। প্রায় দুই বৎসর পরে কিছু পরিবর্ত্তিতআকারে ঐ সকল বিষয়ে আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা পুরতন্ত্রের (Municipality) উন্নতি বিধানের জন্য একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হয়। দিগম্বর মিত্র তাঁহার অন্যতম সদস্য মনোনীত হন। ঐ সমিতির (Commission) নির্দ্ধারণ অনুযায়ী অনেক বিষয়ে নূতন ব্যবস্থা হয় এবং অনেক উন্নতিকারক কার্য্য সম্পাদনের আয়োজন হয়। এতৎ সম্পর্কে নূতন আইন প্রণীত হইলে দিগম্বর মিত্র একজন অবৈতনিক বিচারক (Honorary Magistrate) এবং জষ্টিস অব দি পিস (Justice of the Peace) নিযুক্ত হন। এই সময়ে চব্বিশ পরগণার জিলা জজ মিঃ এডওয়ার্ড লাটুরের (Edward Latour) বিচার পদ্ধতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া তিনি ও আরও কয়েকজন ছোটলাটের নিকট দরখাস্ত করেন। লাটুর সাহেবের বিরুদ্ধে তাঁহাদের প্রধান অভিযোগ এই ছিল যে, তিনি বিচারকালে স্বভাবতঃই অর্থবান অভিযোক্তাদের বাক্য বিশ্বাস করিতেন না এবং অধিকাংশস্থলেই তাঁহাদের বিরুদ্ধে রায় দিতেন। তাঁহাদের অভিযোগের সপক্ষে তাঁহারা কয়েকটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহাদের ঐ দরখাস্ত প্রেরিত হইবার পরেই, ঠিক বিপরীত এক দরখাস্তও ছোটলাটের নিকটে প্রেরিত হয়।

তাহাতে অনেক উকীল ও মোক্তার স্বাক্ষর করেন।

সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারত সরকারের ভয়ানক অর্থকষ্ট উপস্থিত হয়। সত্বর অর্থ পাইবার অন্য কোনও সুবিধা জনক উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, কর্তৃপক্ষ আয়কর (Income Tax) স্থাপন করিলেন। বলা বাহুল্য ঐ নূতন কর স্থাপিত হওয়াতে জনসাধারণ অত্যন্ত বিরক্ত হইল। উহা আদায়ের জন্য যে সব উপায় অবলম্বন করা হইত, তাহাতে অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পাইল। তখন দেশের লোককে শান্ত করিবার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য, বড়লাট লর্ড ক্যানিং একটি পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। অনুরুদ্ধ হইয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন দিগম্বর মিত্র এবং রমানাথ ঠাকুরকে ঐ সভায় তাঁহাদের প্রতিনিধি মনোনীত করেন।

১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে, প্রধানতঃ ভাগীরথীর তীরবর্তী কয়েকটি স্থানে, এক প্রকার ভীষণ জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়। তাহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই ঐ প্রকারের জ্বর, অন্যান্য স্থানে লোককে আক্রমণ করিয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছিল। কিন্তু ঐ সময়ের ন্যায় মহামারীর আকার ধারণ করে নাই। পূর্ব্বে ঐ প্রকার পীড়ার আর কাহারও অভিজ্ঞতা না থাকায়, কেহ উহাকে নূতন জ্বর কেহ বা বর্দ্ধমান জ্বর নামে অভিহিত করিতেন। তাহার পরেও কয়েক বৎসর একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঐ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইতে থাকে এবং আক্রান্ত স্থানগুলিতে ভীষণ লোক ক্ষয় হইতে থাকে। সমস্ত পশ্চিম বঙ্গে ভীষণ হাহাকার পড়িয়া গেল। হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও চব্বিশ পরগণা জিলার বহু স্থান একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়িল। এই ভীষণ দুরবস্থায় দেশের শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ চিন্তান্বিত হইয়া উঠিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হইতে, উহার কারণ নিরূপণ এবং যথোচিত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার জন্য আবেদন প্রেরিত হইল। সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিরা, উহার কারণ স্থির করিবার জন্য, নানা ভাবে গবেষণা আরম্ভ করিলেন। নানারূপ মত প্রচারিত হইল এবং তৎফলে রোগ দমনের জন্য তদনুযায়ী ব্যবস্থাও হইল। কিন্তু সবই বৃথা হইল। রোগের প্রকোপ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। অবশেষে কর্তৃপক্ষ ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে কয়েকজন ব্যক্তিকে লইয়া একটি অনুসন্ধান সমিতি (Commission) নিযুক্ত করিলেন। ঐ সমিতিতেও দিগম্বর মিত্র, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি মনোনীত হইলেন। সমিতির কার্য্যে তাঁহাকে অন্যান্য সভ্যদের সহিত ব্যাধিপীড়িত

স্থানসমূহে অনেকবার পর্যটন করিতে হয়। তিনিই একমাত্র ঐ সমিতির দেশীয় সদস্য ছিলেন। তজ্জন্য গ্রামবাসিদিগকে জিজ্ঞাসা করা প্রভৃতি কাজ প্রধানতঃ তাঁহাকেই করিতে হইত। যথা সময়ে অনুসন্ধান শেষ করিয়া, সমিতি তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিলেন। দিগম্বর মিত্র কোনও কোনও বিষয়ে অপর সদস্যদের সহিত এক মত হইতে না পারিয়া, পৃথক মন্তব্য প্রদান করেন। তাঁহার মত (Theory) প্রথমত উপেক্ষিত হয়। কিন্তু তিনি তাহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া, নিজ জমিদারীর অন্তর্গত ব্যাধি পীড়িত স্থানে নিজ প্রণালীতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন এবং হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকাতে ক্রমান্বয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে অনেক বৎসর পরে,তাঁহার মতই সঠিক বলিয়া গৃহীত হয়।

১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দের নভেম্বর মাসে তিনি প্রথম ছোটলাটের ব্যবস্থা পরিষদের (Legislative Council) সদস্য মনোনীত হন। তৎপূর্ব্বে, কেবল বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু রামগোপাল ঘোষ এবং রাজা সত্যচরণ ঘোষাল ঐ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে তিনি পুনরায় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার সময়ে, তিনি সর্ব্বদাই দেশের ও দশের হিতকর কার্য্যে উদ্যোগী ছিলেন। নিজের নানা সূত্রে লব্ধ অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি কর্তৃপক্ষকে নানারূপ সুপরামর্শ দিয়া দেশের কল্যাণ সাধনে যত্নবান ছিলেন।

১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে যখন উড়িষ্যায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখন তিনি সত্বর উড়িষ্যায় তাঁহার জমিদারীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং নানা ভাবে প্রজাদিগের কষ্টের লাঘব করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি ছোটলাটকে তার করিয়া এবং পরে পত্রদ্বারা,বিস্তৃত ভাবে দুর্ভিক্ষের তীব্রতা সম্বন্ধে সংবাদ প্রদান করেন। তৎফলেই প্রধানতঃ ছোটলাট দার্জ্জিলিঙ্ হইতে কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হন।

দেশ প্রচলিত অনেক সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধেও তিনি নিজের শক্তি প্রয়োগ করেন। গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ, চড়ক পূজায় পিঠ ফোঁড়ান, সতীদাহ, প্রভৃতি অনেক অনিষ্টকর নৃশংস প্রথা যাহাতে রহিত হয়, তজ্জন্য তিনি আবশ্যকানুযায়ী শক্তি প্রয়োগ করেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ নিবারণ করিবার আইনের তিনি বিরুদ্ধতা করেন। বিধবা বিবাহ প্রচলন করা সম্বন্ধে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত এক মত ছিলেন না।

১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা বন্দরের উন্নতি বিধানের জন্য, যে পরামর্শ সমিতি গঠিত হয়, তিনি তাহার একজন সদস্য নির্ব্বাচিত হন। সেই বৎসরই তিনি ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউশনের একজন পরিদর্শক নিযুক্ত হন। ঐ সময়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রণীতব্য বিধি সমূহ বিবেচনা করিবার জন্য, যে সকল বিশেষ (Select) কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলিতেই তিনি সদস্য মনোনীত হন। পর বৎসর সরকারের বিশেষ নির্দ্দেশ বলে, তিনি এবং আরও ছয়জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইবার বাধ্যতা হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হন।

পূর্ব্বোক্ত উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের পর উড়িষ্যার জমি সংক্রান্ত বন্দোবস্ত করিবার সময় উপস্থিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে, বাঙ্গালা দেশে যে দশশালা ব্যবস্থা ছিল, তাহারই অনুকরণে উড়িষ্যার ত্রিশশালা বন্দোবস্ত ছিল। দিগম্বর মিত্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষপাতী ছিলেন। ঐ নূতন বন্দোবস্ত করিবার সময় উপস্থিত হইলে, তিনি যুক্তি ও তথ্য অবলম্বনে বিশেষ ভাবে আন্দোলন করেন। তাহার ফলে যে ব্যবস্থা হয়, তাহাতে উড়িষ্যার জমিদার ও প্রজা উভয়েই উপকৃত হন।

১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে ইয়োরোপে তুর্ক দেশের রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপল নগরে পাশ্চাত্য চিকিৎসা ব্যবসায়ীগণের এক আলোচনা সভা হয়। তাহাতে এইরূপ মত ব্যক্ত হয় যে, ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর যে সকল মেলা হইয়া থাকে, তাহাতেই কলেরা রোগের উৎপত্তি ও বিস্তার হয়। ভারতবর্ষে উৎপন্ন ঐ রোগই ক্রমে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিস্তৃত হয়। ভারত সরকার এই বিষয় জানিতে পারিয়া, উহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে তৎপর হইলেন এবং এই বিষয়ে দিগম্বর মিত্রের মতামত জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি এক দীর্ঘ মন্তব্যে, উক্ত নির্দ্ধারণের ভ্রম প্রদর্শন করেন এবং তৎসহ বিভিন্ন মেলা ও তদনুরূপ স্থানে ঐ রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার উপায় সম্বন্ধে, কয়েকটি সুচিন্তিত পন্থার উল্লেখ করেন।

১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে প্রথম ভারত সরকার উপলব্ধি করেন যে, স্থানীয় প্রয়োজনের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা দরকার হয়, তাহা স্থানীয় লোকদের নিকট হইতেই সংগ্রহ করা উচিত। কিন্তু এবিষয়ে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত কোনও ব্যবস্থা করা হয় নাই। ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালা সরকার এইভাবে স্থানীয় দরকারে স্থানীয় অর্থ সংগ্রহের কি উপায় করা যায়, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য, একটি কমিটি গঠন করেন। সেই কমিটিতে দিগম্বর মিত্র একজন

সদস্য মনোনীত হন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন প্রথমে এক সভায় উহার প্রতিবাদ করেন। দিগম্বর বাবুই প্রতিবাদ করিয়া প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করেন। কিন্তু পরে তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, কর্তৃপক্ষ অর্থ সংগ্রহের জন্য নূতন কর স্থাপন করিতে বদ্ধ পরিকর, তখন তিনি, পূর্ব্বোক্ত সমিতির সদস্য রূপে, যাহাতে অন্যায়ভাবে কিছু না করা হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা যথা-সাধ্য প্রয়োগ করেন।

১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে তিনি তৃতীয়বার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। সেই বৎসরই রাজা রমানাথ ঠাকুর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হওয়ায় দিগম্বর মিত্র তাঁহার স্থলে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ইতিপূর্ব্বে তিনি সহঃসভাপতি হইয়াছিলেন। ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি কলিকাতার সেরিফ (Sheriff) নিযুক্ত হন। বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ঐ সম্মানাস্পদ পদ লাভ করেন। ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারতাগমন উপলক্ষে কলিকাতায় যে দরবার হয়, তাহাতে তিনি সি-এস-আই (C. S. I.) উপাধি লাভ করেন। ইহার পরে তিনি যে কয় বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন, সেই সময়ে সর্ব্বদাই দেশের জনহিতকর কাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। বস্তুতঃ সেই সময়ে বাঙ্গালীদের মধ্যে যাঁহারা নিজগুণে কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন, রাজা দিগম্বর মিত্র তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান ছিলেন। সমস্ত গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসার জন্য, কর্তৃপক্ষ তাঁহার মতামত গ্রহণ অন্যতম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। তিনি যে সকল বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা প্রসূত পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত লোকক্ষয়কারী সংক্রামক পীড়ার কারণ নির্ণয় ও তাহার প্রতিকারোপায় সর্ব্ব প্রধান। তাঁহার এই সকল বিবিধ জনহিতকর কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে তিনি 'রাজা' উপাধি লাভ করেন।

পারিবারিক জীবনে শেষ বয়সে তিনি বিশেষ মনঃপীড়া লাভ করেন। তাঁহার একমাত্র সুযোগ্য পুত্র গিরিশচন্দ্র শোচনীয় দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তদবধি তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমেই মন্দ হইতে থাকে। ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দের ২০শে এপ্রিল (১২৮৬ বঙ্গাব্দ বৈশাখ) তিনি পরলোক গমন করেন।

এই দেশে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে যে সকল মনস্বী পাশ্চাত্য জ্ঞানের আস্বাদ লাভ করিয়া, নিজেদের বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা ও কর্ম্মকুশলতার দ্বারা দেশের নানারূপ কল্যাণ সাধন করেন, রাজা দিগম্বর মিত্র তাঁহাদের মধ্যে

একজন প্রধান ছিলেন। তাঁহার পিতা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছলঅবস্থারলোক হইলেও বস্তুতঃ তিনিই কেবল স্বীয় অধ্যবসায়, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কর্ম্মকুশলতার বলে লোক সমাজে উচ্চ মর্য্যাদা, রাজ সম্মান প্রভৃতির অধিকারী হন।

তিনি বন্ধুবৎসল, পরোপকারী ও মধুর প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। কথা ও কার্য্যে পূর্ব্বাপরই তিনি সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেন। অসামান্য খ্যাতি ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইয়াও, কখনও গর্ব্বিত হন নাই। মধ্যযুগে তিনি বাঙ্গালার একজন শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন।

দিঙনাগ, আচার্য্য—প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে, দাক্ষিণাত্যের (মাদ্রাজ প্রদেশস্থ) কাঞ্চীনগরীতে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতাপিতার নাম অজ্ঞাত। আচার্য্য নাগদত্তের নিকট তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের দীক্ষালাভ করেন এবং স্থবির বাদীয় ত্রিপিটকে পারদর্শী হন। পরে তিনি আচার্য্য বসুবন্ধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং মহাযানীয় শাস্ত্রেও ব্যুৎপন্ন হন। নালন্দার বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষা-কেন্দ্রে উপনীত হইয়া, কয়েকজন ব্রাহ্মণ ও অন্যমতাবলম্বী পরিব্রাজককে বিচারে পরাস্ত করিয়া, বৌদ্ধমতে আনয়ন করেন। পরে তিনি উড়িষ্যায় গমন করেন এবং মহারাষ্ট্র প্রদেশও পর্য্যটন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সর্ব্বত্রই তিনি বিরুদ্ধবাদীদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় মতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। অসাধারণ বিচার ক্ষমতার জন্য তিনি অনেক সময়ে 'তর্ক-পুঙ্গব' নামে অভিহিত হইতেন। উড়িষ্যার রাজার রাজস্ব সচিব ভদ্রপালিত দিঙ-নাগের নিকট দীক্ষিত হন। তিনি কোন্ সময়ে পরলোক গমন করেন তাহা এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে।

মধ্যযুগের ভারতীয় দর্শনাচার্য্যগণের মধ্যে দিঙনাগ অতি উচ্চ স্থান অধিকার করেন। তিনি এবং জৈনদার্শনিক সিদ্ধাচার্য্য ন্যায়শাস্ত্রকে ধর্ম্মতত্ত্ব ও দর্শনের বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে স্থাপন করেন বলিয়া বিশেষজ্ঞগণের অভিমত। বস্তুতঃ মধ্যযুগের ভারতীয় দর্শনের তাঁহারা পূর্ব্বাচার্য্য ছিলেন। তাঁহার জীবিতকালে তিনি প্রতিপক্ষগণকর্তৃক বহুবার বিচারে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেও বিরুদ্ধবাদীগণ তাঁহাকে মুক্তি দেন নাই। উদ্দ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র, মল্লিনাথ, কুমারিল ভট্ট প্রমুখ দেশ বিখ্যাত আচার্য্যগণ তাঁহাকে আক্রমণ বা বিদ্রূপ করিবার কোনও সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। ইহা হইতেই, জীবিতকালে তাঁহার প্রভাব ও বিদ্বত্তার খ্যাতির পরিমাণ অনুমেয়।

আচার্য্য দিঙ্নাগের প্রধান গ্রন্থ

'প্রমাণ সমুচ্চয়'। ঐ গ্রন্থখানি তিনি অন্ধ্র দেশস্থিত বেঙ্গী নামক স্থানে অবস্থানকালে রচনা করেন। অনুষ্টুব ছন্দে সংস্কৃত ভাষায় উহা রচিত। মূল গ্রন্থখানি এখন অপ্রাপ্য। তবে তিব্বতীয় ভাষায় উহার অনুবাদ আছে। অনুবাদকের নাম হেমবর্ম্মা ও কনকবর্ম্মা। উহা, প্রত্যক্ষ, স্বার্থানুমান, পরার্থানুমান, হেতুদৃষ্টান্ত, অপোহ ও জাতি এই ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। দিঙনাগ বাৎস্যায়ন প্রভৃতির মত খণ্ডন করিয়া নাগার্জ্জুনের মত সমর্থন করেন। আবার পরবর্ত্তী কালে উদ্দ্যোতকর তাঁহার ন্যায়বার্ত্তিকে দিঙনাগের মত খণ্ডন করেন। দিঙনাগ ন্যায়শাস্ত্র আলোচনার এক নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করেন। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের স্বরূপ কি, তাহাদের বিষয় কি, এই সকল দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনার সূত্রপাত করেন। পরে আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রমাণসমুচ্চয়ের টীকাস্বরূপ প্রমাণ-বার্ত্তিক-কারিকা রচনা করেন। বাচস্পতি মিশ্র, ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্য টীকা গ্রন্থে দিঙনাগের মত খণ্ডন করেন।

দিদ্দাপাল—তিনি কাবুলের শাহীবংশীয় রাজা ছিলেন। কাবুলের শাহীবংশ গজনীর সুলতান মাহমুদ কর্ত্তৃক উৎখাত হইলে, তাঁহারা কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি পরে কাশ্মীরের অধিপতি অনন্তদেবের (১০২৯—১০৮১ খ্রীঃ) অন্যতম সেনাপতি হন।

দিদ্দারাণী— কাশ্মীরের গুপ্তবংশীয় নরপতি ক্ষেমগুপ্তের মহিষী এবং লোহার দুর্গের অধ্যক্ষ পরাক্রমশালী সিংহরাজের কন্যা। ক্ষেমগুপ্তের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র অভিমন্যু গুপ্ত ৯৫৮—৯৭২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র নন্দীগুপ্ত (৯৭২—৭৩ খ্রীঃ) ত্রিভুবন গুপ্ত (৯৭৩—৭৫ খ্রীঃ) ও তৎপরে ভীমগুপ্ত (৯৭৫—৮০খ্রীঃ) ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। পাপীয়সী দিদ্দা তিন পৌত্রকেই হত্যা করিয়া পরে স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করেন। দিদ্দার চরিত্র অতিশয় কলুষিত ছিল। তিনি ৯৮০—১০০৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সংগ্রামরাজ রাজা হন।

দিনকর--(১)তিনি একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত। তাঁহার রচিত করণ গ্রন্থের নাম খেটক সিদ্ধি। উহাতে ১৫০০ শকের (১৫৭৮ খ্রীঃ) ক্ষেপক প্রদত্ত হইয়া গ্রহের স্পষ্টী করণ ক্রিয়া মাত্র আছে। উহা ব্রহ্মসিদ্ধান্ত মতানুযায়ী গণিত। এই করণকে তিনি লঘু খেটক সিদ্ধি বলিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার আর একখানা বৃহৎ খেটক সিদ্ধিও ছিল। চন্দ্র ও সূর্য্যের গণনা স্পষ্ট করণার্থ ১৫০০ শকে (১৫৭৮ খ্রীঃ) দিনকর চন্দ্রার্কী নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

দিনকর—(২) শাণ্ডিল্যবংশজাত অনন্তের পুত্র দিনকর। ১৭৬৭ শকে (১৮৪৫ খ্রীঃ) চক্রধর কৃত যন্ত্রচিন্তামণির উপর এক টীকা লিখিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু সারণী গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ বিজ্ঞান সারণীতে ১৭৩৪ শকের (১৮১২ খ্রীঃ) উদাহরণ আছে। গ্রহ লাঘা মতানুযায়ী পঞ্চাঙ্গ গণনায় দিনকরের, সারণী বিশেষ উপযোগী। গোমকরের পদ্ধতি ভূষণের উপর দিনকর ১৭২৯ শকে (১৮০৭ খ্রীঃ) এক টীকা রচনা করেন।

দিনকর—(৩) তিনি (১৪৭৪ শকের ১৫৫২ খ্রীঃ) পূর্ব্বে মকরন্দ ধারণ নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

দিনকর রাও, রাজা— খ্যাতনামা মহারাষ্ট্রীয় অমাত্য। ১৮১৯ খ্রীঃ অব্দে বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরি জিলার দেরবত নামক স্থানে এক ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রাঘব দাদু (রাও)। দিনকরের পূর্ব্বপুরুষেরা অনেকদিন ধরিয়াই গোয়ালিয়র রাজ্যে বাস করিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে উচ্চরাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি উত্তমরূপে ফারসী ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তিনি পরে পরিণত বয়সে ইংরাজি শিক্ষা করেন। মাত্র পনের বৎসর বয়সে গোয়ালিয়র রাজ সরকারে তিনি একটি চাকুরী গ্রহণ করেন। ঐ কাজে বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করাতে, পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহারই পরিত্যক্ত পদ (প্রাদেশিক সুবাদারী) লাভ করেন। এই কার্য্যেও বিশেষ কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দেওয়াতে ক্রমশ উন্নতি লাভ করিতে করিতে ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে তিনি মন্ত্রীর পদ লাভ করেন। ঐ সময়ে রাজা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন বলিয়া, রাজ্যমধ্যে নানারূপ কলহ বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। যথার্থভাবে রাজকর সংগৃহীত না হওয়াতে অর্থাভাব উপস্থিত হয়। তিনি মন্ত্রীর পদ লাভ করিয়া দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার সহিত শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। নানাদিকে ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজের বেতনও মাসিক পাঁচ হাজারের স্থলে দুই হাজার নির্দ্দিষ্ট করিলেন। রাজকর আদায়ের নানারূপ সুবন্দোবস্ত করিলেন। এইভাবে রাজ্যের সকল বিভাগে আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন ও উন্নতি বিধান করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই রাজ্য মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তাঁহারই সুপরামর্শে চালিত হইয়া,গোয়ালিয়রের মহারাজা বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দেন নাই। এমন কি বিদ্রোহী সিপাহীগণ রাজ্য মধ্য দিয়া গমনাগমন করিতে

আরম্ভ করিলেও তাঁহার শাসনগুণে গোয়ালিয়রের রাজবাহিনী আদৌ উত্তেজিত হয় নাই। তদ্ভিন্ন তিনি আরও নানা উপায়ে বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করেন। তাঁহার এই সকল উপকারের জন্য ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে বড়লাট আগ্রার দরবারে বিশেষভাবে ধন্যবাদ এবং পুরস্কার স্বরূপ কাশী জিলায় একটি জমিদারী প্রদান করেন। সেই বৎসরই তিনি গোয়ালিয়রের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কয়েক বৎসরের জন্য ঢোলপুর রাজ্যে এক উচ্চপদ গ্রহণ করেন। ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে তিনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার একজন সদস্য মনোনীত হন। কয়েক বৎসর পরে তিনি কে-সি-এস-আই (K. C. S. I.) উপাধি এবং ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে ঐ উপাধি বংশগত করিয়া দেওয়া হয়।

১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে, বরোদার গাইকোয়াড় মলহর রাওয়ের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচারের জন্য যে বিচারক গোষ্ঠী (Tribunal) মনোনীত হয়, দিনকর তাঁহার অন্যতম সদস্য ছিলেন

তিনি শেষজীবনে সর্ব্বপ্রকার কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন। সঙ্গীত শাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। সরলতা, বিনয়, প্রভৃতি মহৎগুণের জন্য তিনি লোকের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দিনরাজ ঘোষ—তিনি দিনাজপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বর্দ্ধনকুঠীর রাজা আজাবলের কন্যা কল্যাণীকে বিবাহ করিয়া বর্দ্ধনকুঠীর জমিদারীর সাত আনা অংশ প্রাপ্ত হন। তদ্ভিন্ন নবাব সরকারে তিনিও চাকুরী করিয়া প্রচুর ধন সঞ্চয় করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি দিনাজপুরের নবাব হইয়া রায় উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি একপ্রকার স্বাধীন নরপতিই ছিলেন। তাঁহার নামানুসারেই দিনাজপুর জিলার নাম হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর শুকদেব রায় রাজা হইয়াছিলেন।

মতান্তরে বঙ্গের স্বাধীন রাজা গণেশের জামাতা হরিরাম ঘোষ (অন্য নাম দিনরাজ ঘোষ) এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। দেবকীনন্দ ঘোষ নামে একজন উত্তর রাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থ সন্তান রংপুরে অন্তর্গত বর্দ্ধনকুঠীর রাজার উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার হরিনারায়ণ ও হরিরাম নামে দুই সুদর্শন পুত্র ছিল। রাজা গণেশ দেবকীনন্দনের কনিষ্ঠ পুত্র হরিরামের সহিত স্বীয় কন্যা কল্যাণীর উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। এবং হরিরামের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া দিনরাজ নাম রাখিলেন। রাজা গণেশের পুত্র যদু মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন

করিলে, দিনরাজ উত্তরদিকের পার্ব্বত্য জাতিকে দমন করিবার জন্য তথায় জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার উপাধি রায় হইল। যাহা হউক উভয় মতেই দিনরাজই দিনাজপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

দিনরাজের পুত্র শুকদেবের সময়ে কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ দিনাজপুর রাজ্য লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। মুঘল ও উজবেগ সর্দ্দারেরাও তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণ অংশ অধিকার করিয়াছিল। ১৬৭৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়দেব রাজা হইলেন। তিনি অকালে ১৬৮২ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে তাঁহার অনুজ প্রাণনাথ রায় জমিদারী প্রাপ্ত হইলেন। তিনি খুব পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। কোচবিহার-পতিকে পরাস্ত করিয়া তিনি স্বীয় অপহৃত রাজ্য অধিকার করেন। মুঘল সুবাদার মানসিংহকে সাহায্য করিয়া তিনি অনেক স্থান প্রাপ্ত হন। দিনাজপুর, রংপুর, বগুরা, রাজসাহী, মালদহ ও পূর্ণিয়া এই কয়েকটী জিলার কিয়দংশ তাঁহার অধিকারে ছিল। মানসিংহের চেষ্টায় প্রাণনাথ রায় ও কোচবিহার-পতি লক্ষ্মীনারায়ণের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয়। ১৭২৩ সালে প্রাণনাথ পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র রামনাথ রাজ্যাধিকারী হন। ১৭৪০ সালে বঙ্গের সুবাদার আলীবর্দ্দী খাঁ, দিল্লীর সম্রাট মোহাম্মদশাহ হইতে তাঁহাকে রাজার সনদ ও খিলাত আনাইয়া দেন। ১৭৬৩ সালে তিনি পরলোক গমন করিলে জ্যেষ্ঠ পুত্র বৈদ্যনাথ রায় রাজা হন। তাঁহার সময়ে ১৭৮৯ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশের সহিত দশশালা বন্দোবস্ত হয়। তিনি ১৭৯০ সালে পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র রাধানাথ রাজা হন। তাঁহার সময়ে জমিদারীর অনেক অংশ হস্তচ্যুত হয়। তৎপরে তাঁহার পুত্র গোবিন্দনাথ রায়ের সময়ে অধিকাংশ সম্পত্তির উদ্ধার হইয়াছিল। ১৮৫১ সালে তিনি পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র তারকনাথ রায় রাজা হন। ১৮৬৫ সালে তিনি অপুত্রক পরলোক গমন করিলে তাঁহার মহিষী শ্যামামোহিনী রায় গিরিজানাথ রায়কে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। এই বদান্য রাজা দেশের বহু সৎকর্ম্মে বহু টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া, বর্ত্তমান রাজা জগদীশ নাথ রায়কে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দিনশা এদালজি ওয়াচা (Dinshaw Edulji Wacha)—খ্যাতনামা পারশী দেশ নেতা। ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে বোম্বাই নগরে এক মধ্যবিত্ত পারশী বণিক পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। গৃহশিক্ষকের নিকট বাল্য শিক্ষা

লাভ করিয়া, দশ বৎসর বয়সে তিনি বোম্বাই এর প্রসিদ্ধ এলফিনষ্টোন ইনষ্টিটিউশনে (Elphinstone Institution) ভর্ত্তি হন। চার বৎসর পরে, স্কুল বিভাগের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, তিনি উহারই কলেজ বিভাগে প্রবেশ করেন। তখনও বিশ্ববিদ্যালয়কর্ত্তৃক প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তীক্ষ্ণধী ও অধ্যবসায়ী ছাত্র বলিয়া তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। সমস্ত কাজই তিনি যথাসাধ্য উত্তমরূপে করিতে ভালবাসিতেন। এই প্রকৃতি তাঁহার চিরজীবন সমভাবে ছিল। সেইজন্য পরবর্ত্তী জীবনে, রাজনীতি ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

কলেজের পাঠ সমাপন হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতা তাঁহাকে ব্যবসায়ে নিযুক্ত করেন। পিতার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া তিনি স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলে অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবসায় বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। ব্যবসায়ী অপেক্ষা রাজনীতিকরূপেই তিনি সমধিক খ্যাতি অর্জ্জন করেন। প্রথম কয়েক বৎসর তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি অথবা দেশসেবায় আত্ম নিয়োগ করিবার সুবিধা পান নাই। কিন্তু যখন ধীরে ধীরে জনসেবা ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, তখনই পূর্ব্বোক্ত গুণাবলীর জন্য সর্ব্বসাধারণের প্রশংসা লাভ করিতে লাগিলেন। ১৮৮০—৮৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর (Indian Spectator) নামক পত্রিকার সহিত যুক্ত ছিলেন। ঐ পত্রিকাতে, এবং দেশীয় ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত অন্যান্য পত্রিকাতেও ভারতের অর্থনীতি ও রাজস্বনীতি সম্বন্ধে তাঁহার অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। জনসেবার ক্ষেত্রে তিনি বরাবরই একটি উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কাজ করিতেন। অন্যায় অথবা অসৎভাবে কাহাকেও কোনও কাজ করিতে দেখিলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতেন এবং তীব্রভাবে ঐ সকল কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেন। ভারতপ্রবাসী প্রসিদ্ধ ইংরেজ সাংবাদিক নাইট সাহেব এই বিষয়ে তাঁহার গুরুস্থানীয় ছিলেন। ওয়াচা নিজেই একথা অনেকবার কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়াছিলেন। নাইট সাহেবের রচনাবলী পাঠ করিয়াই ভারতের ভূমি, রাজস্ব, অর্থনীতি প্রভৃতি জটিল বিষয় সমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করিবার জন্য তাঁহার মনে প্রবল স্পৃহা জন্মে এবং তিনি ঐ সকল বিষয়ে গভীরতর জ্ঞান লাভ এবং কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগেই বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

সুদীর্ঘকাল তিনি বোম্বাই পুরতন্ত্রের সদস্য ছিলেন। সেইখানেও তাঁহার স্বভাব সুলভ তেজস্বিতা, ন্যায়নিষ্ঠা কর্ম্মদক্ষতা প্রভৃতি মহৎগুণের জন্য তিনি

সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন। বোম্বাই পুরতন্ত্রের সদস্যরূপে জনহিতকর কার্য্যে তাঁহার কার্য্য এত বিস্তৃত ও বিভিন্নমুখী ছিল যে, আর খুব কম লোকের জীবনে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

মাদক ব্যবহার নিবারণের জন্যও তিনি নিজের শক্তি ও সময় ব্যয় করেন। এ বিষয়ে তিনি বোম্বাই অঞ্চলের প্রধান কর্ম্মীদের অন্যতম ছিলেন। ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি (Indian National Congress) এবং তৎস্থানীয় রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত তিনি প্রথমাবধি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। কংগ্রেসের কার্য্যে যখন হইতে চরম পন্থীদের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন হইতে তিনি প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের কার্য্য হইতে দূরে চলিয়া যান। কিন্তু দেশের রাজনীতি আন্দোলনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন নাই। ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে এলাহাবাদ নগরে অনুষ্ঠিত মহাসমিতির ষষ্ঠ অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৮৯৭ খ্রীঃ অব্দে বিলাতের প্রসিদ্ধ ওয়েলবী কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দানের জন্য বোম্বাই প্রদেশ হইতে তিনি ও গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রেরিত হন। বাঙ্গালা দেশ হইতে দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গমন করেন। (দাদাভাই নৌরজী ৮৮৩ পৃঃ ও গোপালকৃষ্ণ গোখলে ৪২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। তিনি যতদিন ঘনিষ্ঠ এভাবে কংগ্রেসের সহিত যুক্ত ছিলেন। ততদিন উহার অধিবেশনগুলিতে যথা সম্ভব উপস্থিত থাকিয়া, আলোচনা ও বিতর্কে উৎসাহের সহিত যোগ দিতেন। এই সকল আলোচনা সূত্রে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির মধ্যে, প্রথম অধিবেশনে সামরিক ব্যয়ের বাহুল্য সম্বন্ধে ; ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ অধিবেশনে লবণকর হ্রাস করার সপক্ষে, নাগপুরে পরবর্ত্তী বৎসর অনুষ্ঠিত অধিবেশনে ভারত সরকারের সামরিক ব্যয় ও সীমান্ত নীতির বিরুদ্ধে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি সমধিক বিখ্যাত।

দিনশা এদালজিওয়াচা কখনও দেশের জন্য কাজ করিয়া, নাম কিনিবার জন্য উৎসুক ছিলেন না। কর্ত্তব্যবোধে তিনি সব কাজ করিতেন এবং কর্ত্তব্যবোধে তিনি যাহা ঠিক বলিয়া বুঝিতেন, কোনওরূপ বিদ্রূপ বা ভীতি প্রদর্শনে সেই পথ হইতে বিচ্যুত হইতেন না। ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুষ্ঠুভাবেই সম্পাদন করা উচিত। (What is worth doing, is worth doing well) এই নীতি বাক্য তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। রাজনীতি ক্ষেত্রে শাসকবর্গের অন্যায় নীতির তিনি চিরকালই তীব্র ভাবে প্রতিবাদ করিতেন।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, ন্যায় ও সত্যের জন্য তীব্র অনুরাগ, দেশের মঙ্গলের জন্য অসামান্য পরিশ্রম প্রভৃতি মহৎগুণের জন্য তিনি রাজ সম্মান লাভেও বঞ্চিত হন নাই। প্রথমে তিনি C. I. E. ও পরে সার (Knight) উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৯৩৬ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বিরানব্বই বৎসরে এই কর্ম্মবীরের দেহান্ত হয়।

দিবাকর—(১) গোদাবরীর উত্তর তটে গোল গ্রামে (নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত বর্ত্তমান গোল) ভরদ্বাজ বংশীয় দিবাকর নামে এক মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার বংশে বহু জ্যোতিষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম রাম ছিল। দিবাকর নিজেও একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। 'গ্রহলাঘব' প্রণেতা বিখ্যাত জ্যোতিষী গণেশের তিনি শিষ্য ছিলেন। কালে তিনি স্বয়ং একজন বিখ্যাত অধ্যাপক হন। তৈত্তিরীয়গণের তিনি অগ্রণী, ভট্টাচার্য্য কুমারিলের ন্যায় অদ্বিতীয় মীমাংসক ছিলেন। কাশীতেই বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনায় নিরত থাকিয়া দেহত্যাগ করেন। শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু, মল্লারি, কেশব ও বিশ্বনাথ নামে তাঁহার বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পাঁচ পুত্র ছিলেন।

দিবাকর—(২) তিনি প্রথম দিবাকরের প্রপৌত্র। তাঁহার পিতা নৃসিংহ বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার ছিলেন। দিবাকর, কমলাকর, গোপীনাথ ও রঙ্গনাথ নামে নৃসিংহের চারি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিবাকর ১৬২৫ খ্রীঃঅব্দে 'পদ্ম জাতক' নামে একখানা জাতক পদ্ধতি প্রণয়ন করেন। কেশবের জাতক পদ্ধতির উপর ১৬২৬ খ্রীঃ অব্দে (১৫৪৮ শকে) প্রৌঢ় মনোরমা নাম্নী টীকা রচনা করেন। তাঁহার রচিত মকরন্দ বিবরণ, মকরন্দ সারণী জানিবার পথে প্রধান সহায়। এতদ্ব্যতীত তিনি পদ্ধতি প্রকাশ ও তাঁহার টীকা গণিত তত্ত্বচিন্তামণি প্রণয়ন করিয়াছেন। তির্য্যক, সার্থক, সারণী গ্রন্থ দিবাকর রচিত

দিবাকর—(৩) বর্ষফল পদ্ধতি গ্রন্থের রচয়িতা।

দিবাকর পাণ্ডা—পাণ্ডা, চৌধুরী, হিজলীর, তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা ও তাঁহার বংশধর বাহাদুর খাঁর সময় পর্য্যন্ত দ্বারকাদাস চৌধুরী ও দিবাকর পাণ্ডা চৌধুরী রাজস্ব সচিব ছিলেন। ১৬৬১ খ্রীঃ অব্দে বাহাদুর খাঁ রাজস্ব অনাদায়ের জন্য ধৃত হইয়া, ঢাকা নীত হইলেন। হিজলীর রাজস্ব আদায়ের জন্য ইহা দুই ভাগে খাজনামুটা ও জলামুটা বিভক্ত হইল। খাজনা মুটার ভার দ্বারকা দাস চৌধুর ও জলামুটার ভার, দিবাকর পাণ্ডা চৌধুরী পাইলেন।

বর্ত্তমান জলামুটার জমিদারেরা এই দিবাকরেরই বংশধর। তাজ খাঁ মস্‌নদ-ই-আলা ও বাহাদুর খাঁ দেখ।

দিবাকর মিশ্র—একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। তাঁহারই আশ্রমে থানেশ্বরের অধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের ভগিনী রাজশ্রী স্বামীর নিধনের পরে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। কনৌজের গ্রহ বর্ম্মার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। মালবরাজ কর্ত্তৃক তাঁহার স্বামী নিহত হয়। সেই সময়ে রাজশ্রী বন্দী হন, পরে তাঁহাকে মুক্তি দিলে, তিনি তাঁহার স্বামীর বন্ধু দিবাকর মিশ্রের আশ্রমে আশ্রয় প্রাপ্ত হন। এই স্থানে তিনি অগ্নিতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহার ভাই হর্ষবর্দ্ধন আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। রাজশ্রী, হর্ষবর্দ্ধন দেখ।

দিবাকর সেন—পুনা নগরে প্রাপ্ত প্রাপ্ত বাকাটক বংশের রাণী প্রভাবতীর তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, মগধের সমুদ্র গুপ্তের পৌত্রী, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতী বাকাটক বংশের অধিপতি রুদ্রসেনের প্রধানা মহিষী ছিলেন। তাঁহাদের পুত্র দিবাকর সেন।

দিবোদাস—কাশীর রাজা। তিনি একজন অসাধারণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। সেজন্য সাধারণতঃ লোকে বলিত স্বয়ং ধন্বন্তরী কাশীরাজ দিবোদাস রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের নাম 'চিকিৎসা দর্পণ'। বিশ্বামিত্রের পুত্র সুশ্রুত ও অন্যান্য ঋষি কুমারেরা তাঁহার নিকট আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

দিব্যসিং—খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড় নামক স্থানে কাত্যায়ন গোত্রীয় দিব্যসিং নামে এক স্বাধীন ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজধানী লাউড়ের অন্তর্গত নবগ্রামে ছিল। সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্যের পিতা দত্তক চন্দ্রিকা প্রণেতা কুবেরাচার্য্য দিব্যসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য শান্তিপুরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইলে, দিব্যসিংহ তথায় গমনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তখন তাঁহার নাম কৃষ্ণদাস হয়। তিনি সাধারণতঃ লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি "বাল্যলীলাসূত্র" নামে অদ্বৈতাচার্য্যের বাল্যকালের বিবরণ সম্বলিত এক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। তদ্ব্যতীতও সংস্কৃত "বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী" নামক গ্রন্থের তিন পদ্যানুবাদ করেন।

দিব্যসিংহ দ্বিতীয়—তিনি খুর্দ্দার গজপতি রাজা প্রথম বীরকিশোর দেবের পৌত্র ছিলেন। ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় মুকুন্দ রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন।